দর্শনকোষ
সরদার ফজলুল করিম

দর্শনকোষ

সরদার ফজলুল করিম

প্যাপিরাস

পুনঃমুদ্রণ
জানুয়ারি ২০১২

পঞ্চম সংস্করণ
জুলাই ২০০৬

প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রকাশক
মোতাহার হোসেন
প্যাপিরাস
১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন ৯৬৬১০৬৬

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস
কালজয়ী কম্পিউটার
৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
রিকো প্রিন্টার্স
৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫

মূল্য
চারশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-8065-02-4

DARSHANKOSH Dictionary of Philosophy containing explanations of selected terms and problems in philosophy, political science, history and sociology including brief statements of theories and thinkers in these fields in bengali by Sardar Fazlul Karim. Published by Motahar Hossain, PAPYRUS, Shahbag, Dhaka 1000, Bangladesh. First Papyrus enlarged edition, February 2002. Second Edition. May 2006. Reprint January 2012. Price : Tk. 450 & $ 50.00.

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের
জ্ঞানানুরাগী
পাঠকদের উদ্দেশে

দর্শনকোষের পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

(প্যাপিরাস-এর দ্বিতীয় সংস্করণ)

আমার পরিতাপের বিষয়, দর্শনকোষের বর্তমান সংস্করণের পূর্ব সংস্করণের (প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ) 'গেটিসবার্গ ভাষণটি' যিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তিনি প্রফেসর এ.এন.এম. শামসুল হক আজ প্রয়াত।

বর্তমান সংস্করণটিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা ১৫টির অধিক অন্তর্ভুক্তি সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এই সংকলনটির সংকলক হিসেবে অনুভূতিটি এরূপ যে, 'মানুষ হিসেবে ব্যক্তির মৃত্যু হলেও দর্শনকোষখানির মৃত্যু ঘটবে না।'

বর্তমান পঞ্চম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত 'ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত' স্নেহভাজন মোতাহার হোসেন প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ।

ঢাকা
এপ্রিল ২০০৬

সরদার ফজলুল করিম

'দর্শনকোষ'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

আমার 'দর্শনকোষ'-এর বর্তমান সংস্করণের মুখবন্ধ বা ভূমিকার প্রতিবেদনটিতে যে একটি সার্থকতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে, তা আমি এর রচয়িতা হিসাবে অস্বীকার করব না।

দৈহিক বয়স এখন আমার ৭৬ পেরিয়েছে। মানুষের নাকি অধিককাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা হয়। সংকটময় বাংলাদেশের সংকটগ্রস্ত একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার-প্রধান হিসাবে তেমন ইচ্ছা আমার থাকা ঠিক নয়। পালনীয় দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা বহন করে বেঁচে থাকা উচিত কাজ নয়।

আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আমি জানি। তথাপি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে আমি আমার জীবনের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতায় এই প্রত্যয়টি বোধ করি যে, আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের সর্বশাখার জ্ঞান আমাদের কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী এবং পাঠকবর্গের কাছে যথাসম্ভব সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় যদি পৌঁছে দিতে আমরা না পারি, তা হলে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মানের উন্নতি ঘটবে না। এই উদ্দেশ্য নিজের মনে ধারণ করে যা কিছু সৃষ্টিমূলক কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা আমি করেছি, তার মধ্যে নানা বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের আকর হিসাবে 'দর্শনকোষ'খানি দেশের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং পাঠকবর্গের নিকট যে, প্রিয় এবং পরিচিত হয়ে উঠেছে, এটিকে আমি আমার জীবনের একটি সার্থকতা বলে গণ্য করি।

আমি দর্শনকোষখানির প্রত্যেক সংস্করণকেই আমার জীবনের সর্বশেষ সম্পাদনা বলে বিবেচনা করেছি। তবু আমার সরল সেই বিবেচনাকে অতিক্রম করে দর্শনকোষখানির জন্য যে আজো পাঠকের মনে একটি প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগ্রত রয়েছে তার মূল আমাদের সর্বশাখার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ।

আমি মনে করি গ্রন্থখানির অনিবার্য সীমাবদ্ধতা যাই থাক, গ্রন্থখানি আমাদের জাতীয় জীবনের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রয়োজনকে যথাসাধ্য পূরণ করে চলবে। আমার তিরোধানের পরেও।

যাঁদের স্নেহ, সাহায্য, পরামর্শ এবং পর্যালোচনা দর্শনকোষখানিকে পাঠকবর্গের কাছে প্রিয় করে তুলেছে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, যে-কৃতজ্ঞতা আমার প্রকাশ ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

এঁদের মধ্যে আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, শিক্ষাগুরু প্রয়াত জ্ঞানাচার্য অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের স্মৃতি আমার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু এখনো সঞ্চারিত করে। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি তাঁর উপস্থিতিতেই ঘটেছিল। তিনি সেদিন আমাকে সস্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং দর্শনকোষখানিকে আরো সুসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করতে বলেছিলেন।

তারপরে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন সময়ের কর্মাধ্যক্ষ এবং কর্মীবৃন্দ পরপর কয়েকটি সংস্করণে দর্শনকোষখানিকে প্রকাশ করে এসেছেন।

সাম্প্রতিক কালে দর্শনকোষখানির প্রাপ্তি পাঠকদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে বাংলা একাডেমীর ইচ্ছা সত্ত্বেও তাদের আর্থিক নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দ্রুত গ্রন্থখানার পুনঃপ্রকাশে অসুবিধা বোধ করলে, নতুন প্রজন্মের পরিচিত একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'প্যাপিরাস' যে সহৃদয়তার সঙ্গে 'দর্শনকোষ' খানির বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এ জন্য আমি নিজে এবং সোৎসাহী পাঠকবর্গ আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।

বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত 'গেটিসবার্গ ভাষণটি' সুহৃদবর অধ্যাপক এ.এন.এম. শামসুল হক সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ফেব্রুয়ারি, ২১ **সরদার ফজলুল করিম**
২০০২ সাল

ভূমিকা

(প্রথম বাংলা একাডেমী সংস্করণের)

কোনো এনসাইক্লোপেডিয়া বা জ্ঞানকোষ একক প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এজন্য যৌথ প্রচেষ্টা আবশ্যক। ইংরেজি ভাষায় ছোটবড় আকারের নানা এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রকাশ দেখা যায়। বাংলা ভাষায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে এরূপ জ্ঞানকোষ নাই। জ্ঞানকে সর্বজনীন করার জন্য জ্ঞানকোষ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে আমাদের নিদারুণ দৈন্যই আমার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থ রচনার মানসিক তাগিদ সৃষ্টি করে। সে প্রায় ছ'বছর পূর্বের কথা। নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা আমি জানি। তথাপি এক্ষেত্রে কিছু না করাকে নিজের মনে অপরাধ বলে বোধ হয়েছে। এই মানসিক বোধ থেকে এবং বন্ধুজনদের উৎসাহে কাজটি শুরু করি। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ একাডেমীর গবেষণা পত্রিকাতে 'দর্শনকোষ'খানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন ১৯৬৮ সনে। একাডেমী পত্রিকাতে প্রকাশিত হতে থাকলে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্রবন্ধু এবং জ্ঞানানুরাগী বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আমি আন্তরিক উৎসাহজনক সাড়া পেতে থাকি। তাঁরা সবাই 'দর্শনকোষ'খানি সমাপ্ত করার তাগিদ দেন। তাঁদের এই তাগিদ এবং পরামর্শ আমার এই কাজে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগায়।

'দর্শনকোষ' নামে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও দর্শনকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের অত্যাবশ্যকীয় পদ, তত্ত্ব, তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তির উপর রচিত ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধের ভিত্তিতে বর্তমান কোষখানি তৈরি করা হয়েছে। এরূপ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সংখ্যা চার শতের অধিক। জ্ঞানকোষের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নাই। বর্তমান কোষ আকারে খুব বৃহৎ নয়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে আমাদের জ্ঞান এবং শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে সযত্ন লক্ষ্য রেখে নির্বাচন করা হয়েছে। ব্যাখ্যা কিংবা বিবরণের পরিধিও সীমাবদ্ধ। তার কারণ, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বিষয়গুলিকে প্রাথমিকভাবে বাংলা ভাষায় উপস্থিত করা এবং পাঠকদের মনে বিষয়গুলির প্রতি কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি করা যাতে তাঁরা বৃহত্তর কোষ কিংবা গ্রন্থের মধ্যে তাঁদের জ্ঞানের পিপাসা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।

কাজটি অগ্রসর হচ্ছিল। এমন সময়ে দেশের উপর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তনীয় বর্বর হামলা শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রিতে। এরপর যে-বর্বরতার অন্ধকার যুগ বাংলাদেশের বুকে নেমে আসে তাতে কত জ্ঞানী, গুণী, কবি, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, শিক্ষক নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তাঁর সংখ্যা আজো নির্দিষ্ট হয় নি। সেই অন্ধকার পর্যায়েও আপন শক্তি ও সাধ্যমতো 'দর্শনকোষে'র কাজটি চালাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আমাকে পরবর্তীকালে গ্রেপ্তার করে বন্দিনিবাসে নিক্ষেপ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বন্দিনিবাস থেকে মুক্ত হয়ে আমি আবার কাজ শুরু করি এবং গত বৎসরই কাজটি সমাপ্ত করে একাডেমীর কাছে পেশ করি।

জ্ঞানকোষ মাত্রেরই সংযোজন এবং সংশোধনের অবকাশ থাকে। নতুন বিষয় সংযোজনের কাজটি চালিয়ে যাব। সম্ভব হলে নতুন সংস্করণের পূর্বেই কোষের নতুন সংযোজন প্রকাশ করা হবে। 'দর্শনকোষ' রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করা হয়েছে তার উল্লেখ অন্যত্র করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ এবং সুহৃদজনের কাছে অনুরোধ, তথ্য কিংবা তত্ত্বগত কোনো গুরুতর ভুল নজরে পড়লে তাঁরা যেন লেখককে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন।

'দর্শনকোষ' রচনার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে একাধিক সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা মনে পড়ছে। তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক 'দর্শনকোষ' প্রকাশের ব্যাপারে যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশন দপ্তরের পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বি সহ-পরিচালক জনাব আবুল হাসানাত, গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল হক এবং বাংলা একাডেমীর অপরাপর বন্ধুরা এই 'দর্শনকোষ'-এর সঙ্গে গোড়া থেকে এর উৎসাহদাতা এবং পরামর্শদাতা হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষা বিভাগের প্রধান জনাব আবদুল হাই বাংলা একাডেমীতে নিযুক্ত থাকাকালে এই দর্শনকোষ রচনার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। বাংলা একাডেমীর মুদ্রণালয়ের কর্মীদের আগ্রহ এবং যত্ন ব্যতীত দর্শনকোষ প্রকাশে অধিকতর বিলম্ব ঘটত। তাঁদের মধ্যে মুদ্রণালয়ের অফিসার জনাব চৌধুরী আবদুর রহমান, জনাব শামসুদ্দীন, জনাব মোহাম্মদ আফজাল হোসেন এবং অন্যান্য কর্মী তাঁদের যত্ন এবং পরিশ্রম দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন 'দর্শনকোষ'কে মুদ্রণপ্রমাদ মুক্ত রাখতে। তথাপি অনিবার্যভাবে মুদ্রণপ্রমাদ কিছু রয়ে গেছে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণ অধিকতর শুদ্ধ এবং পূর্ণতরভাবে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থের মধ্যে বিষয়ের ইংরেজি নাম এবং বর্ণক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, আমাদের শিক্ষিত মহলে এর বেশিরভাগ বিষয়ের ইংরেজি নাম এখনো পরিচিত এবং প্রচলিত। বর্তমানে প্রয়োজন এই বিষয়গুলির বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা। গ্রন্থশেষে ইংরেজি এবং বাংলা বর্ণক্রমের ভিত্তিতে বিষয়সূচি সংযুক্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে আবার বলি কোনো জ্ঞানকোষই সম্পূর্ণ নয়। কারণ, জ্ঞানের শেষ নাই। জ্ঞানকোষ মাত্রই আমাদের মনে কিছু তৃপ্তি এবং অনেক অতৃপ্তি এবং অন্বেষার সৃষ্টি করে। আমার এ প্রচেষ্টাও যদি জ্ঞানপিপাসুর মনে কিছু তৃপ্তি এবং অনেক অতৃপ্তি এবং অন্বেষার সঞ্চার করতে পারে তা হলেই নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করব।

সরদার ফজলুল করিম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮ই ভাদ্র, ১৩৮০
২৫শে আগস্ট, ১৯৭৩

যে ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা নিয়েই 'দর্শনকোষ' রচনার দুঃসাহস দেখাতে হয়েছিল সে সীমাবদ্ধতাকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেও যে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি, তা এই গ্রন্থের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের কাছে উল্লেখের প্রয়োজন হবে না। 'দর্শনকোষ' যে বহুদিন যাবৎ বই-এর দোকানে, এমনকি সড়কের উপরে কিংবা দুষ্প্রাপ্য বস্তুর আধারেও অপ্রাপ্য হয়ে রয়েছে, এটি পাঠকদের প্রীতিরই স্মারক। 'দর্শনকোষ'কে তাঁরা বর্জনীয় পদার্থ বলে গণ্য করেন নি, তাকে সংরক্ষণের বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন। পথে ঘাটে তরুণ ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষার্থী, বন্ধুজন, সুহৃদ, শিক্ষাবিদ এবং পাঠকবৃন্দের তাগিদ এবং দাবি ছিল, 'দর্শনকোষ'-এর নতুন একটি সংস্করণের। কিন্তু সে দাবি পূরণ করা লেখকের নিজের ক্ষমতার মধ্যে নাই। এবং তার 'দর্শনকোষ'-এর বর্তমান নতুন সংস্করণের প্রধান কৃতিত্ব বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মনজুরে মওলার, যিনি গ্রন্থখানির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সংকট সত্ত্বেও এর নতুন সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

'দর্শনকোষ' প্রকাশিত হওয়ার পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। তাঁর এমন উৎসাহদানে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর মোহাম্মদ আবু জাফর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের 'বই' মাসিকে 'দর্শনকোষ'-এর একটি বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে এই গ্রন্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বেশ কয়েকটি পরামর্শও প্রদান করেছিলেন। আমি সকৃতজ্ঞভাবে তাঁর আলোচনা পাঠ করেছি এবং তাঁর সুপরামর্শের দিকে খেয়াল রেখে যথাসাধ্য একে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থের গুণগ্রাহী আলোচনা করেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তরুণ শিক্ষক মোকাররম হোসেনও। তিনিও আমার ধন্যবাদের পাত্র। চট্টগ্রামের এক তরুণ পাঠক সাগ্রহে চিঠি লিখে গ্রন্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। এরূপ জানা অজানা পাঠকবর্গের অকৃপণ উৎসাহদান আমার মধ্যে 'দর্শনকোষ' রচনার একটা সার্থকতাবোধ সৃষ্টি করেছে। আমার জীবনকালে 'দর্শনকোষ'-এর নতুনতর কোনো সংস্করণ হবে, এমন আশা করা, বিরাজমান পরিস্থিতিতে, কিছুটা দুরাশা। কিন্তু এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি যে, 'দর্শনকোষ'-এর উত্তরপুরুষরা জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নানা জ্ঞানকোষ তৈরি দ্বারা এর সূচনার ধারাটি সমৃদ্ধ করে চলবেন। ইতোমধ্যে 'সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ', 'ইতিহাসকোষ', 'জ্ঞানের কথা', 'চরিতাভিধান' প্রভৃতি শিরোনামে ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারের বিভিন্ন গ্রন্থ যে বাংলাদেশে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং নতুনতর উদ্যোগে যে আরো নানা ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হচ্ছে, এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের লক্ষণ।

বর্তমান 'দর্শনকোষ' কেবল দর্শনশাস্ত্রের পদ কিংবা সমস্যার আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণভাবে এ গ্রন্থ একটি ক্ষুদ্র জ্ঞানকোষ। সে কারণে ক্ষমতানুযায়ী এবং গ্রন্থের আকারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এর বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক শত নতুন অন্তর্ভুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি এ কোনো সুসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ

নয়। নতুন সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্তের পরে '৮৫ সালের মহান একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশনা সমাপ্ত করার লক্ষ্যে গ্রন্থের সর্বদিকে দৃষ্টিপাতের সময় খুবই সংকীর্ণ ছিল। সে কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিমাণ হয়তো কম নয়। তথাপি যথাসাধ্য শুদ্ধ মুদ্রণ এবং অন্যান্য পারিপাট্যের প্রতি বাংলা একাডেমীর পাঠ্য পুস্তক ডিভিশনের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম, তাঁর সহকর্মী জনাব ফজলুল হক সরকার, জনাব আবদুল ওয়াহাব এবং আহ্ছানিয়া মিশন প্রেসের কর্মী জনাব মোহসীন যে সাগ্রহ তত্ত্বাবধান প্রদান এবং পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্য তাঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। 'হিপোক্রাটিসের শপথ'টি সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্নেহভাজন ডা. এস. এ. মাহমুদ। তাঁকে আমার স্নেহাশীর্বাদ।

'দর্শনকোষ'-এর অবশ্যই একটি দর্শন আছে। বলা চলে রচনাকার বা সংকলকের দর্শন। সেটি জটিল কোনো দর্শন নয়। সে কেবল এই সহজ বিশ্বাস যে, মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ত বিকাশশীল। প্রবহমান। কেবল যান্ত্রিকভাবে নয়। সচেতন, সংঘবদ্ধ, সমাজগত যৌথ প্রচেষ্টায় উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম জীবন সৃষ্টির লক্ষ্যে বিকাশমান প্রয়াস। মানুষের সমাজ জীবনের এমন বিকাশে শতবৎসরও কোনো হিসাবের কাল নয়। আসলে যেমন স্থান অসীম, তেমনি কাল অসীম। তাতে বর্তমানের কোনো সংকট, প্রতিবন্ধক কিংবা আশাভঙ্গ সেই অনিবার্য বিকাশের পরিচয়সূচক ব্যতীত তাকে রুদ্ধ করে দেওয়ার কোনো শক্তির প্রকাশ নয়। সেই বিশ্বাসে স্থির থেকেই বর্তমান নিবেদনের ইতি টানছি। এ গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞানানুরাগী পাঠকবৃন্দের। তাঁদের উদ্দেশেই এ গ্রন্থ উৎসর্গিত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

সরদার ফজলুল করিম

'দর্শনকোষ'-এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সনে। বেশ কিছুদিন ধরে এ সংস্করণের কপি আর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। একাডেমীর বিক্রয়কেন্দ্রের কর্মীরাই 'দর্শনকোষ'-এর নতুন সংস্করণের জন্য আমাকে তাগিদ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্য পাঠকবর্গ 'দর্শনকোষ'খানি ক্রয়ের জন্য প্রায়শই একাডেমীর বিক্রয়কেন্দ্রে আসেন। কিন্তু কপি নিঃশেষিত হওয়ার কারণে 'দর্শনকোষ' তাঁরা ক্রয় করতে পারেন না বলে তাঁদের উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে 'দর্শনকোষ' পুনর্মুদ্রণের কথা বলেছেন। তাঁদের তাগিদ এবং বাংলা একাডেমীর অনুকূল সিদ্ধান্তে 'দর্শনকোষ'-এর তৃতীয় সংস্করণটি এখন প্রকাশিত হলো। এ জন্য আমি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর তেমন বৃদ্ধি করা না গেলেও পূর্বতন সংস্করণের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের অসামান্য লোকদার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব আজ প্রয়াত। তাঁর পরিচয়দানের দায়বদ্ধতা থেকে 'দর্শনকোষ'-এর বর্তমান সংস্করণের উপযুক্ত স্থানে তাঁর উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি যুক্ত করেছি।

যথাসাধ্য সংশোধনের মাধ্যমে সময়বোধক আলোচনাকে সমকালীন পর্যায়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। সব আলোচনাতে তা হয়তো সম্ভব হয় নি। পাঠকবৃন্দ আশা করি সে দিকটি খেয়ালে রেখে আলোচনার বিষয়কে অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন।

শব্দের বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী গৃহীত বানান পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যে এই নিয়ম রক্ষিত হয়েছে এমন হয়তো বলা যাবে না।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞানানুরাগী পাঠকদের উদ্দেশে এই সংস্করণটি উৎসর্গিত হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

সরদার ফজলুল করিম

দর্শনকোষ

A

Abelard, Pierre : পিয়ারে আবেলার্দ (১০৭৯-১১৪২ খ্রি.)

একাদশ ও দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। 'ইউনিভার্সাল' বা অনন্য-নির্ভর ভাবের অস্তিত্বের প্রশ্নে আবেলার্দ মন-নির্ভর ভাবের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আবেলার্দের মন-নির্ভর ভাবের মতবাদ ভাবাদর্শের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর ধর্মব্যাখ্যাও খ্রিষ্টান ধর্মের 'গোঁড়া ক্যাথলিক মতের' বিরোধী ছিল। আবেলার্দের 'সিক এট নন' 'হ্যাঁ এবং না' নামক গ্রন্থখানি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই পুস্তকে তিনি যাজক সম্প্রদায়ের প্রচারিত ধর্মীয় ব্যাখ্যার পরস্পর-বিরোধিতা প্রতিপন্ন করেন এবং ধর্মের প্রশ্নে যুক্তিকে অগ্রাধিকার দান করেন। উপরোক্ত গ্রন্থে আবেলার্দ বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নকে দ্বন্দ্বমূলকভাবে আলোচনা করেন। প্রশ্নের ক্ষেত্রে সমাধান না থাকলেও তাঁর আলোচনার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ এবং যুক্তিমূলক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবেলার্দের অভিমত ছিল, ধর্মীয় বিশ্বাস-বহির্ভূত যে-কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবাদী পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি। আবেলার্দের জীবনকালে তাঁর অভিমত অধিকাংশ দার্শনিকের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হলেও যুগের বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবেলার্দ বলতেন, 'ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বাদ দিলে এমন কিছু নাই যাকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করা যায়। ধর্মযাজক কিংবা প্রেরিত পুরুষ কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।'

আবেলার্দের এরূপ যুক্তিবাদী মতের জন্য গোঁড়া ক্যাথলিক সম্প্রদায় তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল।

Absolute : পরম বা চরম সত্তা

ভাববাদী দর্শনে 'পরম সত্তা' একটি মৌলিক ধারণা। এই দর্শনের ব্যাখ্যানুযায়ী পরম সত্তা হচ্ছে চরম সম্পূর্ণ এক অস্তিত্ব। সমস্ত খণ্ড অস্তিত্ব পরম সত্তার প্রকাশ। কিন্তু কোনো খণ্ড অস্তিত্ব আপন শক্তিতে পরম সত্তার কোনো হানি বা অপূর্ণতা ঘটাতে পারে না। পরম সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। খণ্ড অস্তিত্বের সাধারণ সম্মেলনেও পরম সত্তার সৃষ্টি নয়। পরম সত্তা সমস্ত সৃষ্টির মূল শক্তি। পরম সত্তা নির্বিশেষ সত্তা। সর্বপ্রকার বিশেষ-প্রকাশ-নিরপেক্ষ সে। বস্তুবাদী দর্শন খণ্ড অস্তিত্ব বা বিশেষ-নিরপেক্ষভাবে কোনো পরম এবং নিরাকার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। পরম সত্তাকে বিভিন্ন ভাববাদী দার্শনিকের তত্ত্বে বিভিন্ন নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে পরম সত্তা 'দি আইডিয়া' বা বস্তু নিরপেক্ষ ভাব বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ফিকটে অহংবোধ 'আমি'কে পরম সত্তা বলেছেন।

হেগেলের দর্শনে পরম সত্তাকে এক সার্বিক এবং পরম ভাব বলে প্রকাশ করা হয়েছে। শপেনহার 'ইচ্ছা শক্তি'কেই পরম সত্তা বলেছেন। বার্গসঁা একে ইনটুইশন বা স্বজ্ঞা বলেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে পরম সত্তা বলে অভিহিত করা হয়।

Absolute and Relative : নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ

যুক্তিবিদ্যায় যে পদ অপর কোনো পদের উপর নির্ভরশীল নয় তাকে নিরপেক্ষ পদ বলে, যেমন—মানুষ, পানি, মাটি। অপরদিকে যে পদের অর্থ অপর কোনো পদের উপর নির্ভরশীল তাকে রিলেটিভ বা আপেক্ষিক পদ বলে। যেমন—ছাত্র কিংবা শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষককে যুক্তভাবে পরস্পর নির্ভরশীল পদ বা 'কোরিলেটিভ টার্মস' বলে। দর্শনে অনন্য-নির্ভর সত্তাকে এ্যাবসোলিউট এবং নির্ভরশীল সত্তাকে আপেক্ষিক সত্তা বা 'রিলেটিভ' বলা হয়। অনন্য-নির্ভর সত্তা অপর কোনো সত্তার উপর নির্ভরশীল নয় ; অপর কোনো সত্তার সঙ্গে সে যুক্ত নয়। অনন্য-নির্ভর সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ; তার কোনো পরিবর্তন নাই।

আপেক্ষিক সত্তা অপর সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত। পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সম্পর্কের ভিত্তিতেই সামগ্রিক সত্তার উদ্ভব। সামগ্রিক সত্তার প্রতি অংশ অপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সংযোগের ভিত্তিতেই প্রতিটি অংশ বা খণ্ডের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে অনন্যনির্ভর স্বাধীন এবং অপরিবর্তনীয় চরম বলে কিছু নাই এবং তেমন কোনো অস্তিত্বের কল্পনা করাও চলে না। অস্তিত্বমাত্রই আপেক্ষিক। আপেক্ষিকের জটিল সম্মেলনে যে সামগ্রিক সত্তা সে তার অংশসহ নিরন্তর পরিবর্তমান ও বিকাশশীল।

Absolutism : নিরঙ্কুশতা

শাসনের অবাধ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ শাসন বলা হয়। নিরঙ্কুশ শাসনে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করার অধিকার ভোগ করে না। নিরঙ্কুশ শাসনের বিপরীত হলো গণতান্ত্রিক শাসন।

গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিতে কোনো এক ব্যক্তি বা সম্রাট শাসনের একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে না। নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণই জনসাধারণকে শাসন করে। গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার আধুনিককালের সর্বজন স্বীকৃত এবং কাম্য ব্যবস্থা বলে পরিচিত। প্রাচীন গ্রিসে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাচীন গ্রিসের এই গণতন্ত্রে দাসদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। গ্রিক সভ্যতার ধ্বংসের পরবর্তীকাল থেকে আধুনিক পুঁজিবাদী বিপ্লব পর্যন্ত ইউরোপে এবং অন্যত্র সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজা বা সম্রাটদের একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

Abstract and Concrete : বিমূর্ত এবং মূর্ত

যুক্তিবিদ্যায় যে পদ দ্বারা বস্তু-নিরপেক্ষভাবে কোনো গুণ বুঝায় তেমন পদকে গুণবাচক বা এ্যাবস্ট্রাক্ট পদ বলে। যথা, মনুষ্যত্ব, দয়া, অন্ধত্ব। অপর পক্ষে যে পদ দ্বারা কোনো বস্তু বুঝায় তাকে বস্তুবাচক পদ বা কনক্রিট টার্ম বলে। যথা, গাছ, রহিম, ঢাকা শহর ইত্যাদি।

দর্শনে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাকে বিমূর্ত এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকে মূর্ত বলা হয়। মূর্ত এবং বিমূর্তের প্রশ্নে ইতিহাসে মত পার্থক্য দেখা যায়। ভাববাদী দর্শনে বিমূর্তকেই পরম বলে মনে করা হয়। বস্তুবাদী দর্শনে মূর্তের গুণাগুণকে মানসিকভাবে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করাকে বিমূর্ত ক্ষমতা বলা হয়। ঊনবিংশ শতকে জার্মান দার্শনিক হেগেল মূর্ত এবং বিমূর্তকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুনতর ব্যাখ্যাসহ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। হেগেল মূর্ত এবং বিমূর্তের একটি দ্বন্দ্বমূলক এবং নিত্য বিকাশমান সম্পর্কের কল্পনা করেন। হেগেলের নিকট বিমূর্ত মূর্তের বিপরীত কোনো ভাব বা বস্তু নয়। নিরন্তর বিকাশে মূর্ত বিমূর্তে পরিণতি লাভ করে। এই বিমূর্ত আবার মূর্তেও প্রকাশিত হয়। হেগেলের চরম বিমূর্ত অবশ্য একটি ভাববাদী ধারণা। সে ব্যাখ্যায় মূর্ত বিমূর্তের আংশিক প্রকাশ। ইতিহাস, সমাজ, বস্তুজগৎ : সবই এরূপ ব্যাখ্যায় চরম বিমূর্তের মায়ারূপ প্রকাশ—স্থায়ী সত্য নয়। বস্তুবাদী দর্শন, বিশেষ করে মার্কসবাদী দর্শন হেগেলের মূর্ত-বিমূর্তের ব্যাখ্যায় পরস্পর-বিরোধিতা আরোপ করে। মার্কসবাদী দার্শনিকদের মতে মূর্তের বিকাশ ও সামগ্রিকতাই যদি বিমূর্তের সৃষ্টি, তবে মূর্তবিচ্ছিন্নভাবে বিমূর্তের কোনো অস্তিত্ব নেই। তেমন ক্ষেত্রে মূর্তই চরম সত্য, বিমূর্ত নয়। এবং সমাজ, ইতিহাস, জগৎকে বিমূর্তের ভ্রান্তিকর খণ্ড প্রকাশ বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

মার্কসবাদী দর্শনের মতে ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-মাধ্যমের গ্রাহ্য বস্তু, ভাব এবং ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞান-সাপেক্ষ জগৎই সত্য। জ্ঞান-সাপেক্ষ জগতের সামগ্রিক ধারণাই বিমূর্ত ধারণা। জ্ঞেয়-জগতের ঊর্ধ্বে কোনো অজ্ঞেয় বিমূর্ত সত্তা নেই। জ্ঞান-সাপেক্ষ-মূর্ত জগতের প্রতিটি অংশ প্রতিটি অংশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত।

সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'এ্যাবস্ট্রাক্টের' অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর আংশিক বা অপূর্ণ ধারণা। 'সাধারণ জ্ঞান', 'সাধারণ ধারণা' এরূপ কথা দ্বারা এই ভাবটি ব্যক্ত করা হয়। এর বিপরীত ভাবে 'কনক্রিট' কথাটি ব্যবহৃত হয়। কনক্রিট বলতে কোনো কিছুর বস্তুগত বা নির্দিষ্ট ধারণাকে বুঝায়।

Abdul Gaffar Khan : আবদুল গফফার খান (১৮৯১-১৯৮৮)

'খান আবদুল গফফার খান'রূপে ইনি পরিচিত। আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকার অধিবাসী। উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনকালে গান্ধীজির অহিংস নীতির অনুসারী বলে 'সীমান্ত গান্ধী' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পুশতুভাষী এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজেদের একটি বিশিষ্ট জাতি বলে বিবেচনা করে। ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানভুক্ত হলেও খান আবদুল গফফার খান তাঁর এলাকার আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 'পাখতুনিস্তান' আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তিনি 'খোদাই খেদমতগার' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজ শাসনের কাল ব্যতীত পাকিস্তান আমলেও তাঁর স্বাধীনচেতা এবং পাখতুনদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবির কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ প্রকৃতিগতভাবে দুর্ধর্ষ বলে পরিচিত। তাঁদের জনপ্রিয় নেতার মৃদুভাষণ, নম্র আচরণ এবং আপন নীতিতে অনমনীয়তা খান আবদুল গফফার খানকে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন করেছে। বয়সের

দিক থেকে শতবর্ষ পূরণের নিকটবর্তী বয়সেও তিনি রাজনৈতিক জীবন যাপন করেছেন এবং পাখতুনদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন। ভারত সরকার খান আবদুল গফফার খানের সংগ্রামী জীবনের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে নেহেরু অ্যাওয়ার্ড (১৯৬৭) এবং ভারত রত্ন (১৯৮৭) প্রদান দ্বারা সম্মানিত করে। ১৯৮৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

Abul Kalam Azad, Maolana : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৪)

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ইসলাম ধর্মের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। পিতা মওলানা খায়রুল দীন এবং পিতামহের সূত্রে মৌলানা আজাদের পরিবারের আরবের হেজাজ এবং মক্কার সঙ্গে সংযোগ ছিল। তাঁর পিতা একজন প্রখ্যাত পির ছিলেন এবং বোম্বে, কলকাতা এবং রেঙ্গুনে তাঁর প্রচুর সংখ্যক মুরিদ ছিল।

আবুল কালামের শিক্ষা প্রধানত গৃহের মধ্যে পারিবারিক প্রথায় পরিচালিত হয়। কিন্তু কিশোরকাল থেকেই আবুল কালাম ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। "প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির পাঠক্রমের সবগুলি শিক্ষণীয় বিষয় তিনি পিতার শিক্ষকতায় পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। ইহার পরে আজাদ গভীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে তিনি প্রথমে ফরাসি এবং পরে ইংরেজি শিক্ষা করেন।" কিশোরকাল থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। এবং 'আজাদ' তাঁর কবিনাম। উর্দু ভাষায় তিনি ক্ষমতাবান বাগ্মী ছিলেন। কিশোর বয়সে মাসিক সাহিত্যপত্র 'লিসানাল সিদক' সম্পাদনা করেন। ১৯১২ সনে কোলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল হেলাল' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে যুদ্ধ সম্পর্কে 'আল হেলালের' ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মতের কারণে ব্রিটিশ সরকার প্রথমে পত্রিকা থেকে জামানত তলব করে এবং পরে জামানত বাজেয়াপ্ত করে। মৌলানা আজাদের মতামত সর্বদাই ইংরেজ সরকারের বিরোধী এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামী চরিত্রের ছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতের জন্য ১৯১৬ সনে তাঁকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং রাঁচিতে নজরবন্দি করে রাখা হয়। ১৯২০-এ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে মৌলানা আজাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্সের সভাপতি হন। আমৃত্যু ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে 'ভারতীয় জাতি'মূলক জাতীয়তাবাদী চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং ত্রিশের দশক থেকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং বিভেদ বৃদ্ধি পেলে এবং মুসলিম লীগ মুসলমানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে মুসলিম লীগ নেতা মি. জিন্নাহ দাবি করলেও মৌলানা আজাদ সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রবাহের বিরুদ্ধতা করেন এবং অবিচলভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন। মৌলানা আজাদ একাধিকবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনতার আলোচনাকালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে 'ইংরেজ, ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হলে গান্ধীসহ কংগ্রেসের অপর সকল প্রখ্যাত নেতার সাথে মৌলানা আজাদ কারারুদ্ধ হন। "রাঁচীর নজরবন্দি থেকে জুন ১৯৪৫ পর্যন্ত তাঁর বন্দি জীবনের দৈর্ঘ্য মোট দশ বৎসর সাত মাস হয়।" স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ সনে তিনি

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ধর্ম এবং রাজনীতিক অভিমতমূলক যে সকল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন তার কোনো সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা সহজ নয়। তাঁর মৃত্যুপূর্বকালে আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বা 'ভারতের স্বাধীনতালাভ' গ্রন্থ তাঁর নির্দেশমতো মৃত্যুর পরে একটা নির্দিষ্টকাল অতিক্রম শেষে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে তাঁর রাজনৈতিক নানা অভিমত নিঃসঙ্কোচে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র যে অধিককাল দ্বন্দ্বহীনভাবে বজায় থাকতে পারবে না, এ ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি উক্ত পুস্তকে প্রকাশ করেন।

Academy of Plato : প্লেটোর একাডেমী

গ্রিক 'একাডেমীয়া' শব্দ থেকে ইংরেজি একাডেমী শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের একটি বাগানকে একাডেমাসের বাগান বলা হয়। খ্রি. পূ. ৩৮৭ সনে প্লেটো এখানে দার্শনিক আলোচনার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পূর্বে এই বাগানে গ্রিক দেব-দেবীদের উদ্দেশে পশু উৎসর্গ করা হতো। এথেন্সের একাডেমীর ইতিহাসে তিনটি পর্যায়ের কথা জানা যায় (১) প্রথম পর্যায় বা প্লেটো পর্ব। প্লেটো পর্বে প্লেটোর পরে স্পুসিয়াস, জেনোক্রাটিস এবং পলেমনকে একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। (২) দ্বিতীয় পর্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আরসেসিলাস পরিচিত। এটাকে একাডেমীর মধ্যযুগ বলেও অভিহিত করা হয়। এই যুগে আলোচনার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন স্টোয়িক বা প্রতিরোধহীন সমর্পণবাদকে খণ্ডন করা। আরসেসিলাসের পরে আসেন ল্যাসিডিস। (৩) তৃতীয় পর্যায়কে একাডেমীর নবপর্যায় বলেও অভিহিত করা হয়। এই পর্বের প্রধান উদ্যোগী চিন্তাবিদ ছিলেন কারনিয়াডিস। কারনিয়াডিসের চিন্তাধারা পূর্বতন সন্দেহবাদের প্রকারবিশেষ।

প্লেটো ৩৪৭ খ্রি. পূ. অব্দে মারা যান। প্লেটোর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দার্শনিক এ্যারিস্টটল একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য দার্শনিক যাঁরা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ ইউডোক্সাস এবং ফিলিপাস, গণিত শাস্ত্রবিদ থিটিটাস এবং একাধারে সমাজতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ এবং বৈজ্ঞানিক হিরাক্লিডিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একাডেমীর প্রথম যুগকেই একাডেমীর স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই যুগে একাডেমীর সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানটিকে একটি মুক্তবুদ্ধি গবেষণা এবং দর্শন সম্পর্কিত আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। এই যুগে মতামতের দ্বন্দ্বে দেখা যায় যে, স্পুসিপাস প্লেটোর বস্তুনিরপেক্ষ 'পরমভাব'-এর ধারণাকে খণ্ডন করে 'আংকিক সংখ্যাই হচ্ছে একমাত্র নিত্যসত্য'—পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়ের এই অভিমতকে সমর্থন করছেন। স্পুসিপাস আরো দাবি করেন যে, 'ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান, জ্ঞান নয়, মায়ামাত্র' প্লেটোর এ তত্ত্ব ভ্রান্ত। তাঁর মতে যুক্তিসহযোগে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারি। প্রাকৃতিক জগতের ইতিহাস বর্ণনাতেও স্পুসিপাসের বিশেষ আগ্রহ ছিল। একাডেমীর আদি যুগের অন্যতম দার্শনিক জেনোক্রাটিস প্লেটোবাদ এবং পাইথাগোরীয়বাদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি একদিকে প্লেটোর নিকট থেকে সমস্ত অনিত্য প্রকাশের পেছনে এক নিত্য সত্তার অস্তিত্বকে গ্রহণ করেন, অপরদিকে নিত্য এবং অনিত্যের

সংঘাতে সংখ্যার উৎপত্তি হয় বলেও অভিমত প্রকাশ করেন। খ্রিষ্টাব্দের চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকে একাডেমীর মতাদর্শ নব-প্লেটোবাদ বলে পরিচিত হয়। ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান একাডেমীর আলোচনা নিষিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেন। ইউরোপে নব জাগরণের যুগে (১৪৫৯-১৫২১ খ্রিষ্টাব্দ) ফ্লোরেন্স শহরে 'একাডেমী' নামে আলোচনা ও গবেষণার নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। এই পর্যায়ে প্লেটোর রচনাবলীর উদ্ধার এবং অনুবাদ এবং এ্যারিস্টটলের দর্শনের নতুনতর ব্যাখ্যা গুরুত্ব লাভ করে।

'একাডেমী' বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত শব্দ। একাডেমী শব্দ দ্বারা সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝান হয়। এই অর্থে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই 'একাডেমী' নামক প্রতিষ্ঠানকে কার্যরত দেখা যায়। বিশ্বের বিখ্যাত একাডেমীগুলির মধ্যে ফরাসি একাডেমী, ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ একাডেমী, গ্রিসের একাডেমীয়া এথেন্স, জাপানের দি ন্যাশনাল একাডেমী অব জাপান, আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দি নিউইয়র্ক একাডেমী অব সায়েন্সেস এবং রাশিয়ার একাডেমী অব সায়েন্সেস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীও একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান।

Accident, Accidens : অবান্তর লক্ষণ

যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত একটি শব্দ। একটি পদের গুণ যদি এমন হয় যে, গুণটি কিংবা গুণসমূহ উক্ত পদের জাত্যর্থ বা কনোটেশনের অন্তর্ভুক্ত নয়, জাত্যর্থ থেকে উদ্ভূতও নয়—অর্থাৎ উক্ত গুণকে পদের জাত্যর্থ থেকে অনুমান করা চলে না ; কিন্তু গুণটিকে পদের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলে এরূপ গুণকে উক্ত পদ বা টার্মের এ্যাকসিডেন্ট বা এ্যাকসিডেন্স বলা হয়। বাংলাতে এক 'অবান্তর লক্ষণ' বলা যায়। অনেক মানুষের 'চুল কালো', এই দৃষ্টান্তে চুল কালো বা কালো চুল থাকার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ। এ গুণটি 'মানুষ' হওয়ার জন্য অপরিহার্য নয়। মানুষ হওয়ার অপরিহার্য গুণ হচ্ছে 'জীবন্ত এবং যুক্তিবাদিতা'। অবান্তর লক্ষণ একটি পদের বিচ্ছেদ্য কিংবা অবিচ্ছেদ্য গুণ বলেও বিবেচিত হতে পারে। যে অবান্তর লক্ষণ পদের মধ্যে স্থায়ীভাবে দেখা যায়, তাকে অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন কবি নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একটি বিশেষ সনে জন্মগ্রহণ করার গুণটি উপরোক্ত পদটির অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

দর্শনশাস্ত্রেও 'এ্যাকসিডেন্ট' বলতে অস্থায়ী, অনিত্য এবং অপরিহার্য গুণকে বুঝায়। এদিক থেকে নিত্যসত্তা বা পরম সত্তার বিপরীত হচ্ছে অনিত্যসত্তা বা এ্যাকসিডেন্ট। পদের গুণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং অপরিহার্যের পার্থক্য প্রথম প্রকাশ করে দার্শনিক এ্যারিস্টোটল। 'এ্যাকসিডেন্ট' শব্দের ব্যবহার তাঁর রচনাবলীতেই প্রথম দেখা যায়। পরবর্তীকালে মধ্যযুগের স্কলাসটিক বা ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে 'এ্যাকসিডেন্ট'-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের দর্শনেও বস্তুর পরিহার্য এবং অপরিহার্য গুণের আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে কোনো বিশেষ বস্তুই যেমন অপর কোনো বিশেষ বস্তু থেকে চরমভাবে বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি বস্তুর কোনো গুণকে অপর কোনো গুণের সঙ্গে তুলনাক্রমে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ্য গুণ বলা চলে না।

Accidental Evolution : আকস্মিক বিকাশ, আকস্মিক বিবর্তন

জীবন এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং বস্তুবাদের বিরোধিতা হিসাবে 'আকস্মিক বিবর্তনবাদ'-এর উদ্ভব দেখা যায়। এ মতের প্রধান ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার, এস. লয়েড মরগান, সি.ডি. ব্রড প্রমুখ দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত দার্শনিককে 'নব বাস্তববাদী' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ ভাবধারা মূলত ভাববাদী দর্শনের প্রকারবিশেষ।

চার্লস ডারউইন তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিস' গ্রন্থে বলেছিলেন, জীবন ও প্রকৃতির ইতিহাস হচ্ছে ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে জীবনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার প্রাণীর বিকাশ ঘটেছে। জীবনের বিবর্তনে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য কোনো নতুনের আবির্ভাব সম্ভব নয়। ডারউইনের এই মত বস্তুবাদী মত। উল্লিখিত দার্শনিকগণ বিবর্তনবাদের এই তত্ত্বকে জীবনের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মনে করেন না। এঁদের মতে জীবনের বিকাশের ইতিহাসে এমন সমস্ত পর্যায় এবং সৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাকে বিবর্তনবাদের ধারাবাহিকতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সৃষ্টির ধারা অনির্দিষ্ট। সে ধারার অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ কোনো নিয়ম দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না। সৃষ্টি অগ্রসর হয় আকস্মিক নতুন সত্তার উদ্ভবের মাধ্যমে। সৃষ্টির অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য ক্রমবিকাশ নয়, আকস্মিক উদ্ভব এবং উৎক্রমণ। জগতের কোনো পর্যায়ের কোনো নতুন অস্তিত্বের সঙ্গে অতীতের কোনো অস্তিত্বের সাদৃশ্য নাই। জীবনের বিকাশের এই ব্যাখ্যা আকস্মিক বিবর্তনবাদের একটি দিক। এ ছাড়া সমগ্র অস্তিত্বের নতুনতর ব্যাখ্যাদানের চেষ্টাও এই দর্শনের অনুসারীগণ করেছেন। এই দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা আলেকজাণ্ডার তাঁর 'স্পেস, টাইম এ্যাণ্ড ডিটি' গ্রন্থে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অস্তিত্বের মূল হচ্ছে 'স্থান-কাল' এই ধারণা। 'স্থান-কাল' ধারণাই সমস্ত অস্তিত্বের সৃষ্টি করেছে ; বস্তু বা অস্তিত্ব থেকে 'স্থান-কাল' ধারণার সৃষ্টি হয় নি। মর্গান মনে করেন, জগতের অস্তিত্ব মাত্রই সপ্রাণ। প্রাণ ব্যতীত আদৌ কোনো বস্তু বা অস্তিত্ব নাই।

Acosta, Uriel : উরিয়েল এ্যাকোস্টা (১৫৮৫-১৬৪০ খ্রি.)

ওলন্দাজ দার্শনিক। জন্ম পর্তুগাল, ১৫৮৫ কিংবা ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যু ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম জীবনে ক্যাথলিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। কিন্তু যুক্তিবাদকে নিজের দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে পরবর্তীকালে ক্যাথলিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্যাথলিকের নির্যাতনের ভয়ে ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। এই পর্যায়ে উরিয়েল এ্যাকোস্টা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মূল ইহুদি ধর্মের ভাবধারাসমূহকে ইহুদি যাজক সম্প্রদায় বিকৃত করেছে বলে তিনি ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে আত্মার অবিনশ্বরতার উপর 'Sbre a martali dade da alam do homen' নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং দাবি করেন যে, দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার অবিনশ্বরতা বলে কিছুই নাই। সনাতন মতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য উরিয়েল এ্যাকোস্টাকে ইহুদি সমাজ থেকে দু দুবার বহিষ্কার করা হয়। একদিকে ইহুদি যাজক সম্প্রদায় এবং অপরদিকে ওলন্দাজ সরকারের নিগ্রহে উরিয়েল

এ্যাকোস্টা আত্মহত্যা করেন। তাঁর অপর গ্রন্থের নাম ছিল 'Exemplar humane vitae' এই পুস্তকে তিনি রাষ্ট্রীয় ধর্ম, ইহুদি এবং খ্রিষ্টান, সমস্ত রকম ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন। সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত ওলন্দাজ দার্শনিক স্পিনোজা উরিয়েল এ্যাকোস্টার মতবাদে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। লেখক কে. এফ. গুজকাউ-এর বিষাদাত্মক নাটক 'উরিয়েল এ্যাকোস্টা' (১৮৪৭) উরিয়েল এ্যাকোস্টার জীবন-কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত।

Activists : কার্যবাদী, ক্রিয়াবাদী

রাজনৈতিক দলের মধ্যে লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে মতামতের পার্থক্যের উদ্ভব হয়। এরূপ মতামতে যদি কোনো উপদল দলের লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা কার্যের উপর অধিক জোর দেয় তবে তাদেরকে কার্যবাদী বা ক্রিয়াবাদী বলা হয়।

Activity : ক্রিয়া

মনোবিজ্ঞানে, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। দর্শনের ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনার্থে গৃহীত কর্মবাদ বা প্রাগমেটিজমের তত্ত্ব।

মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি এবং বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি বস্তু বা পরিবেশকে ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস প্রায়। জীবমাত্রেরই একটি স্বাধীন ক্রিয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সকল জীবের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার স্বাধীনতা এবং বিকাশের স্তর সমান নয়। এজন্য প্রাথমিক ধরনের ক্রিয়া এবং জটিল উচ্চতর ধরনের ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। মনুষ্যেতর জীবেরও কার্যক্ষমতা আছে। কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের ক্রিয়ার মধ্যে মানুষের তুলনায় স্বাধীনতার পরিচয় কম। মনুষ্যেতর পশু-পক্ষীর ক্রিয়াকে পরিবেশই অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ পরিবেশ দ্বারা কেবল নিয়ন্ত্রিত হয় না ; পরিবেশকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে পরিবর্তিত করার জন্য আপন মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করে। মানসিকভাবে উদ্দেশ্য থাকা বা উদ্দেশ্যের সৃষ্টি করা কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই জটিল এবং উন্নতভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ক্রিয়া কথার মধ্যে একটি সামাজিক অর্থ নিহত আছে। কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছুর সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়। ব্যক্তির অর্থ সামাজিক পরিবেশের ব্যক্তি। সে কারণে ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পেছনে সামাজিক পরিবেশ এবং উক্ত পরিবেশের বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান। মানুষের আদিতেও ব্যক্তির ক্রিয়া সামাজিক পরিবেশের চাহিদা থেকেই শুরু হয়েছে। জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করেছে। মস্তিষ্ক চালনার ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর জীবের তুলনায় মানুষ অধিকতর জটিল এবং স্বাধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধিকারী। কিন্তু ব্যক্তির এই স্বাধীনতা চরম মনে করা ভুল। সামাজিক পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি কেবলমাত্র মস্তিষ্কের ইচ্ছানুযায়ী কোনো ক্রিয়া-কাণ্ডের সূত্রপাত করতে পারে না। এদিক থেকে ব্যক্তি পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তি ও পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক এবং পরস্পর-নির্ভরশীল। কেউই চরমরূপে স্বাধীন নয়।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রিয়া দুরকম হতে পারে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। বাহ্যিক ক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয় সহযোগে বস্তুর উপর সক্রিয় হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বস্তুর মানসিক স্মৃতি ও ছবির উপর কল্পনার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়। যে-কোনো বাহ্যিক ক্রিয়ার পূর্বে ব্যক্তি তাকে মানসিকভাবে পূর্বেই সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। মুখে যে শব্দ উচ্চারণ করে অপর ব্যক্তির নিকট আমরা ভাব প্রকাশ করি, সে শব্দকে মানসিকভাবে প্রায়শই আমরা পূর্বে উচ্চারণ করে নিই। এরূপ ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক চেষ্টায় মানসিক ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে স্বয়ংক্রিয় বা মনেরও অগোচর হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক ক্রিয়া পরিবেশকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক ক্রিয়াই তত্ত্ব হিসাবে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগমূলক ক্রিয়াও পরস্পর-নির্ভরশীল। পরিবেশের আঘাত মস্তিষ্ককে উপযুক্তরূপে পরিবর্তনের চিন্তায় সক্রিয় করে। মানসিকভাবে পরিকল্পিত ক্রিয়াকৌশল পরিবেশের উপর প্রয়োগের মারফত ব্যক্তি তার বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করতে প্রয়াস পায়।

Adler, Alfred : আলফ্রেড এ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৮)

অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী। মনোসমীক্ষার প্রবর্তক সিগমণ্ড ফ্রয়েডের পরেই মনোসমীক্ষার ক্ষেত্রে এ্যাডলারের খ্যাতি। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের প্রশ্নে দুজনার মত এক নয়। এ্যাডলারের মনোসমীক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এ্যাডলার ব্যক্তিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র বলে মনে করেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিবেশ দ্বারা গঠিত। মনোবিকার বা মানসিক রোগের মূল হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত। ব্যক্তি চায় পরিবেশকে জয় করতে। জয়ের এই প্রবণতা ব্যক্তির জন্মগত। শৈশবেই এর উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তি দৈহিক দুর্বলতা, মানসিক অক্ষমতা কিংবা অপর কোনো প্রতিকূল কারণে পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে জয়ী না হলে নিজের মনে সে বাস্তব অবস্থার পরিপূরক এক কল্পজগতের সৃষ্টি করে। এভাবেই মানসিক রোগ কিংবা মনোবিকারের সূত্রপাত হয়। ব্যক্তি আপন কল্পলোকে বাস্তব জগতের সর্বপ্রকার পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। যে দৈহিকভাবে দুর্বল সে তার কল্পজগতে নিজেকে অপরিমিত শক্তিশালী মনে করে। এর ফলে বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এ্যাডলারের তত্ত্ব অনুযায়ী মানসিক রোগীর রোগ দূরীকরণের জন্য ব্যক্তি শৈশবকাল এবং পরিবেশ উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। কেন না, শৈশবকালের পরাজয়গুলিই রোগীর মনে বদ্ধমূল মনোবিকারের সৃষ্টি করে। রোগীকে এমন অবস্থায় নিরাময় করবার প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের বিপদ সম্পর্কে তাকে সচেতন করার চেষ্টা করা এবং যথাসম্ভব বাস্তব সংঘাত থেকে তাকে দূরে রাখা। ফ্রয়েড যেখানে ব্যক্তির মূল জীবনবোধের পেছনে যৌন অনুভূতি এবং যৌন আকাঙ্ক্ষাকে আবিষ্কার করেছেন, এ্যাডলার সেখানে ব্যক্তির জীবনবোধের পেছনে সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। ফ্রয়েড মানসিকভাবে সুস্থ অসুস্থ উভয় ব্যক্তির মনকে যৌনাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। যৌনাকাঙ্ক্ষার উপর এই গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে এ্যাডলার ফ্রয়েডের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। এ্যাডলার ব্যক্তির যৌনবোধকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে যৌনবোধ বা অনুভূতি ব্যক্তির জটিল চরিত্রের একটি মাত্র অনুভূতি। সর্বপ্রকার বোধ নিয়ে ব্যক্তির যে চরিত্র, তার বিবেচনা ব্যতীত ব্যক্তিচরিত্রের কোনো বিশেষ অনুভূতির সঠিক বিচার সম্ভব

নয়। ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্রকে এ্যাডলার বলেছেন ব্যক্তির জীবনপ্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত জীবনে এ্যাডলার একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে যখন তিনি যুক্ত হন, তখন ফ্রয়েড তাঁকে মনোসমীক্ষণ সংঘের সভাপতি মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু মনোবিশ্লেষণে মতপার্থক্যের জন্য এ্যাডলার ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রয়েডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে 'মুক্তবুদ্ধি মনোসমীক্ষণবিদ সংঘের' প্রতিষ্ঠা করেন। মতবিরোধের ফলে উভয় বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক তিক্তরূপ ধারণ করে। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চরিত্রের নতুনতর বিচার এ্যাডলারের খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে জানার জন্য শৈশবকে জানার আবশ্যকতা এবং দুর্বলতাবোধ থেকে যে শৈশবকালেই ব্যক্তির জীবনে পরাজয়ের গ্লানি ও বিকার দেখা দিতে পারে এবং সে বিকার বদ্ধমূল হয়ে ব্যক্তিকে মানসিক রোগীতে পরিণত করতে পারে—এ্যাডলারের এই তত্ত্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গৃহীত হয়েছে। এ্যাডলারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের ইংরেজি নাম হচ্ছে 'দি নিউরোটিক কন্‌স্‌টিটিউশন' (১৯১২) এবং 'ইনিডিভিডুয়াল সাইকোলজি' (১৯২৪)।

Adler, Max : ম্যাকস এ্যাডলার (১৮৭৩-১৯৩৭)

অস্ট্রিয়ার রাজনীতিক লেখক এবং দার্শনিক। অস্ট্রিয়ার সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির তাত্ত্বিক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে এ্যাডলার সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থী গ্রুপকে সমর্থন করেন। ১৯০৩ সালে কার্লরেনার এবং রুডলফ হিলপারডিং-এর সঙ্গে যৌথভাবে এ্যাডলার ভিয়েনাতে একটি শ্রমিকদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অস্ট্রিয়ার মার্কসবাদে এ্যাডলারের ভূমিকার একটি দিক হচ্ছে, একটি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্বকে দাঁড় করাবার তিনি চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নব্য-কাণ্টীয় এবং আর্নেস্ট ম্যাকের পজিটিভিজম দর্শন দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। লেনিন পরবর্তীকালে তাঁর 'ম্যাটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে ম্যাকের দর্শনকে ভাববাদী বলে সমালোচনা করেন।

Aenesidemus : এনিসিডেমাস (খ্রি. পূ. প্রথম শতক)

খ্রি. পূ. প্রথম শতকের গ্রিক দার্শনিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এনিসিডেমাস সন্দেহবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি প্লেটোর একাডেমীর সদস্য ছিলেন। সন্দেহবাদের ক্ষেত্রে এনিসিডেমাসকে তাঁর পূর্বগামী বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক পিরহোর (৩৬৫-২৭৫ খ্রি. পূ.) অনুসারী বলা যায়। এনিসিডেমাসের মতে কোনো কিছু সম্পর্কেই সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, তর্কের ক্ষেত্রে যুক্তির অভাব ঘটে না। এক যুক্তি যাকে সত্য বলে দাবি করে, অপর যুক্তি তাকে অসত্য বলে প্রমাণ করতে পারে। কাজেই সত্য এবং অসত্য নিয়ে যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির লড়াই-এর চেয়ে শ্রেয় হচ্ছে মনের শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা। যুক্তির লড়াই মনের শান্ত অভিমতকে বিনষ্ট করে। সত্যাসত্যের লড়াই ছাড়াই মানুষ জীবনযাপন করে। 'অন্য সবাই যেমন চলে আমারও তেমনি চলাই কর্তব্য।' সাধারণের মত গ্রহণ করা

এবং অপরিহার্যকে বিশ্বাস করাই জীবনে শান্তিলাভের প্রকৃষ্টতম পথ। এনিসিডেমাসের পরবর্তীকালে খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে সেক্সটাস এমপিরিকাস-রচিত 'দেবতায় বিশ্বাসে বিপক্ষ-যুক্তি' নামক গ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন সন্দেহবাদীদের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর রচনাই পাওয়া যায়। উপরোক্ত গ্রন্থের একস্থানে দার্শনিক সেক্সটাস এমপিরিকাস সন্দেহবাদী দর্শনকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'আমরা সন্দেহবাদীরা জগতের প্রচলিত কিছু অমান্য করি না। কিন্তু প্রচলিত আচার-আচরণ তত্ত্বকে আমরা বিশ্বাসও করি না। বাস্তবে যা ঘটছে সে সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বীকার কিংবা অস্বীকারের প্রশ্ন অবান্তর। দেবতাদের সবাই বিশ্বাস করে ; তাদের নানা উপঢৌকন দেয়। মানুষ দেবতাদের উদ্দেশে নানা আচার-আচরণ করে। সে সমস্ত আচার আমরাও পালন করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী—কিংবা অবিশ্বাসী। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জোর করে কিছু বলার পক্ষপাতী আমরা নই।' (বার্ট্রাণ্ড রাসেল হিস্টরি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি—২৬২ পৃষ্ঠা)

এই ব্যাখ্যায় প্রাচীন সন্দেহবাদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এনিসিডেমাসের দর্শন তৎকালীন গ্রিক সামাজিক অবস্থারও পরিচয়বাহক। গ্রিসের সমাজ-ব্যবস্থার পূর্বকার শক্তি ও সমৃদ্ধি তখন বিনষ্ট। সমাজ জীবনে অস্থিরতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। প্লেটো-এ্যারিস্টটলের দর্শন প্রতিপত্তি হারিয়েছে। এমন সামাজিক ও চিন্তাগত পরিবেশে গ্রিক সন্দেহবাদের উদ্ভব ঘটে।

জ্ঞানের বিপক্ষে এনিসিডেমাস দশটি যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। যুক্তিগুলি এরূপ : (১) মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিচার এবং অনুভূতির সিদ্ধান্ত একরূপ হয় না। (২) ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক এবং মানসিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের কারণে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির জ্ঞান পৃথক হয়। (৩) ব্যক্তির বিভিন্ন ইন্দ্রিয় একই বিষয় সম্পর্কে পরস্পর পৃথক ধারণা সৃষ্টি করে। (৪) ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক অবস্থার উপর জ্ঞানের রূপ নির্ভরশীল। দৈহিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। (৫) বস্তু সম্পর্কে ধারণা ব্যক্তির সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর দূরত্ব এবং অবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হয়। (৬) কোনো বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান কখনোই প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞান প্রতি ক্ষেত্রেই মাধ্যম-নির্ভর। (৭) বস্তুর বর্ণ, গতি, পরিমাণ, তাপ ইত্যাদি চরিত্র পরিবর্তিত হলে বস্তুর জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। (৮) বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর পরিচয়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলে বিষয় সম্পর্কে বিষয়ীর জ্ঞানও পৃথক রূপ লাভ করে। (৯) যাকে জ্ঞান বলা হয় তা আসলে ব্যক্তিবিশেষের অনুমান এবং অভিমত মাত্র। (১০) বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ অভিমত এবং আচার-আচরণের প্রকাশ দেখা যায়।

এই দশটি যুক্তির প্রত্যেকটি মৌলিক নয়। একটি ক্ষেত্রের যুক্তি ভিন্নতর প্রকাশে অপর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানের নিশ্চয়তার বিপক্ষে এনিসিডেমাসের যুক্তিসমূহের মূল কথা হচ্ছে এই যে, সত্যের কোনো অনন্য-নির্ভর অস্তিত্ব নাই। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে একই সত্য প্রতিভাত হয় ; ফলে কোনো সত্য সঠিক তা জানা সম্ভব নয়। জ্ঞানের অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তি। কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির ধারণা ব্যক্তির বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ঘটনার ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ককেও এনিসিডেমাস

অস্বীকার করেন। দর্শনের ইতিহাসে আধুনিক যুগে জ্ঞানের প্রশ্নে সন্দেহবাদী দর্শনের যে প্রকাশ দেখা যায়, তার যুক্তি মূলত এনিসিডেমাস এবং অন্যান্য গ্রিক সন্দেহবাদী দার্শনিকের যুক্তিরই অনুরূপ।

Aesthetics : সৌন্দর্যতত্ত্ব

'সৌন্দর্যতত্ত্ব' কথাটি ব্যাপক। এ কারণে এর বিষয়বস্তুর সীমা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি, শিল্পকলার বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য প্রভৃতি সমস্যাকে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনে সৌন্দর্যতত্ত্বের ভূমিকা আলোচিত হয়।

সাধারণভাবে সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আদিম অনুভূতি বলে মনে করা হয়। প্রকৃতির মোকাবেলায় আদিম কাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো কোনোটি মানুষের মনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া। এই আবেগময় প্রতিক্রিয়ার মূলে মানুষের জীবন রক্ষার অচেতন জৈবিক প্রয়োজনই আদিকালে সমধিক কাজ করেছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং শক্তির প্রকাশকে আপন জীবন রক্ষার সহায়ক কিংবা ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করেছে। এ সমস্ত শক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মনে জাগরূক রাখার সে চেষ্টা করেছে। এই আদিম বোধ থেকেই আদি শিল্পকার্যের সৃষ্টি। এই উৎস থেকে সামাজিক ভালোমন্দ বোধেরও উৎপত্তি।

মানুষের নিজের জীবনের মতোই সৌন্দর্যানুভূতির ইতিহাস দীর্ঘ। সভ্যতার জটিল বিকাশের ধারায় সৌন্দর্যতত্ত্বকেও প্রাথমিক যুগে সহজ এবং আধুনিককালে জটিল এবং অবাস্তবের লক্ষণযুক্ত দেখা যায়।

কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের আবেগময় অনুভূতি এবং তার ভাষাগত প্রকাশ ব্যতীত শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত এবং অন্যান্য মানবিক সৃষ্টিকে সুন্দর কিংবা অসুন্দর এবং ভালো কিংবা মন্দ হিসাবে বিচারের প্রয়াসকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্ব বলতে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তত্ত্বকে বুঝায় না। এর দ্বারা উপরোক্ত বিষয়গুলির উপরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তা কিংবা ভাবধারার কথা বুঝায়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় সুন্দর এবং অসুন্দরের অথবা ভালো এবং মন্দের কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ কিংবা মানদণ্ড আছে কিনা সে প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিসর, ভারতবর্ষ এবং চীনের দাস-প্রধান সমাজে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রিসের হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিকের রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের আমরা সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন এবং টমাস একুইনাস প্রমুখ ধর্মতাত্ত্বিকগণ সৌন্দর্যতত্ত্বে রহস্যবাদের আমদানি করেন। তাঁদের মতে, জগতাতীত এক ঐশ্বরিক সুন্দরের

অস্তিত্ব রয়েছে। সেই ঐশ্বরিক সুন্দরের মানদণ্ডেই জাগতিক বস্তুনিচয়ের সৌন্দর্য পরিমাপ করতে হবে। মধ্যযুগের এই রহস্যবাদের প্রতিক্রিয়া ঘটে পরবর্তীকালে নব-জাগরণের চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকগণের মধ্যে। এঁদের মধ্যে পেতরার্ক, আলবার্ট, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, দুরার, ব্রুনো এবং মন্টেনের নাম বিখ্যাত। পাশ্চাত্যের নব-জাগরণের পরবর্তী জ্ঞানান্বেষণের যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে বার্ক, হোগার্ত, ডিডেরট, রুশো, লেসিং প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। সৌন্দর্যতত্ত্বে মধ্যযুগীয় রহস্যবাদকে অস্বীকার করে এঁরা মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মানবতাবাদের এই ঐতিহ্যকে বহন করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিলার এবং গ্যেটে ঘোষণা করেন যে, সৌন্দর্য এবং শিল্পের উৎস হলো মানুষ এবং তার বাস্তব জীবন।

সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে দুটি প্রধান ধারার সাক্ষাৎ সব যুগেই পাওয়া যায়। এদের একটি হচ্ছে সৌন্দর্য সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা ; অপরটি ভাববাদী। ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব সৌন্দর্যকে অতি-প্রাকৃতিক একটি সত্তা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। অতি-প্রাকৃতিক এই সত্তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এবং সিদ্ধির অতীত। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই মাত্র এই নিকষ সুন্দরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এরূপ ব্যাখ্যায় ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং সুন্দরের ধর্মীয় রহস্যবাদী কল্পনায় কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার মোহে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস সমাজের শক্তিমান শ্রেণীগুলো সব যুগেই করে এসেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে দর্শনের অন্যান্য মৌলিক প্রশ্নের ন্যায় ভাববাদের বিরোধী ব্যাখ্যা হচ্ছে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষের বাস্তব পরিবেশ এবং জীবনের মধ্যেই সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি এবং বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। সৌন্দর্যতত্ত্বে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের বিরোধ সমাজের শোষক এবং শোষিতের বাস্তব বিরোধের ভাবগত প্রতিফলন।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনটি প্রশ্ন মূল (১) বস্তুজগতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং বিকাশ ; (২) মনোজগতে সৌন্দর্যানুভূতির উদ্ভবের ব্যাখ্যা, এবং (৩) শিল্পকর্মের মূল্যায়ন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রবহমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ধারাতে ক্রমাধিক পরিমাণে আনন্দজনক জীবনযাপনের তাগিদে সুন্দর, অসুন্দর, মহৎ, হীন, হর্ষ এবং বিষাদ প্রভৃতি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাপকতার দিক থেকে সৌন্দর্যতত্ত্ব কেবল শিল্পকলার সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করে না। শিল্পকলার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি প্রয়োগগত দিক মাত্র। ব্যাপকভাবে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচ্য হচ্ছে মানুষ। তার সৃজনশীল ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশে, মহতের জন্য জীবন উৎসর্গে, দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে যে আনন্দানুভূতি সে বোধ করে কিংবা বর্বরতার আঘাতে যে ঘৃণা তার মনে উদ্ভূত হয়, তার বিকাশ-প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য।

Agent Provocateur : প্ররোচক, উস্কানিদাতা, দালাল

রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ অনেক সময়ে নিজ পক্ষীয় লোককে অন্য পক্ষের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সমর্থকের ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। এরূপ কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হয় ছদ্মবেশী সমর্থক দ্বারা এমন কোনো ঘটনার সৃষ্টি করা যার ফলে উক্ত পক্ষের কোনো মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এরূপ লোকের

সন্ধান পেলে তাকে প্ররোচক, উস্কানিদাতা বা দালাল বলে অভিহিত করে। ইংরেজি 'এজেন্ট প্রভোকেচার' কথাটির মূল ফরাসি। এর অর্থ উস্কানিদাতা বা প্ররোচক। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোনো রাজনীতিক দল নিজের ব্যর্থতার দায়িত্ব কল্পিত 'প্ররোচকের' ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী দল নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক রাষ্ট্র কর্তৃক আর এক রাষ্ট্রকে আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টির জন্য প্ররোচক দ্বারা মারাত্মক ঘটনা ঘটাবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

Agnosticism : অজ্ঞেয়বাদ

সাধারণভাবে অজ্ঞেয়বাদ বলতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎ বা বিশ্বকে জানার অক্ষমতা বুঝায়। এদিক থেকে সন্দেহবাদ বা সংশয়বাদের সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ কথাটি সংশয়বাদের মতো প্রাচীন নয়। অজ্ঞেয়বাদের ইংরেজি শব্দ এ্যাগনস্টিসিজ্‌ম-এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলীর রচনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে বিধাতার অস্তিত্বকে জানা সম্ভব কি অসম্ভবের প্রশ্নে অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব। উনিশ শতকে ধর্মের বিতর্কে এরূপ একটা অভিমতের প্রকাশ দেখা যায় যে, জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাতে বিশ্বচরাচরের কোনো বিধাতা আছে কিংবা নাই এরূপ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ হচ্ছে মানুষ যে সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না, সেই সীমাকে অতিক্রম করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি করা।

অজ্ঞেয়বাদের এই যুক্তি প্রধানত অষ্টাদশ শতকের কাণ্টীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করেই করা হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে জ্ঞানের প্রশ্নে সন্দেহবাদের শুরু হয় ইংরেজ দার্শনিক হিউমের মধ্যে। হিউম জ্ঞান সম্পর্কে ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে 'এ্যান এনকোয়ারি কনসারনিং হিউম্যান আনডারস্ট্যাণ্ডিং' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ প্রধানত তাঁর পূর্বগামী ভাববাদী ধারণার জবাব হলেও তাঁর যুক্তির মারফত, মানুষের আদৌ কোনো জ্ঞান সম্ভব কিনা, সে মৌলিক প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক কাণ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাববাদকে হিউমের মৌলিক আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্যই তার 'নু মেনা' বা মূল সত্তা হিসাবে বস্তুকে জানার অসম্ভবতার তত্ত্ব উপস্থিত করেন। তাঁর মতে মূল সত্তা হিসাবে বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু মানুষ নিজের জ্ঞানসূত্র বা ক্যাটেগরি ব্যতীত কোনো কিছুর জ্ঞানই লাভ করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানসূত্র মারফত দৈনন্দিন-দৃষ্ট বস্তুকেই মাত্র জানা যায়। অ-দৃষ্ট মূল বস্তুসত্তাকে জানা যায় না। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ ধর্মের ক্ষেত্রে কাণ্টের যুক্তি প্রয়োগ করে বিধাতাকে স্বীকার-অস্বীকারের বাইরে রেখে দেবার প্রয়াস পায়। ঊনবিংশ শতকে দর্শনের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব বৃহত্তর বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে-পুঁজিবাদ-বিরোধ শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি এবং আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ-বিরোধী শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাস্তব জগতের উপর মানুষের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাস্তব জগতের উপর মানুষের শক্তিকে যত বেশি প্রতিষ্ঠিত করে তুলছিল, তত বেশি ধর্ম এবং দর্শনের রাজ্যে ভাববাদের নতুনতর যুক্তি আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এমন

পরিস্থিতিতে কাণ্ট যেমন দর্শনের ক্ষেত্রে জটিল যুক্তিজালে ভাববাদকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদ বিধাতার অস্তিত্বকে জ্ঞানের বাইরে রেখে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ পরিণামে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে নি। অজ্ঞেয়বাদীদের মতে কেবল যে, বিশ্ব-বিধাতাই অজ্ঞেয়, তাই নয়। মানুষের কাছে প্রাকৃতিক বিধান, সমাজের বিকাশের ধারা—সবই অজ্ঞেয়। তাই তাঁদের মতে বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞান আমাদের দিতে পারে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অজ্ঞেয়বাদকে অসার বলে অভিহিত করে। আধুনিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। এঙ্গেলস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এ্যান্টিডুরিং'-এ অজ্ঞেয়তাবাদকে খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে বস্তুকে মানুষ আদৌ জানতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মাথা ঘামাবার দিন শেষ হয়ে গেছে। কারণ মানুষ বস্তুকে কেবল তাত্ত্বিকভাবেই জানছে না। বাস্তবভাবে সে বস্তুকে স্পর্শ করছে, বিশ্লেষণ করছে, তার অন্তর্নিহিত বিধি-বিধানকে জানছে এবং জ্ঞাত সেই বিধানকে প্রয়োগ করে বস্তুকে সে নতুনভাবে গঠনও করছে। এর পরে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের আর অবকাশ থাকে না বলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অভিমত পোষণ করে।

Agrippa : আগরিপা (খ্রি. দ্বিতীয় শতক)

খ্রিষ্টাব্দের আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের রোমান সংশয়বাদী দার্শনিক। কেউ কেউ আগরিপাকে গ্রিক দার্শনিক বলেও মনে করেন। প্রাচীন সন্দেহবাদীদের মধ্যে আগরিপা অবশ্যই বিশিষ্ট ছিলেন। কারণ প্রাচীন যুগে 'আগরিপা' নামে একখানা পুস্তক রচিত হওয়ার কথা জানা যায়।

আগরিপা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর 'পঞ্চ'যুক্তির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। সংশয়বাদী এনিসিডেমাসের সমস্যা ছিল দশটি। আগরিপার সমস্যার মূলগতভাবে এনিসিডেমাসের সমস্যা থেকে পৃথক না হলেও আগরিপার সমস্যার ব্যাপকতা এনিসিডেমাসের চাইতে অধিক। জ্ঞানের কোনো নিশ্চয়তা নাই—এ অভিমত আগরিপা তাঁর পঞ্চযুক্তির মারফত যত জোরালোভাবে উপস্থিত করেছিলেন, প্রাচীন দর্শনে সেরূপ জোরালো অভিমত অপর কোনো সংশয়বাদী উপস্থিত করেন নি।

জ্ঞানের অনিশ্চয়তার প্রমাণস্বরূপ আগরিপার পঞ্চযুক্তি নিম্নরূপ

প্রথম যুক্তি   পরস্পর-বিরোধীতা। বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরস্পর-বিরোধী। সাধারণ মানুষ এবং দার্শনিক এরা কেউ জ্ঞানের মাধ্যম সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন না। কোনো পক্ষের মতে ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানই জ্ঞান। আবার অপর কোনোপক্ষ এরূপ অভিমত পোষণ করে যে ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতি উভয়ের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান লাভ করি। পরস্পর-বিরোধী এই অভিমতের কোনো মীমাংসা নাই। ফলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি   বিরামহীন পশ্চাদ্ধাবনের যুক্তি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমরা একটি দত্ত সত্য বা প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করি। একটি বিশেষ অনুমানের ক্ষেত্রে দত্ত সত্যকে সঠিক বলে ধারণা করি। কিন্তু সঠিক বলে গৃহীত সত্যেরও প্রমাণের

আবশ্যক। সেরূপ প্রমাণের জন্য অপর একটি দত্ত সত্য বা প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করি। কিন্তু এর প্রমাণের জন্য অপর আর একটি সত্যের আমরা বরাত দেই। বরাতের পরে বরাতের এই ধারা বিরামহীন। ফলে চূড়ান্তরূপে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছান আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বতঃসিদ্ধের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। যাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয়, তা যে স্বতঃসিদ্ধ—তারও প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু প্রমাণ শুরু করলেই আমরা বিরামহীন বরাতের অন্তহীন পশ্চাদ্ধাবনের প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে পড়ি। ফলত জ্ঞান এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব।

তৃতীয় যুক্তি : আপেক্ষিকতা। বিষয়ী বা যে জানে তার সঙ্গে বিষয় বা যা জানা হয় তার সম্পর্ক অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সম্পর্ক জ্ঞানকে গঠিত করে। ফলে এই সম্পর্ক-বহির্ভূত অবস্থায় জ্ঞাত বিষয়ের চরিত্র কি তার জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চতুর্থ যুক্তি : হাইপথেসিস বা প্রকল্প। কোনো সিদ্ধান্তের জন্য সিদ্ধান্তের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক একটি বিবৃতিকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি। একে আমরা হাইপথেসিস বা প্রকল্প বলি। গৃহীত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্যকে আমরা স্বীকৃত প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি-অসঙ্গতির ভিত্তিতে প্রমাণ করি। কিন্তু যে প্রকল্পের ভিত্তিতে আমরা একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করি, সেই প্রকল্পের প্রমাণের কোনো প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করি নে ; ফলে অপ্রমাণিতের ভিত্তিতে প্রমাণের অসঙ্গতি সৃষ্ট হয়।

পঞ্চম যুক্তি : চক্রাবর্তের সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিজ্ঞার প্রমাণের জন্য আমরা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করি। এতে সিদ্ধান্তের প্রমাণের জন্য প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞার প্রমাণের জন্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করার চক্রাবর্তের সৃষ্টি হয় ; ফলে কোনোটি সম্পর্কেই আমরা কোনো জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হই নে। চক্রাবর্তের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই যুক্তিটির উল্লেখ করা যায় : মানুষ মরণশীল। সক্রেটিস একজন মানুষ। সুতরাং সক্রেটিস মরণশীল। পুনরায় সক্রেটিস মরণশীল। সক্রেটিস একজন মানুষ। সুতরাং সকল মানুষ মরণশীল।

আগরিপার পঞ্চযুক্তির সবগুলো হয়তো তাঁর নিজের মৌলিক কোনো উপস্থাপনা নয়। আগরিপার পূর্বগামী সংশয়বাদী দার্শনিকগণ নানাভাবে জ্ঞানের অনিশ্চয়তার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আগরিপার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি জ্ঞানের প্রশ্ন সংশয়কে যেরূপ স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, এরূপ সুনির্দিষ্ট প্রকাশ প্রাচীন সংশয়বাদের ইতিহাসে অপর কোনো দার্শনিকের মধ্যে দেখা যায় না।

Aggression : অন্যায় আক্রমণ, আগ্রাসন

এক রাষ্ট্র অপর রাষ্টের উপর বিনা কারণে সশস্ত্র আঘাত হানলে তাকে আক্রমণ বা আগ্রাসন বলা হয়। অন্যায় আক্রমণ কথাটির অর্থ সহজ হলেও যুদ্ধমান পক্ষের কেউই আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করতে চায় না। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণকারী বলে অভিযুক্ত করে। একমাত্র নিরপেক্ষ কারুর পক্ষে বলা সম্ভব যে, এমন ক্ষেত্রে আক্রমণকারী কে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে তখন আর কেউ নিরপেক্ষ থাকে না। কেবল বিশ্বযুদ্ধ নয়। আধুনিক আন্তর্জাতিক জটিল রাজনীতিতেও নিরপেক্ষ কোনো রাষ্ট্র আছে, একথা বলা কঠিন। কোনো অবস্থায় কোনো কার্য আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে এর কোনো সংজ্ঞা জাতিসংঘের

ঘোষণাপত্রেও গৃহীত হয় নি। ১৯৩৩ সালে আক্রমণের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য আফগানিস্তান, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, ইরান, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক এবং রাশিয়া এই আটটি দেশের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে (ক) এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (খ) যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকে আক্রমণ (গ) যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতীত অপর রাষ্ট্রের ভূখণ্ড, নৌযান বা বিমানের উপর সশস্ত্র আক্রমণ (ঘ) এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৌঅবরোধ সৃষ্টি এবং (ঙ) প্রতিপক্ষীয় রাষ্ট্রের বিদ্রোহাত্মক কোনো সশস্ত্র বাহিনীকে আশ্রয় দান কিংবা তাকে সশস্ত্রভাবে সজ্জিত করতে সাহায্য করা এবং প্রতিপক্ষীয় রাষ্ট্রের দাবি সত্ত্বেও এরূপ বাহিনীকে বহিষ্কার করে দিতে অস্বীকার করাকে একের বিরুদ্ধে অপরের আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে।

Ajivika : আজীবিক

শব্দগত অর্থ আজীব আ+জীব+অ জীবনসাধন, জীবনোপায় জীবিকা। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রচারের সমকালে 'আজীবিক' নামক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'গোশাল' বলে এক ব্যক্তি। গোশালে জন্ম বলেই তাঁর নাম গোশাল হয়েছিল এরূপ অনেকে মনে করেন। জীবন, ধর্ম, দেহ, আত্মা, বিশ্ব ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে আজীবিক সম্প্রদায়ের অভিমত আজীবিকবাদ বলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে আখ্যাত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আজীবিকদের তত্ত্বের একটি গুরুত্ব আছে। এঁরা জীবন ও জগতের ব্যাখ্যায় আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এঁদেরকে অনুবাদী বলেও আখ্যায়িত করা হয়। আজীবিকদের মতে, বস্তু জগতের মূলে রয়েছে চারটি মৌলিক অণু, যথা—মৃত্তিকা, পানি, অগ্নি এবং বায়ু। জগতের যা কিছু সৃষ্টি তার এই চারটি মূল অণুর সম্মেলনেই গঠিত হয়। জীবন নিজে অণু নয়। জীবন এমন একটি শক্তি যার অণুর সম্মেলনকে অনুধাবন করতে সক্ষম। সৃষ্টির মৌলিক পদার্থ অণু শাশ্বত। অণুর বিভাজন নেই। অণু সৃষ্টির মূলে। কিন্তু নিজে সৃষ্ট নয়। অণুর ধ্বংসও সম্ভব নয়। মৌলিক অণুগুলি গতি নয়। এক অণু অন্য অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে না। কিন্তু যে কোনো অণু যে কোনো অভিমুখে গতিশীল হতে পারে। বস্তুর যে গুণ তা একটি বিশেষ বস্তুর অণুর সংখ্যা এবং সম্মেলন প্রকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়। জীবন ও জগতের এই বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায়, আজীবিকগণ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী মত পোষণ করতেন। সম্ভবত ইতিহাসে এঁরাই প্রথম অনুবাদী। আজীবিকদের অনুবাদী মতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের ডিমোক্রিটাস (খ্রি. পূ. ৪৬০-৩৭০) এবং এপিক্যুরাস (খ্রি. পূ. ৩৪১-২৭০) এর অনুবাদী তত্ত্বের বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আজীবিকদের প্রতিষ্ঠাতা গোশাল সম্পর্কে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। গোশাল জৈনধর্মের জন্মের প্রকারভেদ অস্বীকার করেন। তাঁর মতে জীবন মাত্রই, নিয়তির বন্ধনে আবদ্ধ। জন্মের কোনো প্রকারভেদ বা জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করতে পারে, একথা গোশাল মানতেন না। গোশালের মতে জন্মান্তরের দীর্ঘ

কিংবা হ্রস্ব কোনো সড়কেই জীবনের দুঃখ বা কর্মের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির উপায় নেই। মানুষের জীবনের পথ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। কোনো সাধনা বা আচরণই জীবনের সেই নির্ধারিত পথকে পরিবর্তিত করতে পারে না।

গোশাল এবং আজীবিকগণ জীবনোপায় বা জীবনাচরণে সাধারণের ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁরা দিগম্বর থাকতেন এবং একটি দণ্ড হাতে চলতেন। এজন্য এঁদের 'দণ্ডী'ও বলা হতো। এঁরা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন। কিন্তু ভিক্ষা করেও প্রয়োজনের অধিক জমাতেন না।

সম্রাট অশোকের শাসনকাল ছিল খ্রি. পূ. ২৭৪-২৩২ সন। সম্রাট অশোকের নানা অনুশাসন প্রস্তর খণ্ডে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এরূপ একটি প্রস্তরলিপিতে আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। এই লিপিতে বলা হয়েছে যে, সম্রাটের এরূপ কর্মচারী বা মহামাত্রও নিযুক্ত রয়েছে যাদের দায়িত্ব হচ্ছে আজীবিকদের বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা।

Al-Farabi : আল-ফারাবী (৮৭৩-৯৫০ খ্রি.)

আল-ফারাবীর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে আবু নসর মুহম্মদ আল-ফারাবী। দর্শনের ইতিহাসে ইনি আল-ফারাবী নামেই সুবিখ্যাত। ইসলামি দর্শনে আল-ফারাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে মনে করা হয়। মুসলিম দার্শনিকগণ মনে করতেন, আল ফারাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ যদি কেউ থাকেন তিনি হচ্ছেন গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল। মুসলিম দার্শনিক আলকিন্দী আল-ফারাবীকে নিঃসন্দেহে ইবনে সীনা এবং ইবনে রুশদ-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন।

খ্রিষ্টাব্দের নবম এবং দশম শতকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষ করে বাগদাদে গ্রিক দর্শনের বিশেষ চর্চা হতো। এই সময়ে গ্রিসের প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের রচনাবলীর আরবি অনুবাদ হতে থাকে। আল-ফারাবী প্রধানত শিক্ষালাভ করেন বাগদাদের এ্যারিস্টটল-এর দর্শন শিক্ষাদানকারী খ্রিষ্টান বিদ্যাকেন্দ্রে। প্লেটোর দর্শনের নতুনতর ব্যাখ্যাদাতা প্লাটিনাস-এর ব্যাখ্যার প্রভাবও আল-ফারাবীর উপর নিশ্চিতভাবে পড়েছিল। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের এই দুই স্তম্ভ আল-ফারাবীকে এত প্রভাবিত করেছিল যে, উপরোক্ত দর্শনের পারস্পরিক বিরোধিতা সত্ত্বেও আল-ফারাবী কাউকে বর্জন করতে পারেন নি। এ কারণে আল-ফারাবী প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের সামঞ্জস্যের বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করেন। আল-ফারাবী শিক্ষাগত জীবনে কেবল দর্শনের চর্চা করেন নি। তিনি সে-যুগের জ্ঞানের অন্যান্য শাখাও আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সঙ্গীতের বিচিত্র শাখাতে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

আল-ফারাবী প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিক' এবং 'লজ' বা 'বিধান'-এর উপর নিজের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। আল-ফারাবীর সমধিক বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'উত্তম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ভ্রান্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ'। এ গ্রন্থ আদর্শ নগর বা 'মদিনাল ফাজিলা' বলেও আখ্যাত। গ্রন্থের নামকরণ এবং বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, প্লেটো যেমন 'রিপাবলিক' বা আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিরেন, আল-ফারাবীও তেমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন। আল-ফারাবীর আদর্শ রাষ্ট্র প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ন্যায় সাধারণ মানুষের অ-সাধ্য বোধ হতো না। প্রকৃত পক্ষে আল-ফারাবী যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে কার্যকর

দেখেছেন, তাদের উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের আদর্শ রাষ্ট্র কল্পনা করেছিলেন। আল-ফারাবী কোনো চরম মত পোষণ করেন নি। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রায়ই তিনি পরস্পর-বিরোধী ধারাকে এক সাথে মিলাবার চেষ্টা করেছেন। এই আপসের প্রমাণ যেমন প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যে রয়েছে, তেমনি বিশ্বের স্রষ্টা এবং সৃষ্টির ব্যাখ্যাতেও রয়েছে। আল-ফারাবী একদিকে মনে করেছেন যে, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র স্রষ্টা ; আর সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর প্রকাশ। অপর দিকে আল্লাহকে স্রষ্টা স্বীকার করেও সৃষ্টি বা বিশ্বকে শাশ্বত বলে তিনি অভিমত পোষণ করেছেন। বিশ্বকে শাশ্বত মনে করার মধ্যে বস্তুজগৎ এবং বিজ্ঞানকে স্বীকারের প্রবণতা আল-ফারাবীর চরিত্রে দেখা যায়। এদিক দিয়ে সে-যুগে তিনি প্রগতিশীল চিন্তাবিদের স্বাক্ষর রেখেছেন, একথা বলা যায়। ধর্মের ন্যায় তাঁর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেও একনায়কত্বের প্রকাশ ছিল। আল-ফারাবীর মতে রাষ্ট্রর রইস বা প্রধান থাকবে সবার উপরে। অপর সকলে তার বাধ্য হবে। সে নিজে কারু বাধ্য হবে না। নাগরিকদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগের ক্ষেত্রে স্তরভেদ থাকবে। এক স্তর তার উপরের স্তরের আদেশ মান্য করবে। এবং অধঃস্তরের উপর আদেশ জারি করবে। অধঃতম স্তরের নাগরিক কেবল হুকুম মান্যই করবে অপর কাউকে সে হুকুম দিবে না। কারণ হুকুম দেবার মতো তার নিচে অধঃতর কোনো স্তর থাকবে না। মুসলিম সভ্যতার অর্থনীতিক বিকাশের তৎকালীন যুগে একনায়কত্বের এই ধারণা গোত্রতান্ত্রিক বহুধাবিভক্ত সামন্তবাদী সমাজকে এককেন্দ্রিক বৃহত্তর রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে সংহত করার অনুকূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। যুগের প্রেক্ষিতে এরূপ ভাবধারার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। চরম সত্য বা স্রষ্টার ব্যাখ্যায় আল-ফারাবী যেমন প্লেটোর ভাবধারাকে গ্রহণ করেছেন, মনোজগতের বিশ্লেষণে তেমনি তিনি এ্যারিস্টটল-এর ব্যাখ্যাকেই অধিকতর স্বীকার করেছেন।

আল-ফারাবীর রচনাসমূহ জার্মান এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

Alberuni : আলবেরুণী (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.)

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, গবেষক এবং জ্ঞানসাধক। জন্ম মধ্য এশিয়ার (রাশিয়ার) খোরেজম বা খারিজমের খিবায় ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যু ১০৪৮ কিংবা ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দে।

'আলবেরুণী' নামে ইতিহাসে পরিচিত। আসল নাম আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন বোখারার বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা (৮৯০-১০৩৭ খ্রি.)। জন্মসূত্রে আলবেরুণী পারসিক এবং শিয়া ছিলেন। 'তাঁর সমালোচনার ক্ষমতা, সহনশীলতা, সত্যানুরাগ এবং মানসিক সাহস মধ্যযুগে অতুলনীয় ছিল। তিনি আরবি ভাষায় ভূগোল, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেন।' গবেষকগণ তাঁর রচনার সংখ্যাকে বিপুল বলে অনুমান করেন। "১০৩৫ খ্রিষ্টাব্দে এক বন্ধুর জিজ্ঞাসার জবাবে লেখা আল-বেরুণীর একটি চিঠির নকল পাওয়া গেছে যাতে তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার একটি ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। তালিকা মতে ১৩৮টি পুস্তকের নাম আছে। এ তালিকা তৈরির পরেও তিনি প্রায় সতের বৎসর জীবিত ছিলেন। পরবর্তী সতের বৎসর

ধরে তিনি আরো যেসব বই লিখেছিলেন তা ধরলে এবং অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জিতে যেসব বই-এর নাম পাওয়া যায় সেসব মিলিয়ে বর্তমান পণ্ডিতরা আলবেরুণীর রচিত ১৮০টি পুস্তকের নাম পেয়েছেন। আলবেরুণীর গ্রন্থাবলী ১২ শতক থেকে ইউরোপে যতটা আদৃত হয়েছে, প্রাচ্যে ততটা হয় নি।"

বাংলাদেশে সাহিত্যিক সত্যেন সেন আলবেরুণীর ভারত আগমন এবং তাঁর জ্ঞান সাধনাকে ভিত্তি করে 'আলবেরুণী' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন (১৯৬৯)। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসের অতুলনীয় উপাদান হিসাবে আলবেরুণীর 'ভারততত্ত্ব' পৃথিবীতে আজ সুপরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ঐতিহাসিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ আলবেরুণীর 'ভারততত্ত্ব' গ্রন্থটি মূল আরবি থেকে বাংলাতে অনুবাদ করেছেন (১৯৭৪)।

আলবেরুণীর 'ভারততত্ত্ব' গ্রন্থের মূল আরবি নাম 'কিতাব কি তাহকিক মালিল হিন্দ মাকুলাত মাকবুলাত কি আল আকল উমর যুলাত।' বাংলা গদ্যে এর মানে : বুদ্ধি বিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর যা গ্রহণযোগ্য নয়, হিন্দুদের সব রকম চিন্তা পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা।

Book on an accurate description of all categories of Hindu thought, those which are admissible to reason as well as those which are not. এডওয়ার্ড জাকাউ (Edward Zachau) কর্তৃক সম্পাদিত মূল আরবি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে লণ্ডন থেকে। Alberuni's India—এই নামে দুখণ্ডে এর ইংরেজি অনুবাদ এডওয়ার্ড জাকাউ প্রকাশ করেন ১৮৮৮। কিতাবুল হিন্দ নামেও আলবেরুণীর 'ভারততত্ত্ব' পরিচিত।

গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করে তার উত্তর পশ্চিম দখল করেছিলেন (১০২২ খ্রি.)। সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র খারিজম রাষ্ট্রও জয় করেছিলেন। খারিজম জয় করে সেখানকার গণ্যমান্য নাগরিক এবং জ্ঞানীদের তিনি তাঁর রাজ্য গজনীতে বন্দি করে এনেছিলেন (১০১৭ খ্রি.)। এই বন্দিদের মধ্যে খারিজমের আলবেরুণী ছিলেন। পরবর্তীকালে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক হয়তো আলবেরুণীই ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন। জ্ঞানসাধক আলবেরুণী তাঁর এই ভারত গমনকে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সাক্ষাৎভাবে অধ্যয়নের বিরাট সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে থাকাকালীন সময়ে তিনি ভারতীয় সমাজের তথ্যাবলী গভীর অভিনিবেশ এবং আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আলবেরুণী 'কিতাবুল হিন্দ্' রচনা সমাপ্ত করেন ১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে গজনী প্রত্যাবর্তন এবং সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পাঁচমাস পরে।

কিতাবুল হিন্দ্ বা ভারততত্ত্বে আলবেরুণী জটিল এবং বিচিত্র তত্ত্ব এবং তথ্য যেরূপ বিস্তারিতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত করেছেন তা এক বিস্ময়কর শক্তির স্মারক হিসাবে জ্ঞানের ইতিহাসে বিরাজ করছে। 'কিতাবুল হিন্দ্' রচনার পূর্বে আলবেরুণী কপিলের সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনসহ পৌলিশ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, বৃহৎসংহিতা, খণ্ডখাদ্যক, বরাহমিহিরের লঘুজাত কর্ম প্রভৃতি ছোটবড় ২২টি ভারতীয় পুস্তক আরবিতে তর্জমা করেছিলেন। তিনি বহু ভাষাবিদ ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের আরবি অনুবাদ থেকে বুঝা যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তা ছাড়া ফার্সি, গ্রিক, হিব্রু এবং আরামিয় ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। আলবেরুণীর মাতৃভাষা ছিল খোরেজমী বা প্রাচীন ইরানি

ভাষার একটি আঞ্চলিক শাখা। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থ আরবি ভাষাতেই রচিত। কারণ তাঁর মাতৃভাষাকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশের উপযোগী মনে করেন নি।

অধ্যাপক মহামেদ হবিবুল্লাহর বাংলা অনুবাদে দেখা যায় আলবেরুণীর 'ভারততত্ত্ব' প্রস্তাবনা ব্যতীত আশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচিত বিষয়ের আভাসদানের জন্যে কিছুসংখ্যক অধ্যায়ের শিরোনাম এখানে উল্লেখ করা গেল : ভারতীয়দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ; ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশ্বাস ; ভাব এবং ইন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ; কার্যকারণ—আত্মার সঙ্গে জড় পদার্থের সম্বন্ধ ; সৃষ্ট জীবসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের নাম ; মূর্তি পূজার সূচনা ও বিগ্রহসমূহের বর্ণনা ; হিন্দুদের ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র ; ভারতীয় পরিমাণ বিজ্ঞান ; ভারতীয়দের বর্ণমালা, সংখ্যাচিহ্ন ও অদ্ভুত রীতি ; ভারতবর্ষের নদ-নদী ; সমুদ্র নগরাদির পারস্পরিক দূরত্ব ও সীমানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; গ্রহ নক্ষত্রাদির নাম, চন্দ্রের কক্ষপথ ও অনুরূপ বিষয় ; মেরু পর্বতের কথা ; সমুদ্রে জোয়ার ভাটার পারম্পর্য ; সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ ; আদালতের মামলা মোকদ্দমা ।

মোটকথা, এ এক অতুলনীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থ দশম-একাদশ শতকের ভারতীয় জ্ঞান, সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণের একটি পূর্ণ জ্ঞান কোষবিশেষ।

আলবেরুণী রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের কাল নিরুপণের পদ্ধতি বিষয়ক 'আসারুল বাকিয়া' ; গণিতশাস্ত্র ও জ্যামিতি বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব কানুন আল মাসুদী কি হাইওআল নজুম' ; ধাতুবিদ্যা বিষয়ক 'কিতাবুল জামাহীর ফি মারেফাতুল জওয়াহীর' ; চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক 'কিতাব আল সায়দানা ফিল তিব্ব' ; এবং ভৌগোলিক তথ্যমূলক গ্রন্থ 'তাহদীদ ফি নেহায়াতুল আমাকিন'।

তাঁর রচনায় বিষয়ভিত্তিক সংখ্যা আলবেরুণীর নিজের প্রস্তুত একটি তালিকার ভিত্তিতে নিম্নরূপ : জ্যোতিষ পদ্ধতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ১৮ ; বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক তথ্য, আয়তন, দূরত্ব নির্ণয় ইত্যাদি — ১৫ ; গণিত পদ্ধতি — ৮ ; সূর্যকিরণ ও ছায়ার বৈজ্ঞানিক তথ্য — ৪ ; জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিষয়ে — ৫ ; কাল ও সময় নির্ণয় — ৫ ; জ্যোতিষশাস্ত্রে শুভাশুভ ফলাফল নির্ণয় — ১২ ; জ্যোতিষ গণনাবিধি — ৭ ; উপন্যাস, কাব্য ও অতিপ্রাকৃত কিংবদন্তি বিষয়ক — ১৩ ; ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণ বিষয়ে — ৬।
(দ্রষ্টব্য : আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ; আলবেরুণী : সত্যেন সেন।)

Al-Ghazali : আল-গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

আল-গাজ্জালীর সম্পূর্ণ নাম ছিল আবু হামিদ মুহম্মদ আল-গাজ্জালী। খোরাসান বা ইরানের তুশের গাজলা গ্রামে জন্ম বলেই তিনি গাজ্জালী নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে আল-গাজ্জালী ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এবং রক্ষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। আল-গাজ্জালীর দার্শনিক চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামকে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে পরলোক, দোজখ ইত্যাদি কল্পলোক সম্পর্কে মানুষের মনে ভয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল। মুসলিম মুক্তবুদ্ধি মোতাজিলাদের দার্শনিক আলোচনা ও মতামতও মানুষের মনে বিশ্বাসের বদলে যুক্তির

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল। অবস্থার এই বিকাশে আল-গাজ্জালী চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। মোতাজিলাবাদীদের যুক্তির বিরুদ্ধে অধিকতর জোরালো যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তির পরাক্রমকে পরাস্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আল-গাজ্জালী দর্শন চর্চা করেন। তাঁর এই লক্ষ্য অর্জনের চিন্তায় তিনি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েন যে, ৩৬ বছর বয়সে তিনি বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদ ত্যাগ করে সুফীজীবন যাপন করতে শুরু করেন। সুফী হয়ে তিনি মুসলিম জগতের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে তিনি যুক্তির পথ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করে ঘোষণা করেন যে, যুক্তির মাধ্যমে সত্যকার জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। বিশ্ব-স্রষ্টার সন্ধান এবং বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটন কেবল অহি বা আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই সম্ভব। এই সিদ্ধান্তে এসে তিনি 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' বা 'দর্শনের ধ্বংস' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি বিশ্বের শাশ্বত চরিত্র, বুদ্ধির শক্তি প্রভৃতি তত্ত্বের যাথার্থ্য সম্পর্কে মুসলিম দার্শনিকদের উপস্থাপিত প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্নের চেষ্টা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, চরম সত্যের জ্ঞান প্রমাণ-ভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। আল-গাজ্জালী ঘটনার ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধকেও অস্বীকার করেন। কোনো ঘটনাই অপর কোনো ঘটনার কারণ বা ফল নয়। দু'টি ঘটনার মধ্যে সমকালীনতা বা কালক্রম থাকতে পারে। অগ্নির সংঘটনের পরবর্তীকালেই কোনো দাহ্যবস্তুর দহনকে আমরা দেখতে পারি। কিন্তু তাতে এমন প্রমাণিত হয় না যে, আগুন দাহ্যবস্তুর দহনের কারণ হিসাবে কাজ করেছে। মুসলিম চিন্তার ক্ষেত্রে আসারীয় এবং মোতাজিলা নামে গোঁড়ামি এবং মুক্তবুদ্ধির যে দু'টি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আল-গাজ্জালী তার মধ্যে আসারীয় গোঁড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বস্তুত যুক্তি এবং বুদ্ধিবাদের এরূপ শক্তিমান প্রতিপক্ষের সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে। তাঁর চিন্তাধারা সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে বলেই ইতিহাসের বিশ্লেষণকারীগণ মনে করেন। এ জন্য আল-গাজ্জালীকে দার্শনিকের চেয়ে ধর্ম-রক্ষক হিসাবে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। তৎকালীন ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের অস্থিরতা এবং জটিলতাই আল-গাজ্জালীর অভিমতকে আবশ্যকীয় করেছিল। ইউরোপেও পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিরোধী যে সন্দেহবাদ এবং অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব দেখা যায় আল-গাজ্জালীর মধ্যে তার পূর্বাভাস সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। বস্তুত আল-গাজ্জালীর দর্শন-বিরোধী ভূমিকাই পাশ্চাত্যের সংশয়বাদী এবং অজ্ঞেয়বাদীদের চমৎকৃত করে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষেত্রেও আল-গাজ্জালী নিরপেক্ষ ছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আল-মোসতাজিরের আদেশে আল-গাজ্জালী শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ইবনে রুশদ আল-গাজ্জালীর 'দর্শনের ধ্বংস' গ্রন্থের পাল্টা জবাব হিসাবে 'দর্শনের ধ্বংসের ধ্বংস' নাম একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন।

Aligarh Movement : আলীগড় আন্দোলন

১৮৫৭ সনের সিপাহি বিদ্রোহ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার একটি ধারা আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। উত্তর ভারতের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইংরেজি শিক্ষিত, ব্রিটিশ শাসনের কর্মচারী স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) এই ধারার

উদ্যোগী ব্যক্তি। সিপাহিবিদ্রোহে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতবাসী, বিশেষ করে তার মুসলিম সম্প্রদায়ের যে বিদ্রোহাত্মক এবং অসহযোগী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল স্যার সৈয়দ আহমদ তাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন মুসলমান সম্প্রদায়ের তথা তার উচ্চতর বিত্তবান অংশের উন্নতির উপায় ইংরেজি শিক্ষা বর্জন এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতায় নয়। তাদের উন্নতির উপায় হচ্ছে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা, তার মাধ্যমে পাশ্চাত্তের জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করা এবং ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আলীগড়ে এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি অনুবাদ সংস্থা তৈরি করে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানকে উর্দু ভাষায় উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকারের সহযোগী হলেও ধর্ম এবং সামাজিক সমস্যার ব্যাখ্যা এবং অনুধাবনে তাঁর দৃষ্টি ছিল উদারতাবাদী এবং সংস্কারমূলক। কালক্রমে আলীগড় ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর তরুণদের নিকট জ্ঞানচর্চার অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতে থাকে। তাঁরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আলীগড় গমন করেন এবং তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের মুসলিম হিসাবে একটি 'জাতিবোধের'ও সৃষ্টি হতে থাকে। এই আন্দোলন থেকে পরবর্তীকালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৯২০)।

Al-Kindi : আল-কিন্দী (৮০০-৮৭০ খ্রি.)

আবু ইউসুফ ইয়াকুব এবনে ইসহাক আল-কিন্দীর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। ৮৭০ কিংবা ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। বসরার মেসোপটেমিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে আল-কিন্দী জন্মগ্রহণ করেন। নবম শতাব্দীতে তিনি মুসলিম দার্শনিক, বিশেষ করে আরবি ভাষার দার্শনিকদের মধ্যে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই যুগে আরবি অনুবাদের মাধ্যমে গ্রিক দর্শনকে মুসলিম জগতে প্রচার করার যে ঐতিহাসিক চেষ্টা চলছিল তাতে আল-কিন্দীর স্মরণীয় অবদান রয়েছে। এ্যারিস্টটলের মেটাফিজিক্স বা তত্ত্বকথার আরবি অনুবাদের পরিকল্পনা আল-কিন্দী গ্রহণ করেছিলেন। আল-কিন্দীর রচনাবলীর খুব সামান্য অংশই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু গবেষকদের মতে তার রচনাবলীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। আল-কিন্দী এ্যারিস্টটলের অর্গানন-এর উপর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে আলোচনা করেছিলেন। অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের ন্যায় আল-কিন্দী গ্রিক দর্শনের প্রধান দুজন প্রবক্তা প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের ভাবধারায় বিরাটভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত আল-কিন্দী প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং পাইথাগোরাস—তিনজন গ্রিক দার্শনিককেই সমধিক শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য এবং বিরোধ সত্ত্বেও আল-কিন্দী উক্ত গ্রিক চিন্তাবিদগণকে নিজের জন্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আল-কিন্দী বিশ্ব-জগতের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য কার্য-কারণের বিধানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে বিশ্ব-চরাচরে কার্য-কারণের বিধান অমোঘ এবং সার্বিক। কার্য-কারণের মাধ্যমেই বিশ্বজগৎ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। কার্য-কারণের সামগ্রিক উপলব্ধির মধ্যে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিহিত। কার্য-কারণের উপর এই জোর সত্ত্বেও আল-কিন্দী ধর্মের ক্ষেত্রে মনে করতেন যে,

বুদ্ধিগত জ্ঞানের চেয়ে অহিগত জ্ঞান শ্রেয়। এতদ্ব্যতীত, যে সমস্ত মুসলিম দার্শনিক জগৎকে শাশ্বত বলেছেন এবং আল্লাহ্‌র ন্যায় শাশ্বত কাল থেকে জগৎ বিকশিত হয়ে আসছে বলে মনে করেছেন, তাঁদের মতের তিনি বিরোধিতা করেন। কাল-কিন্দীর মতে বিশ্বজগৎ শাশ্বত নয়। স্রষ্টা কোনো একদিন শূন্যাবস্থা থেকে বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। ভবিষ্যতে কোনো একদিন বিশ্বজগৎ বিধাতার হুকুমে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আল-কিন্দীর এ অভিমত মৌলিক নয়। ষষ্ঠ শতকের খ্রিষ্টান দার্শনিকগণ আলেকজান্দ্রিয়াতে এরূপ অভিমত পোষণ করতেন। আল-কিন্দী জ্ঞানের একাধিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রকে একটি বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে পদার্থের ন্যায় নিরাময় প্রণালির ক্ষেত্রে আঙ্কিক অনুপাতের প্রয়োগ। ঔষধ প্রস্তুত প্রণালিতে অনুপাতের বিধান যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, বাস্তবভাবে আল-কিন্দী তা প্রমাণ করেন। আল্লাহ্‌কে আল-কিন্দী সৃষ্টির মূল বলে স্বীকার করেছিলেন। বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে স্তরক্রমে তাঁর প্রতিচ্ছায়া পড়ে। এই স্তরক্রম্যের মধ্য দিয়ে আত্মা দেহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে অমরতা প্রাপ্ত হয়। আল-কিন্দী ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক বিরোধী অভিমত পোষণ না করলেও দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, অঙ্ক অর্থাৎ জ্ঞানের বিচিত্র শাখায় তাঁর আগ্রহ এবং অধ্যয়নের কারণে গোঁড়াপন্থী মুসলমানগণ আল-কিন্দীকে অবিশ্বাসী বিবেচনা করেন।

Alexander, Samuel : স্যামুয়েল আলেক্সাণ্ডার (১৮৫৮-১৯৩৮)

স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার আধুনিককালের ব্রিটিশ দার্শনিকদের মধ্যে 'নিওরিয়ালিস্ট' বা নয়া বস্তুবাদী বলে পরিচিত। নয়া বস্তুবাদ প্রকৃত পক্ষে বস্তুবাদী দর্শন নয়। ভাববাদেরই সে প্রকারবিশেষ। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে স্যামুয়েল আলেক্সাণ্ডারের দার্শনিক অভিমতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি স্থান এবং কালকে ভাব কিংবা জ্ঞানসূত্র না বলে মহাবিশ্বের মূল বস্তু মনে করেছেন। মহাবিশ্বের এই মৌলিক বস্তু অর্থাৎ স্থান এবং কালকে তিনি আবার গতি হিসাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর অভিমতটি মোটামুটি এরূপ যে, স্থান-কালের গতি কিংবা স্থানকালরূপ গতি থেকে অচিন্তনীয় জটিল পরিক্রমায় বস্তু, জীবন, মন, মূল্যবোধ, বিধাতার বাহক এবং বিধাতা—সমস্ত সত্তারই উদ্ভব হয়েছে। অচিন্তনীয় অধিকতর সত্তার উদ্ভব এই পরিক্রমায় হচ্ছে এবং হবে। বিশ্বপুঞ্জের এই ব্যাখ্যায় বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তবে একে বিশিষ্ট করার জন্য স্যামুয়েল আলেক্সাণ্ডার তাঁর বিবর্তনবাদকে 'বিকাশমান বিবর্তন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। নবতর সৃষ্টির আন্তপ্রেরণায় এই বিকাশমান বিবর্তন প্রবহমান। স্যামুয়েল আলেক্সাণ্ডারের ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'স্পেস, টাইম এ্যাণ্ড ডিটি' অর্থাৎ স্থান কাল এবং বিধাতা। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিফোর্ড বক্তৃতাবলী হিসাবে প্রদত্ত এবং ১৯২০ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই অভিমতের মাধ্যমে আলেকজাণ্ডার সুসংবদ্ধ আকারে তাঁর দর্শন প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর পদ্ধতিকে অভিজ্ঞতালব্ধ পরাবিদ্যা আখ্যা দেন। অভিজ্ঞতালব্ধ পরাবিদ্যা বা এমপিরিক্যাল মেটাফিজিক্স বলতে তিনি বিজ্ঞানের সামগ্রিকতাকে যেমন বুঝাতে চান, তেমনি বিভিন্ন শাখায়

বিভক্ত বিজ্ঞান যে-সত্যে পৌঁছাতে পারে না, বিজ্ঞানোর্ধ্ব সেই সত্যের কথাও তিনি এর মারফত প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে মন এক দিক থেকে যেমন দেহ এবং দেহাভ্যন্তরের স্নায়ুমণ্ডলীর অতিরিক্ত কোনো সত্তা নয়, তেমনি অপরদিকে এ সত্তা বিকাশমান বিবর্তনের এক নতুন উদ্ভব। স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার তাঁর দর্শনে বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছে। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় আলেকজাণ্ডারের দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান-বিরোধী অভিমতে পর্যবসিত হয়েছে। উপরোক্ত দার্শনিকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'আর্ট এ্যাণ্ড দি ম্যাটেরিয়াল' (১৯২৫) এবং 'বিউটি এ্যাণ্ড আদার ফরম্স্ অব ভ্যালু (১৯৩৩)।

Alexandrian School of Philosophy : আলেক্সান্দ্রীয় দর্শন

গ্রিক সভ্যতার পতনের পর মিশরের আলেক্সান্দ্রীয়া শহর প্রায় হাজার বছর ধরে বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ পর্যন্ত বিস্তারিত কালকে উপরোক্ত কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এবং খিষ্টপূর্ব ৩০ থেকে ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে এর দার্শনিক চিন্তাধারার সমধিক বিকাশের যুগ বলা হয়।

আলেক্সান্দ্রিয়ার দার্শনিকগণ সে যুগের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছেন। আলেক্সান্দ্রীয় দর্শনের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে দার্শনিক হিরোক্লিসের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। হিরোক্লিসের জন্মকাল সম্ভবত ৪২০ খ্রিষ্টাব্দ। আলেক্সান্দ্রিয়ার দার্শনিকগণ প্লেটোর দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটোর দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা তাঁরা উপস্থিত করেছেন। হিরোক্লিসের দার্শনিক চিন্তায় প্লেটোর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। সমস্ত অস্তিত্বের মূলে রয়েছে 'ভাব', এ অভিমত ছিল প্লেটোর। প্লেটোর 'ভাব'-এর প্রতিফলন পাওয়া যায় হিরোক্লিসের 'ডেমিয়ার্জ' রূপ ধারণায়। হিরোক্লিসের মতে এই 'ডেমিয়ার্জ' হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টি এবং সত্তার মূল। 'ডেমিয়ার্জ' আপন শক্তিতে শূন্যাবস্থা থেকে সমস্ত অস্তিত্বকে সৃষ্টি করে।

মূল 'ডেমিয়ার্জ' ক্ষুদ্রতর ডেময়ার্জকে তার শক্তির বাহনরূপে ব্যবহার করে। এই বাহনদের মাধ্যমেই সকল অস্তিত্বের ভাগ্য 'ডেমিয়ার্জ' নিয়ন্ত্রিত করে। আলেক্সান্দ্রীয় দর্শনের ইতিহাসে হিপাসিয়া নামক একজন মহিলা দার্শনিকের নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এরূপ কথিত আছে যে, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী জনতা উক্ত হিপাসিয়াকে তাঁর চিন্তাধারার জন্য নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করে।

আলেক্সান্দ্রীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের সঙ্গে দর্শনের মিলন ঘটাবার প্রয়াস। গ্রিক সভ্যতার ধ্বংসের যুগে বিভিন্ন প্রকার পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক তত্ত্ব মানুষের মনে একটি অবিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছিল। এই অবস্থাতে প্রাচ্যের ইহুদি ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বের সংযোগ ঘটে আলেক্সান্দ্রীয়া নগরে। দার্শনিক ফিলো খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি প্লেটোর দর্শনের সাহায্যে বাইবেলের ব্যাখ্যা করেন। ফিলো প্লেটোর 'ভাব'কে যেমন একদিকে গ্রহণ করেন তেমনি অপরদিকে তাকে বিশ্বচরাচর সৃষ্টিকারী এক বিশাল অগ্নিরূপে কল্পনা করেন। বিশ্বের প্রাণ-অপ্রাণ সমগ্র সত্তার মধ্যেই এই অগ্নির প্রকাশ ঘটেছে বলে ফিলো মনে করতেন।

Alienation : বিচ্ছিন্নতা

কোনো কিছুর গুণ বা শক্তিতে তার মূল আধার নিরপেক্ষভাবে স্বকীয় সত্তা হিসাবে প্রতিপন্ন করাকে দর্শনে বিচ্ছিন্নতা বলা হয়। সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশে বিচ্ছিন্নতাবাদ যে একটা প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে, সে সত্যকে মার্কসবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস প্রথমে উদ্ঘাটন করেন। তাঁর মতে মানব সমাজের ক্রমবিকাশে মানুষের শ্রমশক্তি, শ্রমশক্তির বিভিন্ন ফলাফল যেমন—অর্থের উৎপাদন, মুদ্রার আবিষ্কার, উৎপাদনের সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুর আধার হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু কালক্রমে শ্রমের এই ফলগুলোকে মূল আধার-নিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। শ্রম, মুদ্রা বা উৎপাদনের সম্পর্ক সব কিছুই যেন মানুষ-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা। মার্কসবাদী মতে এরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদ সামাজিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে দেখা দেয়। মার্কসের মতে মানুষের আদি সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের ধারায় উন্নততর উৎপাদন বা জীবিকার্জনের উপায়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণের পার্থক্যের ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হয়। শ্রমেরও ক্রমাধিক পরিমাণে বিভাগ ঘটতে থাকে। শ্রমের এক বিভাগ অপর বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর-বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। যে হাতের কাজ করে সে আর মাথার কাজ অর্থাৎ চিন্তার কাজ করতে পারবে না। এক শ্রম অপর শ্রমের চেয়ে শ্রেয় কিংবা হীন বলে বিবেচিত হতে থাকে। কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রম এভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

Allama Abul Fazl : আল্লামা আবুল ফজল

জন্ম জানুয়ারি ১৪, ১৫৫১, জন্মস্থান আগ্রা, ভারত। আবুল ফজলের মৃত্যু ঘটে আগস্ট ২২, ১৬০২।

আবুল ফজল একাধারে ঐতিহাসিক এবং সামরিক অধিনায়ক ছিলেন। আবুল ফজল সম্রাট আকবরের দরবারে ধর্মতাত্ত্বিকও ছিলেন। গোড়াতে আবুল ফজল পিতার শিক্ষালয়ে শিক্ষাগ্রহণের পরে সম্রাট আকবরের দরবারের অঙ্গীভূত হন।

প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আবুল ফজলের সমালোচনায় সম্রাট আকবরের চিন্তার পরিবর্তন ঘটে এবং ধর্মের গোড়ামীর স্থানে তাঁর মনে একাধিক ধর্মের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়।

Altruism : পরার্থবাদ

ইংরেজি 'অলট্রুইজম' শব্দের উৎপত্তি ফরাসি ভাষা থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যায় এই শব্দের ব্যবহার করেন। ইগোইজম বা আত্মবাদের বিরোধীভাব হিসাবে পরার্থবাদ ব্যবহৃত হয়। পরার্থবাদ কথাটির সাধারণ অর্থ সুপরিচিত। এই অর্থে পরার্থবাদ দ্বারা অপরের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা বা ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব বুঝায়। আত্মবাদের ন্যায় পরর্থবাদকেও মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে অগাস্ট কোঁতে মনে করেন। মা যখন সন্তানের জন্য কষ্ট স্বীকার করে তখন মা পরার্থপরতার পরিচয় দেয়। পরার্থপরতা যখন মানুষের একটি সামাজিক অনুভূতি তখন এই অনুভূতির

চর্চা এবং উন্নতি সাধন দ্বারা মানুষের সমাজকে স্বার্থের সংঘাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব বলে কোঁতে মনে করতেন। সমাজকে উন্নত করার মাধ্যম হিসাবে পরার্থবাদকে উক্ত দার্শনিক একটি নীতিগত তত্ত্ব হিসাবে দাঁড় করান। কোঁতের মতে পরার্থপরতা কেবল মানুষের নয়। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এটা একটা মৌলিক জৈবিক অনুভূতি। এই অনুভূতির জন্যই পশু-পাখিও সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নিজে বিপদ বরণ করে।

American Civil War : আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে দাসপ্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলীয় কয়েকটি অঙ্গরাষ্ট্রের সশস্ত্র সংঘর্ষ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বলে পরিচিত। এই গৃহযুদ্ধ ১৮৬১ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আব্রাহাম লিংকন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দাস প্রথা বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। দাসপ্রথা বিলোপ কিংবা তাকে অব্যাহত রাখা, এই প্রশ্নে কেন্দ্রের সঙ্গে মত বিরোধের ভিত্তিতে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে দাস প্রথা সমর্থক রাষ্ট্রের একটি 'কনফেডারেসী' গঠন করে। দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে ১৮৬১ সালের ১২ এপ্রিল গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে। বিচ্ছিন্নতাবাদী দক্ষিণ ক্যারোলিনার বাহিনী কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুর্গের উপর আক্রমণ করে। ঐ সালের জুন মাস পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ পূর্ণ আকার গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্রোহী দক্ষিণাঞ্চলকে বশীভূত করার জন্য সমুদ্রে অবরোধের সৃষ্টি করে। লোকবল, সৈন্যবল, শিল্প-শক্তি এবং সুসংগঠিত সরকারের শক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং দাসপ্রথা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী কৃষি-প্রধান দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রীয় জোটের চেয়ে অবশ্যই অধিক পরাক্রমশালী ছিল। তথাপি ১৮৬১ ও ৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য বাহিনীকে দুইটি গুরুতর পরাজয়ের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পরিণামে সরকারের নৌ অবরোধ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক অধিনায়ক জেনারেল গ্রাণ্ট এবং জেনারেল শারমানের যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণীয় রাষ্ট্রজোট হতবল হতে শুরু করে। তাদের সেনাবাহিনীতে ব্যাপক আকারে ছাউনীত্যাগ শুরু হয় এবং ১৮৬৫ সালের ৯ এপ্রিল তাদের সেনাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথার বিলোপ ঘোষণা করেন। এই প্রগতিশীল এবং মানবতাবাদী ভূমিকার জন্য দাস প্রথার সমর্থক প্রতিক্রিয়াশীলদের গুপ্তঘাতকের হাতে ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে আব্রাহাম লিংকন নিহত হন। দক্ষিণাঞ্চলকে পরিপূর্ণরূপে বশীভূত করার নীতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।

American Civilization : আমেরিকার সভ্যতা

আমেরিকার সভ্যতা বলতে কি বুঝায়? এশীয় সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং আফ্রিকার সভ্যতা—কথাগুলির একটি স্বাভাবিক অর্থ আছে। মহাদেশ হিসাবে বিভক্ত এই সমস্ত

অঞ্চলের সভ্যতা বলতে প্রাচীনকাল থেকে এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করে এসেছে তাকেই এই সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা বলে নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু 'আমেরিকার সভ্যতা' বলতে আধুনিককালে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের আদি অধিবাসীদের নিজেদের গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বুঝানো হয় না। অস্ট্রেলীয় মহাদেশের সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আমেরিকার সভ্যতা বলতে আধুনিককালে যাকে বুঝানো হয় তার সূচনা খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে নয়। এবং এ সভ্যতা গঠন করেছে এই অঞ্চলের আদি অধিবাসীগণ নয়। গঠন করেছে ইউরোপ মহাদেশ থেকে আগত স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ইংরেজ, জার্মান, ইটালিয়ান প্রভৃতি জাতির ভাগ্যান্বেষীগণ। বস্তুত ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে কলাম্বাসের আমেরিকা 'আবিষ্কারের' পর থেকে বিপুল আকারে ইউরোপীয় মানুষ আমেরিকায় আগমন করতে শুরু করে। কিন্তু কলম্বাস যখন আমেরিকার সন্ধান পান তখন বিরাট আমেরিকাভূখণ্ড জনশূন্য কিংবা সভ্যতাবিহীন ছিল না। আমেরিকার নিজস্ব অধিবাসীদের প্রতিষ্ঠিত সেই সভ্যতা ইউরোপীয় অধিবাসীদের আক্রমণ এবং গ্রাসের ফলে আজ বিলুপ্তপ্রায়। ইতিহাসের জাদুঘরে তার কেবলমাত্র কিছু রেশ এবং আভাস দেখা যায়। সভ্যতার হাতে সভ্যতার বিনষ্টির এ একটি বিস্ময়কর এবং আধুনিক দৃষ্টান্ত।

এশিয়া মহাদেশ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যকার বেরিং প্রণালীর বিস্তার অনতিক্রমণীয় না হলেও বিপুল আয়তন আমেরিকা মহাদেশ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে ভৌগোলিকভাবে মহাসমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। তার একদিকে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। অপরদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্র বিস্তারিত। প্রাচীনকালে মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে উত্তর আমেরিকার সঙ্গে জল যোগাযোগ একেবারে ছিল না, এমন অনুমান করা চলে না।

গবেষকগণ অনুমান করেন, আমেরিকার আদি অধিবাসীগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন গোত্র হিসাবে মহাদেশের বিভিন্ন বাসোপযোগী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে উত্তর অঞ্চল থেকে একটি শিকারী জনগোষ্ঠীকে মেক্সিকোতে এসে বসতি স্থাপন করতে দেখা যায়। এই নবাগত জনগোষ্ঠী স্থানীয় কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনযাপন করতে শুরু করে। এদের মিলিত জীবনযাত্রা থেকে টোলটেক নামীয় একটি জাতির বিকাশ ঘটে। মেক্সিকোর টোলটেক জাতির সভ্যতার চিহ্ন তাদের তৈরি মৃৎপাত্র এবং পিরামিড শীর্ষের মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গেছে।

এর কয়েক শত বছর পরে খ্রিষ্টীয় দশম শতকে উত্তর অঞ্চল থেকে আর একটি জনগোষ্ঠী মেক্সিকো উপত্যকায় অভিযান চালিয়ে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই নবাগতগণ ছিল আজটেক। এরা টোলটেকদের পরাভূত করে। আজটেক জাতি 'টেনোছিটিলান' নামে একটি শহরের পত্তন করে। আধুনিক মেক্সিকো শহরের পূর্বভিত্তি আজটেকদের টেনোছিটিলান। আজটেকদের সভ্যতা পূর্বের চেয়ে উন্নত ছিল। স্বর্ণ এবং তাম্রের ব্যবহার, গণনার একটি পদ্ধতির আবিষ্কার, বর্ষপঞ্জী তৈরির ক্ষমতা এবং চিত্রলিপির ব্যবহার এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজটেকগণ ক্রমান্বয়ে তাদের বসতি মেক্সিকোর দক্ষিণ পূর্বের ইউকাতান উপদ্বীপে বিস্তারিত করে। ইউকাতানে তখন মায়াসভ্যতা নামে একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আজটেকগণ মায়াসভ্যতাকেও পরাভূত করে। মায়াগণ প্রস্তরের নগর এবং মিশরের পিরামিডের ন্যায় প্রস্তরমন্দির তৈরিতে পারদর্শী ছিল। তারা বিরাটাকারের বাড়ি তৈরি করতে পারত। এ সমস্ত স্থাপত্যের বিচিত্র অঙ্গসজ্জার ধ্বংসাবশেষ তাদের স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। মায়াদের গঠিত নগরের মধ্যে চিতেনইটজা, মায়াপান, উক্‌স্‌মল প্রভৃতি নগর খ্যাতি লাভ করে। এই নগরগুলি নগররাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করেছিল। দশম শতাব্দী থেকে কয়েক শত বছর এই নগররাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে তীব্র লড়াইতে নিযুক্ত ছিল। আমেরিকার নিজস্ব সভ্যতার মধ্যে মায়া সভ্যতাই সবচেয়ে প্রাচীন এবং বিকশিত বলে খ্যাত। মায়াসভ্যতার ক্ষয়ের কাল হচ্ছে দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী। মায়াসভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত ও পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল। অভিজাতদের হাতে কোকোয়ার জমি, মৌমাছির চাষ এবং লবণের খনিগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল। অভিজাতদের অধীনে প্রচুর সংখ্যক দাসও থাকত। বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে বা বসতিতে মায়াগণ যে সংগঠিত জীবনযাপন করত তার মধ্যে গোত্রীয় জীবন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য প্রধান ছিল। কিন্তু বিকাশের পথে গোত্রীয় যৌথ জীবনের মধ্যে আর্থিক অসাম্যও ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হতে থাকে। যুদ্ধের বন্দি, দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী, ঋণবদ্ধ মানুষ এবং অনাথরা দাসশ্রেণীর প্রধান উৎস ছিল। মায়াদের মধ্যে এইকালে দাসসমাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে।

মায়াসভ্যতাকে পরাভূত এবং তার বিকাশকে গ্রহণ করে আজটেকগণ সমগ্র মেক্সিকোতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আজটেকগণ সেচ ব্যবস্থা উন্নতি ঘটিয়ে কৃষিকার্যকে অধিকতর বিকশিত করে। নানা রকম ফল ও সবজি ব্যতীত তামাকের চাষেরও তারা প্রচলন করে। হস্তশিল্পের মধ্যে আসবাবপত্র তৈরি, বস্ত্রবয়ন এবং ধাতবশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজটেকগণ প্রস্তর বা ইট দ্বারা বাড়ি তৈরি করতে পারত। তা ছাড়া খালখনন ও বাঁধ তৈরিতেও তারা দক্ষতা অর্জন করেছিল।

আজটেকগণও গোড়ার দিকে গোত্রীয় যৌথ জীবনযাপন করত। জমি যৌথ সম্পত্তি ছিল। নির্বাচিত সমরপতি যুদ্ধ ও শান্তি, উভয় সময়ে গোত্রের প্রধান বলে বিবেচিত হতো। কয়েকটি গোত্র মিলে আবার যৌথ জীবনযাপনের জন্য প্রধান সমরপতিকে কোনো বিশেষ গোত্র থেকে নির্বাচিত করত। আজটেকগণ যুদ্ধবাজ ছিল। প্রায়ই তারা অভিযান, যুদ্ধ এবং লুণ্ঠনে লিপ্ত থাকত। আর এই যুদ্ধ পরিচালনা এবং জয়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তাদের গোত্রীয় সাম্যবাদী জীবনের ভাঙন ঘটে। যুদ্ধের সম্পদ ও দাস প্রধানত সমরপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। এভাবে অসাম্যের উদ্ভব এবং বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব আজটেকগণও সম্পদবান আজটেকের দাসে পরিণত হয়। এবং দাস ব্যবস্থা আজটেক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকেও আজটেকদের যুদ্ধোন্মাদ জাতি হিসাবে দেখা যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার এণ্ডিজ পর্বত অঞ্চলে আর একটি সভ্যতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে প্রাচীনকাল থেকে কুইচোয়া, আয়মারা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী বাস করে আসছিল। এদের সভ্যতাও বিশেষ বিকাশ লাভ করেছিল। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে কুইচোয়ার গোত্রভুক্ত ইনকাগোত্র অন্যান্য গোত্রকে পরাভূত করে একটি বৃহদাকারের রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল। এই রাষ্ট্রের অধিপতি নিজেকে 'সাপাইনকা' (একমাত্র ইনকা) বলে অভিহিত

করত এবং নিজেকে সূর্যদেবের পুত্র বলে বিশ্বাস করত। ইনকাগণও কৃষি, পশুপালন ও নানাপ্রকার হস্তশিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে ক্রমাধিক সংযোগ এবং সংমিশ্রণের মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এ সমস্ত সভ্যতা অধিকতর বিকাশলাভ করতে পারত। কিন্তু এই সভ্যতাসমূহের নিজস্ব বিকাশ ধারা পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর উন্নততর মারণাস্ত্রসজ্জিত ইউরোপীয় অভিযানকারীদের আক্রমণ, লুণ্ঠন ও শোষণের দুর্বার আঘাতে রুদ্ধ হয়ে যায়।

American Philosophy : আমেরিকার দর্শন

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করার জন্য 'আমেরিকার দর্শন' আখ্যাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমেরিকা বলতে কেবল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বুঝায় না। সে কারণে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্য 'আমেরিকার দর্শন' কথাটি উপযুক্ত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত ইউরোপ মহাদেশ থেকে আগত অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত হয়েছে। এ জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপ মহাদেশে ঊনবিংশ শতকে প্রচলিত ভাবধারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল। দর্শনের ক্ষেত্রেও ইউরোপের বিভিন্ন ধারা এবং উপধারার সাক্ষাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিকদের মধ্যে পাওয়া যায়। ইউরোপ থেকে ভিন্নভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শনকে চিহ্নিত করা সহজ ছিল না বলে বিগত শতকের দর্শনের ইতিহাসে 'মার্কিন দর্শন' বলে কোনো বিশেষ দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপ ত্যাগকারী জনসমষ্টি একটি অনাবাদী ভূখণ্ডকে আবাদযোগ্য করে আধুনিক সভ্যতা গঠনে যে ভাবধারার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তা বিশ্লেষণের যোগ্য। নতুন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং বৈজ্ঞানিকগণ যেভাবে সহায়তা করেছেন দার্শনিকগণও সেভাবে তাঁদের চিন্তাধারার মাধ্যমে এই গঠনকার্যে অংশগ্রহণ করেছেন। গঠনমূলক এই যুগের চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তবতা। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে কোনো সমস্যার তাত্ত্বিক বিচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুগের দার্শনিকগণের মধ্যে প্রকট হয় নাই। বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা চিন্তা করেছেন। এ কারণে মার্কিন দার্শনিকদের মধ্যে বাস্তব জীবনের স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জীবনবোধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাগমেটিজম বা প্রয়োগবাদের জন্ম হয়।

১৮৮০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শনের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা এই সময়ে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে জেমস ডিউই, পিয়ার্স, রয়েস, জর্জ সান্টায়ানা এবং আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডের মতো মৌলিক চিন্তাবিদদের উদ্ভব ঘটে। উপরোক্ত দার্শনিকদের গ্রন্থরাজি এবং অভিমত দর্শনের সমগ্র ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। হোয়াইটহেডকে প্রাগমেটিজম বা প্রয়োগবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা মনে করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক দর্শনে যে সমস্ত তত্ত্ব সমধিক আলোচিত হচ্ছে তার মধ্যে লজিকাল পজিটিভিজম বা যৌক্তিক দৃষ্টবাদ এবং লিঙ্গুইস্‌টিক ফিলোসফি বা ভাষা-দর্শনই প্রধান।

American War of Independence : আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬-১৭৮১) ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমেরিকার বিপ্লব বলেও অভিহিত করা হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বিকাশের একটি পর্যায়ের স্মারক। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইংল্যাণ্ডে পশম ও সুতার বস্ত্রশিল্প, কয়লা উত্তোলন এবং লৌহ তৈরির শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করে। পশমশিল্পের বিস্তারের সঙ্গে ভূমি ও কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভেড়ার পশম ছিল পশমশিল্পের মূল কাঁচামাল। কৃষিপণ্যের চেয়ে পশমের লাভ অধিক দেখে জমিদারগণ জমি থেকে ব্যাপকভাবে কৃষকদের উচ্ছেদ করে তাদের জমিদারিকে মেষপালনের খামারে পরিণত করতে শুরু করে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন নিঃস্ব মুজরে পরিণত হয়ে শহরে এবং শিল্পাঞ্চলে জমায়েত হতে থাকে। এই নিঃস্ব জমিহীন কৃষকরা শিল্পের সস্তা মজুর হিসাবে শিল্প বিকাশের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করে। ইংল্যাণ্ডের এই বিকশিত শিল্পের জন্যে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে বাজারের আবশ্যক হয়। এই বাজারের প্রয়োজনে শক্তিশালী নৌবহরের মালিক ইংল্যাণ্ড উপনিবেশের জন্যে বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৭০১ থেকে ১৭১৪ পর্যন্ত স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত ফ্রান্সের সঙ্গে সাত বছরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সমস্ত যুদ্ধের ফলে ভারতে এবং উত্তর আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। উত্তর আমেরিকাতে ফরাসিগণ কানাডাকে ইংল্যাণ্ডের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আমেরিকাতে এই বিজয় ইংল্যাণ্ডের শাসকদের জন্যে নতুন সংকটেরও সৃষ্টি করে। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে (১৪৯২) কলাম্বাসের আমেরিকা সন্ধান লাভের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নানা ধরনের অধিবাসী ধনরত্নের আশায় আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে আগমন করতে থাকে। ইউরোপীয়দের এই আগমন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিরাট স্রোতের আকার ধারণ করে। এই সমস্ত অভিযানকারীগণ আমেরিকার আদি অধিবাসীদের তুলনায় মারণাস্ত্র এবং অন্যান্য কলাকৌশল অধিকতর উন্নত ও শক্তিশালী ছিল। বিশাল আমেরিকার বিপুল অংশ তখনো অনাবাদী অবস্থাতে ছিল। ইউরোপীয় অভিযাত্রীগণ একদিকে আমেরিকার আদি অধিবাসীগণকে ধ্বংস করে, অপরদিকে অনধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ দখল এবং আবাদ করে ইউরোপীয় উপনিবেশ বা বসতি স্থাপন করতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই আটলান্টিক উপকূলব্যাপী ইংরেজদের উপনিবেশ বিরাট আকার ধারণ করে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে কানাডা লাভের ফলে এই উপনিবেশ আরো বৃদ্ধি পায়। এই সকল উপনিবেশের ইউরোপীয় অধিবাসীদের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে ত্রিশ লক্ষে পৌঁছে যায়। এই উপনিবেশের অধিবাসীগণ এখন আর ইউরোপ থেকে আগত কোনো অস্থায়ী বাসিন্দা নয়। এখন এরা নিজেদেরকে আমেরিকার অধিবাসী বলে গণ্য করে নিজেদেরকে 'আমেরিকান' বলে ঘোষণা করতে শুরু করে। এই সমস্ত

উপনিবেশবাসীদের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে তাদের মূলদেশ ইংল্যাণ্ডের শাসকদের শাসন ব্যবস্থা ও স্বার্থের বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে রচিত শাসনবিধি দ্বারা ইংল্যাণ্ডের রাজা আমেরিকার উপনিবেশগুলিকেও শাসন করত। পার্লামেন্টে আমেরিকার উপনিবেশের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। উপনিবেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পূর্ব থেকেই ইংল্যাণ্ডের এই শাসনবিধির প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার সাত বছরের যুদ্ধের পূর্বে তেমন পরিচালিত হয় নি। তার একটা কারণ ছিল, ফ্রান্স সম্পর্কে উপনিবেশের অধিবাসীদের ভয়। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে গেলে, কানাডা থেকে ফরাসিরা তাদের আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু সাত বছরের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং কানাডা ইংরেজ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমেরিকার অধিবাসীদের সে ভয় এবার দূর হলো।

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট এবার যখন পুরোনো কায়দায় আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর ট্যাক্স ধার্যের আইন পাশ করতে লাগল, উপনিবেশের অধিবাসীদের নিজস্ব শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার বাধা নিষেধ আরোপ করে চলল তখন উত্তর আমেরিকার এই সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশের অধিবাসীগণ বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দেখাতে শুরু করল। এই সময়েই আমেরিকানগণ একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম ধ্বনি উচ্চারণ করে 'নো ট্যাকসেশন উইদ-আউট রিপ্রেজেন্টেশন : প্রতিনিধি নাই, তো ট্যাক্স নাই' (১৭৬৭)। তারা সরকারের কর দিতে অস্বীকার করতে শুরু করল। ইংরেজ সরকার এর পাল্টা দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উপনিবেশবাসীরা ইংল্যাণ্ডের প্রেরিত চা এবং অন্যান্য দ্রব্য বর্জন করার আন্দোলন শুরু করে (১৭৭৪)। ইংরেজ সরকার তার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার বাণিজ্য নৌযানগুলিকে সমুদ্রপথে অবরোধ করে। এর জবাবে আমেরিকার উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৭৭৪ সালে আমেরিকানগণ সশস্ত্রভাবে সরকারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়। ১৭৭৫ সনে লেকসিংটনে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সামান্য রাইফেলধারী কিছু আমেরিকানদের কাছে ব্রিটিশ সৈন্য ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। ১৭৭৫-এর মে মাসে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন ফিলাডেলফিয়াতে আহূত হয়। এই সম্মেলনে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে জর্জ ওয়াশিংটনের (১৭৩২-১৭৯৯) অধিনায়কত্বে এক আমেরিকান বাহিনী গঠন করা হয়। ফিলাডেলফিয়ার সম্মেলন ১৭৭৬-এর জুলাই ৪ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে এবং আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি নিজেদের 'দি আমেরিকান স্টেটস' বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (ইউ.এস.এ.) হিসাবে ঘোষণা করে। ইতিহাসে এই ঘোষণা 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

এই ঘোষণা-পত্রের রচয়িতা ছিলেন টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬)। এই ঘোষণার পরে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের বাহিনী টিকে থাকতে অক্ষম হয়। ইংরেজ সৈন্য আমেরিকানদের হাত থেকে নিউইয়র্ক দখল করে।

ক্রমান্বয়ে আমেরিকার এই স্বাধীনতা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। স্বাধীনতাকামী যুদ্ধরত আমেরিকানগণ ফ্রান্স ও স্পেনের সাহায্য কামনা করে। ফরাসি জনমত তো বটেই, ফরাসি সরকারও এই সুযোগে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করে

আমেরিকানদের অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। স্পেনও সাত সাগরের একচ্ছত্র অধিপতি ইংল্যাণ্ডকে আঘাত করার এই সুযোগ গ্রহণে পিছিয়ে থাকলো না। স্বাধীনতাকামী আমেরিকানদের পক্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এবার একটি আন্তর্জাতিক জোট তৈরি হয়ে গেল। এই জোটের আঘাতের মুখে ইংরেজশক্তি আর টিকতে সক্ষম হলো না। তারা ইয়র্ক টাউনের যুদ্ধে ফরাসি ও আমেরিকানদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে আমেরিকার উপনিবেশজোটের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হলো (১৭৮১)।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মানুষের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রীমনা চিন্তাবিদদের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আমেরিকার সৈন্যগণকে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ 'স্বাধীনতার সন্তান' বলে গণ্য করতে শুরু করে। ইংল্যাণ্ডের চিন্তাবিদ সেইন্ট সাইমন এবং পোলাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা যোসিসকোসহ অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকাতে উপস্থিত হন। ১৭৮৯ সনের ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্রে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ বিরাট অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছিল।

Amphiboly : বাক্যের দ্ব্যর্থকতা

যুক্তির ক্রটিবিশেষ। যুক্তির মধ্যে একটি বাক্যকে যদি একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয় কিংবা বাক্যটি যদি এরূপভাবে গঠিত হয় যে তার একাধিক অর্থ করা সম্ভব, তা হলে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হতে পারে। এ কারণে একই যুক্তির মধ্যে একাধিক অর্থপূর্ণ কোনো বাক্য ব্যবহারকে দ্ব্যর্থকতার দোষে দুষ্ট বলা হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এরূপ দ্ব্যর্থক বাক্য বা শব্দ ব্যবহার পরিহার করা সঙ্গত। কিন্তু দ্ব্যর্থক বাক্য সাহিত্যের কাব্য, নাটক প্রভৃতি শাখায় প্রচুর পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসের দেবমন্দিরের ভবিষ্যদ্বক্তাগণ দ্ব্যর্থক ভাষাতেই তাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করত। এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রাচীন লিডিয়ার সম্রাট ক্রিসাস পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করার পূর্বে তাঁর ভাগ্য গণনার জন্য ডেলফির ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন এই অভিযানের ফলাফল কি হবে। ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিল : 'আপনি একটি বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করবেন।' ভবিষ্যদ্বক্তার কথা সত্য হয়েছিল। ক্রিসাসের অভিযানে এক বিরাট সাম্রাজ্য অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সে সাম্রাজ্য পারস্য নয় ; সে ছিল ক্রিসাসের নিজের সাম্রাজ্য।

Amritsar Massacre : অমৃতসর হত্যাকাণ্ড

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সনে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে ইংরেজ সামরিক অধিনায়ক জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি বদ্ধ উদ্যানে সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড অমৃতসর হত্যাকাণ্ড নামে বিখ্যাত। জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে এ ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বলেও পরিচিত।

তখন ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের অধীনে। উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকেই ভারতের উদীয়মান ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হতে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষার সাংগঠনিক প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়। গোড়ার দিকে এ প্রতিষ্ঠানের দাবি ছিল ইংরেজ শাসনাধীনে ন্যায়বিচার এবং স্বায়ত্তশাসন লাভ। কিন্তু ইংরেজ শাসনের তরফ থেকে, এ দাবির কোনো পূরণ ঘটে না। ইংরেজ শাসকেরা বলতে থাকে, ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ। ভারতবর্ষের মানুষ স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের নিজস্ব প্রয়োজনে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অপরাপর ঘটনার প্রভাবে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এবং দেশবাসীর চেতনায় ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্রমান্বয়ে বৃহৎ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র রেলপথ স্থাপিত হতে থাকে। টেলিগ্রাফ তারও বসানো হয়। কিছু কিছু শিল্প কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। বিশেষ করে কাপড়ের কলের স্থাপনা ও বিস্তার ঘটে। আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাবও দেশবাসীর চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করতে থাকে। ১৯০৫ সালে একদিকে রাশিয়ার মতো বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি ক্ষুদ্র জাপানের মতো এশিয়া শক্তির নিকট রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়। অপরদিকে রাশিয়ার ভেতরে নির্যাতিত জনসাধারণ সামন্ততান্ত্রিক জার সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান সংঘটিত করে। ১৯০৫ সালের বিপ্লব পর্যুদস্ত হলেও পৃথিবীর পরাধীন জাতি এবং নির্যাতিত মানুষের উপর এর প্রভাব কম ছিল না। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনৈতিক সংকটও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃহৎ বৃহৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত দেশকে দখল করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবার নতুন প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এরই ফলে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধে জড়িত হয়। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের জন্য ভারতীয়দের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়। পরাধীন ভারতবাসীর মনের সন্দেহ এবং অনিচ্ছা দূর করার জন্য ইংরেজ সরকার প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে যে, এই যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে সকল জাতির শৃঙ্খলমুক্তি এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান। এরূপ ঘোষণায় বিশ্বাস করে ভারতবাসীরাও যুদ্ধে যোগদান করতে থাকে। অবিভক্ত ভারতের অন্যতম জননেতা গান্ধীজি এই সময়ে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতে তাঁর কর্মস্থল স্থাপন করেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রচুর সংখ্যক ভারতবাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হতে থাকে।

কিন্তু ১৯১৯ সালে যুদ্ধ শেষ হলেও ভারতবাসী ইংরেজদের শাসনের নীতিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পায় না। যারা যুদ্ধে যোগদান করেছিল তাদেরকেও সৈন্যবাহিনী ভেঙে বেকার করে গ্রামে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধশেষের মন্দা অর্থনীতিকে আঘাত করে। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারীতে এককোটির অধিক মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবাসীর মনে সন্দেহ এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন অবস্থায় ইংরেজ সরকার একদিকে যেমন মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বলে কিছু সীমাবদ্ধ শাসন সংস্কারের ঘোষণা করে তেমনি অপরদিকে রাওলাট বিল পাশ করে ইংরেজবিরোধী সকল রকম বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাওলাট আইনের অধীনে বিনা কারণে গ্রেপ্তার, অন্তরীন এবং সংক্ষিপ্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণহীন বিচার ও বন্দিত্বের বেপরোয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এরূপ অবস্থায় গান্ধীজি সত্যাগ্রহ বা অহিংস পন্থায় এই দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদের কথা ঘোষণা করেন। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে (১৯১৯) পাঞ্জাবে যাওয়ার পথে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে আহমেদাবাদের শিল্পশ্রমিক এবং পাঞ্জাবের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। সরকার গান্ধীজিকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি বিক্ষোভ ক্ষান্ত হয় না। এই বিক্ষোভ তখন প্রধানত পশ্চিম ভারত এবং পাঞ্জাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। ধর্মঘট এবং বিক্ষোভে সরকারি দপ্তর এবং যানবাহন আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। শ্বেতচর্মের ইউরোপীয় অফিসার ও অধিবাসীও জনতার ক্রোধের পাত্র হয়ে ওঠে। তারাও আক্রান্ত হতে থাকে। ১৩ এপ্রিল দুজন রাজনীতিক নেতাকে অমৃতসরে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা সামরিক ছাউনি লক্ষ্য করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। ছত্রভঙ্গ জনতা শহরে ঢুকে রেলওয়ে স্টেশন ও দুটি ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে ভস্মীভূত করে। চারজন ইউরোপীয় অধিবাসী জনতার আক্রমণে নিহত হয়। একজন মহিলা মিশনারী নিখোঁজ হয়। সামরিক ছাউনির ইংরেজ অধিনায়ক জেনারেল ডায়ার ক্ষিপ্ত হয়ে শহরে সবরকম জনজমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি উদ্যানে বেশ কিছু লোক সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে জমায়েত হয়। উদ্যানটির মাত্র একটি নিষ্ক্রমণ পথ ছিল। জেনারেল ডায়ার এই জমায়েতের সংবাদ পেয়ে একদল গুর্খা এবং বালুচ বাহিনী এবং সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে উদ্যানের মুখে হাজির হন। তাঁর হুকুমে উদ্যানের মুখ সাঁজোয়া গাড়ির দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তারপর কোনোরকম হুঁশিয়ারী না দিয়ে সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর বিরামহীনভাবে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। সর্বমোট ১৬০৫ রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়েছিল। উদ্যানটি জনতায় পূর্ণ ছিল। হতচকিত জনতা প্রাণরক্ষার জন্য পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পলায়নের কোনো পথ ছিল না। নিজেদের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় হুড়োহুড়িতে এবং অবিরাম গুলিবর্ষণে চার শতাধিক লোক ঐ স্থানে নিহত হয়। সরকারি হিসাব সাধারণত কমের দিকে থাকে। সরকারি হিসাব মতে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১২০০ জন আহত হয়। ডায়ারের এই চণ্ডনীতি পাঞ্জাব সরকার সমর্থন করে। ১৫ এপ্রিল পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয়। এই সময় অমৃতসর এবং পাঞ্জাবের অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। যে স্থান থেকে ইংরেজ মহিলাযাত্রী নিখোঁজ হয়েছিল সে স্থানে সকল মানুষকে চার হাত পায়ে পশুর মতো হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়। সান্ধ্য আইনের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম, ইংরেজ সামরিক অফিসারকে হাত তুলে সালাম না জানানো ইত্যাদি অপরাধের জন্য প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের দণ্ড দেওয়া হতে থাকে। দেশব্যাপী প্রতিরোধের ঝড় ওঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিপূর্বে ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে যে 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন সে খেতাব একটি তীব্র প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে তিনি বর্জন করেন। দেশব্যাপী প্রতিবাদের ফলে সরকার যদিও 'হান্টার কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিশন এই ঘটনার উপর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তদন্ত কমিশনের সাধারণ সমালোচনামূলক রিপোর্টের ভিত্তিতে জেনারেল ডায়ারকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয় তথাপি কমিশনের নিকট ডায়ারের সদম্ভ উক্তিই যে ইংরেজ সরকারের মনোভাবের প্রকাশ করেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। জেনারেল ডায়ার নির্দ্বিধায় বলেছিলেন "আমি

যখন গুলিবর্ষণ শুরু করি তখন বিরামহীনভাবেই করি। জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত আমি গুলিবর্ষণ থেকে বিরত হইনি। কারণ আমার মতে এই পরিমাণ ছিল ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ। আমার হাতে সেদিন যদি সৈন্য সংখ্যা অধিকতর থাকত তা হলে নিহত ও আহতদের সংখ্যা অবশ্যই অধিকতর হতো। কারণ, কেবল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা নয়। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজন ছিল সেখানে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত পাঞ্জাবের সকলের মনে উপযুক্ত বাধ্যতাবোধ সৃষ্টি করা।"

ঐতিহাসিকরা মনে করেন ১৯১৯ সালের অমৃতসর হত্যাকাণ্ড তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই মাত্র তুলনীয়। এই সময় থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এখন থেকে ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন আপসহীনতার পথ গ্রহণ করতে থাকে। বলা চলে, জেনারেল ডায়ার সেদিন তার কামানের গর্জনে কেবল ইংরেজ বর্বরতাই ঘোষণা করেন নি, তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্তিম কালেরও ঘোষণা করেছিলেন।

Analogy : উপমা, সাদৃশ্য, সাদৃশ্যানুমান

ইংরেজি 'এ্যানালজি' শব্দ গ্রিক শব্দ 'এ্যানালজিয়া' থেকে উদ্ভূত। এ্যানালজিয়ার অর্থ হচ্ছে অনুপাত। প্রাচীনকালে অনুপাতের সমতা বা সাদৃশ্য অঙ্কশাস্ত্রে সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কেবল অনুপাতের সমতা নয়, দুইটি বিষয়ের মধ্যে কিছু পরিমাণ গুণের সাদৃশ্যের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে। ইনডাকটিভ বা আরোহ যুক্তিতে সাদৃশ্যানুমনা যুক্তির একটি পদ্ধতি। সাদৃশ্যানুমানের পদ্ধতিটি এরূপ ক এবং খ কে পারস্পরিকভাবে তুলনা করা হলো। দেখা গেল ক-এর ত, থ, দ, ধ নামক গুণ রয়েছে ; খ-এরও রয়েছে থ, দ, ধ গুণ। ক-এর গুণের কিছু সংখ্যকের সঙ্গে খ-এর গুণের উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা চলে যে, খ-এর মধ্যে অপর অর্থাৎ 'ত' গুণটিও থাকতে পারে।

সাদৃশ্যানুমানের এই গঠন থেকে বুঝা যায়, এরূপ সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা থাকে না। সিদ্ধান্তটি সঠিক হতে পারেও আবার না-ও হতে পারে, এরূপ একটা অনিশ্চিত অবস্থার অবকাশ এরূপ অনুমানের মধ্যে থেকে যায়। এ কারণে সাদৃশ্যানুমানকে সঠিক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু সাদৃশ্যানুমানকে পুরাপুরি বাতিল করাও চলে না। মানুষের জ্ঞানের অনুন্নত পর্যায়ে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান একটি অপরিহার্য পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত ছিল। এরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত গবেষণার পরবর্তী পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সাদৃশ্যানুমান জ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সাদৃশ্যানুমান কম-বেশি পরিমাণে নিশ্চিত হতে পারে। নিশ্চয়তার পরিমাণ নির্ভর করে উপমিত বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক সাদৃশ্যের সংখ্যা এবং চরিত্রের উপর। সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উপমিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে ; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের পরিমাণ বৈসাদৃশ্যের চেয়ে অধিক হয় উপমা দুইটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপমা বা সাদৃশ্যের অসতর্ক ব্যবহার ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। জননী এবং জন্মভূমির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। 'জননী সন্তানকে লালন পালন করে ; জন্মভূমিও তার অধিবাসীর জীবনধারণের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সন্তান অসুস্থ হলে জননী তার শুশ্রূষা করে। সুতরাং জন্মভূমির অধিবাসী অসুস্থ হলে জন্মভূমিকে তার শুশ্রূষা করে হবে।' এখানে জন্মভূমিকে জননীর সঙ্গে রূপকার্থে সদৃশ মনে করা হয়েছে। এরূপ সাদৃশ্যানুমান যথাযথভাবে সঠিক হতে পারে না।

সাদৃশ্যানুমানকে নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে উপযুক্ত গবেষণার ভিত্তিতে এর সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করা আবশ্যক। নচেৎ, এরূপ অনুমান নিছক অপ্রমাণিত অনুমানেই সীমাবদ্ধ থাকে।

Analysis and Synthesis : বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ

উভয় শব্দ মানুষের মানসিক কিংবা দৈহিক একটি বিশেষ ক্রিয়ার কথা বুঝায়। বিশ্লেষণ বলতে একটি সমগ্রকে তার অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহে বিভক্তকরণ এবং সংশ্লেষণ বলতে অংশসমূহের সম্মেলনের মাধ্যমে সমগ্রের পুনর্গঠনকে বুঝায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আদিকাল থেকে মানুষ এই উভয় পদ্ধতিকে ব্যবহার করে এসেছে। উভয় পদ্ধতি কোনো বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য অপরিহার্য। বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমেই মানুষ এই সত্যে উপনীত হয়েছে যে, বস্তুজগতের কোনো বস্তুই একক নয়। এর প্রত্যেকটি এক একটি জটিল সত্তা। এ কারণে কোনো বস্তু বা সমস্যার যথার্থ জ্ঞান বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে যথাযথভাবে লাভ করা চলে না। পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য বিশ্লেষণের পরিপূরক পদ্ধতি হচ্ছে সংশ্লেষণ। বিবেচ্য বিষয় বা বস্তুকে বিশ্লেষণ করে যেমন তার অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহকে স্পষ্টতররূপে বুঝতে হবে, তেমনি অংশসমূহকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের পারস্পরিক নির্ভরতার ও সম্পর্কের ভিত্তিতে মূল বস্তুটির সামগ্রিক রূপটিও উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্লেষণ ব্যতীত সংশ্লেষণ সম্ভব নয়। আবার সংশ্লেষণ ব্যতীত বিশ্লেষণ সামগ্রিক জ্ঞানদানে অক্ষম। উভয় পদ্ধতি দ্বান্দ্বিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ উক্ত পদ্ধতি দুইটির পারস্পরিক নির্ভরতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এই দর্শনের মতে ভাববাদী দর্শনে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পারস্পরিক নির্ভরতাকে উপেক্ষা করা হয়। ভাববাদী দর্শনের বিশ্লেষণকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি বলে মনে করা হয়।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ভাষা, যুক্তি, রসায়ন বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রযুক্তি হচ্ছে। ইংরেজ দার্শনিক জি.ই. মূর এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁদের রচনাবলীতে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর পদ্ধতিকে লজিকাল এ্যাটোমিজম বা 'যৌক্তিক অণুবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে কেবল পদার্থ নয়, বিশ্বের সামাজিক, মানবিক, রাষ্ট্রনৈতিক যে-কোনো অস্তিত্বই মৌলিক এবং জটিলতাহীন কতকগুলি সত্তা দ্বারা গঠিত। তাঁর মতে দার্শনিকের কর্তব্য হচ্ছে যা-কিছু জটিল তাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার অন্তর্ভুক্ত সহজ সত্তা প্রকাশ করা।

Anarchism : নৈরাজ্যবাদ, নৈরাষ্ট্রবাদ

রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রচারক একটি সমাজ দর্শন। ইংরেজি এ্যানার্কিজম শব্দের মূল হচ্ছে গ্রিক 'এ্যানার্কস' শব্দ। সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের সময়ে ইংল্যাণ্ডে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। 'লেভেলারপন্থীদের' তখন নৈরাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হতো। ফরাসি বিপ্লবে শব্দটিকে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যে-কোনো দল তাদের চাইতে বিপ্লবাত্মক মতাদর্শের লোক এবং দলকেই নৈরাজ্যবাদী বলে অভিহিত করত। ফরাসি দার্শনিক প্রুধোঁর রচনার মধ্যেই নৈরাজ্যবাদী মতের সম্যক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি ১৮৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সম্পত্তি কি' গ্রন্থে 'নৈরাজ্যবাদ' ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে নৈরাজ্যবাদ যে-কোনো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরোধী। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশের প্রতিবন্ধক। মানুষের জীবনে শৃঙ্খল বিশেষ। অত্যাচারের যন্ত্র। মানুষের সমাজে রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন। পারস্পরিক ইচ্ছা এবং চুক্তির মাধ্যমে গঠিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা মানুষের জীবনকে পরিচালিত করবে ; আইন, অস্ত্রপ্রয়োগকারী বাহিনী, শাসন, সংগঠন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নয়।

এই তত্ত্বের পরিপূরক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সমস্ত রাষ্ট্রকাঠামোকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এজন্য নৈরাজ্যবাদের সমর্থক কেউ কেউ বিপ্লবের কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন বিপ্লব নয়, মানুষের সততার স্বাভাবিক বিজয়ের দ্বারা একদিন নৈরাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার কেউ গুপ্তহত্যার মারফত ক্ষমতাসীনদের উচ্ছেদ করে উক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিমত পোষণ করেছেন। সাধারণত নৈরাজ্যবাদ বলতে অরাজকতা বুঝায়। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপও নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে করা হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে নৈরাজ্যবাদের তথা নৈরাষ্ট্রবাদের সঙ্গে অরাজকতা বা সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক দেখা যায় না। নৈরাজ্যবাদ তত্ত্বের ইতিহাসে উক্ত মতের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা এবং প্রবক্তা হিসাবে ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম গডুইন (১৭৫৬-১৮৩৬ খ্রি.) ফ্রান্সের পিয়ের যোশেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫ খ্রি.), রাশিয়ার মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬ খ্রি.), প্রিন্স পিটার ক্রোপোটকিন (১৮৪২-১৯২১ খ্রি.) এবং রুশ লেখক কাউন্ট লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রি.)—এঁদের নাম পাওয়া যায়।

মার্কসবাদও পরিণামে রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থার আদর্শ পোষণ করে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মার্কসবাদ একমত নয়। মার্কসবাদ নৈরাজ্যবাদকে পাঁতিবুর্জোয়া অবাস্তব দর্শন বলে অভিহিত করে। মার্কসবাদের মতে নৈরাজ্যবাদ শোষণহীন সমাজের কথা বললেও সমাজের শোষণের উদ্ভব এবং শোষণের চরিত্র সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদের কোনো বাস্তব এবং যথার্থ বিশ্লেষণ নাই। নৈরাজ্যবাদের অন্যতম সমর্থক মাইকেল বাকুনিন তাঁর মত প্রচারের জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী নামক একটি সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক-এ যোগদান করে। কিন্তু সমাজের ব্যাখ্যা এবং সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি নিয়ে মার্কসবাদীদের সঙ্গে বাকুনিনপন্থীদের বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙে যায়।

Anaxagoras : এনাক্সাগোরাস (৫০০-৪২৮ খ্রি. পূ.)

সক্রেটিসের পূর্ববর্তী যুগের অন্যতম গ্রিক দার্শনিক। এই যুগের অপর গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে থেলিস, এনাক্সিমেনিস এবং এনাক্সিমেণ্ডারের নাম বিখ্যাত। আদি গ্রিক দার্শনিকদের বৈশিষ্ট্য ছিল জীবন এবং জগতের ব্যাখ্যায় বাস্তবতাবোধ। এনাক্সাগোরাসের দর্শনেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পরিপূর্ণ বস্তুবাদের বদলে তাঁর দর্শনে ভাববাদেরও প্রকাশ দেখা যায়।

এনাক্সাগোরাসের মতে বস্তুপুঞ্জ সংখ্যাহীন মূল বস্তুনিচয়ের দ্বারা গঠিত। বস্তু বা অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত বস্তুনিচয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। একটির সঙ্গে অপরটির কোনো মিল নেই। আদিতে সত্তা স্থির ছিল। সেই স্থির অস্তিত্বে 'নাউসের' অনুপ্রবেশে অস্থিরতা এবং আবর্তের সঞ্চার হয়। এই আবর্তের ফলেই বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এনাক্সাগোরাস যাকে 'নাউস' বলেছেন, তাকে মন বলা চলে। সক্রেটিসের পূর্বে সৃষ্টির মূলে মনের মৌলিক ভূমিকার কথা এনাক্সাগোরাসের ন্যায় অপর কেউ বলেন নি। নাউসের কারণেই এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক হয়েছে। এবং বস্তুর প্রকারভেদ ঘটেছে। মন সমগ্র সত্তার সৃষ্টির কারণ হলেও মন কোনো অস্তিত্বের সঙ্গেই অভেদ আকারে সম্পৃক্ত নয়। এনাক্সাগোরাসের মতে আদি সত্তার মধ্যেও সংখ্যাহীন অস্তিত্ব রয়েছে। তার কারণ, কোনো অস্তিত্বই অনস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। সে জন্য প্রত্যেকটি উদ্ভূত অস্তিত্বই অপর অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত। মাথার চুল নিশ্চয়ই যা চুল নয় তা থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। যে অবস্থা থেকে চুলের উদ্ভব তার মধ্যে চুলের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই নিহিত আছে।

এনাক্সাগোরাস মনে করতেন, পৃথিবী আকারে চেপ্টা এবং বায়ুর সমুদ্রে ভাসমান। চাঁদ আলো দেয় বটে—কিন্তু সে আলো সূর্য থেকে সে পায়। সূর্য, চন্দ্র, তারা এ সবগুলি উত্তপ্ত পাথর। কোনোটার আকার বড়, কোনোটার আকার ছোট। আমাদের চেতনার মূলে রয়েছে পরস্পরবিরোধী অবস্থার সম্পর্ক। কারণ একটি সদৃশ অবস্থা আর একটি সদৃশ অবস্থাকে আলোড়িত করে তুলতে পারে না। আমরা যখন ঠাণ্ডা বোধ করি, তখন আমাদের শরীরের ভিতরের অবস্থা উষ্ণ এবং বাইরের অবস্থা ঠাণ্ডা বলেই আমরা শরীরের ভিতরে ঠাণ্ডা বোধ করি।

এনাক্সাগোরাসের দর্শনের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বুঝা যায়, তিনি প্রধানত বস্তুবাদী ছিলেন। প্রাকৃতিক জগতের ব্যাখ্যায় অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তিরই তিনি উল্লেখ করেন নি। সৃষ্টির মূল শক্তি মনকেও এনাক্সাগোরাস সূক্ষ্ম এবং বিশুদ্ধ বলে কল্পনা করেছেন। ঐশ্বরিক অস্তিত্ব অস্বীকারের জন্য এনাক্সাগোরাসকে নাস্তিক বলে মনে করা হতো। তিনি দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—এই অভিযোগ এথেন্সের তৎকালীন সরকার এনাক্সাগোরাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। জীবন রক্ষার্থে এনাক্সাগোরাসকে এথেন্স থেকে পলায়ন করতে হয়। 'প্রাকৃতিক জগৎ' সম্পর্কে এনাক্সাগোরাসের যে পুস্তক রচনা করেন তার কিছু কিছু অংশ অবলুপ্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে পরবর্তী যুগের জ্ঞানান্বেষণে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। এনাক্সাগোরাস আইওনিয়া দ্বীপের ক্লাজোমিনীর অধিবাসী বলে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৪ সালে তিনি আইওনিয়া পরিত্যাগ করে এথেন্স আগমন করেন

এবং দীর্ঘ ত্রিশবৎসর এথেন্সে জীবন-জগৎ-অঙ্কশাস্ত্র-জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিমতের ব্যাখ্যা করেন। পেরিক্লিস এবং ইউরিপাইডিস তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, দর্শন-গুরু সক্রেটিসও এক সময়ে এনাক্সাগোরাসের শিষ্য ছিলেন।

Anaximander : এনাক্সিমেণ্ডার (খ্রি. পূ. ৬১০-৫৪৬)

আদি গ্রিক দার্শনিক থেলিসের শিষ্য। এনাক্সিমেণ্ডারের দর্শন বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে এনাক্সিমেণ্ডারের ব্যাখ্যা দ্বন্দ্বমূলক চরিত্রে বিশিষ্ট। বস্তুজগৎ এবং প্রাণিজগতের বিবর্তনমূলক ব্যাখ্যার আভাসও এনাক্সিমেণ্ডারের দর্শনে স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। গ্রিক ভূ-বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এনাক্সিমেণ্ডার বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র, মহাকাশের তারকারাজির নক্‌শা, সূর্যের দৈনিক ও বার্ষিক পরিক্রমা অনুধাবনের জন্য সূর্যঘড়ি আবিষ্কার এবং পৃথিবীর গোলক তৈরির আদি কৃতিত্ব এনাক্সিমেণ্ডারের। মহাবিশ্বে পৃথিবী যে স্থির হয়ে আছে তার কারণ এই যে, মহাবিশ্ব একটা বৃত্তস্বরূপ। পৃথিবী হচ্ছে সেই বৃত্তের কেন্দ্র। বৃত্তের সর্ববিন্দু থেকে পৃথিবীর সমদূরত্বেই পৃথিবীর স্থির অবস্থাকে নিশ্চিত করেছে। থেলিসের শিষ্য হলেও পৃথিবী সম্পর্কে এনাক্সিমেণ্ডারের এই ব্যাখ্যা থেলিসের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টত পৃথক। থেলিসের মতে পৃথিবী জলের সমুদ্রে ভাসমান। প্রাকৃতিক জগতের বিকাশ সম্পর্কে এনাক্সিমেণ্ডারের অভিমতও সুনির্দিষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক। পৌরাণিক কোনো কল্পনা কিংবা অতিপ্রাকৃতিক ঐশ্বরিক শক্তির আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রাকৃতিক জগৎকে ব্যাখ্যা করতে চান নাই। এনাক্সিমেণ্ডারের মতে আপেরিয়ন বা অসীমতা থেকেই বিশ্বের শুরু। আপেরিয়ন বা সৃষ্টির মূলশক্তি তাপ এবং শৈত্যের সম্মেলন। আপেরিয়ন থেকে অগ্নির সৃষ্টি। আদি অগ্নি বায়ুমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করলে তা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে চন্দ্র, সূর্য এবং তারকারাজি। নিসর্গজগতের এই সৃষ্টিসমূহ এক একটি অগ্নির চক্র হয়ে মহাবিশ্বে নিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে অগ্নির হল্কা ছুঁড়ে দিচ্ছে। আদিতে বিশ্ব কেবল বাষ্পময় ছিল। সমুদ্র বাষ্পেরই সৃষ্টি। আদি বাষ্পের অবশিষ্ট অংশই বাতাস এবং শুষ্ক পৃথিবীর রূপ গ্রহণ করেছে। এভাবে বিশ্বের যা-কিছু সৃষ্টি, আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, ভূখণ্ড সবই আদি শক্তি তাপ এবং শৈত্যের চিরন্তন সংঘর্ষ এবং বিচ্ছুরণের ফল। এনাক্সিমেণ্ডারের মতে আদিশক্তি তাপ এবং শৈত্যের সংঘর্ষকে স্বীকার করে নিলে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র কোনো কিছুর সঠিক ব্যাখ্যা পেতে আমাদের অসুবিধা হবে না। জীবনের বিকাশও তাপ এবং শৈত্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে। জীবনের আদি সৃষ্টি জলজ-প্রাণ হিসাবে ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে জীবন শুষ্ক ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। এনাক্সিমেণ্ডারের বিবর্তনবাদী এই মতে মানুষের রূপও আদিতে বর্তমানের ন্যায় ছিল না। বিশেষ করে মানব-শিশু বর্তমানে যেরূপ দুর্বল প্রাণী তাতে প্রকৃতির আদি অবস্থায় বর্তমান রূপে সে নিশ্চয় রক্ষা পেতে পারত না। মানবশিশুর তুলনায় অপরাপর পশু শিশু অবস্থায় অনেক বেশি শক্তিশালী। সে কারণে অনুমান করতে হবে যে, মানুষ আদিতে অবশ্যই অপর কোনো প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে এনাক্সিমেণ্ডারের গদ্যে লেখা গ্রন্থই আদি দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত।

Anaximenes এনাক্সিমেনিস (৫৮৮-৫২৫ খ্রি. পূ.)

গ্রিক দর্শনের আদি যুগকে প্রাকৃতিক দর্শনের যুগ বলা হয়। বাস্তব জগতে মানুষ বাস করে। তার আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ত মানুষের জীবনকে আঘাত করছে। তাকে অসহায় করে তুলছে। মানুষ জীবনের তাগিদেই প্রাকৃতিক শক্তির মোকাবেলা করে। ঝড় শুরু হলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে। বন্যার পানি বাঁধ বেঁধে ঠেকাবার চেষ্টা করে। সমুদ্রের সীমানার সন্ধান করে। প্রকৃতিকে নিজের বাধ্য করতে না পারলে মানুষের রক্ষা নাই। প্রকৃতিকে বাধ্য করার জন্য আবশ্যক হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। জগতের মূল কি? আলো, বাতাস, আর পানি? এরাই সৃষ্টির মূলে? এই জ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে বশ করা সম্ভব নয়। মানুষের সভ্যতা, ইতিহাস, দর্শন—সব কিছুর মূলে রয়েছে এই স্বাভাবিক প্রশ্ন। আদি গ্রিক দর্শনের খ্যাতি এই কারণে যে, আদি গ্রিক দর্শন মানুষের জীবনের সকল প্রশ্নের যথাসম্ভব জবাব দিয়ে মানুষকে জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। এই যুগের থেলিস, এনাক্সিমেণ্ডার এবং এনাক্সিমেনিসের নাম শুধু দর্শনে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সৃষ্টির মূল কি? এ প্রশ্নের জবাবে এনাক্সিমেনিস বলেছেন : বায়ু হচ্ছে বিশ্বের মূল শক্তি। বায়ুর শেষ নাই, সীমা নাই। বায়ু থেকেই সমস্ত অস্তিত্বের সৃষ্টি। ঈশ্বর আর দেবতা—তারাও বায়ুর প্রকাশ। বায়ুর চরিত্র হচ্ছে এই যে, বায়ু অস্থির। বায়ু সদাঘূর্ণ্যমান। আবর্তের মধ্যে বায়ুর রূপান্তর ঘটে। ঘূর্ণ্যমান বায়ু একদিকে যেমন গতির বেগে বাষ্পে পরিণত হতে পারে, তেমনি অপরদিকে সে জমাট বাঁধা বায়ু আবহাওয়ার উৎপত্তি ঘটায়। আবহাওয়া থেকে সৃষ্টি হয় মেঘ। মেঘ থেকে হয় পানি। পানি জমাট বেঁধে হয় মাটির সৃষ্টি। মাটির মধ্যে তৈরি হয় প্রস্তর। এমনি করে পৃথিবীর সৃষ্টি।

মূলশক্তি বায়ুর সঙ্গে এনাক্সিমেনিস বস্তুর তাপ এবং শৈত্যাবস্থার ভূমিকাকেও স্বীকার করেছেন। ঘূর্ণ্যমান বায়ুর কারণে যে অস্তিত্বের সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে আছে তাপ এবং শৈত্যের চরিত্র। বলা চলে, তাপ এবং শৈত্য বায়ু থেকে পৃথক কোনো সত্তা নয়। তাপ এবং শৈত্য বায়ুর গুণবিশেষ।

আমাদের পৃথিবী হচ্ছে চেপ্টা। তার গভীরতা তেমন কিছু নাই। অন্তরীক্ষের নক্ষত্ররাজি অগ্নিপিণ্ড। এগুলি নিশ্চয় অন্তরীক্ষে আপন আপন স্থানে কোনো কিছু দিয়ে আটকা আছে। সেই অবস্থায় আকাশের দৃশ্যমান অস্তিত্বগুলি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তারকারাজি অগ্নিগোলক। কেবল দূরত্বের কারণে তার তাপ আমাদের দগ্ধ করতে পারে না। দিনরাত্রির ভেদাভেদের কারণ নিশ্চয়ই এই যে, আবর্তিত হতে হতে চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্র পৃথিবীর সুউচ্চ পাহাড়-পর্বতের আড়ালে গেলে আমরা ওদের দেখতে পাই না। জমাট বায়ু থেকে যেমন মেঘের সৃষ্টি, তেমনি জমাট বায়ুর কারণেই বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ এবং বিদ্যুৎ ও বজ্রের উৎপত্তি।

বিশ্বে যে একটা নিয়মের ব্যাপার চলেছে তা এনাক্সিমেনিসের দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু নিয়মের কারণেই নিয়ম এরূপ তত্ত্বে পৌঁছার অবস্থা তখনো জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে পৌঁছে নি। এনাক্সিমেনিস বললেন কারণ বাদে কোনো কাজ হতে পারে না। নিয়মেরও নিশ্চয়ই কারণ

আছে। আর সে কারণ হচ্ছে বায়ু। আমাদের আত্মা যেমন আমাদের দেহের সূত্রধর, তেমনি বায়ু সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে তার নিয়মের মূল বা সূত্র হিসাবে কাজ করছে।

গ্রিকদর্শনের আদি যুগে বস্তুজগতের সৃষ্টি এবং সংগঠন সম্পর্কে যে অন্বেষা চলছিল, সে অন্বেষার ক্ষেত্রে এনাক্সিমেনিসের উপরোক্ত অভিমতসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। 'ঘূর্ণ্যমান বায়ু পর্যায় বিশেষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, এবং নতুন অস্তিত্ব তৈরি করতে পারে' এনাক্সিমেনিসের এই অভিমতের মধ্যে 'সংখ্যা থেকে গুণে রূপান্তরের' দ্বন্দ্বমূলক বৈজ্ঞানিক সত্যোপলব্ধির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

Annexation : পররাজ্য গ্রাস

কোনো অঞ্চল কিংবা অপর কোনো রাষ্ট্রের কোনো অংশকে জোর করে দখল করাকে পররাজ্য গ্রাস বলে। এরূপ দখলের মাধ্যমে দখলকৃত অঞ্চলের সার্বভৌম কর্তৃত্ব দখলকারী রাষ্ট্র প্রয়োগ করে। অপর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রাংশের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ পররাজ্যগ্রাসের একটি লক্ষণ হলেও জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কোনো আশ্রিত বা অছিরাষ্ট্রকে এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। অছিভুক্ত একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাও সাময়িককালের জন্য অপর রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া যেতে পারে।

Animism : আত্মাবাদ, সর্বপ্রাণবাদ

ল্যাটিন এ্যানিমা শব্দ থেকে ইংরেজি এ্যানিমিজম শব্দের উৎপত্তি। 'এ্যানিমার' অর্থ হচ্ছে আত্মা। আত্মার নিজস্ব অস্তিত্ব থাকার অভিমতকে 'আত্মাবাদ' বলা চলে। এই অর্থে 'আত্মাবাদ' মানুষের প্রাচীনতম অভিমতগুলির অন্যতম। উৎপাদনের অনুন্নত এবং প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যখন প্রকৃতির নিকট অসহায় ছিল তখন বাঁচার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নানা রহস্যের সন্ধান পাবার সে চেষ্টা করেছে। যে দেহ কিছুকাল পূর্বেও সচল ছিল সে দেহ মৃত্যুর কারণে এখন নিশ্চল। তা হলে মৃত্যু কি? মানুষ ভেবেছে, মৃত্যু হচ্ছে দেহ থেকে আত্মার তিরোধান। আদিকাল থেকে কথাটা আজো আমাদের মধ্যে চলে আসছে। এখনো আমরা মৃত মানুষের আত্মার শান্তি কামনা করি। মানুষ নিদ্রা যায়। তখন আত্মা দেহে থাকে না। তাই মানুষের চেতনা থাকে না। কিন্তু আবার আত্মা দেহে প্রত্যাবর্তন করে। দেহে তাই চেতনার সঞ্চার হয়। মৃত্যুকালেও আত্মা দেহ ছেড়ে প্রস্থান করে। যে আত্মা আজ প্রস্থান করেছে, সে কাল হয়তো ফিরে আসবে। তাই প্রাচীনকালে মানুষ মৃতদেহ কবরে রেখে আসার সময়ে আত্মার জন্য প্রয়োজনীয় সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রীও রেখে আসত। আত্মা যখন আবার ফিরবে তখন সে নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত থাকবে। ক্ষুধার্ত আত্মা যেন নিরন্ন, উপবাসী না থাকে, তাই এই ব্যবস্থা। আত্মা একবার প্রস্থান করলে সহজে আবার না-ও ফিরতে পারে। সে পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ভারত মহাসাগরে 'বিপদ-দ্বীপে'র মানুষ এখনো বিভ্রান্ত আত্মাকে ধরার জন্য দড়ির ফাঁদ ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। আত্মা যে-কোনো দেহ বা বস্তুতেই আশ্রয় নিতে পারে। যে-আত্মা মানুষের ছিল, সে-আত্মা স-জীব, অ-জীব, যে-কোনো আধারে প্রবেশ করতে পারে।

তাই ইট, পাথর, গাছ, লতা-পাতা, আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুরই আত্মা আছে। এ-কারণেই এ তত্ত্ব সর্বপ্রাণবাদ বলেও পরিচিত। জন্মান্তরবাদ তত্ত্বের মূলেও এই বিশ্বাস। আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অপরিহার্য অংশরূপে স্বীকৃত। এই বিশ্বাস থেকে দেবদূত, ভূত, প্রেত ইত্যাদি অস্তিত্বের কথাও মানুষ কল্পনা করেছে। অশান্ত, বিভ্রান্ত কিংবা দুষ্ট আত্মাকে জয় করার প্রয়োজনে মানুষের আদিম অবস্থায় তুক-তাক মন্ত্র বা জাদুবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। সর্বপ্রাণ এবং আত্মাবাদ মানুষের আদিম সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। ইংরেজ গ্রন্থকার ই.বি. টেইল তাঁর বিখ্যাত 'প্রিমিটিভ কালচার' পুস্তকে সর্বপ্রাণ এবং আত্মাবাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Anselm : এনসেলম (১০৩৩-১১০৯ খ্রি.)

ইংল্যাণ্ডের ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক। এনসেলম ধর্মের সঙ্গে যুক্তির মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেন। তৎকালে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গোঁড়ামির যে প্রবল ধারা খ্রিষ্টিয় সমাজে প্রচলিত ছিল, এনসেলম তার মধ্যে যুক্তির ভূমিকা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। যুক্তি মাত্রই ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে—প্রচলিত এই ধারণার তিনি বিরুদ্ধতা করেন। এনসেলম বলেন যে, যুক্তি বিশ্বাসকে বিনষ্ট করবে এমন কোনো কারণ নেই। যুক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করতে পারে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে এনসেলম ঘোষণা করেন : 'জ্ঞানের জন্যেই আমি বিশ্বাস করি।' অন্ধবিশ্বাস জ্ঞানকে সাহায্য করে না। তাই অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তির উপর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এনসেলেমের এই অভিমতের অনুসরণেই মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তি-তর্ক প্রয়োগের একটি ঐতিহাসিক ধারার সূচনা হয়। এই ধারা স্কলাসটিসিজম নামে পরিচিত। এনসেলম বিধাতার অস্তিত্বের জন্য দার্শনিক প্রমাণ উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর একখানি গ্রন্থে তিনি জাগতিক অস্তিত্বের ভিত্তিতে বিধাতার অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। অপর গ্রন্থে বিধাতার গুণাবলীর আলোচনা করেন।

Antagonistic and Non-Antagonistic Contradictions আপসহীন এবং আপসমূলক বিরোধ

সমাজের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় মার্কসপন্থীগণ আপসহীন এবং আপসমূলক বিরোধ কথা দুটি ব্যবহার করেন। মার্কসবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে বিরোধী শক্তির সংঘাতের মাধ্যমেই সমাজ বিকাশ লাভ করে, সমাজের এক স্তরের স্থানে নতুন স্তর প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিরোধ হচ্ছে সমাজ বিকাশের প্রাণশক্তি। একেবারে বিরোধশূন্য কোনো জীবন বা সমাজের কল্পনা মার্কসবাদের মতে অবাস্তব কল্পনা। মার্কসপন্থীগণ বিরোধকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এক শ্রেণীর বিরোধকে তাঁরা বলেন, আপসহীন বিরোধ। অপর শ্রেণীকে তাঁরা আপসমূলক বিরোধ বলে আখ্যায়িত করেন। উৎপাদনের মারফতই মানুষ জীবন ধারণ করে। উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপায়ের মালিকানার তারতম্যের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ সমাজের অধিবাসীগণ বিভিন্ন আর্থিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কোনো বিশেষ যুগের

উৎপাদনের হাতিয়ার যাদের একচ্ছত্র মালিকানায় কবলিত হয়, তারা শোষক এবং শাসকে পরিণত হয় এবং সে যুগে যাদের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলি থাকে না তারা শোষিত এবং নির্যাতিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের পরে এই কারণেই সমাজে কোনো যুগে মানুষ প্রভু এবং দাসে বিভক্ত হয়েছে ; কোনো যুগে ভূস্বামী এবং ভূমিদাসে এবং আর এক যুগে পুঁজিপতি এবং শ্রমিকে বিভক্ত হয়েছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে এরূপ বিরোধকে মার্কসপন্থীগণ আপসহীন বিরোধ বলে বিবেচনা করেন। এরূপ বিরোধ আপসহীন এই কারণে যে, এদের উভয়ের স্বার্থ এরূপ পরস্পর-বিরোধী যে, এর কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। বিরোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চরম অবস্থায় তীব্রতম সংঘর্ষে বা বিপ্লবের মাধ্যমে এর সমাধান ঘটে। অর্থাৎ উৎপাদনের হাতিয়ারে নতুন মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটে, পূর্বতন মালিকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ক্রমান্বয়ে সমাজের আর্থিক কাঠামো থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই নিয়মে বিপ্লবের মাধ্যমে দাস সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিককালে পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজেও উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর মালিকানা নিয়ে শ্রেণী-বিভাগের সৃষ্টি হবে এবং আপসহীন বিরোধের অবকাশ থাকবে, মার্কসবাদীগণ এরূপ অভিমত পোষণ করেন না। সমাজতন্ত্রবাদে উৎপাদনের হাতিয়ার নিয়ে অর্থাৎ উৎপাদনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর আপসহীন বিরোধের অবকাশ থাকে না। কিন্তু আপসমূলক বিরোধের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক সমাজেও থাকবে। আপসমূলক বিরোধ বলতে তাঁরা পুরাতন ভাবধারার সাথে নতুন ভাবধারার বিরোধ, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আঞ্চলিক অসাম্যের বিরোধ, কায়িক এবং মানসিক শ্রমের মূল্য নির্ণয়ের বিরোধ, গ্রাম ও শহরের আপেক্ষিক বিরোধ—ইত্যাদির কথা বুঝান। এ সমস্ত বিরোধ সমাধানের জন্য চরম সংঘর্ষ কিংবা বিপ্লবের আবশ্যক হবে না। শ্রেণীগত আর্থিক শোষণের বিলোপের পরে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ যত অধিক পরিমাণে জয় করে মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করতে থাকবে, তত অধিক পরিমাণে আপসমূলক বিরোধগুলিরও সমাধান ঘটতে থাকবে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নতুনতর বিরোধের উদ্ভব ঘটবে, কিন্তু সে বিরোধ আপসহীন নয় ; সে বিরোধ আপসমূলক।

Anti-Duhring : এ্যান্টিডুরিং

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর একখানি গ্রন্থের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'এ্যান্টিডুরিং'। আসলে এঙ্গেলস-এর গ্রন্থখানির মূল নাম হচ্ছে 'হার ইউজেন ডুরিংস রিভোল্যুশন ইন সায়েন্স' বা 'হার ইউজেন ডুরিংকৃত বিজ্ঞানে বিপ্লব'। নামটির মধ্যে একটি ব্যঙ্গাত্মক সুর আছে। কারণ ডুরিং নামক সমকালীন এক লেখক মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা হিসাবে এঙ্গেলস ১৮৭৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এই সমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন উল্লিখিত নামে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ্যান্টিডুরিং-এর মধ্যে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন ১. দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ২.

রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি ; ৩. বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব। গ্রন্থের তিনটি ভাগে এই মূল বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়। প্রথমভাগে এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দর্শনের মূল প্রশ্ন কি, বস্তুজগতের মূল বিধান, জ্ঞানের সমস্যা, স্থানকালের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং বস্তুর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় এঙ্গেলস বিবর্তনের ডারউইনীয় তত্ত্ব, বিকাশে জৈবকোষের ভূমিকা, কান্টের বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। এই অংশে এঙ্গেলস সামাজিক নীতি, সাম্য এবং ব্যক্তির কার্যে স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতার প্রশ্নও আলোচনা করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে এঙ্গেলস রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণকালে ডুরিং-এর তত্ত্বের সমালোচনা করেন। দ্রব্যমূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্য, পুঁজি, জমির খাজনা প্রভৃতি অর্থনীতিক প্রশ্নে মার্কসবাদের তত্ত্বগুলি এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেন। সমাজের বিকাশের মূল নিয়ামক কে? ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তি? না মানুষের অর্থনীতিক সম্পর্ক? এই প্রশ্নে শক্তির তত্ত্বকে নাকচ করে অর্থনীতির সম্পর্কের নিয়ামক ভূমিকার কথা এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অর্থনীতিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং বিকাশকে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেন। গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দেন। সমাজতন্ত্রে এবং সাম্যবাদে দ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টন কি রূপ গ্রহণ করবে, পরিবারের কি রূপান্তর ঘটা সম্ভব, শিক্ষা-ব্যবস্থা কীভাবে পুনর্গঠিত হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিরোধ কীভাবে বিলুপ্ত হবে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের পার্থক্য কীভাবে নির্ধারিত হবে—সমাজতান্ত্রিক সমাজের ইত্যাকার সমস্যারও এঙ্গেলস আলোচনা করেন এবং তা সমাধানের সূত্র ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত এ্যান্টিডুরিং মার্কসবাদের একখানি মৌলিক গ্রন্থ। মার্কসবাদের মূল প্রশ্নসমূহের প্রাঞ্জল আলোচনা গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় চিরায়ত সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

Anti-thesis : বিরোধ, প্রতিশক্তি

বস্তুজগতে নিত্যপ্রবাহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক হচ্ছে প্রতিশক্তির দ্বন্দ্ব বা বিরোধে সম্পর্ক। বিরোধ হচ্ছে বস্তুজগতের গতির মূল নিয়ামক। বিরোধ বা দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বস্তুজগতের বিকাশকে সাধারণত ইংরেজিতে থিসিস, এ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিসরূপে প্রকাশ করা হয়। দ্বন্দ্বমান দুটি বস্তু বা অবস্থার একটিকে থিসিস এবং অপরটি এ্যান্টিথিসিস বলা হয়। থিসিস এবং এ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব নিষ্ফলভাবে কার্যরত থাকে না। এই দ্বন্দ্ব কালক্রমে বস্তুর মধ্যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। এই নতুন অবস্থাকে সিনথেসিস বলা হয়। সিনথেসিসও আবার স্থায়ীভাবে সিনথেসিস থাকে না। সিনথেসিসই কালক্রমে আবার থিসিস এবং এ্যান্টিথিসিসের উদ্ভব ঘটায়। সূত্রটি আমরা অস্তি, নাস্তি এবং সমন্বিত অস্তিত্ব বা সমন্বস্তি বলেও প্রকাশ করতে পারি। মানব সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পর্যায়ক্রমিক ধারাকে মার্কসবাদীগণ দ্বন্দ্বের এই সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

Antithesis of Mental and Physical Labour মানসিক ও দৈহিক শ্রমের বিরোধ

শ্রমের বিভাগ কথাটি আজ অত্যন্ত সুপরিচিত। শ্রমের ক্ষেত্রে মানসিক ও দৈহিক শ্রমের বিভাগটিও পরিচিত। কিন্তু সভ্যতার আদিতে শ্রমের কোনোরূপ বিভাগই ছিল না। অনুন্নত অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমই করতে হতো। কিন্তু প্রকৃতিকে অধিকতর পরিমাণে বশ করার প্রয়োজনে মানুষ একদিন শ্রম বিভাগের আবশ্যকতা বোধ করল। দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে অল্প শ্রম এবং অধিক শ্রমের কাজের পার্থক্য প্রথমে শুরু হয়। এই শ্রম বিভাগের উদ্ভব ঘটে দাস সমাজে। অর্থাৎ এক মানুষ অপর মানুষকে শক্তির জোরে অধীনস্থ করে নিজের স্বার্থে খাটাবার কৌশল যেদিন আবিষ্কার করেছে, সেদিন থেকে প্রভু এবং দাসের শ্রমে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রভু-শ্রেণীর শ্রম তখন থেকে দৈহিক থেকে মস্তিষ্কের ব্যবহারজনিত শ্রমে রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে যেমন এই শ্রমবিভাগের উৎপত্তি তেমনি সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং প্রকৃতিকে জয় করার সংগ্রামে আদিতে এ বিভাগ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমবিভাগ, বিশেষ করে মানসিক ও দৈহিক শ্রমের বিভাগ শ্রেণীগত এবং বংশগতভাবে অপরিবর্তনীয় হতে শুরু করায় শ্রমের বিভাগ মানুষের সামগ্রিক শক্তির বিকাশের সহায়ক না হয়ে তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে। একদিকে শ্রমবিভাগের আবশ্যকতা, অপরদিকে শ্রমবিভাগের অপরিবর্তনীয়তা সমাজের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেছে। এই বিরোধ শ্রেণীবিরোধে রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক বিপ্লবের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন এরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণীহীন সমাজেই কেবল শ্রমবিভাগের অবাঞ্ছিত বিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হতে পারে। এরূপ সমাজে শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের কোনো অপরিবর্তনীয় বিভাগ থাকবে না। এরূপ বিভাগ বংশগতও হবে না। সমাজের ব্যক্তিমাত্রই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কলাকৌশলের এরূপ অধিকারী হবে যে, কোনো শ্রেণী শুধুমাত্র দৈহিক শ্রমে এবং অপর কোনো শ্রেণী শুধুমাত্র মানসিক অর্থাৎ মস্তিষ্কের শ্রমে নিয়োজিত থাকবে না। ফলে মানসিক শ্রম এবং তার পরিফল কোনো বিশেষ শ্রেণীরই করায়ত্ত থাকবে না।

Antinomy : বিরোধী সিদ্ধান্তের সমস্যা

একই যুক্তি থেকে পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হলে বিরোধী সিদ্ধান্তের সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্লেটো, এ্যারিস্টটল, জেনো প্রমুখ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের রচনায় পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তমূলক দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গতি এবং সংখ্যার যুক্তিতে যে পরস্পর-বিরোধীতার অবকাশ রয়েছে, দার্শনিক জেনো তা দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করেন। গতি সম্পর্কে জেনোর দৃষ্টান্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। জেনো বলেন যে, একটি তীর গতিশীল বলার অর্থ তীরটির একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকা এবং না থাকা। তীরটি যদি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে তবে উক্ত মুহূর্তে তীরটি গতিশীল নয়। অপরদিকে তীরটি যখন গতিময়, তখন কোনো বিশেষ মুহূর্তে কোনো বিশেষ স্থানে তার অবস্থান ঘটতে

পারে না। কারণ অবস্থিতি মানে গতিশূন্যতা। ফলে অবস্থান হলে গতি থাকে না। আবার গতি থাকলে অবস্থান থাকে না। এ-যুক্তিতে দেখা যায় যে, তীরের গতি আছে বা গতিময় তীর-এর সত্যটি আমাদের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আধুনিক কালে কাণ্টের দর্শনে পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তমূলক সমস্যার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তের পদ্ধতি দ্বারা কান্ট তাঁর সত্তার অজ্ঞেয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কাণ্টের সত্তার অজ্ঞেয়তার মূল কথা হলো এই যে, মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম হচ্ছে বুদ্ধি। কিন্তু বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করতে পারে না। অপরদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই সত্তা নয়। চরম সত্তা ইন্দ্রিয় অতিক্রান্ত অস্তিত্ব। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেই চরমসত্তা বা বস্তুর বস্তুত্ব অনুধাবন করার প্রচেষ্টায় বিশ্বজগৎ সসীম এবং অসীম, যা জটিল তা অ-জটিলের সংযোগ এবং কোনো কিছুই অ-জটিল নয় ; বিশ্ব সংসারে মানুষ স্বাধীন ; বিশ্বসংসারে মানুষ স্বাধীন নয় এবং বিশ্বের সৃষ্টির মূলে কারণ আছে ; বিশ্বের সৃষ্টির মূলে কোনো কারণ নেই এরূপ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়। পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তের উপরোক্ত সমস্যায় যেটি লক্ষ রাখা আবশ্যক সে হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় এরূপ সিদ্ধান্তের উদ্ভব কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জ্ঞান মানুষের একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। উক্ত প্রক্রিয়ায় এক সময়ে যা সত্য অপর সময়ে তা অসত্য হয়ে যেতে পারে। সত্য এবং অ-সত্যের দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই জ্ঞান অগ্রসর হয়। মানুষ সসীম। আবার সেই সসীম মানুষের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বিশ্ব অসীম। এখানে আপাতদৃষ্টিতে একটি পরস্পর-বিরোধিতার উদ্ভব ঘটছে সসীম যদি অসীমকে জানতে না পারে তা হলে 'বিশ্ব যে অসীম' এ কথা সে জানল কি করে ; আবার সে যদি জেনেই থাকে যে, বিশ্ব অসীম তা হলে সে জ্ঞাত বিশ্বকে আর অসীম বলা যায় কেমন করে? বস্তুত মানুষ যা জেনেছে তাই তার জ্ঞাত ; যা সে জানে নাই তাই অজ্ঞাত এবং অসীম। কিন্তু যা অসীম তাকে মানুষ জ্ঞাত হয়ে যে অসীম বলছে একথা যেমন সত্য নয়, তেমনি যা জ্ঞাত তাতেই জ্ঞেয় জগতের শেষ নয় ; জ্ঞাত-র বাইরে রয়েছে অজ্ঞাত অর্থাৎ অসীম জ্ঞানের জগৎ। সে জগৎও মানুষ ক্রমান্বয়ে জ্ঞাত হবে। এ বিচারে জ্ঞানের জগৎ সসীম এবং অসীম, উভয় কথাই সত্য। এখানে পরস্পর-বিরোধিতার সমস্যা যথার্থ নয়, বাহ্য। দর্শনের ইতিহাসে এই পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা অজ্ঞেয়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বিভিন্ন যুগে দেখা গেছে। ভাববাদ যে এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা চরম সত্তাকে জ্ঞানের বাইরে রাখার চেষ্টা করেছে, কাণ্টের মধ্যেই তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ মেলে।

Anti-Semitism : ইহুদি বিদ্বেষ

ইহুদি বিদ্বেষ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে হিটলারের নাজিদল শাসিত জার্মানিতে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে। নাজিগণ জার্মান দেশে শাসনের মূলনীতি হিসাবে আর্যজাতি তত্ত্বকে গ্রহণ করে। জার্মানগণ আর্য এবং জার্মানির অর্থনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সম্প্রদায় ইহুদিগণ অনার্য এবং বিশুদ্ধ জার্মানদের চাইতে হীন—এই বিদ্বেষমূলক তত্ত্বের ভিত্তিতে নাজিসরকার ইহুদির বিরুদ্ধে নানা প্রকার আইন-কানুন প্রণয়ন করতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের মূলে ইহুদিরা, তারা জার্মানির অর্থনীতিক দুর্দশার কারণ,

ইহুদিদের রক্ত অপবিত্র এই অভিযোগ তুলে হিটলারের সরকার জার্মানির ইহুদি সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা যত ঘনীভূত হতে থাকে তত ইহুদিদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমস্ত প্রকার নাগরিক অধিকার থেকে ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকদের বঞ্চিত করা হয়। তাদের সঙ্গে খাস জার্মানদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩৯ সালে হিটলার বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটালে জার্মানির অভ্যন্তরে ইহুদি নির্যাতন চরম আকার গ্রহণ করে। সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায়কে বলশেভিক বা সাম্যবাদের অনুচর আখ্যা দেওয়া হয় এবং নাজিরা ব্যাপকভাবে ইহুদিদের গ্রেপ্তার করে বন্দি নিবাসে প্রেরণ করতে থাকে এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে নির্বিচারে হত্যা করে। এরূপ পরিবেশে আইনস্টাইনের ন্যায় যে সমস্ত ইহুদি বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক জার্মানি থেকে পলায়ন করে অন্যান্য দেশে আশ্রয় নিতে সক্ষম হন কেবল তাঁরা এই নিধনযজ্ঞ থেকে রেহাই পান।

Apartheid : পৃথগবাসন, বর্ণবৈষম্য

দক্ষিণ আফ্রিকার নগণ্য সংখ্যক শ্বেতবর্ণের স্বৈরতান্ত্রিক শাসক দল কর্তৃক সংখ্যাগুরু এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মূল কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অনুসৃত পৃথগবাসনের এবং নিগ্রহের নীতি বর্ণবিদ্বেষ বলে পরিচিত। ইংরেজ 'আপারথিড' কথার উদ্ভব দক্ষিণ আফ্রিকায়। এর অর্থ জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে অধিবাসীদের পৃথক বাসের ব্যবস্থা করা। ইউরোপের শ্বেতবর্ণের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক আফ্রিকা মহাদেশ জোর করে দখলের সূচনায় অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যাশনাল পার্টি নামক রাজনীতিক দল ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার বৈষম্যমূলক বিধান প্রণয়ন করা হতে থাকে। এই সমস্ত আইন দ্বারা শ্বেতবর্ণের সরকার অশ্বেতকায়দের সব রকম রাজনীতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদের যাতায়াতের অধিকার, জীবিকার্জনের স্বাধীনতা, ধর্মপালন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। বান্টুস্থান নাম দিয়ে আফ্রিকাবাসীদের নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ সমান এবং সমান সুযোগের অধিকার একথা প্রচার করা কিংবা বিশ্বাস করা দক্ষিণ আফ্রিকাতে অপরাধ বলে বিবেচিত। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার অনুসৃত এই বর্ণবৈষম্যের নীতির উপর আলোচনা করা হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে সকল রাষ্ট্র যেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিকভাবে বর্জন করে এরূপ আহ্বানও গৃহীত হয়। কিন্তু এরূপ প্রস্তাবের কোনো বাস্তব কার্যকর ভূমিকা না থাকাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তার নীতির কোনো পরিবর্তন করে নি। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও অব্যাহত রেখেছে। বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন প্রকারে সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৮৫ সালে এ সংগ্রাম সাফল্যের এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছে, একথা বলা

যায়। বর্ণবৈষম্য কেবল দক্ষিণ আফ্রিকাতেই অনুসৃত হচ্ছে না। ধনবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের আবহাওয়া বিশেষ প্রকট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে নিগ্রো অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ না করলেও তার দক্ষিণাঞ্চলীয় অনেক অঙ্গরাষ্ট্রে সরকারিভাবে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বাসস্থান, শিক্ষা ও জীবিকায় বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে অবশেষে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে শ্বেতবর্ণের শাসনকারী সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সকল নাগরিকের ভোটদানের এবং শাসন করার অধিকার স্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসানের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

Apriori and Aposteriori : অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং অভিজ্ঞতালব্ধ

ভাববাদী দর্শনের দুটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞান যথার্থ এবং কোনো জ্ঞান যথার্থ নয়—এই প্রশ্নে প্রাচীনকাল থেকেই এরূপ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্লেটো, বার্কলে, কাণ্ট প্রমুখ প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকের মতে জ্ঞান হচ্ছে দুরকম : অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ঊর্ধ্ব বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ বলে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান চরম সত্যের জ্ঞানদানে সক্ষম নয়। সঠিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান, অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত মনে করতেন মানুষের নিজের অস্তিত্ববোধ অভিজ্ঞতা-উর্ধ্বজ্ঞান। যেমনি অঙ্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কিংবা কোনো কিছু একই সঙ্গে সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না, এরূপ যৌক্তিক সিদ্ধান্তও অভিজ্ঞতালব্ধ নয়—এরা অভিজ্ঞতাঊর্ধ্ব। কাণ্ট 'নিজ সত্তায় বস্তু' বা 'থিং ইন ইটসেল্ফ'কে অজ্ঞেয় রাখার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অভিজ্ঞতাঊর্ধ্ব কথাকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সত্তার দৃষ্ট প্রকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এরূপ জ্ঞান সত্তার 'নিজ সত্তায় অবস্থিত বস্তুর' যথার্থ জ্ঞান নয়। কিন্তু নিজ সত্তায় অবস্থিত বস্তুই হচ্ছে চরম সত্তা। এই চরম সত্তার জ্ঞান অভিজ্ঞতার বাইরে কেবল অনুভূতির মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। কাণ্টের মতে, স্থান, কাল, কার্যকারণ, সম্পর্ক ইত্যাদি জ্ঞানসূত্রগুলি মানুষের অভিজ্ঞতাঊর্ধ্ব বোধ, অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন জ্ঞানকে অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব বলে পরস্পর-বিরোধী মাধ্যমে বিভক্ত করার বিরোধী। এই দর্শনের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম, 'অভিজ্ঞতা-পূর্ব' বলে জ্ঞানের কোনো মাধ্যম নেই।

Aristotle : এ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.)

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরূপে ইতিহাসে পরিচিত। গ্রিক সম্রাট আকেজাণ্ডারের কিশোর বয়সে এ্যারিস্টটল তাঁর শিক্ষক ছিলেন। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের অবদান অতুলনীয়। প্রাচীন গ্রিক দর্শন এ্যারিস্টটলের হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। নিজের শিক্ষা জীবনে এ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু প্লেটোর জীবিতকালেই এ্যারিস্টটল দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে প্লেটো থেকে ভিন্নতর অভিমত পোষণ করতে শুরু করেন। কিন্তু প্লেটোর জীবনকালে দুজনার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ঘটে নি। এতে

উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটোর মৃত্যুর পরে (৩৪৭ খ্রি. পূ.) এ্যারিস্টটল প্লেটোর একাডেমী পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে লাইসিয়াম-এ শিক্ষাদান শুরু করেন। এ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন মেসিডোনিয়ার একটি নগরে। মেসিডোনিয়া এবং মেসিডোনিয়ার সম্রাট ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এথেন্স নগরীতে তাঁকে পরবর্তী জীবনে বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মেসোডোনিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারকেও এ্যারিস্টটল সমর্থন করেন নি। মানসিকভাবে তিনি গ্রিসের দাস প্রধান নগর-গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। দাস এবং প্রভুর শ্রেণীভেদ জন্মগত বলেই তিনি মনে করতেন। কিন্তু তিনি স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করেন নি। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ্যারিস্টটলের চিন্তার ক্ষমতা এবং ব্যাপকতা যেরূপ বিস্ময়কর ছিল, তেমনি তাঁর চিন্তাধারায় দাস-প্রধান গ্রিক সমাজের সীমাবদ্ধতার পরিচয়ও দুর্লভ নয়। জীবন ও জগতের এমন কোনো দিক ছিল না, যেদিকে এ্যারিস্টটল তাঁর গবেষণার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেন নি। এ কারণে এ্যারিস্টটলকে জ্ঞানসমুদ্র বলে স্মরণ করা হয়।

এ্যারিস্টটলের দর্শন ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির রহস্য ভেদে তাঁর অভিমত প্রধানত বস্তুজগৎ এবং বস্তুজগৎ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক কল্পনার উপর নয়। কিন্তু প্লেটোর ভাববাদী প্রভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি। এ কারণে এ্যারিস্টটলের দর্শনে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মিশ্রণ দেখা যায়।

এ্যারিস্টটলের মতে বস্তুমাত্রেরই তিনটি রূপ আছে। বস্তুত্ব, আকার, গতি বা লক্ষ্য। বস্তুর বস্তুত্ব একদিকে অনড়, গতিহীন ; কিন্তু অপর দিকে বস্তুর বস্তুত্বের মধ্যে বস্তুর আকার, গতি এবং লক্ষ্যও নিহিত বা সুপ্ত। যা বস্তুর আকার তা বস্তুর অন্তর্নিহিত বা সুপ্ত শক্তিরই প্রকাশ। কিন্তু সে জন্য বস্তুর আকার এবং বস্তুর বস্তুত্ব এক নয়। আকার বস্তু থেকে পৃথক। আকার ব্যতীত বস্তু কল্পনা করা যায় না। আকারই বস্তুকে উপলব্ধির যোগ্য করে। এ কারণে আকার অবশ্যই অধিকতর সত্য এবং চিরন্তন। বস্তুর পরিবর্তন কিংবা ক্ষয় আছে। কিন্তু আকারের পরিবর্তন বা ক্ষয় নাই। আকার অনুযায়ী বস্তুকে আমরা উপলব্ধি করি, বস্তু অনুযায়ী আকারকে নয়। আকারের এইরূপ ব্যাখ্যায় এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের ভাববাদী বৈশিষ্ট্যটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। আকার থেকে এ্যারিস্টটল সমগ্র সৃষ্টির মূল শক্তি হিসাবে অতিপ্রাকৃতিক ঈশ্বরের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর হচ্ছে সমস্ত অস্তিত্বের গতির উৎস। কিন্তু ঈশ্বরের নিজের কোনো গতি নেই।

এ্যারিস্টটলের দার্শনিক ব্যাখ্যায় সব সময় ঐক্য এবং পারম্পর্যের সাক্ষাৎ মেলে না। বস্তু থেকে আকারকে পৃথক ভাবলেও এ্যারিস্টটল অন্যত্র প্লেটোকে এই কারণে তীব্র সমালোচনা করেছেন যে, প্লেটো সাধারণ ভাবকে (মনুষ্যত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি) বিশেষ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর সমালোচনা হিসাবে এক্ষেত্রে এ্যারিস্টটল এরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, বিশেষ থেকে সাধারণ ভাবকে আদৌ পৃথক করা যায় না। বিশেষের মাধ্যমেই কেবল সাধারণ বা 'নির্বিশেষ' ভাবকে অনুধাবন করা চলে। প্লেটোর দর্শনের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের এই সমালোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত এ্যারিস্টটলের উপরোক্ত সমালোচনা ভাববাদের একটি মৌলিক সমালোচনা। এই সমালোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী বস্তুবাদী দর্শন বিকাশ লাভ করে।

দেহের গবেষণা অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রেও এ্যারিস্টটলের অবদান স্মরণীয়। তিনিই দেহের প্রথম রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্রোপচার এবং দেহ ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এ্যারিস্টটলের পিতা নিজে চিকিৎসাবিদ ছিলেন। এ্যারিস্টটলের শিশুকালে তিনি মারা গেলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণার পারিবারিক ঐতিহ্য হয়তো এ্যারিস্টটলকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এ্যারিস্টটল যুক্তিশাস্ত্রের পিতা বলে স্বীকৃত। মানুষের চিন্তা ও তার প্রকাশকে বিশ্লেষণ করে সুশৃঙ্খলভাবে তার প্রকার নির্ধারণ ইউরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম করেন। যুক্তির মৌলিক বিধানগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এই বিধানগুলি প্রায় অপরিবর্তিতভাবে আজও যুক্তিশাস্ত্রে গৃহীত এবং আলোচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক আলোচনার শুরুও এ্যারিস্টটলে।

সত্তা, গুণ, পরিমাণ বা সংখ্যা, সম্পর্ক, স্থান, কাল, অবস্থান, করণ, অধিকরণ ইত্যাদি জ্ঞানসূত্রগুলির গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা এ্যারিস্টটল করেছিলেন। তাঁর সমস্ত সূত্রের অনেকগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজও প্রযুক্ত হচ্ছে। এ্যারিস্টটলের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, তাঁর সময় পর্যন্ত বিকশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রকে তিনি সুসংবদ্ধ আকারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এ্যারিস্টটল থেকেই যে-কোনো সমস্যার সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে, একথা অবিসংবাদীরূপে সত্য।

এ্যারিস্টটলের দর্শনের বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের অন্ধকার ভেদ করে নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনায় এক বিরাট শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। মুসলিম সভ্যতার আমলেও এ্যারিস্টটলের দর্শনই মুসলিম চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে। এ্যারিস্টটলের তত্ত্বসমূহের বিরুদ্ধবাদী বা সমর্থনকারী সমালোচনাই মুসলিম চিন্তাবিদদের আলোচনাকে ধর্মবিশ্বাসাতিরিক্ত দার্শনিক আলোচনার গুণে গুণান্বিত করেছিল। মুসলিম দার্শনিকদের নিকট থেকে ইউরোপ এ্যারিস্টটলের পরিচয় লাভ করে। মধ্যযুগে ইউরোপের গোঁড়া ধর্মবিশ্বাস এ্যারিস্টটলের দর্শনের ভাববাদী তত্ত্বকে ধর্মতত্ত্বের পরিপোষক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। এর ভিত্তিতেই মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজম বা যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

মার্কসবাদী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এ্যারিস্টটলকে প্রাচীন জ্ঞান দর্শনের শীর্ষমণি বলে আখ্যাত করেছেন।

Associationist Psychology : অনুষঙ্গী মনোবিজ্ঞান

কোনো কিছু আমাদের স্মরণে জাগরিত হওয়ার কারণ কি? 'ক' বললেই অর্থাৎ 'ক' স্মরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'খ' স্মরণে এসে যায়, খ বললে গ। কিন্তু এর কারণ কি? এর সাধারণ উত্তর দিই আমরা এভাবে যে, শিশু বয়সে বারংবার একটা ধারাক্রমে উচ্চারণ করে আমরা এদের মুখস্থ করেছি। মুখস্থ করেছি একথা সত্য, কিন্তু মুখস্থ করায় আমাদের মনে কিংবা মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে কি পরিবর্তন ঘটেছে যাতে 'ক' মনে করলেই 'খ'ও উদিত হয়? আমার মায়ের কথা মনে হলেও বাড়ির ছবি আমার মনে জাগরিত হয়? দর্শন এবং

মনোবিজ্ঞানে এটি বেশ পুরাতন প্রশ্ন। স্মরণশক্তির বা স্মরণে পড়ার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানী দিয়েছেন। এঁদের একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, একটি স্টিমুলাস বা উদ্দীপক অপর একটি উদ্দীপকের নৈকট্য এবং পৌনঃপুনিকতার কারণে আমাদের মন বা মস্তিষ্কের কোষে পরস্পর সম্পর্কিত প্রতিছাপের সৃষ্টি করে। ফলে কিছুকালের ব্যবধানেও পরস্পর সম্পর্কিত উদ্দীপকগুলির প্রতিছাপের কোনো একটি ক্রিয়াশীল হলেও অপরগুলিও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ইংরেজিতে একেই এ্যাসোসিয়েশন নামে অভিহিত করা হয়। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই এ্যাসোসিয়েশনিস্ট সাইকোলজি বা অনুষঙ্গী মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। মনের ক্রিয়াকলাপের অনুষঙ্গী ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশের পূর্বে হবস, লক এবং স্পিনোজার দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানে একটি বস্তুবাদী ধারা বিকাশ লাভ করে। এই ধারাটি বিংশ শতাব্দীতে ব্যবহারবাদ বা বিহেভিয়রিজম্ তত্ত্বের রূপ গ্রহণ করেছে।

Attention : মনোযোগ, মনোদৃষ্টি

একটি মুহূর্তে কোনো কিছুর উপর মন কিংবা মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীল হওয়াকে মনোযোগ বা মনোদৃষ্টি বলা হয়। মনোযোগ দুরকমের হতে পারে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ এবং অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ। ইচ্ছাকৃত মনোযোগের ক্ষেত্রে মন আন্তরিক কোনো উদ্দীপক বা স্টিমুলাসের কারণে একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবেশ করতে পারে। অর্থাৎ একটি বিষয় সচেতন মনের বিবেচনার সীমার মধ্যে আসতে পারে। অনিচ্ছাকৃত মনোযোগের ক্ষেত্রে কোনো উদ্দীপক তার অস্বাভাবিকতা বা বৈপরিত্য কিংবা নতুনত্ব দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির উপর এরূপ আঘাত হানতে পারে—যাতে মনের দৃষ্টি উদ্দীপকের উপর পড়তে বাধ্য হয়। যেমন, সাধারণভাবে যে-শব্দের মধ্যে আমি কোনো একটা মুহূর্তে অবস্থান করছি, সে মুহূর্তে একটি বিকট শব্দ হলে শব্দের অস্বাভাবিকতাই আমার মনকে আকৃষ্ট করবে। বলা চলে, মন বাধ্যতামূলক এই উদ্দীপকের দিকে আকৃষ্ট হবে। অসংখ্য উদ্দীপক দ্বারা আমরা সর্বদা পরিবেষ্টিত। মনুষ্যেতর প্রাণী উদ্দীপক মাত্রতেই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র মানুষই নিজের স্বার্থের বিবেচনায় অসংখ্য উদ্দীপকের কোনো একটিকে বাছাই করে তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যখন আমার উদ্দেশ্য হয় আমার গ্রন্থের একটি কঠিন দার্শনিক কথার অর্থ উদ্ধার করা, তখন শব্দ তরঙ্গের যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধিও আমার মনকে আকৃষ্ট না করতে পারে। ইচ্ছানুযায়ী মনোযোগ দানের ক্ষমতাকেই মনোবিজ্ঞানে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ বলা হয়। মানুষের মন আদিতে অন্যান্য প্রাণীর মতোই উদ্দীপক মাত্রেরই দাস ছিল। যে-কোনো উদ্দীপক যখন তখন তার মনকে আকৃষ্ট করতে পারত। শত শত বছরের শ্রমের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের তাগিদে উদ্দীপকের দাস হওয়ার চেয়ে উদ্দীপককে দাস করার ইচ্ছায় মানুষ ইচ্ছামূলক মনোযোগের ক্ষমতা নিজের মধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের মন এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা আজ যেমন, তার শৈশবেও তেমন ছিল, এমন কথা ভাবা ঠিক নয়।

August Movement : আগস্ট আন্দোলন

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করে তা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত।

এই শতাব্দীর বিশের দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবি প্রবল হতে শুরু করে। বিশের এবং ত্রিশের দশকে বিভিন্ন প্রকার আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে এবং তার চেয়েও জঙ্গী শ্রমিক-কৃষকদের জীবিকার সংঘবদ্ধ আন্দোলন এবং মধ্যবিত্তের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে এই স্বাধীনতার দাবির তীব্রতা প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু একদিকে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি এবং অপরদিকে ভারতের প্রধান রাজনীতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনৈক্যের কারণে ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত সফলতা অর্জন করতে পারে নি। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে এই যুদ্ধ এশিয়াতে বিস্তারিত হয়। জাপান অক্ষশক্তি, অর্থাৎ জার্মানি ও ইতালির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। মিত্রপক্ষের প্রধান শক্তি ছিল সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরাধীন ভারতও ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। ১৯৪২-এ এশিয়াতে যুদ্ধের সীমানা ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে বাংলার নিকটে এসে পড়ে। ব্রহ্মদেশও তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। জাপান কলকাতা নগরী ও চট্টগ্রামের উপর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে। ব্রিটিশ সরকার তখন একটা সামরিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ব্রিটিশ সরকারের এই সঙ্কটকে স্বাধীনতা লাভের উত্তম সময় বিবেচনা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নিকট ৪২-এর আগস্ট মাসে একটি প্রস্তাব মারফত কতগুলি দাবি উত্থাপন করে। ভারতীয় জাতীয় কমিটির ওয়ার্কিং কংগ্রেসের এই প্রস্তাব আগস্ট প্রস্তাব নামে পরিচিত। প্রস্তাবটির এক অংশে ব্রিটিশ সরকারের নিকট অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, মিত্রপক্ষের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ভারতের স্বাধীনতা অপরিহার্য। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকারই মাত্র মিত্রপক্ষকে যুদ্ধ জয়ে উপযুক্ত রূপে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। প্রস্তাবের অপর অংশে গান্ধীর নেতৃত্বে গণআন্দোলন শুরু করার কথাও বলা হয়েছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের আশা ছিল, তাদের স্বাধীনতার দাবি এবং আন্দোলনের হুমকীতে ব্রিটিশ সরকার তাদের সঙ্গে আপস আলোচনাতে সম্মত হবে। কিন্তু ভারতের জনমত তখনো জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বিভক্ত। এই অনৈক্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা। ব্রিটিশ সরকার এই দুর্বলতাকে ভিত্তি করে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে দমননীতি গ্রহণ করে। আগস্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ৮ আগস্ট। তার পরদিনই ৯ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার গান্ধীসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিভিন্নস্থানে আন্দোলন জঙ্গী এবং ধ্বংসাত্মক আকার গ্রহণ করে। রেল লাইন, টেলিগ্রাফ তার এবং শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আন্দোলনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে। মেদিনীপুরের একটি অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা অস্বীকার করে স্বাধীন সরকার স্থাপন করা হয়। কিন্তু এ

সমস্ত কার্যক্রম খুব সংগঠিত ছিল না। কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয় নি। অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী গান্ধী তখন কারাগারে আবদ্ধ। বিচ্ছিন্ন এবং নেতৃত্বহীন এরূপ স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ ব্রিটিশ সরকারের সামরিক এবং নির্মম দমনের মুখে অধিক দিন স্থায়ী হতে পারে নি। ৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এ আন্দোলন দমিত হয়ে যায়। আগস্ট ৯ এবং ডিসেম্বর ৩১-এর মধ্যে ৬০ হাজারের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হয় ; ১৮০০০ রাজনীতিক কর্মীকে ভারত রক্ষা আইনে আটক রাখা হয় ; পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর গুলি বর্ষণে প্রায় এক হাজার নিহত হয়। (দ্রষ্টব্য : রজনী পামে দত্ত : 'ইণ্ডিয়া টু ডে')

Augustine Saint : সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রি.)

উত্তর আফ্রিকার হিপোতে অগাস্টিনের জন্ম। যৌবনকালে অগাস্টিন ছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসে প্যাগান বা প্রকৃতিবাদী। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সত্যানুসন্ধানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। অগাস্টিনের রচনার আগ্রহ এবং ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। তাঁর সমকালীন জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তির জীবনের নীতিগত সমস্ত সমস্যাই তাঁর রচনাসমূহে আলোচিত হয়েছে। এই রচনার মধ্যে তাঁর 'কনফেকশন' বা 'স্বীকারোক্তি' এবং 'সিটি অব গড' বা 'ঈশ্বরের রাজ্য' প্রসিদ্ধ। তাঁর স্বীকারোক্তির মধ্যে তাঁর যৌবনকালের আচরণ এবং বিচিত্র ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ এবং বিচার শেষে ৩৩ বৎসর বয়সে অগাস্টিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে হিপোর ধর্মযাজক রূপে ঘোষণা করা হয়। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি খ্রিষ্টধর্মের একজন শক্তিশালী প্রচারক এবং রহস্যবাদী দার্শনিকরূপে জীবনযাপন করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে অগাস্টিনের মূল কথা ছিল : বিশ্বাস ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। তাঁর 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'সিটি অব গড' খণ্ডাকারে তের বছর ধরে রচিত হয়। সর্বপ্রকার সমস্যাই তিনি তাঁর এই গ্রন্থে আলোচনা করেন। 'ঈশ্বরের রাজ্য' এবং 'পাপের রাজ্য'কে অগাস্টিন পুণ্য এবং পাপ ; সৎ এবং অসৎ-এর দ্বন্দ্বমান জগৎরূপে কল্পনা করেন। বিশ্ব সম্পর্কে খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাস অগাস্টিনের ইতিহাস ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। ইতিহাসের এ ব্যাখ্যাকে অদৃষ্টবাদ বলা হয়। বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটবে তা সবই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত।

Autarchy : স্বশাসন, স্বয়ংসম্পূর্ণতা

Autonomy : স্বায়ত্তশাসন

অটারকী এবং অটোনমি উভয়ই গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রিক 'অটারকীয়া'র অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণতা। অর্থনীতিকভাবে কোনো রাষ্ট্র যদি এরূপ নীতি গ্রহণ করে যে, জীবনের যা কিছু প্রয়োজন সেসব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই উৎপাদিত হবে এবং কোনো কিছুর জন্যই সে অপর রাষ্ট্রের উপর বা অপর রাষ্ট্র থেকে আমদানির উপর নির্ভর করবে না তা হলে একে অটারকী বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি বলা যায়। অপরদিকে স্বায়ত্তশাসন বলতে যেমন কোনো পরাধীন

জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছা বুঝাতে পারে, তেমনি স্বায়ত্তশাসন দ্বারা একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কোনো অঞ্চল বা অধিবাসীর নির্দিষ্ট পরিমাণ শাসনাধিকারকেও বুঝাতে পারে। স্বায়ত্তশাসনের বাস্তব এবং সঙ্গত দাবি পূর্ণ না হলে এবং রাষ্ট্রের কোনো প্রভাবশালী জনাংশের মধ্যে নির্যাতিত কিংবা বঞ্চিত থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিন প্রবাহিত হতে থাকলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিচ্ছিন্নতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার রূপ গ্রহণ করতে পারে।

Axis : অক্ষ

Axis Power : অক্ষশক্তি

অক্ষ বলতে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্য থেকে কোনো গ্রহের দূরত্বের পরিমাণ ; ভূগোলে পৃথিবীর গ্রহের কাল্পনিক মেরুকেন্দ্ররেখা এবং প্রাণিবিদ্যায় প্রাণীদেহের মেরুদণ্ডকে বুঝায়। কিন্তু রাজনীতিতে 'অক্ষশক্তি' কথাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রচারিত হয়। অক্ষশক্তি দ্বারা তখন জার্মানি, ইটালি এবং জাপান এই তিন শক্তির জোটকে বুঝান হত। শক্তির কেন্দ্র হিসাবে অক্ষ কথাটি ব্যবহার করে প্রথমে ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিবাদী ইতালির শাসক মুসোলিনী। মুসোলিনী নাকি জার্মানির হিটলারের সঙ্গে আঁতাত গঠনের কালে রোম-বার্লিন সম্পর্ককে শক্তির অক্ষরেখা বলে অভিহিত করে। এই আঁতাতকে তারা ইস্পাতদৃঢ় আঁতাত বলে আখ্যায়িত করে। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জঙ্গীনীতির মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের ধ্বংস এবং তখনকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করা। এই মূল লক্ষ্যের জন্য জার্মানি এবং ইতালি জাপানকেও সাম্যবাদবিরুদ্ধতার চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে দ্বিধা থাকলেও যুদ্ধের সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ড এবং মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্যজোট গঠনে বাধ্য হয়। এই ঐক্যের ফলে অক্ষশক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৪৫ সালে পরাজয় বরণে বাধ্য হয়।

B

Babeuf : বাব্যুফ (১৭৬০-১৭৯৭ খ্রি.)

ফরাসি বিপ্লবী। ১৭৯৬ সালে বাব্যুফের নেতৃত্বে 'সমানদের ষড়যন্ত্র' নামে একটা আন্দোলন সংঘটিত হয়। ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়াকে বাব্যুফ এবং তাঁর অন্যতম সাথী ডারথেকে ১৭৯৭ সালে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। বাব্যুফ থেকে বাব্যুফবাদের জন্ম হয়। বাব্যুফ এবং তাঁর সঙ্গীরা সমগ্র ফরাসি দেশে একটি কেন্দ্র থেকে শাসনের ভিত্তিতে 'সমানদের রিপাবলিক' বা সমানদের একটি জাতীয় কম্যুন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে বাব্যুফবাদ প্রগতিমূলক ছিল। বাব্যুফবাদীগণ ফরাসি দেশে প্রথম সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে বাস্তবে বিপ্লবী আন্দোলনরূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

Bacon, Francis : ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.)

দর্শন এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পথপ্রদর্শক।

বেকনের জ্ঞান এবং গবেষণার উৎসাহ কোনো একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, আইন, সর্বক্ষেত্রেই বেকন তাঁর সৃষ্টিশীল মননের পরিচয় দিয়েছেন। বেকনকে তাই সর্ব-বিষয়ে পারদর্শী বলা যায়। কেবল জ্ঞানের তত্ত্বগত আলোচনায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায়ও তিনি ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজ সম্রাট প্রথম জেমস-এর রাজত্বকালে 'লর্ড-চ্যান্সেলর' হিসাবে নিযুক্ত হয়ে বেকন সম্রাটের শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হন। একদিকে যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেকন অন্ধবিশ্বাস এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিলেন সংগ্রামী অপরদিকে ব্যক্তিগত জীবনে আত্মস্বার্থসাধনে তিনি ছিলেন বিবেকহীন।

'নোভাম অর্গানাম', এসেজ, এডভাঞ্চমেন্ট অব লারনিং, 'সাইণ্টিয়ারাম', 'নিউ এ্যাটলাণ্টিস' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে 'নোভাম অর্গানাম' গ্রন্থের জন্যই বেকন খ্যাতি অর্জন করেন সমধিক। এই গ্রন্থের মধ্যেই বেকনের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার সুসংবদ্ধ প্রকাশ পাওয়া যায়। বেকন নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না সত্য, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনি যে উদ্‌গাতা ছিলেন এ সত্য অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে রূপান্তর সাধিত হচ্ছিল। পুঁজিবাদের তখন প্রথম যুগ। পুঁজিবাদের বাধাহীন বিকাশের জন্য উৎপাদনের নতুনতর উপাদান অর্থাৎ কলকবজা, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার যেরূপ আবশ্যক ছিল তেমনি আবশ্যক ছিল বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শের। পুঁজিবাদ এবং জ্ঞানের বিকাশকে বেকন এই ভাবাদর্শ দ্বারা অবারিত করেছিলেন।

জ্ঞান অর্জনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেকন ঘোষণা করেন যে, মানুষ জ্ঞানলাভ করবে প্রকৃতিকে জানার জন্য এবং তাকে বশ করার জন্য। এরূপ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিয়ত পরিবর্তিত বিশ্ব-প্রকৃতির পরিবর্তনের সত্যকার কারণ জানা। প্রকৃতির কার্য-কারণকে জ্ঞাত হওয়া প্রচলিত দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অলীক জাল বুননি দ্বারা সম্ভব নয়। প্রচলিত দর্শন আর ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তাগণ মাকড়শার মতো নিজেদের কল্পনার জাল বিস্তার করে বিশ্ব-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু এ পথ সত্যকার জ্ঞানের পথ নয়। সত্যকার জ্ঞান শুরু হবে সন্দেহ এবং প্রশ্ন দিয়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে চার রকম দেবতার মূর্তিপূজা অনড় আসন গেড়ে বসে আছে। সেই অনড় মূর্তিদের ধ্বংসকারী হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করে বেকন বলেন, মানুষের মনকে এই অপদেবতাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। বেকনের মতে এই অপদেবতা বা আইডলগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) জাতিগত অপদেবতা। মানুষ হিসাবে মানুষের জাতিগত কুসংস্কার ও অবাস্তব ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে সেগুলিকে মানুষের জাতিগত অপদেবতা বলা যায়। মানুষ বিনা প্রশ্নে নিজের জ্ঞানের অসীমতা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তাকে বেকন তাঁর একটি জাতিগত কুসংস্কার বলে আখ্যায়িত করেন। প্রাকৃতিক সমস্যার বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ না হওয়ার প্রবণতাও মানুষের একটা জন্মগত সংস্কার। মানুষ কেবল তাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে চায় যা তার আত্মস্বার্থ সাধন করে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেও মানুষ এই কারণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই চরম জ্ঞান বলে মনে করে। (২) অন্ধকার বিবরের অপদেবতা হচ্ছে মানুষের মনের দ্বিতীয় অপদেবতা। প্লেটোর গুহায় বন্দি মানুষ যেমন সত্যের ছায়াকেই সত্য বলে মনে করত তেমনি সকল মানুষই ব্যক্তিগতভাবে নিজ জীবনের অন্ধকার গুহায় বন্দি। ব্যক্তিজীবনের গুহার অন্ধকারে বসে মানুষ সত্যের আসল রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তার ছায়াকেই সত্য বলে আঁকড়ে থাকে। এই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতেও সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সত্য সাধককে বিবরের এই বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। যে তত্ত্বের প্রতি ব্যক্তির মানসিক আকর্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে, সত্য সাধক হিসাবে তাকে সেই তত্ত্বকেই অধিক সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ ও পরীক্ষার মারফত তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হবে। (৩) বাজারী অপদেবতার বাধাও জ্ঞানলাভের জন্য কম নয়। ভাষার সীমাবদ্ধতাকে বেকন বাজারের অপদেবতা বা 'আইডলস অব দি মার্কেট প্লেস' বলে আখ্যায়িত করেন। ভাষার মারফত মানুষ ভাবের বিনিময় করে। কিন্তু ভাষার অর্থ বহনের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য এক ব্যক্তি যা বলে অপরে তা সঠিকভাবে বুঝে না। নিজের ইচ্ছামতো অপরের কথাকে সে গ্রহণ করে। তাই একই শব্দের একাধিক অর্থ। এ কারণে সঠিক জ্ঞানের জন্য সর্বপ্রথমে আবশ্যক হচ্ছে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সঠিক অর্থ নির্দিষ্টকরণ। (৪) থিয়েটার বা মঞ্চের অপদেবতার কারণেও আমরা বিশ্বপ্রকৃতির সঠিক জ্ঞান লাভে ব্যর্থ হই। প্রচলিত দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে বেকন মঞ্চের অপদেবতা বলেছেন। তার কারণ, মঞ্চে যেমন বাস্তবে একটা কল্পলোক তৈরি করা হয় তেমনি দার্শনিকগণ আসল সত্যকে আড়াল করে একটা মিথ্যা জগতের পরিবেশ তৈরি করেন। তত্ত্বদ্বারা দার্শনিক জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতগুলোকেও আমাদের ভূমিসাৎ করতে হবে। দর্শনের সমালোচনার সময়ে বেকন মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনকে আক্রমণ করলেও

প্রাচীন গ্রিসের দর্শন, বিশেষ করে ডিমোক্রিটাস এবং অন্যান্য বস্তুবাদী গ্রিক দার্শনিকদের তিনি প্রশংসা করেছেন।

এভাবে অজ্ঞানতার প্রতিভূ অপদেবতাদের ধ্বংস করে বেতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বেকন আরো তিনটি সূত্র উল্লেখ করেন। যথা : (১) কোনো সমস্যার সমাধান বা কারণের অনুসন্ধানে প্রথমে কারণের উপস্থিতিসূচক ঘটনাসমূহকে সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে ; (২) দ্বিতীয়ত, উক্ত কারণের অনুপস্থিতিসূচক ঘটনাসমূহকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে ; (৩) তৃতীয়ত উভয় ধরনের ঘটনাকে তুলনাক্রমে বিচার করে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ক্রম উদ্ঘাটন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের এই তিনটি সূত্রকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল তার আরোহী বা ইনডাকটিভ পদ্ধতিতে মিল ও অ-মিলের যুক্ত পদ্ধতি (জয়েন্ট মেথড অব এ্যাগ্রিমেন্ট এ্যাণ্ড ডিফারেন্স) এবং পরিবর্তনের যুক্তক্রম (মেথড অব কনকোমিট্যান্ট ভেরিয়েশন্স) নামক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

বিখ্যাত ফরাসি লেখক ডিডেরট বেকনের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন বেকনের অবিস্মরণীয় অবদান এই যে, মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস রচনাও যখন সম্ভব ছিল না বেকন তখন মানুষের ভবিষ্যৎ পথকে সুনিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বে বেকন রাজতন্ত্রের সমর্থনকারী ছিলেন। তিনি সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা করে এককেন্দ্রিক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের কথা প্রচার করেন। 'নিউ এ্যাটলান্টিস' গ্রন্থে তিনি এক কল্পরাজ্যের বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সে' রাষ্ট্রের রাজকার্য সাধিত হয়। শোষক ও শোষিতের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক উপায়ের ব্যবহারে একটা রাষ্ট্র কি বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করতে পারে তার চিত্র তিনি এই গ্রন্থে তুলে ধরেন।

জ্ঞানলাভের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাকালে বস্তুজগতের যে ব্যাখ্যা বেকন উপস্থিত করেন তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : বস্তু এবং প্রকৃতি বিভিন্ন গুণ সমন্বিত অংশসমূহের সম্মেলনের প্রকাশ। বস্তুর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তার গতি, যান্ত্রিক গতিকে বেকন একমাত্র গতি বলে স্বীকার করতেন না। বস্তুর অন্তরেই গতি নিহিত। যান্ত্রিক গতিতেই কেবল বস্তু গতিবান হয় না। কিন্তু ফ্রান্সিস বেকনের দার্শনিক অভিমত ত্রুটিহীন ছিল না। তাঁর দার্শনিক ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সময়ে বস্তুবাদকে অতিক্রম করে ধর্মীয় প্রভাব প্রকট হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজ হয়তো হুবহু ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের জন্য বেকন অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

Bacon, Roger : রোজার বেকন (১২১৪-১২৯২ খ্রি.)

ইউরোপের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে প্রথম পথিকৃৎ। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সিস বেকন দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নবযুগের সূচনা করেন তার বীজ বপন করেছিলেন তিনশত বছরেরও পূর্বে ত্রয়োদশ শতকে তাঁর স্বদেশবাসী রোজার বেকন। রোজার বেকন জ্ঞানের একাধিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

দর্শনের বস্তুবাদী চিন্তা, অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধতা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পদ্ধতিকে বিশ্ব প্রকৃতির জ্ঞানলাভের পথ বলে ঘোষণা করার অপরাধে তাঁকে যাজক সম্প্রদায় ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার অধিকার থেকে রোজার বেকনকে বঞ্চিত করা হয়। বেকন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে বিবর্ধক কাচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস এবং বন্দুকের জন্য এক প্রকার বারুদও আবিষ্কার করেন। গ্রিক দর্শন এবং আরব জগতের দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের চিন্তারাজিকে বেকন অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানের প্রশ্নে ধর্মযাজকের বাণীর চেয়ে গ্রিক এবং আরব দার্শনিকদের যুক্তি অধিক মূল্যবান ঘোষণা করায় যাজক সম্প্রদায় তাঁর উপর অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং গ্রিক ও আরব দর্শনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ সব কিছুই ধর্মীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয় এবং পোপের আদেশে তাঁকে দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ নজরবন্দি করে রাখা হয়। এই বন্দি অবস্থায় বেকন যাতে কোনো প্রকার জ্ঞানের চর্চা করতে না পারেন, সেজন্য দীর্ঘ দশবছরই তাকে সর্বপ্রকার বই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রাদি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

রোজার বেকনের 'ওপাস মাইউস' নামক গ্রন্থে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়কে তিনি সাতভাগে বিভক্ত করেন, যথা : মানুষের ভ্রান্তির কারণ, দর্শন, ভাষার অধ্যয়ন, অঙ্কশাস্ত্র, চক্ষুর চিকিৎসা, পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞান বা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স এবং নীতিশাস্ত্র।

প্রথম ভাগের আলোচনায় রোজার বেকন বলেন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের ভ্রান্তির কারণ চার প্রকার, যেমন : (১) অজ্ঞানীর হুকুম স্বীকার করে তার কাছে আত্মসমর্পণ ; (২) প্রচলিত প্রথার মোহ ; (৩) জনপ্রিয় কুসংস্কার ; এবং (৪) তথাকথিত জ্ঞানের কৌশলের আড়ালে অজ্ঞানতার প্রশ্রয়দান।

জ্ঞানের পথ হচ্ছে অভিজ্ঞতার পথ। অবশ্য অভিজ্ঞতাকে রোজার বহিঃঅভিজ্ঞতা এবং অন্তঃঅভিজ্ঞতা হিসাবে বিভক্ত করণ। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমাদের বহিঃঅভিজ্ঞতা। এ হচ্ছে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা, মানুষের আভ্যন্তরিক অভিজ্ঞতার উৎস হচ্ছে বিধাতা। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি জ্ঞানের নিশ্চয়তা কেবল বিধাতার দয়াতেই সম্ভব। অভিজ্ঞতার এই ব্যাখ্যা রোজার বেকনের বস্তুবাদকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে। তা সত্ত্বেও যুগের প্রেক্ষিতে রোজার বেকনের দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অভিমতসমূহ অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ।

Bakunin, Mikhail Alexandrovich : বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬ খ্রি.)

অভিজাত পরিবারের সন্তান বাকুনিন ছিলেন একজন পেটিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত চরিত্রের রুশ বিপ্লবী। নৈরাষ্ট্রবাদ বা এ্যানার্কিজম মতবাদের প্রচারকারী হিসাবেই বাকুনিন বিখ্যাত হন।

বাকুনিনের মতাদর্শে বিভিন্ন দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গোড়ার দিকে তিনি জার্মান দার্শনিক ফিকটের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে হেগেলের দর্শন তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। মার্কসবাদের মতে বাকুনিন হেগেলের দর্শনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে তার ভাববাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন।

সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে বাকুনিনের মতবাদ ছিল এরূপ মানুষ মূলত দুটি যন্ত্র দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে একটি রাষ্ট্রযন্ত্র অপরটি ধর্মযন্ত্র বা অলীক বিধাতার দণ্ড। রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যাচার থেকে মুক্তির আশ্বাসে মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের আশ্রয় নেয়। আসলে ধর্ম এবং রাষ্ট্র যুক্তভাবেই মানুষকে শোষণ করে। মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে এই উভয় যন্ত্রকে ধ্বংস করা। বাকুনিনের ধ্বংসমূলক এ মতের পরিপূরক কোনো গঠনমূলক মত ছিল না। তাঁর মতে রাষ্ট্রযন্ত্র বাদে মানুষ স্বাভাবিকভাবে যূথবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে সক্ষম। সে সমাজে কারুর কোনো শাসন বা খবরদারী থাকবে না। বাকুনিনের মতের একটি বিপ্লবাত্মক দিক আছে। কার্ল মার্কসও প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থলে সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন মার্কসবাদের অপর অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের কারণে মার্কস বাকুনিনকে প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কসবাদী চিন্তার বিরোধিতার ফলে বাকুনিন প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কৃত হন। মার্কস-এর সঙ্গে বাকুনিনের মতাদর্শের বিরোধের মূল কারণ ছিল, মার্কস বাকুনিনকে হঠকারী বিপ্লবী বলে গণ্য করতেন।

বাকুনিন সমাজ বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে যেমন কোনো গঠনমূলক মত পোষণ করতেন না, তেমনি সমাজ বিপ্লবের জন্যও কোনো সুসংবদ্ধ সংগঠন ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। বাকুনিন কৃষক এবং ভবঘুরে সর্বহারাকে বিপ্লবের প্রধান শক্তি বলে বিবেচনা করতেন। কৃষক ও ভবঘুরে সর্বহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবে, এই ছিল বাকুনিনের বিশ্বাস। সমসাময়িক সমাজবাদী চিন্তাবিদ প্রুধোর মতামতের প্রভাবও বাকুনিনের মধ্যে লক্ষ করা যায়। 'ফেডারিলিজম, সোস্যালিজম এ্যাণ্ড এ্যান্টি থিওলজিজম' বলে লিখিত বাকুনিনের গ্রন্থে সমাজের যে পরিকল্পনা বাকুনিন প্রথমে উপস্থিত করেন, তা মূলত প্রুধোর নিকট থেকেই গৃহীত।

বাকুনিনের জীবন ঘটনাবহুল। নিজের মতাদর্শ নিয়ে তৎকালীন বিক্ষুব্ধ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লব ও আলোড়নে একাধিকবার অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৮৪৮-৫০ প্রেগবিপ্লবে তাঁর অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত ঘটনার পরে রুশদেশে প্রত্যাবর্তনকালে বাকুনিনকে গ্রেপ্তার করে রুশ সরকার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। ১৮৬১ সালে সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে পলায়ন করে জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে বাকুনিন আবার ইউরোপে উপস্থিত হন। রাশিয়ার নারোদনীক পন্থীগণ বাকুনিনের নৈরাষ্ট্রবাদী মতদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। কার্ল মার্কস ব্যতীত ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং লেনিনও বাকুনিনের নৈরাষ্ট্রবাদী মতের তীব্র সমালোচনা করেন।

Balance of Payments : লেনদেনের ভারসাম্য

কোনো দেশ যখন তার আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখে তখন তাকে লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়। লেনদেনের ভারসাম্যে প্রধান ভূমিকা পালন করে দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদি এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মূল্য। কিন্তু দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যতীতও একটি দেশের আমদানি খাতে ব্যয় এবং রপ্তানি খাতে

আয় হতে পারে। এরূপ আয়ের উৎস হচ্ছে সাধারণত দেশের মধ্যে বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণাদি এবং এই উপলক্ষে পর্যটক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা গ্রহণ। আবার ব্যয়ের কারণও ঘটে দেশীয় নাগরিকগণ যখন বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশে গমন করেন তখন। এ ছাড়া এক দেশের মধ্যে অপর দেশের ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার খাতেও একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রার আয় কিংবা ব্যয় ঘটতে পারে। এ সমস্ত আয়-ব্যয় উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানি কিংবা রপ্তানির ভিত্তিতে ঘটে না বলে বৈদেশিক মুদ্রার এরূপ আমদানি রপ্তানিকে অদৃশ্য আমদানি কিংবা অদৃশ্য রপ্তানি বলে অভিহিত করা হয়।

Balance of Power : শক্তির ভারসাম্য

শক্তির ভারসাম্য একটি দেশের কূটনীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত কৌশলের ব্যাপার। একটি রাষ্ট্র যদি তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এরূপ কৌশল অবলম্বন করে কিংবা করার চেষ্টা করে যাতে তার নিজের রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামরিক শক্তিকে আর কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অনুরূপ শক্তি অতিক্রম করে যেতে না পারে তা হলে এই কৌশলকে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল বলা হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ইউরোপের ক্ষেত্রে এই কূটনীতিক কৌশল অনুসরণ করে চলেছিল। ইউরোপে তখন একদিকে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং ইতালির ত্রয়ী-জোট এবং অপর দিকে ছিল ইংরেজ, ফরাসি এবং রাশিয়ার ত্রয়ী-জোটের শক্তি। এই দুটি জোটের পারস্পরিক লক্ষ্য ছিল যেন প্রতিপক্ষ তাকে অতিক্রম করে যেতে না পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপে জার্মানি যখন ক্রমান্বয়ে পররাজ্য গ্রাস করে নিজ পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে তখন ইংল্যাণ্ড তার পাল্টা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হয়। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার নাজিবাদী জার্মানির প্রতি তোষণনীতি অবলম্বন করে। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বিরাট রুশদেশে ধনবাদের প্রতি-ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পুরাতন ভারসাম্যব্যবস্থাকে ধনবাদী যে কোনো রাষ্ট্রের নিকট অপ্রয়োজনীয় এবং অকেজো করে তোলে। এখন থেকে ধনবাদী এবং সমাজতন্ত্রী শক্তির মধ্যে ভারসাম্যের প্রশ্নটির সূচনা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ধনবাদী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রসমূহের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা ও শক্তি দীর্ঘজীবী হবে না। তারা সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর বিজয়, অধিকতর দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং জার্মানির মতো দুর্ধর্ষ ধনবাদী রাষ্ট্রের পরাজয় এই বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ধনবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতন্ত্রকে প্রধান প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করে তার সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পারস্পরিক শক্তির সমতা বুঝায়।

নব্বই-এর দশকের গোড়াতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রাধান্য সৃষ্টির পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

Basic Democracy : মৌলিক গণতন্ত্র

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে দেশের পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা বাতিল করেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক পরিষদ এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলীতে ভাগ করা হয়। জনসাধারণ এই নির্বাচকমণ্ডলীকে নির্বাচিত করে দিত। এই নির্বাচকমণ্ডলী প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করত এবং যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করত। নির্বাচকমণ্ডলীকে নির্বাচনের এই অধিকার ব্যতীত পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিলে অংশ গ্রহণের কম বেশি অধিকার দেওয়া হয়। এক হাজার অধিবাসীর ভিত্তিতে একজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রথম পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করত। কিন্তু পরবর্তী থানা পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানগণই মাত্র থানা কাউন্সিলের সদস্য এবং থানা কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই জেলা কাউন্সিলে, আবার জেলা কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যদের নির্বাচনে বিভাগীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত হত। ফলে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটদানের ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ কিংবা প্রেসিডেন্টের নির্বাচনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অধিকার ছিল না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক পর্যায়ের ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যতীত অপর স্তরগুলিতে ক্রমাধিক পরোক্ষ নির্বাচন এবং সীমিত অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অভিমত পোষণ করতেন যে, দেশের জনসাধারণ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে তিনি জনসাধারণকে এই বলে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন যে, জনসাধারণ হচ্ছে মূল এবং সেখানে গণতন্ত্র প্রবর্তন করাই হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র। এবং মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে সেরা গণতন্ত্র। কার্যত মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল জনসাধারণকে দেশের জাতীয় সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার একটি সুকৌশল স্বৈরতান্ত্রিক প্রচেষ্টা। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রেও জনসাধারণের কোনো কার্যকর অধিকার ছিল না। প্রতিটি স্তরে আমলাতন্ত্রকে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের উপর খবরদারির অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৫৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ডের প্রতিনিধিগণ স্বায়ত্তশাসনের যে অধিকার ভোগ করত সে অধিকারও মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৬৯-৭০-এর গণআন্দোলনে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন এবং তাঁর মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে।

ক্ষমতায় আরোহণ করার পর জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত করার প্রবণতা উচ্চতর শ্রেণীর শাসকদের একটি সাধারণ প্রবণতা। 'মৌলিক গণতন্ত্র' ছিল এই প্রবণতারই প্রকাশ।

Basis and Superstructure : মূল ও উপরিকাঠামো

সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য অংশের সম্পর্কের ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী দর্শন 'মূল এবং উপরি-কাঠামো' নামক দুটি শব্দ ব্যবহার করে। মার্কসবাদের মতে যে-কোনো সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদই হচ্ছে সমগ্র সমাজের মূল বুনিয়াদ। সমাজ বিকাশের যে-কোনো বিশেষ পর্যায়ে উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং যন্ত্রপাতির মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত হয় সেই পর্যায়ের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। সংক্ষেপে একে বলা হয় 'উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের সম্পর্ক'। উৎপাদনের উপায় এবং সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত মূল বুনিয়াদের উপরই রচিত হয় সে সমাজের আইন-কানুন, নিয়ম-নিষেধ, মতামত, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর রচিত এই কাঠামোকে মার্কসবাদ বহির্গঠন, উপরি-কাঠামো বা সুপার স্ট্রাকচার বলে অভিহিত করে।

অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বা সমাজের মূল কাঠামো অনুযায়ী তার বহিঃকাঠামো গঠিত হয়। যে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হচ্ছে দাসের দৈহিক শ্রমের মালিকানার ভিত্তিতে প্রভুদের সম্পদ সৃষ্টি, সে সমাজের বহিঃকাঠামোর মধ্যে অবশ্যই এই মূল কাঠামোর রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অপরাপর ভাবগত প্রয়োজন প্রতিফলিত হবে। আবার মূল কাঠামোর অন্তর্নিহিত বিরোধও বহিঃকাঠামোর ভাবদর্শের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাওয়ার চেষ্টা করবে। এই বিচারে কোনো সমাজের বহিঃকাঠামোর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তার সঠিক প্রকৃতি বিচারে সে সমাজের মূল কাঠামোর বিশ্লেষণ আবশ্যক।

সমাজ বিকাশের মূল কাঠামোর পরিবর্তনের পরে উপরি-কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। একারণে মূলকাঠামোর পরিবর্তন ব্যতীত ইচ্ছা করলেই কেউ উপরিকাঠামোতে স্থায়ী কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। সমস্ত সমাজের মূল অর্থনৈতিক কাঠামো যখন পরিবর্তিত হয়ে পুঁজির মালিকানা-ভিত্তিক নতুনতর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে তখনি সামন্ত সমাজের ভাবনা-চিন্তা, আইন-কানুন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে নতুন বহিঃকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কসবাদের মতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তনের মাধ্যমেই মাত্র তার পুঁজিবাদী বহির্গঠন পরিবর্তিত হয়ে সমাজবাদী বহির্গঠন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মার্কসবাদের মূল দর্শন দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মতে সমাজের মূল কাঠামো এবং বহিঃকাঠামোর মধ্যকার সম্পর্ক কেবল একমুখী নয় এ সম্পর্কের চরিত্রও দ্বন্দ্বমূলক এবং দ্বিমুখী। কেবল যে মূল কাঠামো সমাজের বহিঃকাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রভাবান্বিত করে, তাই নয়। বহিঃকাঠামো গঠিত হওয়ার পরে তার মধ্যকার বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন, অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারাও মূল গঠনকে প্রভাবান্বিত করে। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের বিকাশ ও ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে তার বহিঃকাঠামোর বিভিন্ন অংশও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

একটি ভাব বস্তু বা বাস্তব অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু একবার উদ্ভূত হলে সে ভাব বাস্তব অবস্থাকেও পরিবর্তিত করতে পারে। মার্কসবাদের এই অভিমতটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মার্কসবাদের মতে ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ

বা মূল কাঠামোর সঙ্গে তার বহিঃকাঠামোর সম্পর্কের অপর দিকটি হচ্ছে বিরোধাত্মক। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের মধ্যকার শ্রেণীগত বিরোধ বহিঃকাঠামোর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। কালক্রমে এই বিরোধ মূল কাঠামো পরিবর্তনের আন্দোলনের রূপ লাভ করে। একটি সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর মূল কাঠামো পরিবর্তনের আন্দোলনের রূপ লাভ করে। একটি সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর মূল ও বহির্ভাগের বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। মার্কসবাদের মত অনুযায়ী এই উভয় দিকের পারস্পরিক সম্পর্কের বিরোধাত্মক চরিত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে আর থাকতে পারে না। কারণ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের শ্রেণীতে শ্রেণীতে মারাত্মক বিরোধের অবকাশ নেই। এ কারণে তার উপরি-কাঠামোর মধ্যেও আপসহীন বিরোধের উদ্ভব ঘটে না। তখন সমাজের মূল গঠন এবং বহির্গঠন সংযুক্তভাবে সমগ্র সমাজের অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সুসমঞ্জস সভ্যতা বিকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

Bastille, Fall of : বাস্তিলের পতন

১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিলের পতন অত্যাচারী ফরাসি সম্রাটের বিরুদ্ধে জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সূচক বলে ইতিহাসে পরিগণিত হয়। বাস্তিল দুর্গ ছিল প্যারিস শহরে ফ্রান্সের বিখ্যাত কারাগার। স্বৈরতান্ত্রিক সম্রাট এবং সামন্তবাদী শাসন ও অত্যাচারের প্রধান প্রতীক হিসাবে বাস্তিল দুর্গ জনসাধারণের মনে সর্বাধিক ঘৃণা এবং ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল। বিপ্লব শুরু হলে প্যারিস শহরের একটি কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা বাস্তিল দুর্গকে আক্রমণ করে এবং দুর্গের সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দুর্গের দ্বার ভেঙে ফেলে দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। জনতার হাতে দুর্গের শাসক নিহত হয়। সমগ্র ফ্রান্সের নির্যাতনের প্রতীক হিসাবে জনতা এরপরে দুর্গকে একেবারে ভূমিসাৎ করে ফেলার জন্য তার প্রাচীরের পাথর একটি একটি করে খুলে ফেলতে আরম্ভ করে। ১৪ জুলাই বাস্তিলের পতন দিবসকে আজো ফরাসি দেশের জনসাধারণ শক্তির দিবস হিসাবে পালন করেন। বাস্তিল আক্রমণের লক্ষ্য এবং এর পতনের তাৎপর্য নিয়ে ইতিহাসের গবেষকদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তিল দুর্গে রাজনীতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য জনতা বাস্তিল আক্রমণ করেছিল, একথা ঠিক নয়। আসলে জনতার প্রধান লক্ষ্য ছিল দুর্গের অস্ত্র দখল করা। কিন্তু একথা ঠিক যে, বাস্তিলের পতনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আক্রমণের উদ্যোগ ব্যাপকতম জনসাধারণের হাতে চলে গিয়েছিল। এদিক দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সবচেয়ে নাটকীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল বাস্তিলের পতন। এই ঘটনার পরে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের জাতীয় পরিষদই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

Behaviourism : আচরণবাদ, ব্যবহারবাদ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে 'বিহেভিয়রিজম' একটি নতুন ধারা। বাংলায় একে আচরণবাদ বা ব্যবহারবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাগমেটিজম বা প্রয়োগবাদ কিংবা কার্যবাদ নামক আধুনিক দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মনোবিজ্ঞানের আচরণবাদ

তত্ত্বের বিকাশ ঘটে ; এ তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন বি. ওয়াটসন (১৮৭৮-১৯৫৮)। অবশ্য এক্ষেত্রে ওয়াটসনের পূর্বগামী হিসাবে থর্নডাইকের (১৮৭৪-১৯৪৯) উল্লেখ করা যায়। জীব-জন্তুর আচরণের উপর থর্নডাইক যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন ওয়াটসন তাকেই মনোবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বে ব্যবহার করেন।

আচরণবাদ বা ব্যবহারবাদের ক্ষেত্রে 'আচরণ' বা 'ব্যবহার' শব্দ বিশেষ অর্থ বহন করে। সাধারণ জীবনে 'ব্যবহার' বা আচরণের সঙ্গে ভালো-মন্দের একটি প্রশ্ন জড়িত থাকে। এবং ব্যবহার বা আচরণ বলতে আমরা কোনো অবস্থায় মানুষের মনের উদ্যোগে গৃহীত কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা বুঝাই। সে দিক থেকে অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলক কোনো প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার বা আচরণ বলা হয় না। যেমন একটি আলপিন দিয়ে কারুর আঙুল বিদ্ধ করলে সে হাত টেনে নেয় বা বেদনার্ত চিৎকার করে ওঠে। এ প্রতিক্রিয়া সাধারণ অর্থে ব্যবহার বা আচরণ নয়। কিন্তু আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীর নিকট উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্তির একটি আচরণ বা ব্যবহার।

আচরণবাদের উদ্ভব ঘটে মনসর্বস্ব কায়েমী মনোবিদ্যার প্রতিবাদ হিসাবে। এতদিন পর্যন্ত এই তত্ত্বই গৃহীত হয়ে আসছিল যে, মানুষের জীবনে মনই হচ্ছে আসল সত্তা। মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী মানুষ পরিবেশের সঙ্গে ব্যবহার করে। কিন্তু মন অদৃশ্য এবং অস্পৃশ্য। এ তত্ত্বের হেরফের কিছু যে না ঘটেছে তা নয়। মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক স্থাপন করারও চেষ্টা হয়েছে। মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ভুন্ড ঘড়ি ধরে মাপার চেষ্টা করেছেন। ডারউইন, মরগান, স্পেন্সার প্রমুখ জীববিজ্ঞানীগণও মনকে পরিবশে-নির্ভর বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। স্পেন্সার ব্যক্তি বা সাধারণভাবে মানুষের জীবনকে পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাধিকভাবে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়া হিসাবে দেখিয়েছেন।

কিন্তু কায়েমী মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ আসে আচরণবাদী এবং পাভলভ-পন্থীদের পক্ষ থেকে। আচরণবাদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াটসন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় কায়েমী মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি উপস্থিত করেন : (১) অদৃশ্য এবং অস্পৃশ্য মনকে চরম বলে স্বীকার করলে মনোবিদ্যা কেবল দার্শনিক তত্ত্ব হয়ে থাকবে ; মনোবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের রূপান্তরিত হতে পারবে না। কারণ মনকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলে না। (২) কায়েমী মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শন বা ইনট্রোসপেকশন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর পদ্ধতি নয়। এ পদ্ধতি দ্বারা শিশু কিংবা পাগল, কারুর মনের খবরই জানা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতি ব্যক্তির জীবনকে দুর্জ্ঞেয় করে রাখে। এমনকি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা বুদ্ধির পরিমাপও অন্তদৃষ্টির মারফত করা সম্ভব নয়।

এই সমালোচনার ভিত্তিতে আচরণবাদ মনোবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করে। ওয়াটসন বললেন, মানুষের সমস্ত প্রকার ব্যবহারের কার্যকারণ সূত্র উদ্ধার করা মানুষের উন্নততর জীবনের জন্য আবশ্যক। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে যদি মানুষের ব্যবহার নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পরিচালিত হয়। তাঁর মতে মানুষের কোনো ব্যবহারই মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। আলপিন বিদ্ধ হলে জীবন্ত ব্যক্তির দেহ বিশেষ আচরণ করতে বাধ্য। আলপিন এখানে স্টিমুলাস বা উত্তেজক। মনুষ্যেতর জীবও এরূপ ক্ষেত্রে একই ব্যবহার করে। এ উত্তেজক যখনই প্রয়োগ করা হবে, তখনি ব্যক্তি এইরূপ

আচরণ করবে। মনের ইচ্ছায় আচরণের কোনো মৌলিক পার্থক্য ঘটবে না। এরূপে ব্যক্তির যে-কোনো ব্যবহারই কোনো একটি উত্তেজকের প্রয়োগে দেহের প্রতিক্রিয়া বিশেষ। যে-প্রতিক্রিয়াকে মানসিক বলে বিবেচনা করা হয় বা হত, সে-আচরণকেও উত্তেজক বা উদ্দীপক প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখানো চলে। যেমন রুশ জীববিজ্ঞানী পাভলভ তাঁর কুকুরের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, খাদ্য দেখে কুকুরের জিহ্বায় লালা নিঃসরণ কুকুরের মনের ক্রিয়া বলে মনে করা হলেও খাদ্যের বদলে একটি শব্দ দ্বারাও কুকুরের জিহ্বাকে লালাসিক্ত করা যায়। এজন্য তিনি প্রথম দিকে খাদ্যের সঙ্গে একটি শব্দের উদ্দীপকও প্রয়োগ করতেন। পরবর্তীকালে খাদ্য বাদে কেবল শব্দের উত্তেজকে কুকুরের জিহ্বা লালাসিক্ত হতে আরম্ভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের যে-কোনো ক্রিয়াই উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া এবং যে-কোনো প্রতিক্রিয়াকেই উত্তেজক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা চলে। অর্থাৎ উত্তেজক বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শিশুর মধ্যে জন্মগত প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা সামান্য। শিশু ক্রমান্বয়ে যেরূপ উত্তেজক বা পরিবেশ লাভ করে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা সে গঠিত হয়। উত্তেজকের ভিত্তিতে গঠিত প্রতিক্রিয়ার বংশপরম্পরা হওয়ারও কোনো উপায় নেই।

আচরণবাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, আচরণবাদ মন বা চেতনার কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এবং আচরণবাদকে চরম আকারে গ্রহণ করলে মানুষের ব্যবহার উত্তেজক প্রয়োগমাত্র দেহের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। একথা সত্য যে, আচরণবাদ মনোবিদ্যাকে মনোবিজ্ঞানে পরিণত করার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাহসিক পদক্ষেপ। মনময় হয়ে মনোবিদ্যা এতকাল যে তত্ত্বমার্গে আবদ্ধ ছিল সেখান থেকে আচরণবাদ তাকে বাস্তব পরীক্ষাগারে এনে মানুষের শিক্ষাগত, সমাজগত, জীবিকাগত দিকগুলিকে ক্রমাধিক পরিমাণে সুনির্দিষ্ট এবং ফলপ্রসূ করে তুলেছে। তবে আচরণবাদের চরম ব্যাখ্যা অর্থাৎ মানুষের ব্যবহার 'উত্তেজক-প্রতিক্রিয়া' ব্যতীত কিছুই নয় এবং মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে তার ব্যবহারের কোনো পার্থক্য নেই, এরূপ অভিমত দ্বিধাহীনভাবে গৃহীত হয় না। অনেক আচরণবাদী মানুষের জটিল ব্যবহার ব্যাখ্যার জন্য সম্প্রতিকালে ইণ্টারমিডিয়েট ভেরিয়েব্‌লস বা 'মধ্যবর্তী ব্যত্যয়'-রূপ ধারণাও গ্রহণ করতে শুরু করেছেন।

Bellarmine, Robert : রবার্ট বেলারমিন (১৫৪২-১৬২১ খ্রি.)

মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত ক্যাথলিক লেখক। ফরাসিদেশের জেসুইটপন্থী ধর্মযাজক। খ্রিষ্ট ধর্মের গির্জার শাসনে পোপের ঐশ্বরিক অধিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বেলারমিন সরকারের প্রকার ভেদ নিয়েও আলোচনা করেন। শাসনের প্রশ্নে বেলারমিন অভিজাততন্ত্রকে নাকচ করেন। তাঁর মতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র হচ্ছে সর্বোত্তম সরকার। কিন্তু একজন আদর্শ চরিত্রবান রাজা পাওয়া মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎই ঘটে। সে কারণে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা রাজার যদৃচ্ছা শাসনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ রাষ্ট্র শাসনের মূল অধিকার জনগণের। রাজার হস্তে জনসাধারণই শাসনের অধিকার ন্যস্ত করে।

অর্থাৎ জনগণকে শাসন করার রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের কথা বেলারমিন অস্বীকার করেন। গীর্জা এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রশ্নে বেলারমিন এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, গীর্জার শাসন এবং রাষ্ট্রের শাসন পরস্পর পৃথক। মানুষের লৌকিক ব্যাপারে পোপের কোনো প্রত্যক্ষ অধিকার থাকতে পারে না। পোপের অধিকার ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ। তবে রাষ্ট্রের শাসক ধর্মের বিরোধী কোনো আইন প্রবর্তন করার চেষ্টা করলে পোপের অধিকার থাকবে সেরূপ আইনকে নিবৃত্ত করার জন্য হস্তক্ষেপ করার এবং গীর্জার অলজ্ঘনীয়তাকে শাসক আক্রমণ করলে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার গীর্জার থাকবে। ফরাসি আইনবিদরা বেলারমিনের এরূপ হস্তক্ষেপমূলক অভিমতের তীব্র সমালোচনা করেন।

Bentham, Jeremy : জেরেমী বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রি.)

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ এবং আইনের ব্যাখ্যাতা। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে জেরেমী বেনথামকে ইউটিলিটারিয়ানিজম বা উপযোগবাদের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। নীতিশাস্ত্রের ন্যায়-অন্যায় এবং ভালো-মন্দ প্রশ্নের আলোচনা করে বেনথাম বলেন যে, নীতি বা ন্যায়ের মূলে রয়েছে কার্যের প্রয়োগ বা সার্থকতার প্রশ্ন। একটা কার্য ভালো বা ন্যায্য বলে বিবেচিত হবে তার প্রয়োগ বা সার্থকতার ভিত্তিতে। সার্থকতা কি? কোনো কাজের ফলে সৃষ্ট সুখই হচ্ছে সে কাজের সার্থকতা। ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করে তখন সে সুখ লাভ করার জন্যই ইহার সম্পাদন করে। আকাঙ্ক্ষিত সুখ লব্ধ হলেই কাজটি সার্থক এবং ন্যায্য। সুখের পরিবর্তে দুঃখের লাভ ঘটলে ব্যক্তির কাছে সে কাজ অসার্থক। সুখের এ ব্যাখ্যা একেবারেই ব্যক্তিক। সুখের এই ব্যক্তিক ব্যাখ্যাকে হিডোনিজম বা আত্মসুখবাদ বলা হয়। বেনথাম নিজে তাঁর তত্ত্বকে কেবল আত্মস্বার্থ বা আত্মসুখবাদ বলে প্রচার করতে চান নি। সে জন্য উপযোগ বা সুখের ব্যাখ্যাকে ব্যাপক করে তিনি সুখ বলতে সামাজিক সুখকেও বুঝাতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপযোগবাদের এই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে বেনথাম বলেছেন যে, রাষ্ট্রের যে-কোনো আইন বা কার্যের সার্থকতার পরিমাপ হবে অধিকতম সংখ্যক মানুষের অধিকতম সুখের বিধান দ্বারা। সুখকেই কাজের সার্থকতার মাপকাঠি করা, আবার অধিক সংখ্যকের সুখ বিধানের সুপারিশের মধ্যে বেনথাম-তত্ত্বের স্ববিরোধিতা প্রকট হয়েছে। এর কারণ, বেনথাম একদিকে যেমন তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিপোষক ছিলেন তেমনি অপরদিকে মানবিকতার বোধ থেকে তিনি সে সমাজের বৈষম্য এবং সুখের সামাজিক বণ্টনে ভারসাম্যহীনতাকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। এ বিরোধিতার সমঝোতা করার জন্য বেনথাম বলেছেন যে, ব্যক্তিগত সুখ এবং সামাজিক সুখের মধ্যে আসলে বিরোধ নেই। একের সুখেই বহুর সুখ। আবার বহুর সুখেই একের সুখ। আত্মসুখ সাধনের মাধ্যমে মানুষ অপরের সুখও সাধন করতে পারে। কারণ সুখ মানে কেবল দেহের আরাম নয়। বিপন্নকে উদ্ধার করার জন্য জীবনদানের মধ্যেও সুখ নিহিত আছে। আর সে সুখই উত্তম সুখ।

নিজের মানবতা বোধ থেকে বেনথাম ইংল্যাণ্ডের আইনের সংস্কারের চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের বৎসর ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বেনথামের 'ফ্রাগমেন্ট অন গভর্নমেন্ট' বা সরকার

সংক্রান্ত আলোচনার পুনঃপ্রকাশ ঘটে। এই আলোচনায় তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রের এবং আইন সংক্রান্ত মতামত উপস্থিত করেন। বেনথাম বলেন, রাষ্ট্রের যে-কোনো বিধান বা কাজের লক্ষ্য হবে সর্বাধিক সংখ্যক অধিবাসীর সর্বাধিক পরিমাণ সুখের বিধান করা। ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কোনো কাজ ন্যায় কিংবা অন্যায় তা নির্ধারিত হবে সে কাজের ফলে যে সুখ লব্ধ হবে কিংবা বিনষ্ট হবে, তার তুলনামূলক পরিমাণ দ্বারা। রাষ্ট্রের কোনো শাস্তিমূলক বিধানের সার্থকতার মাপকাঠিও এইরূপ হবে। এ বিধান যাদের উপর প্রযুক্ত হবে তাদের সুখের পরিমাণ এর প্রয়োগে যদি বৃদ্ধি পায় তবেই এ বিধান ন্যায্য। অন্যথায় এ বিধান অন্যায্য।

তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় বিধানের অধিকাংশই ছিল অলিখিত। আইনের বিশ্লেষণ করে বেনথাম বলেন, রাষ্ট্রের যে কোনো বিধানেরই একটি খারাপ দিক আছে। এর দ্বারা আহত ব্যক্তির সুখ বিনষ্ট হয়। কিন্তু বিনষ্ট পরিমাণের চেয়ে লব্ধ সুখের পরিমাণ অধিক হওয়ার মধ্যেই এ বিধানের ন্যায্যতা নিহিত। প্রত্যেক বিধানের আরো দুটি দিক আছে। একটি তার অধিকারের দিক, অপরটি তার দায়িত্বের দিক। যেমন রাষ্ট্র, তেমন ব্যক্তি—উভয়ের ক্ষেত্রেই এ সত্য। এ কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় আইনের অধিকার ও দায়িত্ব উভয় দিক সম্পর্কে নাগরিকমাত্রেরই ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সে জন্য আইনকে বিধিবদ্ধ, প্রকাশিত এবং প্রচারিত হতে হবে।

বেনথামের নীতিশাস্ত্রীয় তত্ত্বে স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া তিনি সুখের পরিমাণকে আঙ্কিক হিসাবে পরিমাপ করা যায় বলেও মনে করতেন। কিন্তু সুখের পরিমাণের এরূপ আঙ্কিক পরিমাপ সম্ভব বলে তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণ মনে করতেন না। কিন্তু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর নীতিতত্ত্বে একটি মানবতাবোধের পরিচয় আছে। এই বোধ থেকে তাঁর আইনের বিশ্লেষণ এবং আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়াস ইংল্যাণ্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে বহু সংস্কারের সূচনা করে।

Bergson, Henri : হেনরী বার্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১ খ্রি.)

আধুনিক ভাববাদের প্রখ্যাত ফরাসি প্রবক্তা। বার্গসঁ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 'সময় এবং স্বাধীন ইচ্ছা' এবং সৃজনশীল অভিব্যক্তি বিশ্বব্যাপী পরিচিত। উক্ত গ্রন্থ দুখানার ইংরেজি অনূদিত নাম হচ্ছে টাইম এ্যাণ্ড ফ্রি উইল এবং ক্রিয়েটিভ ইভোল্যুশন।

বার্গসঁর ভাবধারা জটিল এবং দুর্বোধ্য। তবে তাঁর অভিমতের মূল বলে যা স্বীকৃত সে হচ্ছে এই যে, বার্গসঁ জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তির পদ্ধতি এবং সত্যের ক্ষেত্রে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সাধারণভাবে বার্গসঁকে ইনট্যুইনিজম বা স্বজ্ঞাবাদের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়। প্রায় শতাব্দীব্যাপী বার্গসঁর জীবনকাল বিস্তৃত ছিল। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ফরাসি দেশ এবং ইউরোপের বিবর্তমান সমাজের তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার স্বর্ণযুগ অস্তমিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট, সংঘাত, বিদ্রোহ, বিপ্লব, মহাসমর, অরাজকতা সভ্যতার শিখরে উন্নীত মানুষের জীবনে দুরারোগ্য ব্যাধি বলে বার্গসঁর মনে হয়েছে। মানুষ আত্মবিনাশকারী সংঘর্ষের নিরসন করে সুস্থ স্বাভাবিক নতুন মানব সমাজ তৈরি করতে পারে, এ জীবনবাদের উপর

তাঁর আস্থা ছিল না। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের জন্য এ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির দুটি পথ এক, মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে বাস্তব সঙ্কট ও অরাজকতার কারণ দূর করে নতুন সমাজ তৈরির কার্যে এবং ভাবধারায় অংশগ্রহণ করা ; দ্বিতীয় পথ হচ্ছে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং বস্তুর সত্যাসত্যতার প্রশ্ন তুলে চিন্তার জাল বুনে চলা। এ পথ যাঁরা আধুনিক যুগে গ্রহণ করেছেন, বার্গসঁ তাঁদের অন্যতম। অবশ্য এ পথ কেবল যে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করে, তা নয়। ক্ষয়িষ্ণু সঙ্কটগ্রস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের এটাই হচ্ছে অপরিহার্য দর্শন। অবাস্তব চিন্তার জালে বাস্তব সঙ্কট ও তার কারণকে আড়াল করে সে সঙ্কটের মূল রক্ষা করার প্রয়াস হচ্ছে এ দর্শনের লক্ষ্য। এ বিচারে বার্গসঁ অসাধারণ লেখনীর ক্ষমতা প্রয়োগে এক জটিল মায়ারাজ্য রচনা দ্বারা আধুনিক ধনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

'টাইম এ্যাণ্ড ফ্রি উইল' পুস্তকের মধ্যে বার্গসঁ তাঁর মতামতকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আদৌ কোনো জ্ঞান নয়। মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় মানুষকে যে জ্ঞান দেয়, সে জ্ঞান হচ্ছে পরিমাপযোগ্য বিভাজ্য বস্তুনিচয়ের জ্ঞান। কিন্তু সত্য হচ্ছে অবিভাজ্য এবং পরিমাপের অযোগ্য। সেই অখণ্ড এবং অপরিমেয় সত্যের জ্ঞান কেবলমাত্র ইনট্যুশন অর্থাৎ উপলব্ধি বা স্বজ্ঞার মারফতই মানুষ লাভ করতে পারে। বুদ্ধি, যুক্তি এবং বাহ্যিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু এ জ্ঞান অলীক। বার্গসঁর মতে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম হবে স্বজ্ঞা। বুদ্ধি এবং যুক্তিকে বার্গসঁ নাকচ করেন বলে বার্গসঁর তত্ত্বকে অ-যুক্তিবাদের দর্শন বলেও অভিহিত করা হয়।

বার্গসঁ তাঁর স্বজ্ঞার দৃষ্টান্ত এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অলীকতা বুঝাবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। কোনো ব্যক্তি তার একটি হাত রাখা অবস্থা থেকে তুলল। এই ঘটনার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে হাতের মালিকের অনুভূতির দিক। এ ব্যাপারে তার অনুভূতি একটি অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু এই ঘটনাটিকে একজন পর্যবেক্ষক যখন দেখে তখন তার কাছে এ ঘটনা হাতের সঞ্চালন প্রক্রিয়ার কতকগুলি মুহূর্ত বা অবস্থা ব্যতীত কিছু নয়। হাত তোলার এটাই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। কিন্তু এ জ্ঞান এবং হাত তোলার মুহূর্তে হাতের মালিকের অখণ্ড উপলব্ধি বা স্বজ্ঞার মধ্যে আদৌ কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই। পদ্ধতির দিক থেকে এরা পরস্পর-বিরোধী। কেবল পদ্ধতি নয়। উভয়ের প্রদত্ত ফল বা সত্যও পরস্পর-বিরোধী। স্বজ্ঞা ব্যক্তিকে এ ক্ষেত্রে যে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান করে, সাধারণ জ্ঞানের সত্য তার বিরোধী।

একটি ঘটনার ক্ষেত্রে যা সত্য, সমগ্র বিশ্ব চরাচর অর্থাৎ জগৎ সম্পর্কে তাই সত্য। বুদ্ধি ও যুক্তি আমাদের সত্যের অলীক ধারণা দেয়। স্বজ্ঞাই কেবল অখণ্ড সত্তার অখণ্ডবোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই অখণ্ড সত্তা কি? এর জবাবে বার্গসঁ বলেন যে, অখণ্ড সত্তা হচ্ছে 'ড্যুরেশন বা স্থিতিকাল'। 'স্থিতিকাল' বস্তু নয়, কিন্তু স্থিতিকালই হচ্ছে সমস্ত বস্তুর মূল। স্থান, কাল, পাত্র বলে যে সমস্ত অস্তিত্বের কথা আমরা বলি, বার্গসঁর মতে সেগুলি এই স্থিতির প্রকার-ভেদ।

কেবল বস্তু নয়, বস্তুর বিকাশের প্রশ্নেও বার্গসঁ বস্তুবাদী বিকাশবাদের বিরোধিতা করেন। বিকাশের বস্তুবাদী তত্ত্ব হচ্ছে যে, বস্তু অন্তর্নিহিত বিরোধের মাধ্যমে নিয়ত পরিবর্তমান। কিন্তু 'স্থিতিকালের' তত্ত্ব প্রয়োগ করে বার্গসঁ বলেন যে, সমস্ত সত্তার মূলে যেমন স্থিতিকাল, তেমনি সেই স্থিতিকাল একটা প্রাণবেগে অভিব্যক্ত হচ্ছে। খণ্ডিত সত্তার ক্ষেত্রে যেমন একথা

সত্য, চরম বা সমগ্র সত্তা সম্পর্কেও একথা সত্য। চরম সত্তা অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এবং এ অভিব্যক্তির মূলে রয়েছে একটা প্রাণাবেগ বা 'ভাইটাল ইমপাল্স'। লতা, বৃক্ষ, জীব-জন্তু, সবকিছু প্রাণাবেগে অভিব্যক্তি হয়ে চলেছে। কেবল প্রাণের প্রশ্ন নয়। সপ্রাণ, অপ্রাণ, বস্তুমাত্রের ক্ষেত্রেই প্রাণাবেগ হচ্ছে অভিব্যক্তির কারণ। 'প্রাণাবেগের' তত্ত্বের ভিত্তিতে বার্গসঁর বিকাশের অভিমত ক্রিয়েটিভ ইভোল্যুশন বা সৃজনশীল অভিব্যক্তিবাদ বলে পরিচিত।

সামাজিক প্রশ্নে বার্গসঁ ছিলেন রক্ষণশীল। সমাজের আর্থিক বৈষম্য, শ্রেণীগত শোষণ ইত্যাদি অন্যায় নয়। এগুলিও স্থিতিকালের অভিব্যক্তি এবং স্বাভাবিক ব্যাপার।

Berkeley George : জর্জ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩ খ্রি.)

খ্রিষ্টান ধর্মযাজক এবং অন্যতম ইংরেজ ভাববাদী। প্রাচীন গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো এবং আধুনিক ভাববাদী দার্শনিক কান্টের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে জর্জ বার্কলের ন্যায় শক্তিশালী ভাববাদী দার্শনিক আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। ধর্মযাজকের জেহাদী মনোভাব নিয়ে জর্জ বার্কলে চিন্তার জগতে বস্তুবাদী দর্শনকে নস্যাৎ করার পণ গ্রহণ করেন। মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা ছিন্ন করে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজতত্ত্ব ইংল্যাণ্ডে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল। ফ্রান্সিস্ বেকনের পর্যবেক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং জন লকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমর্থনমূলক ভাবধারা ইংল্যাণ্ডের নতুন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দুরারোগ্য করে তুলছিল। প্রচলিত ধর্মীয় ভাবধারা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সমাজতত্ত্বের এই অগ্রগতিতে অতিশয় বিপন্ন বোধ করেন। ধর্মীয় ভাবধারার এই সঙ্কটকালে যাজক পরিবারের সন্তান জর্জ বার্কলে ধর্মকে রক্ষা করা নিজের কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

জর্জ বার্কলের গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'প্রিন্সিপ্লস অব হিউম্যান নলেজ' বা 'মানবজ্ঞানের সূত্রসমূহ' নামক গ্রন্থ অতিশয় বিখ্যাত। এই গ্রন্থের মধ্যেই বার্কলের দর্শনের মূলকথা লিপিবদ্ধ। অথচ এ গ্রন্থ ১৭১০ অর্থাৎ বার্কলের মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ তাই দার্শনিক কূটতর্কে অংশগ্রহণে এবং নিজের অভিমত উপস্থাপনে তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতার সাক্ষ্য।

জর্জ বার্কলে তাঁর দার্শনিক অভিমত তাঁর পূর্ববর্তী ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক জন লকের দার্শনিক মতামতের সমালোচনা এবং জবাব হিসাবে উপস্থিত করেন। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থ ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জন লকের 'এসে কনসারনিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' বা মানবজ্ঞান সম্পর্কিত নিবন্ধের সরাসরি সমালোচনা।

বস্তুজগৎ এবং বস্তুজগতের জ্ঞান সম্পর্কে জন লকের অভিমত ছিল এরূপ : বস্তু সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানের সাক্ষ্য যথার্থ। অণুর সম্মেলনেই বস্তু গঠিত। একটা যান্ত্রিক গতিতে বস্তু গতিময় হয়ে আছে। সেই যান্ত্রিক গতিতে বস্তু যখন আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে তখন সে ইন্দ্রিয় সেই আঘাতজনিত অনুভূতিকে মনের মধ্যে বহন করে। এভাবেই মনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বস্তু সম্পর্কে ভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবেই সমন্বয়েই বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি হয়। সুতরাং জ্ঞানের মাধ্যম ভাব এবং ভাবের উৎস অভিজ্ঞতা বা বস্তু। লক অবশ্য অবিমিশ্র বস্তুবাদী অভিমত পোষণ করতে পারেন নি। তিনি বস্তু সম্পর্কিত

ভাবের শ্রেণীভেদ করে এক প্রকার ভাবকে মৌলিক বা বস্তুসঞ্জাত এবং অপর প্রকার ভাবকে অমৌলিক বা মনসঞ্জাত বলে অভিহিত করেছিলেন। এটা জন লকের দর্শনের দুর্বলতা।

পক্ষান্তরে জর্জ বার্কলে মনে করেন যে, বস্তুকে জ্ঞানের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করলে ধর্মীয় বিধাতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। বস্তুই তা হলে চরম সত্তা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি জন লকের উপররোক্ত তত্ত্বকে ধর্মের দিক দিয়ে বিপজ্জনক ঘোষণা করে যুক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বার্কলে বললেন লকের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ভাবকে জানে। এ কথা স্বীকার্য ; কিন্তু এর অধিক যখন লক বলেন যে, মনের সে ভাব মনের বাইরে মননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বের পরিচায়ক ও প্রতিভূ, তখনি লক হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করেন। মন আসলে ভাবের বাইরে আদৌ যেতে পারে না। মন কেবল মনের ভাবকেই জানতে পারে। আমরা যখন টেবিল, চেয়ার, কলম ইত্যাকার কথাগুলি বলি তখন এগুলি দ্বারা আমাদের এক একটি ভাবকে নির্দেশিত করি। 'টেবিল' কথাটি একটি টেবিল নামক 'বস্তু' নয়। লকের মত অনুযায়ী 'টেবিল' কথাটি যদি 'টেবিল' বস্তুর প্রতিভূ হয়, তা হলে টেবিলরূপ ভাব এবং টেবিলরূপ বস্তুর মধ্যে একটা ব্যবধান এবং পার্থক্য রয়েছে, তাকে স্বীকার করতে হয়। টেবিল কথা বা ভাব-ই যদি টেবিলরূপ বস্তু না হয়, তা হলে এ ভাব যে টেবিলরূপ বস্তুর যথার্থ প্রতিভূ, তার নিশ্চয়তা কোথায়? মনের ভাব ব্যতীত জ্ঞানের কোনো মাধ্যম নেই। আবার মনেরও কোনো ক্ষমতা নেই নিজের ভাবকে অতিক্রম করে বস্তু বা অ-মনীয় কোনো সত্তাকে স্পর্শ করার। এমন অবস্থায় যাকে আমরা বস্তু বলি যে মনের ভাব ব্যতীত কিছুই নয়। লক যদি একপ্রকার ভাবকে মন নির্ভর বলে থাকেন, তা হলে তাঁর অপর প্রকার ভাবই বা মন নির্ভর হবে না কেন? টেবিল, চেয়ার, কলমের ন্যায় প্রত্যেকটি ভাবই মন-নির্ভর। মন যখন তাদের সম্পর্কে সচেতন হয় তখনি মনের নিকট তারা অস্তিত্বশীল হয়। 'এসসি এট পারসিপি'—'আমি তাকে দেখি বা প্রত্যক্ষ করি, আর তাই তার অস্তিত্ব'।

বস্তুবাদের এই খণ্ডন বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের বিকাশের সেই যুগে বুদ্ধিজীবী এবং জনসাধারণের নিকট বিশেষ জোরালো বলে মনে হয়েছিল। জন লকের দর্শনের দুর্বলতাই ছিল বার্কলের অভিমতের শক্তির মূল। বার্কলের দর্শনের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, এ দর্শন মনময় দর্শন। শুধু মনময় নয়, এ দর্শন ব্যক্তির মনের মধ্যে আবদ্ধ দর্শন। বার্কলে যখন বলেন, 'আমি দেখি, তবেই সে থাকে' তখন ভাবমাত্রই ব্যক্তির চেতনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বার্কলে নিজেও তাঁর অভিমতের এই সঙ্কট সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর অভিমত ছিল 'সলিপসিস্ট' বা ব্যক্তিক মনের ভাবময় দর্শন। বস্তুকে নাকচ করে মনকে চরম বলে স্বীকার করার ফলে বার্কলের দর্শন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যেখানে মানুষের সমাজ ব্যক্তিক মনের বিচ্ছিন্ন স্বাধীন চিন্তার পরস্পর সংযোগহীন একটা অরাজক অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে ধর্মীয় বিধাতার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এবং যেটাকে আমি টেবিল বলে ভাবছি সেটাকে আর দশটি মনও যে কেন টেবিল বলে ভাবছে তারও হদিস মেলে না। তাঁর দর্শনকে এই সঙ্কট থেকে বাঁচাবার জন্য বার্কলে আর দুটি সূত্রের অবতারণা করেন। ১. ব্যক্তিক মনের বাইরে এক স্বাধীন চরম মনের অস্তিত্ব আছে। সেই চরম মন হচ্ছে ধর্মীয় বিধাতা ; ২. বিধাতার মনে

সমস্ত ভাবই সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বিধাতার ইচ্ছায় তাঁর সুপ্ত ভাব ব্যক্তিমনের সক্রিয় ভাবরূপে প্রকাশিত হয়। বিধাতার মধ্যে সব ভাব বিদ্যমান বলে আমরা যখন টেবিল বা চেয়ার বা কলম সম্পর্কে অচেতন থাকি, তখনও টেবিল, চেয়ার কলম অস্তিত্বহীন হয়ে যায় না। বিধাতার মনে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে ; আবার বিধাতার কারণেই এক টেবিলরূপ ভাব সকলের মনেই জাগ্রত হয় ; এক ভাব ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন মনে জাগ্রত হতে পারে না। বার্কলে এরূপে তার অভিমতের ব্যাখ্যা করে মনে করেন যে, লকের বস্তুকে তিনি অস্তিত্বহীন প্রমাণ করে ভাব এবং বিধাতার অস্তিত্বকে অখণ্ডনীয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই দর্শনের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বার্কলে তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির সত্যকে অস্বীকার করেন এবং বিজ্ঞানের বিকাশে বাধাদানের চেষ্টা করেন। তিনি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিজ্ঞানের কাজ হবে জগতের মূলে যে স্রষ্টা রয়েছে তার প্রকাশ বোঝার চেষ্টা করা ; জাগতিক কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা নয়। নিউটনের মহাশূন্য এবং মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বকে তিনি ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

সহজবোধ্য উদাহরণ দ্বারা বার্কলে তাঁর ভাববাদকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের 'ইমানেন্স', 'প্রাগমেটিজম', 'এমপিরিও ক্রিটিসিজম' প্রভৃতি বিভিন্ন ভাববাদী উপধারার মধ্যে জর্জ বার্কলের মনময় দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মার্কসবাদী দার্শনিক ভি. আই. লেনিন তাঁর 'এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে বার্কলে দর্শন এবং তার আধুনিক পুনঃপ্রকাশের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেন।

Berlin wall : বার্লিন প্রাচীর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাচ্য তথা রাশিয়া এবং পাশ্চাত্য বা ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের উদ্যোগে বার্লিন শহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পূর্বকে পূর্ব বার্লিন আর পশ্চিম অংশকে পশ্চিম বার্লিন বলা হয়। দুই বার্লিনের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ১৯৮৯ সনে পাশ্চাত্য শক্তির আঘাতে বার্লিন দেয়ালের পতন ঘটে।

Bernstein, Eduard : এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন (১৮৫০-১৯৩২ খ্রি.)

জার্মান সোস্যালডিমোক্রাট। মার্কসবাদীগণ বার্নস্টাইনকে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধী ব্যক্তি এবং সংশোধনবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করেন। বার্নস্টাইন মার্কসবাদের মূল দর্শন, অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে নিজস্ব ব্যাখ্যা দ্বারা সংশোধন করার চেষ্টা করেন। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের বদলে বার্নস্টাইন বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব উপস্থিত করেন। তাঁর 'ইভোল্যুশনারী সোস্যালিজম' বা 'বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র' নামক গ্রন্থে বার্নস্টাইন এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে ১. মার্কস পুঁজিবাদের আসন্ন পতনের যে কথা বলেছিলেন তা বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি ; ২. মার্কস শ্রেণীবিরোধকে যেভাবে আপসহীন বিবেচনা করেছেন এবং পুঁজিপতি এবং সর্বহারার দুই প্রান্তে সমাজকে বিভক্ত করেছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অব্যাহত অস্তিত্ব তাকে ভুল প্রমাণিত করেছে ; ৩. পুঁজিবাদের চরিত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। সমাজসংস্কারের আন্দোলনের ফলে পুঁজিবাদের শোষণমূলক চরিত্রের অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে ; ৪. চরম

সংঘর্ষের বদলে ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্য দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর স্থায়ী ফল লাভ করতে পারে। বার্নস্টাইনের কাছে হেগেলের দ্বন্দ্ব এবং মার্কসের দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। মার্কসবাদের 'সর্বহারার একনায়কত্বে'র তত্ত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর মতে শ্রেণীসংগ্রাম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে একটি সমন্বিত সমাজব্যবস্থা রূপ লাভ করবে। সমাজতন্ত্রের কোনো চরম লক্ষ্য থাকার প্রয়োজনকেও বার্নস্টাইন অস্বীকার করেন। শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য হবে সমাজের সংস্কারসাধন, বিপ্লব সংঘটিত করা নয়। "চরম লক্ষ্যের কোনো মূল্য নাই। সংস্কারের চেষ্টা বা আন্দোলনই আসল বিষয়"। রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মেনশেভিক এবং অর্থনীতিবাদী বা ইকনমিস্টদের বার্নস্টাইনের অনুসারী মনে করা হয়। প্লেখানভ এবং লেনিন তীব্রভাবে বার্নস্টাইনের সমালোচনা করেন।

Bhutbada : ভূততত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব

ভারতীয় দর্শনের পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের কেহ কেহ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের লোকায়ত মতকে ভূতবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতককে এই মতের উৎপত্তিকাল বলে অনুমান করা হয়।

'ভূতবাদ' আখ্যা দ্বারা জগৎ ও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা চলে। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধানত জাগতিক। জীবন ও বস্তু জগতের মূলে কি আছে, এ প্রশ্নের জবাবে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের লোকায়ত শাখা এরূপ মনে করত যে, জীবন ও জগৎ হচ্ছে 'পঞ্চ ভূতাত্মক'। প্রাচীন চিন্তাবিদগণ এই পঞ্চভূতকে যথাক্রমে ক্ষিতি (পৃথিবী) অপ (পানি), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ) বলে অভিহিত করতেন। পঞ্চভূত বা পঞ্চমূলের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মত ছিল। বেদান্ত দর্শনের মতে প্রথমে আকাশ থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে পানি এবং পানি থেকে পৃথিবী, এভাবে পঞ্চভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চভূতই হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির মূল উপাদান। সৃষ্টির মধ্যে যত প্রকার বা ভেদ সবই এই মৌলিক উপাদান-সমূহের বিভিন্ন প্রকার সম্মেলনের ফল। এমনকি মন বা চেতনাও সমস্ত উপাদানের একটি বিশেষ ধরনের সম্মেলনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের বিশেষ এবং জটিল সম্মেলনে সৃষ্ট চেতনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, চেতনা অপর কোনো পদার্থে চেতনা সৃষ্টি করতে না পারলেও মূলপদার্থের মিলন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে বিভিন্ন নতুন পদার্থ সৃষ্টিতে সে সক্ষম।

ভূততত্ত্বের চেয়ে ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী ধারা চার্বাক দর্শন নামে অধিকতর পরিচিত। উল্লিখিত পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যোম বা আকাশ ছাড়া অপর চারটি পদার্থের স্বীকৃতি প্রাচীনতম চার্বাক দর্শনে পাওয়া যায়। সৃষ্টি ব্যতীত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের অভিমত ছিল বস্তুবাদী। চার্বাক দর্শন ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত জ্ঞানকে অলীক বলে মনে করত। এ কারণে পরোক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান তাদের কাছে যথার্থ বলে স্বীকৃত হয় নি। ধর্মের অলৌকিক শক্তি বা বিধাতার অস্তিত্ব অনুমানের উপর নির্ভরশীল। এ জন্য চার্বাকরা অজ্ঞেয় বিধাতার অস্তিত্ব এবং আত্মার পুনর্জন্মকেও অস্বীকার করেছে।

Binet, Alfred : আলফ্রেড বাইনেট (১৮৫৭-১৯১১ খ্রি.)

ফরাসি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানী। ফরাসি দেশে ১৮৯৫ সনে আলফ্রেড বাইনেট প্রথম ফরাসি মনোবিজ্ঞানের পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মী সাইমনের সঙ্গে যুক্তভাবে বাইনেট শিশুর বুদ্ধি পরিমাপের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ কারণেই প্রধানত আলফ্রেড বাইনেট খ্যাতি অর্জন করেন। উক্ত পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান বাইনেট পরিমাপক বা বাইনেট-সাইমন পরিমাপক নামে পরিচিত। সাধারণ মনোবিদ্যায় এ পর্যন্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধিগত পার্থক্য এবং তার কারণের বিষয় আলোচিত হয় নি। কেবল অন্তর্দৃষ্টি বা ইনট্রোসপেকশানের মারফত এ পার্থক্যের কারণ স্থির করার উপায় ছিল না। আধুনিক শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের বিষয়টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েও দেখা দেয় নি। কিন্তু শিল্প-বিপ্লব একদিকে যেমন অসংখ্য মানুষকে অর্থনৈতিক জীবনের এক একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করল, তেমনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের বিভাগ এক এক ব্যক্তির উপর উৎপাদনের প্রত্যন্ত অংশের দায়িত্ব ন্যস্ত করল। ফলে উৎপাদনের কোনো সমগ্র প্রক্রিয়ার পরিবর্তে এক একটি বিশেষ দিকে দক্ষতা অর্জন ব্যক্তির জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। সামাজিক এই পরিবেশে আলফ্রেড বাইনেটের দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে সাধারণ মনোবিদ্যা থেকে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের বিকাশে নিবদ্ধ হয়। একই পরিবারের পাঁচটি শিশু একই রকম বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। কি কারণে একই পরিবেশে একটি শিশু যে কাজ যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে, অপর শিশু তা পারে না? এই কারণ অনুসন্ধানেই বাইনেট তাঁর মনোবিজ্ঞানের গবেষণা নিবদ্ধ করেন। নিজের দুটি কন্যার বুদ্ধিগত পার্থক্যই তাঁর প্রথম পরীক্ষার বিষয় হয়। পরে তিনি অপ্রাপ্ত বুদ্ধির শিশুদের শিক্ষায়তনে দল-হিসাবে তাঁর তত্ত্বের পরীক্ষা করেন। বাইনেটের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, বুদ্ধির কোনো একক আছে। দেহের যেমন বয়স বৃদ্ধি ঘটে, তেমনি জন্ম থেকে শিশুর বুদ্ধিরও বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দেহে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে শিশুর বুদ্ধির বয়স বৃদ্ধি না পেতে পারে এবং কোনো স্থানে এসে তার বুদ্ধির বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়েও যেতে পারে।

এই প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য বাইনেট বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য ত্রিশ রকম পরীক্ষা উদ্ভাবন করেন। মৌখিক বা অ-মৌখিক ক্রিয়াগত এই পরীক্ষাগুলিকে বাইনেট খুব সহজ করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে এই পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে আমরা যে-কোনো শিশুর বুদ্ধির পর্যায় স্থির করতে পারি। পরীক্ষাগুলির ফলাফলের গড়ের ভিত্তিতে শিশুর বুদ্ধির একক বার করা সম্ভব। এই একক বা নির্দেশককে ইংরেজিতে 'ইনটেলিজেন্স কুশেন্ট' বলা হয় এবং সংক্ষেপে 'আই. কিউ' অক্ষরদ্বয় দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বাইনেটের পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে কেবল শিশু নয়, যে-কোনো বয়সের ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হতে থাকে। ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বাইনেট এরূপ স্থির করেন কোনো শিশু বা ব্যক্তির দেহের বয়ঃক্রমের সংখ্যাকে তার বুদ্ধির বয়সের ক্রম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে উক্ত ফলকে ১০০ দ্বারা গুণ করেল ব্যক্তির বুদ্ধির মান বা 'আই. কিউ' বার করা সম্ভব হবে। বাইনেট প্রবর্তিত পদ্ধতি হুবহু ব্যবহার করা না হলেও তাঁর পরীক্ষামূলক মনোজ্ঞানের নীতি মনোবিদ্যাকে প্রভূত পরিমাণে উন্নত করেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত হবে এবং কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত হবে না, তা নির্ধারণের জন্য বাইনেটের পরীক্ষার নীতি ও পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বুদ্ধিগত পার্থক্য নিরূপণকে বাইনেট তাঁর মনোবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে স্থির করায় তাঁর অভিমতকে ডিফারেনশিয়াল সাইকোলজি বা ভেদাত্মক মনোবিজ্ঞান বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

Biology : জীববিদ্যা, জীববিজ্ঞান

জীববিদ্যা বা জীববিজ্ঞান বলতে জীবনের বিকাশের নিয়ম এবং জীবনের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা বুঝায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারায় জীবনের বিকাশগত সমস্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেছেন। কিন্তু স্বাধীন, সুসংবদ্ধ এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞান হিসাবে এর উদ্ভব আধুনিককালেই মাত্র ঘটেছে। ফরাসি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯ খ্রি.) তাঁর আলোচনায় প্রথম 'জীববিদ্যা' কথা ব্যবহার করেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের পরিধি বিশেষ ব্যাপক। বস্তুত বর্তমানে জীববিজ্ঞান বলতে পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় একটিমাত্র বিজ্ঞানকে বুঝায় না। জ্ঞানের একটি দিক হিসাবে জীববিদ্যাকে দেখা হয়। যে-কোনো প্রাণীর মধ্যে জীবনের যে বিকাশ ঘটেছে তার বৈজ্ঞানিক আলোচনাই জীববিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এজন্য এই বৃহৎ পরিধির মধ্যে একাধিক জীবনবিষয়ক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। জীববিজ্ঞানের মধ্যে জুলজি বা প্রাণিবিজ্ঞান, বোটানি বা উদ্ভিদবিজ্ঞান, এমব্রিওলজি বা ভ্রূণবিজ্ঞান, পেলিওনটলজি বা প্রত্নজীববিজ্ঞান, মাইক্রোবাইওলজি বা জীবাণুবিজ্ঞান, জেনিটিক্স বা বংশতত্ত্ব এবং ফিজিওলজি বা দেহতত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

জীবনের পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা উনবিংশ শতকেই শুরু হয়। এই শতকের মধ্যভাগে জীবন সম্পর্কে চার্লস ডারউইনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা জীববিদ্যায় একটি বিপ্লব সাধন করে। ইতোপূর্বে জীবন এবং তার বিকাশ কেবল দার্শনিক তত্ত্বকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন পর্যন্ত মানুষের সাধারণ এবং ব্যাপক ধারণা ছিল যে, জীবনের শুরু থেকে মানুষ বর্তমান আকারেই ছিল। মানুষজাতি বর্তমান অবয়বে জীবনের শুরুতেই সৃষ্ট হয়েছে। ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ এবং সজীবদেহের মূল হিসাব সংখ্যাহীন জীবকোষের আবিষ্কার জীবন সম্পর্কে পুরাতন বদ্ধমূল ধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়। জীবনের বিকাশের মূল কারণকেও ডারউইন উদ্‌ঘাটিত করেন। এর ফলে পূর্বকার টেলিওলজিক্যাল বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকাশবাদের তত্ত্বও নস্যাৎ হয়ে যায়।

দার্শনিক তত্ত্ব যেমন বহুকাল দর্শনের পরিধির মধ্যে রেখে জীববিদ্যাকে প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে জীববিদ্যার আধুনিক বিকাশ দর্শনকেও প্রভূত পরিমাপে প্রভাবান্বিত করেছে। বর্তমান জীবন সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই করা হয়। এ ছাড়া জীববিদ্যার বিকাশ দর্শনের জন্য আলোচনার নতুনতর সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। এ সমস্ত সমস্যার মধ্যে জীবদেহের সামগ্রিকতার সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারগত সম্পর্কের সমস্যাটি অন্যতম। জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, একটি

জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে যে একটি পূর্ণ সত্তা বা 'হোল' তৈরি করে, সেই সত্তার বাইরে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ ব্যবহার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ইংরেজিতে এই সমস্যাকে 'wholism'-এর সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

Blanqui, Luis : লুই ব্লাঙ্কুই (১৮০৫-১৮৮১ খ্রি.)

ফরাসিদেশের কাল্পনিক সাম্যবাদী। ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ এর বিপ্লবী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন এবং দু'বার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। জীবনের প্রায় অর্ধভাগ তাঁর কারাগারে অতিবাহিত হয়। ব্লাঙ্কুইর উপর প্রভাব পড়েছিল অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদ, নিরীশ্বরবাদ, কাল্পনিক সমাজবাদ এবং বিশেষ করে বাব্যুফবাদের। তাঁর মনোভাব ছিল বিপ্লবী। কিন্তু বিপ্লব সাধনের জন্য গণআন্দোলন এবং বিপ্লবী দল গঠনের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন নি। এ কারণে তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রমূলক আঘাতে পর্যবসিত হয়েছিল।

Bodin, Jean : বোদিন বা জাঁবোদা (১৫৩০-১৫৯৬ খ্রি.)

ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তাঁর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব বিশেষ আলোচিত তত্ত্ব। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসিদেশ যখন শক্তিসঞ্চার করতে থাকে, এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বিকাশলাভ করে, বোদিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব তখন রাজার একচ্ছত্র শাসনের অধিকারকে জোরদার করে। বোদিন রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রশ্নে পরিবারকে মূল বলে গণ্য করেন। আদিতে পরিবারসমূহের গোষ্ঠীবদ্ধতায় সমাজ বিভক্ত ছিল। পারিবারিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে শক্তিশালী গোষ্ঠীর জয়লাভ এবং দুর্বল গোষ্ঠীসমূহের পরাজয় এবং বশ্যতা স্বীকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে বলে বোদিন অভিমত পোষণ করেন। বোদিনের মতে রাষ্ট্রের শাসকই হচ্ছে সার্বভৌম। ঈশ্বরের বিধান এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক নৈতিক বিধানের বাইরে রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর শাসকের শাসনের সার্বভৌমত্বের অপর কোনো সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে না। এই যুক্তিতে বোদিন রাজতন্ত্রকে সরকারের সর্বোত্তম প্রকার বলে বিবেচনা করেন। কারণ সার্বভৌম রাজাই নাগরিকদের জীবনে শান্তি এবং শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা দান করতে পারে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক সার্বভৌমত্ব বাস্তবে শাসক রাজার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। তা সত্ত্বেও বোদিন আবার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং শাসক রাজা বা রাষ্ট্রের সরকারকে অভিন্ন বিবেচনা করেন নি। সার্বভৌমত্ব যুক্তিগতভাবে অবশ্যই রাষ্ট্রের। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রকাশ ও প্রয়োগ ঘটে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তা হচ্ছে সরকার। কাজেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রকার সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারে।

Border-Line Situation : প্রান্তিক পরিস্থিতি

জাসপারস-এর অস্তিত্ববাদী তত্ত্বের একটি নীতি সূত্র। জাসপারস-এর মতে ভীতি, অপরাধ, দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ, মৃত্যু ইত্যাদি হচ্ছে মানুষের জন্য প্রান্তিক পরিস্থিতি। এগুলি

মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক অভিজ্ঞতার সীমাকে চিহ্নিত করে। এরা হচ্ছে অস্তিত্বের প্রান্ত। এই প্রান্তকে অতিক্রম করে অনস্তিত্বের সূচনা। জাসপারস্-এর মতে প্রান্তিক পরিস্থিতি মানুষ মাত্রের জন্য অমোঘ এবং অনিবার্য। প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করার অর্থই হচ্ছে, মানুষের অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে উৎক্রমণ। মানুষ যথার্থভাবে ন্যায়, অন্যায়, ভালো, মন্দ, সৎ-অসৎ-এর বিসংবাদের মীমাংসা করে নীতিগত সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র এই প্রান্তিক পরিস্থিতির অনিবার্যতা উপলব্ধির মাধ্যমেই গ্রহণ করতে পারে।

Bradley, F.H. : ব্রাডলে (১৮৪৬-১৯২৪ খ্রি.)

ঊনবিংশ, বিংশ শতকের ব্রিটিশ ভাববাদী দার্শনিক। ব্রাডলের 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' বা 'প্রকার ও সত্তা' একখানি বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও ব্রাডলে একজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ। উল্লিখিত কালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক, যেমন কেয়ারড্ (১৮৩৫-১৯০৮), টমাস হিল গ্রিন (১৮৩৬-১৮৮২), বারনার্ড বোসানকোয়েট (১৮৪৮-১৯২৩) এঁরা 'অক্সফোর্ড ভাববাদী' বলে পরিচিত হন। ইতোপূর্বে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে এবং রাজতন্ত্রের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনের মাধ্যমে যে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ঘটেছিল অক্সফোর্ড ভাববাদীদের মধ্যে তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্যের কালে যেখানে ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে মূলতই অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হয়, সেখানে এই ব্রাডলে এবং উল্লিখিত চিন্তাবিদগণ ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপের যে প্রয়োজন রয়েছে, তার উল্লেখ করেন। এঁদের মতে মানুষ যেমন একটি নৈতিক প্রাণী এবং তার কার্যের মূল বিচার তার নীতি বা লক্ষ্যের ভিত্তিতে, রাষ্ট্রের বিচারও তার লক্ষ্যের ভিত্তিতে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রকে পরস্পরবিরোধী শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা অযৌক্তিক। ব্যক্তিকে নিয়ে যেমন রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির উন্নতিতেই রাষ্ট্রের উন্নতি, তেমনি রাষ্ট্র বা সমাজের বাইরেও ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ব্রাডলে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর প্রদান করে তার 'এথিক্যাল স্টাডিজ' গ্রন্থে বলেন যে, নৈতিক প্রাণী হিসাবে পরিবার এবং সমাজের বাইরে 'ব্যক্তি' হিসাবে ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব নাই। পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত দৈহিক এবং মানসিক গুণাবলী যেমন ব্যক্তির অস্তিত্বের মৌল উপাদান তেমনি যে সমাজে সে বর্দ্ধিত হয় এবং জীবন ধারণ করে সেই সমাজের ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠানই তার সামাজিক অস্তিত্বকে তৈরি করে। কাজেই ব্যক্তি বনাম সমাজ বা রাষ্ট্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এমন চরম চিন্তার কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকতে পারে না। অক্সফোর্ড ভাববাদী বলে কথিত চিন্তাবিদদের এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন গ্রিক চিন্তাবিদ এ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক চিন্তার বেশ কিছুটা পুনঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

Brahe, Tycho : টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১ খ্রি.)

জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ডেনমার্কের একটি অভিজাত পরিবারে জন্ম। কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন শুরু করলে ১৫৬০ সনে ২১ আগস্ট সূর্যের পূর্ণগ্রহণের দৃশ্য টাইকো ব্রাহেকে জ্যোতির্মণ্ডলের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় আকৃষ্ট করে। এতদিন পর্যন্ত যেখানে অন্তরীক্ষের তারকামণ্ডলীকে এ্যারিস্টটলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী অপরিবর্তনীয় মনে করা হত সেখানে টাইকো ব্রাহে তারকামণ্ডলীর পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে এ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেন। টাইকো ব্রাহের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কেপলারও তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। গ্রহমণ্ডলের আবর্তন ও গতির নিয়ম সম্পর্কে কেপলারের আবিষ্কারের মূলে টাইকোর পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শের ভূমিকা বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা আজ স্বীকৃত।

Bruno, Giordano : গিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০ খ্রি.)

ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। গিওর্দানো ব্রুনো কেবল দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ইতালির বিখ্যাত কবি এবং নাট্যকার বলেও পরিচিত। স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা ব্রুনো খ্রিষ্টধর্মের ডমিনিকান মত পরিত্যাগ করায় গোঁড়া সাধক সম্প্রদায় তাঁকে ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় আদালতে বিচার করে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করে। দীর্ঘ আট বছর কারাগারে নির্মম নির্যাতনের পরে ব্রুনোকে রোম শহরে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

গিওর্দানো ব্রুনো মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক মতকে সমালোচনা করেন। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল বিস্ময়কররূপে বস্তুবাদী। এই বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি তিনি প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিকদের নিকট থেকেই প্রধানত লাভ করেন। তাঁর বস্তুবাদ প্যানথিজম বা সর্বপ্রাণবাদ বলে আখ্যায়িত হয়। ব্রুনো বিশ্বাস করতেন, একটা বিশ্বপ্রাণের অস্তিত্ব আছে। এই প্রাণ সর্ববস্তুতেই প্রকাশমান। ব্রুনোর মতে প্রকৃতি বা জগৎ হচ্ছে অসীম। তিনি পৃথিবী সম্পর্কে কপারনিকাসের তত্ত্বকে স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রুনোর অভিমতে আমরা কেবলমাত্র কপারনিকাসের তত্ত্বের স্বীকৃতি পাইনে, তাঁর অভিমতে কপারনিকাসের তত্ত্বের অধিকতর বৈজ্ঞানিক বিকাশও লক্ষ করা যায়। কারণ কপারনিকাস যেখানে সূর্যকে স্থির এবং সৌরমণ্ডলকে একমাত্র মণ্ডল বলে মনে করতেন, সেখানে গিওর্দানো ব্রুনো এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সূর্য স্থির নয় এবং সৌরমণ্ডল একমাত্র সৃষ্টিমণ্ডল নয়। তাঁর মতে মহাজগতে অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং পৃথিবী ছাড়া অপর জগতেও জীবন থাকা সম্ভব। ব্রুনোর পূর্বে পৃথিবী গ্রহের গঠন সম্পর্কে কোনো সুসমঞ্জস ধারণা ছিল না। ব্রুনোই বলেন যে, পৃথিবীর সর্বাঞ্চলের গঠনের মধ্যেই মাটি, পানি, বাতাস, তেজ এবং ইথারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের ন্যায় ব্রুনোও বস্তুকে গতিময় মনে করতেন। মানুষের চেতনাও বস্তু বা প্রকৃতিরই ভেদ। এ সমস্ত অভিমত ছাড়া সমগ্র প্রকৃতির গতি, মহাজগতের ঐক্য এবং অস্তিত্বের পারস্পরিক নির্ভরতা প্রভৃতি প্রশ্নেও ব্রুনোর চিন্তা ছিল বৈজ্ঞানিক।

Buddhism : বৌদ্ধবাদ

প্রাচীন ধর্মসমূহের অন্যতম ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। বুদ্ধের জীবনকাল ছিল ৫৬৩—৪৮৩ খ্রি. পূ.। প্রাচীন ভারতে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি ছিল। বুদ্ধের অভিমত এই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ। এ কারণে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সম্রাটগণ বুদ্ধের ধর্মের প্রচারকে রুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের অনুসারীদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি, আচার-অনুষ্ঠান, ব্যাপক পশুবলি এবং অনমনীয় বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে জনমতের প্রতিধ্বনিস্বরূপ ছিল বলে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শুধু ভারতে নয়—ভারতের বাইরে সিংহল, নেপাল, বার্মা, চীন এবং জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারিত হয়। প্রথমে বিরোধাত্মক সম্পর্ক থাকলেও কালক্রমে ব্যাপক হিন্দুধর্ম বুদ্ধকে তার অন্যান্য অবতারের সঙ্গে নবম অবতার বলে স্বীকৃতিদান করে।

বাংলাদেশের একজন প্রাচীন বৌদ্ধ কবি রামচন্দ্র বুদ্ধকে লক্ষ্য করে যে উক্তি করেন, ততে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধের ভাবটি সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত কবির মতে "ব্রহ্মা অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত ; বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গন বিমুগ্ধ ; শঙ্কর আশক্তিবশত পার্বতীকে নিজ দেহে ধারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া, আসক্তি এই সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।"—(বিশ্বকোষ) প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একদিকে যখন আদিম গোত্রতান্ত্রিক যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল এবং অপরদিকে সমাজের একটা অংশ তার অনড় আচার-অনুষ্ঠান এবং বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে নিজের স্বার্থকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে সেইকালে। বুদ্ধ ভগবানের অস্তিত্ব, বেদের নির্ভুলতা এবং বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার করেন।

কিন্তু বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অসার অনুষ্ঠান এবং নির্যাতনমূলক বর্ণ প্রথার শৃঙ্খল থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলেন নি। জনসাধারণকে তিনি আত্মার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করতে বলেছেন। হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদের তত্ত্বকে বুদ্ধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর মতে আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু সে জন্মান্তরের ভালো-মন্দ বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। মানুষ তার কৃতকর্মের কারণে ভালো কিংবা মন্দ জন্মগ্রহণ করে। জীবনের ভোগ বাসনা পরিত্যাগের সাধনা দ্বারাই জীব জন্মান্তরের বন্ধন থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করতে পারে।

বৌদ্ধধর্মে দুটি ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হীনযান ধারা, অপরটি মহাযান ধারা। হীনযান ধারাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম এবং বুদ্ধের শিক্ষা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত ধারা। হীনযান মতে বিশ্ব এবং জীবকে এক ধারায় গ্রথিত করা হত। সৃষ্টি হচ্ছে বস্তু এবং চেতনার বিবর্তন। বিবর্তিত সৃষ্টিমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে। এই স্বভাবই হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম। কোনো অস্তিত্ব বা সত্তার নির্বাণের জন্য আবশ্যক হচ্ছে তার নিজের ধর্মের বর্জন। স্বভাবের বর্জনে সত্তার সমস্ত প্রকার স্বভাব বা ধর্মরূপ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। এই মতের মধ্যে প্রকৃতি ও বস্তু জগতের একটা স্বীকৃতি আছে। পরবর্তীকালে মহাযান মতবাদ বুদ্ধের জীবনের নৈকট্যমূলক অভিমত বর্জন করে। মহাযান পন্থীরা বুদ্ধকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিবিধ অনুষ্ঠান মারফত বুদ্ধের দয়া উদ্রেকের মধ্যে মানুষের মুক্তি নিহিত বলে প্রচার করে। মহাযানপন্থীদের মতে বস্তু

বা বস্তুর ধর্ম হচ্ছে অলীক বা মায়া। জগৎও মায়া। খ্রিষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত বৌদ্ধ যুক্তিবিদ নাগার্জুন যুক্তির পারম্পর্যে জগৎকে মায়া বা শূন্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

Bukharin : বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮ খ্রি.)

রুশ বিপ্লবের একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। কিন্তু বলশেভিক পার্টির নেতা লেনিনের সঙ্গে যেমন তাঁর ১৯১৮ সনে তত্ত্বগত মতবিরোধ ঘটে, তেমনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে স্ট্যালিনের সঙ্গে তার মতান্তর সৃষ্টি হয়। রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য স্ট্যালিনের সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক নেতৃত্বে যে নীতি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে, বুখারিন পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ভিন্ন একটি গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তার বিরোধিতা করেন বলে স্ট্যালিন অভিযোগ করেন। পরবর্তীকালে এই বিরোধী গ্রুপের ধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগে বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর অপর সঙ্গীদের সঙ্গে বুখারিনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

Burke, Edmund : এডমাণ্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭ খ্রি.)

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের বিখ্যাত বাগ্মী সদস্য এবং রাজনীতিবিদ। বার্কের রাজনৈতিক চিন্তা, বক্তৃতা এবং রচনার মধ্যে উদারনীতি এবং রক্ষণশীলতার মিশ্রণ ঘটে। ইংল্যাণ্ডের সরকার আমেরিকার উপনিবেশের উপর ট্যাক্স আরোপ করলে বার্ক উপনিবেশের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি উচ্চকণ্ঠ হন। সে সময়ে রাজনৈতিক দল হিসাবে হুইগ দল কনজারভেটিভ দলের চাইতে উদারনীতিক ছিল। বার্ক হুইগ দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু বার্ক তার সুপরিচিত পুস্তক 'রিফ্লেকশানস অন ফ্রেঞ্চ রিভোল্যুশন' বা 'ফরাসি বিপ্লবের উপর চিন্তা' গ্রন্থে ফরাসি বিপ্লবের তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে নিজের রক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটান। বস্তুত ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে বার্কের সমালোচনার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার একটি অংশের ফরাসি বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে আশঙ্কা এবং ভীতির প্রকাশ ঘটে। ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিপ্লবের উদ্যোগী ভূমিকা ইংল্যাণ্ডের পুঁজিবাদী শ্রেণী গ্রহণ করলেও অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' আওয়াজ মানুষের চিন্তায় একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা ঘটায়। ফরাসি বিপ্লবের এই নতুন তাৎপর্যে কেবল যে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও রাজতান্ত্রিক শাসকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীও ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্যে'র আওয়াজে নিজেদের শ্রেণী শাসনের প্রতি আঘাতের তাৎপর্যকেও উপলব্ধি করে। এডমাণ্ড বার্ক যখন তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় ফরাসি বিপ্লবকে আক্রমণ করে বলেন : "ফরাসি বিপ্লবীদের কাছে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা ঈশ্বরকে যেমন ভয় করি, রাজাকে তেমনি সমীহ করি ; আমরা পার্লামেন্টকে যেমন ভালবাসি, সরকারকে তেমন মান্য করি ; আমরা গীর্জার পুরোহিতদের যেমন ভক্তি করি, অভিজাতদের তেমনি সম্মান করি"— তখন কেবল ব্যক্তিগত আবেগ নয়, সমাজের অধিকতর বিপ্লবী বিকাশের প্রশ্নে ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীগত উদ্বেগের প্রকাশ ঘটে।

C

Campanella, Thomas : টমাস ক্যাম্পানেলা (১৫৬৮-১৬৩৯ খ্রি.)

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের ইতালির দার্শনিক এবং কল্পনাবাদী চিন্তাবিদ। ১৫৮২ সনে ক্যাম্পানেলা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ক্যাম্পানেলার চিন্তার মধ্যে অ-খ্রিষ্টীয় অভিমত, ম্যাকিয়াভেলীর বাস্তববাদ এবং খ্রিষ্টীয় ধর্মীয়ভাব—এসবের মিশ্রণ দেখা যায়। স্কলাসটিসিজম বা মধ্যযুগের ধর্মীয় যুক্তিবাদের বদলে ক্যাম্পানেলা প্রকৃতি এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যায় শক্তি, যুক্তি এবং প্রেম এই তিন নীতি অধিকতর শ্রেয় বলে বিশ্বাস করতেন। 'সিভিটাটিস সলিস' নামে সংলাপের রীতিতে তিনি যে কল্পনা-রাজ্য রচনা করেন সেখানে রাজা হলো একদল নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত ; রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কাজের সেখানে সম্মিলন ঘটেছে এবং সর্বজনীন শ্রমের মাধ্যমে যে সম্পদ উৎপাদিত হচ্ছে তার মালিকানা হচ্ছে যৌথ। কালের বিচারে ক্যাম্পানেলার এরূপ কাল্পনিক সাম্যমূলক চিন্তার সেকালে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। মুক্তচিন্তার জন্য ক্যাম্পানেলা ধর্মান্ধ গীর্জার কোপানলে পতিত হন। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাম্পানেলা ইতালিকে স্পেনের দখলকারী শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য একটি দেশপ্রেমিক বিদ্রোহ সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে নির্মম নির্যাতনের পরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ২৭ বছর ক্যাম্পানেলাকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়। কারাগারে তিনি তাঁর 'সিভিটাটিস সলিস' বা 'সূর্য নগরী' রচনা করেন।

Capital : পুঁজি, মূলধন

১. উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজি হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের মধ্যে একটি উপাদান। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি, যন্ত্র, শ্রম এবং পুঁজি এই চারটি উপাদান প্রধান। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'পুঁজি' শব্দ দ্বারা নতুন পণ্য ক্রয়ের আর্থিক সামর্থ্য বুঝায়। এরূপ অর্থ পুঁজি বলতে কেবল টাকা নয়, মালিকের মালিকানাধীন দালানকোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রি বুঝাতে পারে। 'জাতীয় পুঁজি' দ্বারা দেশের শিল্পে উৎপাদিত সমগ্র পণ্য এবং অধিকতর পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মজুর সম্পদকে বুঝায়। মার্কসীয় অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় 'পুঁজির আসল কাজ হলো বাড়তি পণ্য অর্থাৎ বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করা এবং এই কাজ দিয়েই তার পরিচয়।' কাজেই 'যে কোনো উৎপাদন যন্ত্র বা উপায় বাড়তি মূল্য তৈরির কাজে নিয়োজিত হলে তাকে আমরা বলতে পারি পুঁজি। পুঁজিকে আবার দুরকম ভাগে ভাগ করা যায় — পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল পুঁজি। কলমালিক তার পুঁজি দিয়ে দুরকম জিনিস কেনে ; এক হচ্ছে শ্রমশক্তি, আর এক হচ্ছে সুতো, কাঁচামাল, কলকজা ইত্যাদি। সুতো, কাঁচামাল কলকজা ইত্যাদির মূল্য যত ছিল ঠিক ততটাই

উৎপাদিত পণ্যের ভেতর চলে যায়, এদের মূল্যের কিছু পরিবর্তন হয় না। এই জন্য এদের বলে অপরিবর্তনশীল পুঁজি বা কনসট্যান্ট বা ফিক্সড ক্যাপিটাল। পুঁজির অন্যভাগ যা শ্রমশক্তির জন্য খরচ হয় তা কিন্তু পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য একে বলে পরিবর্তনশীল পুঁজি বা ভেরিয়েব্‌ল ক্যাপিটাল।' (নীহাররঞ্জন সরকার : ছোটদের অর্থনীতি)।

২. মার্কস-এর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'পুঁজি' বা ক্যাপিটাল। এই গ্রন্থে কার্লমার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তার মৌলিক বিধান উদঘাটন করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। 'পুঁজি' হচ্ছে মার্কস-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ১৮৪০ সালের দিকে লণ্ডনে মার্কস পুঁজিবাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৮৩) তিনি এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর আজীবন সাথী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর সম্পাদনায় 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। প্রথম খণ্ডে মার্কস পুঁজির গঠন অর্থাৎ পুঁজি কীভাবে সৃষ্টি হয় ; দ্বিতীয় খণ্ডে পুঁজির সঞ্চরণ বা সারকুলেশন এবং তৃতীয় খণ্ডে তিনি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেন। চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে বাড়তি বা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মার্কস পুঁজিবাদকে একটি বিশেষ পর্যায় বলে চিহ্নিত করে তার সুবিস্তারিত বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি পুঁজিবাদের উৎপত্তি বিকাশ এবং তার পরিণাম বা ধ্বংসের বিধানকে উদঘাটন করেন। মার্কস-এর 'পুঁজি' কেবল আর্থনীতিক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ নয়। মার্কস-এর সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি অর্থাৎ তাঁর দর্শন এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত মার্কসবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল গ্রন্থ হচ্ছে 'পুঁজি'। মার্কস তার দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগের ভিত্তিতে মানুষের সামাজিক আর্থনীতিক বিকাশকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ কোনো অনড় এবং স্থায়ী অস্তিত্ব নয়। পুঁজিবাদ একটি বিকাশমান প্রক্রিয়া। এই আর্থনীতিক প্রক্রিয়া এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামো যেমন আদিতে ছিল না, তেমনি ভবিষ্যতেও এর পরিবর্তন বা রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন অর্থনীতিক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সামাজিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই গুণগত রূপান্তরের মুহূর্ত যে অনিবার্যভাবে অগ্রসর হয়ে আসছে তা মার্কস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। অন্যান্য ব্যবস্থায় যেমন, পুঁজিবাদের অভ্যন্তরেও তেমনি পরিবর্তনের মূল কারণ তার আভ্যন্তরিক বিরোধ। এই বিরোধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্মের পর থেকে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উৎপাদন সম্পর্কের অনিবার্য যৌথ বা সমষ্টিগত রূপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এবং সে বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বিস্ফোরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণাম হচ্ছে 'এক্সপ্রোপ্রিয়েটিং দি এক্সপ্রোপ্রিয়েটরস' বা 'উচ্ছেদকের উচ্ছেদ' অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের উপর সমষ্টিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা। পরিবর্তনের এই ক্রম ব্যাখ্যায় মার্কস এই বিরোধের ক্রম বিকাশের প্রতিটি স্তর, সে স্তরের বৈশিষ্ট্য, তার সংকটের বিশেষ সমাধানের ভিত্তিতে নতুনতর স্তরে আগমন বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন এবং পরিশেষে এই বিকাশের বিধানের উল্লেখ করে বলেছেন 'একটি বিশেষ উৎপাদন-

ব্যবস্থায় যে বিরোধ অন্তর্নিহিত থাকে তার ঐতিহাসিক বিকাশের মাধ্যমেই মাত্র সেই উৎপাদন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং তার স্থানে নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।'

Capitalism : ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ

সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে। মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করছে এটি আধুনিক চিন্তাধারার একটি স্বীকৃত সত্য। আদিতে মানুষ যেরূপ অসহায় ছিল তেমনি আবার মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ আদি সমাজে কোনো শ্রেণীগত বিভেদ ছিল না। জীবন ধারণের জন্য উন্নত থেকে উন্নততর জীবিকার উপায় আবিষ্কারের প্রয়োজন এবং ইচ্ছা মানুষের সহজাত। এই প্রচেষ্টায় শ্রেণীহীন আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজ উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিক প্রভু এবং উৎপাদনের হাতিয়ারহীন দাসের শ্রেণী সমাজে পরিণত হয়। এই দাস সমাজই আবার কালক্রমে জমির মালিকানার ভিত্তিতে সামন্তপতি এবং ভূমিহীন কৃষকের সামন্তবাদী সমাজে বিকাশ লাভ করে। সামন্তবাদী সমাজের উত্তরকালে বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের সহজতর এবং উন্নততর হাতিয়ারের সম্ভাবনা খুলে দেয়। নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হতে শুরু করে। এ সমস্ত যন্ত্রপাতির যারা মালিক হলো তারা দেখল যে, যন্ত্রপাতি চালাবার জন্য প্রচুর সংখ্যক লোকের আবশ্যক। কিন্তু তখনো অধিকাংশ মানুষ সামন্তবাদী প্রভুর হুকুমে জমির সীমানার শিকলে আবদ্ধ। তারা ভূমির মালিক নয়। ভূমির দাস। নতুন শক্তি দেখল সামন্তবাদ কেবল মানুষকেই ভূমির দাস বানিয়ে রাখে নি। তার অস্তিত্ব নতুন উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমির মালিক এবং ভূমির দাসের পারস্পরিক সম্পর্ক শোষক এবং শোষিতের। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সামন্তবাদের পরিবর্তন অপরিহার্য করে তুলল। কৃষকের বিদ্রোহ এবং উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির অজেয় শক্তি সামন্তবাদকে ক্রমান্বয়ে উৎসাহিত করে নতুনতর এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল : ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষ দিয়ে তার যন্ত্র চালায় আর অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করে দ্রব্য, পণ্য যা সে দেশে-দেশান্তরে বিক্রি করতে পারে এবং বিক্রি করে অর্থ আনতে পারে, অধিক যন্ত্র তৈরি করতে পারে এবং অধিকতর সংখ্যক মজুর নিয়োগ করে অধিকতর পণ্য আবার তৈরি করতে পারে। এ এক নতুন ব্যবস্থা, নতুন সমাজ। এখানে জমির চেয়ে যন্ত্র মূল্যবান। কিন্তু এ যন্ত্র থেকে লাভ অর্জনের মূল সূত্র মজুর এবং বাঁধা মজুরিতে মালিকের জন্য তার অবাধ উৎপাদনের ক্ষমতায়। যন্ত্রের মালিকের মুনাফা আসে মজুরের মজুরির অতিরিক্ত শ্রম থেকে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সম্পর্কে হলো একদিকে যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা, অপরদিকে বহু মজুরের যৌথক্রিয়ায় উৎপাদনের যৌথপদ্ধতি। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রথমে করেন কার্ল মার্কস এবং তাঁর আজীবন সঙ্গী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তাঁরা সামন্তবাদের সঙ্গে তুলনাক্রমে সমাজ বিকাশে ধনতন্ত্রবাদের অগ্রসর ভূমিকার কথা যেমন উল্লেখ করেন তেমনি এ সমাজেরও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্যেরও উদঘাটন করেন। যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা

এবং তাঁর উৎপাদনের যৌথ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে এর দ্বন্দ্ব। সামাজিক ক্ষেত্রে এ দ্বন্দ্ব হচ্ছে যন্ত্রের মালিকদের শোষণ এবং যন্ত্রের শোষিত শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব। এই বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব পরিণামে ধনতন্ত্রীদের উৎপাদনের কারণ হয়ে নতুনতর সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা উৎপাদনের উপায়ের যৌথ মালিকানা এবং যৌথ মালিকদের যৌথ উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে বলে মার্কসবাদীগণ বিশ্লেষণ করে দেখান। সমাজবিকাশের এই প্রক্রিয়ায় একাধিক দেশে ধনতন্ত্রবাদের স্থলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অপরাপর দেশের প্রধান আর্থিক ব্যবস্থা এখনো ধনতান্ত্রিক।

ধনতন্ত্রের অগ্রসর ভূমিকা ইউরোপেই প্রধানত কার্যকরী হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী যখন শেষ হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদ তখন নিজ নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশকে করায়ত্ত করে নতুন সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে শুরু করেছে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা এবং পরবর্তীকালে ধনতান্ত্রিক দেশ কিংবা ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অধিক থেকে অধিকতর উৎপাদন এবং ক্রমাধিক মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতাই হচ্ছে ধনতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি। এ কারণেই নিজ দেশে মুনাফার বৃদ্ধি সীমিত হয়ে এলে ধনতন্ত্রবাদ অপর দেশ দখল করে মুনাফার ক্রমাধিক বৃদ্ধির প্রাণশক্তিকে জীবিত এবং সক্রিয় রাখতে চায়। ক্রমে আবার এই প্রয়াস ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের আকার গ্রহণ করে।

Capitalism, General crisis of : পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের বর্তমান অবস্থার মার্কসবাদী বিশ্লেষণে 'পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট' একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। মার্কসীয় বিশ্লেষণের অনুসারীদের মতে পুঁজিবাদের গোড়াকার প্রগতিশীল ভূমিকা আর বজায় নেই। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং ব্যবস্থা এখনো শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তেজী-মন্দার চক্র ক্রমাধিক পরিমাণে তীব্র হয়ে উঠছে। কর্মহীন বা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমাধিক পরিমাণে লাভে পণ্য বিক্রি করতে না পারার সমস্যা বাড়ছে। কিন্তু এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা করছে। ব্যবস্থা মাত্রই তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। অস্তিত্ব রক্ষার এই চেষ্টা নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। উৎপাদনের ব্যয়হ্রাসের মাধ্যমে লাভের হার বজায় রাখার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গবেষণা চালানো হচ্ছে। নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে। পূর্বের অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হচ্ছে। উৎপাদন ও লাভকে বহাল এবং বৃদ্ধি করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর বৃহৎ বা একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতীয় সীমা অতিক্রমকারী বহু জাতীয় করপোরেশন বা কারটেল গঠিত হচ্ছে। সামরিক অস্ত্রপাতি উৎপাদন এবং বিভিন্ন দেশে তা বিক্রি করে লাভ অর্জনের চেষ্টা হচ্ছে। মানুষের শ্রমের ফসল ধ্বংসকারী সমর শিল্প তাই অতীতের চাইতে অধিক ব্যাপক এবং উন্নত হয়ে উঠছে। সমরশিল্পকে বহাল রাখা এবং বৃদ্ধি করার জন্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুদ্ধের আবহাওয়া, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের

আবহাওয়া তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বর্তমানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এবং এর মাধ্যমেই পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রকাশ ঘটছে।

নিম্নের বিবরণটিকে এই বিষয়টির মার্কসবাদী বিশ্লেষণের একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা চলে

"ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শোষণ যার নীতি সেই বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ সম্ভাবনা আজ নিঃশেষিত। পুঁজিবাদ আজ গভীর এক সাধারণ সংকটে নিপতিত। পুঁজিবাদের মীমাংসাহীন দ্বন্দ্ব এবং তার চরিত্রগত বিধান এই সংকটকে অনিবার্য করে তুলছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অর্থ হচ্ছে, পুঁজিবাদ বিকাশের বদলে আজ ক্ষয়ের পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এ ক্ষয় আজ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যেক দেশে, এ ক্ষয় উপর থেকে নিচে সর্বত্র বিস্তারিত। এ ক্ষয় গ্রাস করছে তার অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, এর আদর্শ এবং সংস্কৃতিকে। সাধারণ এই সংকটের ফলে একের পর এক, বিভিন্ন দেশ যারা পুঁজিবাদী-অক্ষ পরিত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ অবলম্বন করছে তাদের নিজের অক্ষের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পুঁজিবাদ ব্যর্থ হচ্ছে।

"পুজিবাদের এই সাধারণ সংকটের সূচনা ঘটে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই একমাত্র ব্যবস্থা বলে বিদ্যমান থাকার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। গোড়াতেও পুঁজিবাদী জগৎ সোভিয়েট সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সামরিক আক্রমণ, অর্থনৈতিক অবরোধ, সীমাহীন অপপ্রচার, আদর্শগত ধ্বংসাত্মক কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ করে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার অব্যাহত অস্তিত্বের মাধ্যমে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রাণশক্তির প্রমাণ ঘটায়।

"পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ইউরোপ ও এশিয়ার একাধিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মধ্যে। বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই একমাত্র বিশ্বব্যবস্থা নয়। তার প্রতিশক্তি হিসাবে একটি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

"বর্তমানে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শান্তির ভারসাম্য আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ পৃথিবীব্যাপী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে দুর্বল হচ্ছে।

"বর্তমান যুগে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনীতি, রাজনীতি ও নৈতিক চরিত্র—সর্বক্ষেত্রকে গ্রাস করে সার্বিক সংকটের রূপ গ্রহণ করছে। তার বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা ১৯৩০-এর মারাত্মক মন্দার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বপুঁজিবাদের প্রধান সকল কেন্দ্রগুলিতেই এই সংকট বিস্তারিত হয়েছে। এই সংকট হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিকশিত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অর্থনীতির সংকট। উৎপাদনে আকস্মিক পতন ঘটছে, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুঁজিবাদের পক্ষে কোনো দেশেরই সক্ষম জনসংখ্যাকে কার্যে নিযুক্ত করার ক্ষমতা নাই। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী সত্তর দশকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কর্মক্ষম লোক

পুরো বেকার। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং উৎপাদনের উন্নততর যান্ত্রিকীকরণ শ্রমজীবী মানুষের মঙ্গলে আসার বদলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে 'ফজুল' বা বাহুল্য বলে বাতিল করে দিচ্ছে।

"এই অবস্থা থেকে যুক্তিগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনের শক্তি বা উপায় এবং উৎপাদনের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এরূপ তীব্রতা লাভ করেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে উৎপাদনী শক্তির শৃঙ্খল হয়ে তাকে রুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করছে।

"কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক শক্তি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে অস্তিত্বের লড়াই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরমান দাবি এবং এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নির্মম অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি পুঁজিবাদের জন্য উৎপাদনের উন্নতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ উদ্ভাবনের প্রয়োগকে অনিবার্য করে তুলছে।

"সাধারণ সংকটের এই নবতম পর্যায়ে পুঁজিবাদের অন্যান্য অন্তর্দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে উঠছে। মজুর এবং পুঁজির দ্বন্দ্বের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কতিপয় একচেটিয়া বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান ও শক্তির সংঘাত তীব্র হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশসমূহের অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ বিশ্বব্যবস্থার অভ্যন্তরেও শক্তিসমূহের জোটবদ্ধতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক বৈরিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।" (ফাণ্ডামেন্টালস অব সায়েন্টিফিক কম্যুনিজম, মস্কো ১৯৭৭)

Categories : সূত্র, মাধ্যম

মানুষের জ্ঞান কতকগুলি মৌলিক ধারণা বা সূত্রের উপর নির্ভরশীল। এই ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্থান, কাল, সম্পর্ক, গুণ, পরিমাণ ইত্যাদি। এই ধারণাগুলি বাদে আমাদের পক্ষে কোনো কিছুর জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। 'স্থান' ধারণার উপর নির্ভর করেই আমরা একটা বস্তুকে স্থানের অন্তর্ভুক্ত করি। আমরা বলি এই বস্তুটি অমুক স্থানে আছে। কালের ধারণা থেকে আমরা বস্তু বা ঘটনার উপর কালানুক্রম আরোপ করি। এরূপ ধারণা ব্যতীত আমাদের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় বলে দর্শনে এদের জ্ঞানের মূলসূত্র বা মাধ্যম বলা হয়।

জ্ঞানের জন্য যে কিছু সংখ্যক মৌল ধারণার আবশ্যক এ সত্য বিভিন্ন দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণই জ্ঞানের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় বৈশেষিক দর্শন বস্তু, গুণ এবং ক্রিয়াকে জ্ঞানের মূলসূত্র বিবেচনা করেছে। গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল জ্ঞানের এরূপ সূত্রের বিস্তৃততর বিশ্লেষণ করে এর সংখ্যা দশটি বলে স্থির করেন। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট জ্ঞানসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানসূত্রগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। ভাববাদী দার্শনিকদের মতে জ্ঞানসূত্রগুলি মানুষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মারফত লাভ করে না। অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণা হিসাবে মূল জ্ঞানসূত্রগুলি মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই থাকে। এই ভাববাদী মতের প্রধান আধুনিক ব্যাখ্যাতা হচ্ছেন কাণ্ট। জ্ঞানের সমস্যায় কাণ্টীয় বিশ্লেষণ সংক্ষেপত এরূপ মানুষ চরম সত্তাকে জানতে পারে না। মানুষ চরম সত্তার বহিঃপ্রকাশকেই

মাত্র জানতে পারে। এই বহিঃপ্রকাশকে মানুষ জানে স্থান, কাল, গুণ, সম্পর্ক এরূপ মৌলসূত্রের মাধ্যমে। জ্ঞানের এই সূত্রগুলি মানুষের মনে অভিজ্ঞতা-পূর্ব ভাব হিসাবে উদ্ভুত হয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে এদের উদ্ভব নয়। বস্তুবাদ জ্ঞানসূত্রগুলিকে নির্বিশেষ ধারণা বলে স্বীকার করলেও অভিজ্ঞতা-পূর্ব উদ্ভবের তত্ত্বকে অস্বীকার করে। বস্তুবাদ, বিশেষ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মানুষের জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে একটি সদা বিকাশমান দ্বন্দ্বমূলক জটিল প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করে। বস্তু থেকে যেমন মানুষের বিকাশ, তেমনি মানুষের সঙ্গে বস্তুর দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটেছে। মানুষ বস্তুর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে। বিভিন্ন বস্তু তার চেতনাকে আঘাত করে করে চেতনাকে বিকশিত করে। বিকশিত সেই চেতনা একাধিক বস্তুকে তুলনা করার ক্ষমতা অর্জন করে। তাদের উপর মিল-অমিলের গুণ আরোপ করে। এমনভাবে যে সূত্রগুলি আজ মানুষের জ্ঞানের মূলসূত্র বা যে সূত্রগুলি মানুষজাতির জন্মগত এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হচ্ছে সেগুলি একদিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করেছে। এরূপ মৌলসূত্র নির্দিষ্ট সংখ্যায় একদিনে সৃষ্টি হয় নি কিংবা চিরকালের জন্য এ সংখ্যার সীমাও স্থির হয়ে যায় নি। জ্ঞানের বিকাশমান প্রক্রিয়ায় মানুষ ক্রমান্বয়ে নতুনতর সূত্র অর্জন করে যাচ্ছে।

Categorical Imperative : শর্তহীন বিধান

শর্তহীন বিধান দর্শন, বিশেষ করে দার্শনিক কান্টের নীতি-শাস্ত্রে ব্যবহৃত একটি কথা। কান্টের মতে নৈতিক জীবনে যে সমস্ত বিধান কার্যকরী সেগুলিকে শর্তসাপেক্ষ এবং শর্তহীন বলে বিভক্ত করা চলে। শর্তসাপেক্ষ বিধানের নিয়ামক হচ্ছে কোনো বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। আমার সন্তানকে যদি আমি এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভালবাসি যে, সেও একদিন আমার বৈষয়িক জীবনে সাহায্যকারী হবে তা হলে সন্তানের প্রতি এই ভালবাসা শর্তসাপেক্ষ ভালবাসা। ভবিষ্যতের প্রতিফলের আকাঙ্ক্ষাই আমার বর্তমানের ভালবাসার নিয়ামক। এখানে সন্তানের প্রতি ভালবাসা শর্তসাপেক্ষ বিধানেরই একটি দৃষ্টান্ত। শর্তসাপেক্ষ বিধান একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। মানুষের নৈতিক জীবনের মূল নিয়ামক এরূপ শর্তসাপেক্ষ বিধান হওয়া উচিত নয়। কান্টের মত অনুযায়ী মানুষের নৈতিক জীবনের নিয়ামক হবে শর্তহীন বিধান। শর্তহীন বিধান দ্বারা কান্ট এমন একটি বিধানকে বুঝাতে চেয়েছেন যে বিধান অপর কোনো লক্ষ্য অর্জনের উপায়মাত্র নয়ে, যে-বিধান নিজেই লক্ষ্য। পিতা যদি সুখশান্তি-সম্পদ অর্থাৎ কোনো প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না করে তার সন্তানকে শুধু ভালবাসার জন্য ভালবাসতে পারে তবেই সে ভালবাসা অপর কোনো লক্ষ্যের উপায়মাত্র না হয়ে নিজেই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে। আর এরূপ ভালবাসাই হচ্ছে সন্তানের প্রতি পিতার আদর্শ ভালবাসা। অনুরূপভাবে ব্যক্তি তার সমাজ জীবনে কেবল শর্তহীন বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে, শর্তসাপেক্ষ বিধান দ্বারা নয়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে-কোনো কাজের পেছনেই একটি নীতি বা লক্ষ্য থাকে। সমাজে যে বিরোধ, বৈপরিত্য বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় তার কারণ ব্যক্তি নিজের স্বার্থসাধনের লক্ষ্যকেই চরম মনে করে। সমাজে যে অধিকার সে নিজে ভোগ করতে চায় সে অধিকার অপরেরও প্রাপ্য একথা সে স্মরণ করে

না। কিন্তু যে অধিকার ব্যক্তি নিজে ভোগ করবে সে অধিকার অপরকেও ভোগ করতে না দেওয়ার নীতি অযৌক্তিক। মানুষ যুক্তিবাদী জীবন। তার পক্ষে অযৌক্তিক কাজ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি তার যে-কোনো সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে এমন নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে, যে-নীতি শুধু তার নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ; যে-নীতি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে-নীতি সার্বিক। যে-ব্যক্তি চুরি করতে যাচ্ছে তাকে বিবেচনা করতে হবে, যে-চুরির অধিকার সে ভোগ করতে যাচ্ছে সে-চুরির অধিকার অপর সকলেরই আছে ; সে মনে করবে যে-মুহূর্তে অপরের দ্রব্য সে আত্মসাৎ করছে সেই মুহূর্তে অপর সকলেও তার নিজের দ্রব্য কিংবা সকলেই সকলের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করছে। এরূপ চিন্তায় ব্যক্তি তার আচরণের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। যে-নীতিকে সে সার্বিক নীতি হতে দিতে চায় না সে-নীতিকে নিজেও পরিত্যাগ করবে। এমনিভাবে আদর্শ সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি হবে। কাণ্ট তাঁর শর্তহীন বিধান দ্বারা এক কল্পলোক বা ইউটোপিয়া তৈরির চেষ্টা করেছেন। শর্তহীন বিধান দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি পরিচালিত হলে একটি আদর্শ সমাজের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তি কেন স্বার্থপর হয়, কেন সে নিজে যে অধিকার ভোগ করে অপরকে সে অধিকার দিতে চায় না এর কারণের কোনো বিশ্লেষণ কাণ্টের নীতিশাস্ত্রে নেই। ফলে, শর্তহীন বিধান একটি অবাস্তব ইচ্ছায় মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। নীতিশাস্ত্র মানুষের সামাজিক আচরণের আলোচনা। বাস্তব অর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থাই ব্যক্তির আচরণের নিয়ামক। কোনো বিশেষ সমাজের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গতি-অসঙ্গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে কোনো চরম আদর্শ ব্যক্তির সামনে পেশ করা নিরর্থক। কাণ্ট তাঁর নীতিশাস্ত্রে এই সত্যকে অস্বীকার করেছেন।

Catharsis : বিমোক্ষণ

পুঞ্জীভূত আবেগ বা শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে শক্তির আধারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া বা উপায়কে ক্যাথারসিস বা বিমোক্ষণ বলা হয়। ইংরেজি ক্যাথারসিস শব্দের মূল গ্রিক শব্দের অর্থে বিশুদ্ধকরণের ভাব যুক্ত ছিল। গ্রিকগণ তাদের সৌন্দর্যতত্ত্বে এবং সাহিত্যে এই অর্থে শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন। এ্যারিস্টটল ব্যক্তির উপর সঙ্গীতের প্রভাব আলোচনা করে বলছেন যে, ব্যক্তির উপর সঙ্গীতের একটি বিশুদ্ধকরণে দিক আছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যক্তির আবেগের প্রকাশ ঘটে এবং ব্যক্তি তার ফলে আনন্দ বা স্বস্তি বোধ করে। আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে মানসিক রোগ নিরাময়ের একটি উপায় হিসাবে, বিমোক্ষণের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখা যায়। মনোবিকলনের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মনোবিকলনের রোগীকে যদৃচ্ছা আবেগ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী অনুমান করেন যে, রোগীর মনে তার অপূর্ণ কামনা বাসনা, ইচ্ছা অনিচ্ছাসঞ্জাত যে আবেগ জমা হয়ে আছে তা যে-কোনো প্রকারে প্রকাশের পথ পেলে রোগী আবার রোগপূর্ব স্বাভাবিক ভারসাম্য ফিরে পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেগ বিমোক্ষণের এ পদ্ধতি রোগীর মনকে হালকা করে তার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যক্তির ভারসাম্য বিনষ্টির কারণ ব্যক্তির নিজের মধ্যে তত নয় যত তার পরিবেশ ও সমাজের মধ্যে। রোগীকে সমাজ-নিরপেক্ষ

বিবেচনা করে তার মনের আবেগ কথায় বা সীমাবদ্ধ আচরণে প্রকাশের সুযোগদান কোনো স্থায়ী ফল দিতে পারে না। এ কারণে বিমোক্ষণ আবেগ প্রকাশের একটি পদ্ধতি হলেও তা মনোবিকলনের ক্ষেত্রে নিরাময়ের কোনো নিশ্চিত উপায় হয়ে উঠে নি।

Catholicism : ক্যাথলিকবাদ

খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় প্রধান : ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়। মূল খ্রিষ্টান ধর্মের আচার, আচরণ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মত পার্থক্য থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ই গোড়াকার ধারা। প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে পরবর্তীকালে যোড়শ শতকে জার্মানির মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে। ক্যাথলিকবাদ খ্রিষ্টান ধর্মের গোঁড়া মতবাদ। ক্যাথলিকবাদের বিশ্বাস পবিত্র আত্মার উৎস কেবল ঈশ্বর নয়। তার উৎস যিশুখ্রিষ্ট বা ঈশ্বরের পুত্রও। পরলোকে পারগেটরী বা পাপীদের শোধনাগারও ক্যাথলিকদের বিশ্বাসের একটি অংশ। পোপ হচ্ছে ক্যাথলিক মতে সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু এবং তিনি যিশুখ্রিষ্টের পার্থিব প্রতিনিধি। পোপ দোষক্রটিশূন্য। ক্যাথলিকবাদে ধর্মযাজকদের জন্য বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন নিষিদ্ধ। রোমের ভ্যাটিকান হচ্ছে পোপের রাজধানী। ইউরোপে মধ্যযুগে পোপতন্ত্র কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, পার্থিব সম্পদ ও শক্তিরও এক বিপুল সাম্রাজ্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখনও পৃথিবীতে খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে ক্যাথলিকদের প্রভাব এবং সাংগঠনিক শক্তি প্রধান।

Causality : কার্য-কারণবাদ

দর্শন শাস্ত্রের একটি শব্দ। দুটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্ককে কার্যকারণ সম্পর্ক বলে অভিহিত করা হয়। দুটি ঘটনার যেটি পূর্বে সংঘটিত হয় তাকে কারণ এবং যেটি তার ফল হিসাবে পরে সংঘটিত হয় তাকে কার্য বলে। কার্য-কারণ সম্পর্ক দুটি ঘটনা বা বস্তুর সম্পর্ক হলেও কার্য ও কারণ হিসাবে দুটি ঘটনা বিশ্বের অপরাপর ঘটনা থেকে বিযুক্তভাবে সংঘটিত হয় না। উপলব্ধির সুবিধার জন্য আমরা দুটি ঘটনাকে অপরাপর ঘটনা থেকে বিযুক্তভাবে ভাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আসলে যে ঘটনাকে কার্য বলে অভিহিত করা হচ্ছে সে একই সময়ে অপর ঘটনার কারণ এবং যাকে কারণ বলে অভিহিত করা হচ্ছে সে অপর ঘটনার কার্য বা ফল হিসাবে সংঘটিত হচ্ছে। বস্তুর সমগ্র বিশ্বচরাচর কার্য কারণের সামগ্রিকসূত্রে আবদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ হিসাবে হিটলারের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সে হিটলার জার্মানির তৎকালীন অর্থনৈতিক-সামাজিক রাষ্ট্রীয় অবস্থারই কার্য বা ফল। আবার বিংশ শতকের ধনতন্ত্রবাদী দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণেই জার্মানির সেই সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় অবস্থার সৃষ্টি। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ কেবল হিটলার নয়। একটি কার্যের সামগ্রিক কারণ তাই একটি নির্দিষ্ট কারণের চেয়ে বৃহত্তর। কোনো ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ তার সামগ্রিক কারণের ভিত্তিতেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে সামগ্রিক কারণ উপলব্ধি করে আমরা জীবন যাপন করি নে। একটি ঘটনার নির্দিষ্ট কারণকেই আমরা স্থির করার চেষ্টা করি।

ঘটনামাত্রেরই কারণ আছে কিংবা কারণমাত্রেরই ফলাফল আছে। কথাটা স্বতঃসিদ্ধ হলেও দর্শনে কার্যকারণের কথা একটি মৌলিক বিষয়। প্রাচীন ভারতের বৈশেষিক দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপের অজ্ঞেয়বাদী হিউমের দর্শনেও কার্যকারণের সমস্যা বিশেষ আলোচনার বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। অন্যান্য সমস্যার ন্যায় কার্যকারণের সমস্যার আলোচনারও দুটি ধারা দেখা যায়। একটি হচ্ছে ভাববাদী ধারা ; অপরটি বস্তুবাদী। ভাববাদী মতে ঘটনায়-ঘটনায় কিংবা বস্তুতে-বস্তুতে কার্যকারণের সম্পর্ক আমাদের মনের কল্পনার বিষয়। কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো বস্তু বা ঘটনা নয়। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্ক দৃশ্য নয়। আমরা বস্তুকে দেখি, কিন্তু বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ককে দেখি নে। আমরা আগুন দেখতে পারি। আমরা ধোঁয়া দেখতে পারি, কিন্তু আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে কার্য-কারণ রয়েছে বা আগুন ধোঁয়ার কারণ এবং ধোঁয়া আগুনের কার্য বা ফল এটা আমরা দেখতে পারি নে। হিউম এই যুক্তিতে কার্যকারণ সম্পর্কের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। দার্শনিক কাণ্ট একদিকে কার্য-কারণ সম্পর্কের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন, আবার অপরদিকে তাকে আমাদের জ্ঞানের অন্যতম অপরিহার্য সূত্র বা মাধ্যম বলে আখ্যাত করেছেন। তাঁর মতে অন্যান্য মূলসূত্রের ন্যায় কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণা আমাদের একটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব জন্মগত ধারণা। বস্তুবাদী দর্শন, বিশেষ আধুনিককালের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন, কার্যকারণ সম্পর্কের ভাববাদী ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে। এই মত অনুযায়ী মানুষের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হচ্ছে মানুষের সাথে বস্তুর সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভিজ্ঞতার নিয়ত বিকাশমান প্রক্রিয়া। বাস্তব ঘটনাকে মানুষ আদিকাল থেকে প্রত্যক্ষ করেছে। মানুষ হিসাবে এই অভিজ্ঞতার পথেই ঘটনার সম্পর্কের কার্যকারণরূপ সে উপলব্ধি করেছে এবং আবিষ্কার করেছে। কার্যকারণ যে, বস্তু জগতের প্রতিটি অণুর সঙ্গে অপর অণুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-বিশেষ, এ ধারণা মানুষ তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই লাভ করেছেন। কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো বস্তু নয়। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক মানুষের কল্পনাও নয়। বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা মানুষের কল্পনার বিষয় নয়। আর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক। একটি আলপিন আমার আঙুলে বিদ্ধ হয়েছে। এটি প্রত্যক্ষ ঘটনা। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে আঙুল থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে এবং আমি ব্যথা বোধ করছি। বিশ্বচরাচরের বস্তুজগতে বস্তুতে বস্তুতে কেনো ফাঁক বা শূন্যতা নেই। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সতত সম্পর্কে বস্তু-জগৎ আবদ্ধ এবং ক্রিয়াশীল।

Chaitanya : চৈতন্য (১৪৮৫-১৫২৭ অথবা ১৫৩৪ খ্রি.)

বৈষ্ণব ধর্মের চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বাংলাদেশ শ্রী চৈতন্য বা চৈতন্যদেব বলে সুপরিচিত। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলায় ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। কিশোর বয়সেই চৈতন্যদেব সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু ধর্মের গীতা এবং ভাবগত পুরাণে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। গীতায় কৃষ্ণ বা ঈশ্বরের উপর ভক্তি স্থাপনকে মানুষের মুক্তির প্রকৃষ্টতম উপায় হিসাবে বলা হয়েছে। চৈতন্যদেব গীতার এই ভক্তিতত্ত্বে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

পঁচিশ বছর বয়সে শ্রী চৈতন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। এই পর্যায়ে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল প্রধান ধর্ম-কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরকে নিজের ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে নির্দিষ্ট করেন। চৈতন্যদেবের পরলোকগমন সম্পর্কে মতভেদ আছে। চৈতন্য সম্প্রদায় মনে করে, চৈতন্যদেব সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে তাঁর আরাধ্য কৃষ্ণকে রাধার সঙ্গে নৃত্যরত দেখেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকর্ষণে তিনি গভীর সমুদ্রে গিয়ে নিমজ্জিত হন। অপর অনেকের মত হচ্ছে শ্রী চৈতন্য ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

শ্রী চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মের মূল কথা হচ্ছে ভক্তিতেই মুক্তি, যুক্তি কিংবা কোনো আচার-আচরণ বা পূজায় নয়। ঈশ্বর করুণার আধার। শিশুতে, প্রেমাস্পদে এবং সর্বজীবে মায়া ও মমতারূপে তার প্রকাশ। মানুষে মানুষে জাতি বা বর্ণের কোনো পার্থক্য নাই। ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য প্রেমময়রূপে কল্পনা করতে হবে। তাকে প্রেমাস্পদের ন্যায় ভালবাসতে হবে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের উপাখ্যানে চৈতন্যদেব তার ধর্মীয়তত্ত্ব আরোপ করেন।

শ্রী চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। চৈতন্যদেব হিন্দু ধর্মেরই একজন ব্যাখ্যাতা। হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথা এবং ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম একদিন বিরাটভাবে প্রসার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রমপ্রথা এবং জন্মান্তরবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারে হিন্দুধর্ম অনেকটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। হিন্দুধর্মের মূল আচার সর্বস্বতাও অনেকের মনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে। শ্রী চৈতন্য হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে এই দ্বিবিধ আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পান। তাঁর মন্দিরে বংশ, বর্ণ বা জাতির কোনো ভেদাভেদ থাকবে না—এ-নীতি সমাজের নির্যাতিত মানুষের মনে প্রবল আবেগের সঞ্চার করে। ফলে চৈতন্যদেবের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যবাদ ভারতবর্ষে বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে বাংলাদেশে নির্যাতিত শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করে। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ প্রেমমূলক গীতিকবিতার সৃষ্টি করে। নতুন দৃষ্টিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে বাংলার কবিগণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করেন। চৈতন্য অনুসারীগণ চৈতন্যদেবকেও ঈশ্বররূপে কল্পনা করে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য তাঁর প্রশংসামূলক জীবনী রচনা করতে শুরু করেন। এর ফলে বাংলা কাব্য সাহিত্যে যে নতুন সৃষ্টির প্রাবল্য দেখা দেয়, তাকে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ চৈতন্যযুগ বলে আখ্যায়িত করেন।

শ্রী চৈতন্যের ধর্মতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্যটি এই যে, চৈতন্যের মতে ঈশ্বর এবং তার প্রকাশের মধ্যে একদিকে যেমন কোনো দ্বৈত ভাব নেই, তেমনি অপর দিকে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং ঈশ্বরও এক কথা নয়। প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম ঈশ্বর এবং তার প্রকাশকে দ্বৈতরূপে কল্পনা করেছে। এর উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণব ধর্মের দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চৈতন্য ঈশ্বর বা চরম সত্তার সঙ্গে তার প্রকাশের দ্বৈতরূপ বা বিরোধকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অপরদিকে তিনি মানুষ অর্থাৎ চরম সত্তার প্রকাশকে ভক্তির মাধ্যমে পরিণামে পরম সত্তার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব লোপ করে দেবার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হতে বলেছেন। একদিকে দ্বৈতভাবের অস্বীকার, অপরদিকে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা বলার জন্য শ্রী চৈতন্যের অভিমতকে অচিন্ত্য বা অভাবনীয় ভেদাভেদ বলে ভারতীয় দর্শনে আখ্যায়িত করা হয়। চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ এবং মুসলিম সুফী চিন্তাবিদদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ মিল দেখা যায়।

Chartism : চার্টিস্ট আন্দোলন, চার্টার বা অধিকার আন্দোলন (১৮৩৮-১৮৪৮)

উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের গণঅধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক একটি আন্দোলনের নাম 'চার্টিস্ট আন্দোলন' বা চার্টার আন্দোলন। রাজনৈতিক অধিকারসহ ১৮৩৮ এর গণঅধিকার অর্জন এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। জনসাধারণের দাবির অন্যতম ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টের নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান, ব্যালটের মাধ্যমে ভোটপ্রদান, পার্লামেন্টের সদস্যদের ভাতা দান, নির্বাচনী এলাকাগুলির সম আকার, পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য বিশেষ পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি থাকার শর্ত বিলোপ। এই সমস্ত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের নেতারা ১৮৩৯ সনে একটি জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করেন। এবং সে কনভেনশনে পার্লামেন্টে গণসহিসহ গণদরখাস্ত পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণসহি সংগ্রহ করে সেই গণসহির স্তূপ বহন করে পার্লামেন্টে নিয়ে আসার চেষ্টায় পুলিশ বাধা দিলে জনসাধারণের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। বার্মিংহামে এরূপ সংঘর্ষে ২৪ জন চার্টিস্ট বা চার্টার আন্দোলনের কর্মী নিহত হয়। এই গণ আন্দোলন ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকে। ১৮৩৯, ১৮৪২ এবং ১৮৪৮ : তিন দফায় গণসহিসহ গণদরখাস্ত পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। প্রতিবারই পূর্বের চেয়ে অধিকতর সংখ্যক সহি সংগৃহীত হতে থাকে। প্রথমে ১২ লক্ষ, দ্বিতীয় বারে ৩৩ লক্ষ এবং তৃতীয়বারে প্রায় ৫০ লক্ষ সহি সংগৃহীত হয়। এই সহির বোঝা এত বিরাট আকার এবং ভারী হয় যে ১৮৪২ সালে এই সহির বোঝা একটা বিরাট পাত্রে স্থাপন করে বিশজন আন্দোলনকারীকে বহন করতে হয়।

বস্তুত এত বিপুল আকারে সহি সংগ্রহ করার ঘটনা ইতিহাসে ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটে নি। সহি সংগ্রহ উপলক্ষে আন্দোলনকারীগণ সমাজের সমস্যাসমূহ নিয়ে যে সভা, আলোচনা ইত্যাদি সংগঠিত করে তাতে শ্রমিকসহ সমাজের নিচের তলার ব্যাপকতর মানুষ আলোড়িত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষের মিছিলে নগরের পর নগরের শান্ত রাস্তা মুখর হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন শ্রমিকদের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে একটি অভূতপূর্ব উপলব্ধির সৃষ্টি হয়। ১৮৪০ সনে চার্টিস্টরা একটি ঐক্যবদ্ধ চার্টিস্ট পার্টি তথা একটি শ্রমিক পার্টি গঠন করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। চার্টিস্ট আন্দোলন পুঁজিবাদী শাসনের সে যুগের ক্ষমতা ও অবস্থার পটভূমিতে বাহ্যত ব্যর্থ হলেও শ্রমজীবী মানুষের চেতনা সঞ্চারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এ কারণে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইংল্যাণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন।

Charvaka : চার্বাক

ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী মতবাদ চার্বাকবাদ বলে পরিচিত। বস্তুবাদী দর্শনকে লোকায়ত দর্শনও বলা হয়। ভারতীয় দর্শনকে সাধারণত ভাববাদী বলে মনে করা হয়। কিন্তু গ্রিক দর্শনের ন্যায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসেও অতি প্রাচীনকাল থেকে বস্তুবাদী দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঋগবেদে বৃহস্পতির যে মতের উল্লেখ দেখা যায় সে মতকে ভারতীয় দর্শনের আদি বস্তুবাদী মত বলা যায়। বস্তুই হচ্ছে চরম সত্তা—ঋগবেদে বৃহস্পতির এরূপ

অভিমতের উল্লেখ আছে। বৃহস্পতির এই বস্তুবাদী অভিমতের অনুসরণ করে চার্বাকবাদের উৎপত্তি ঘটে। মহাকাব্য রামায়ণে ঋষি জাবালীর উক্তির মধ্যেও বস্তুবাদী ভাব পাওয়া যায়।

চার্বাকবাদী দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্ব। তাদের মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে কোনো জ্ঞানই সংশয়মুক্ত হতে পারে না। চার্বাক দর্শনে গোড়ার দিকে ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম মনে করা হত। এ কারণে চার্বাক দর্শনে প্রথমে অনুমানকে জ্ঞানের উপায় হিসাবে স্বীকার করা হয় নি। প্রত্যক্ষভাবে মানুষ কেবল বিশেষকেই জানতে পারে, নির্বিশেষকে নয়। এ জন্য যে জ্ঞান বিশেষের নয়, নির্বিশেষের সে জ্ঞানের কেনো নিশ্চয়তা নেই। অনুমান হচ্ছে নির্বিশেষের জ্ঞান। কিন্তু অনুমানকে অস্বীকার করলে আমাদের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই উপলব্ধি থেকে পরবর্তীযুগের চার্বাকবাদীগণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অনুমানকেও জ্ঞানের একটি মাধ্যম বলে স্বীকার করেছেন। অনুমানের অস্বীকৃতির ভিত্তিতে আদি চার্বাকবাদীগণ কার্যকারণের জ্ঞানকেও অগ্রাহ্য করেন। মানুষ ঘটনাকেই শুধু প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাদের মধ্যকার সম্বন্ধকে সে প্রত্যক্ষ করতে 'পারে না। ঘটনায় ঘটনায় কোনো প্রত্যক্ষ যোগ সম্পর্ক নেই। মানুষ বলে, আগুনের কারণে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। চার্বাক দর্শনের মতে আগুন এবং ধোঁয়া দুটি ঘটনা। মানুষ এই ঘটনা দুটিকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ককে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কাজেই একটি অপরটির কারণ কিংবা ফল একথা বলার উপায় নেই। চার্বাকবাদীদের এই মতের সঙ্গে ইউরোপীয় অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক হিউমের কার্যকারণতত্ত্বের মিল দেখা যায়। চার্বাকবাদীগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ অর্থাৎ মাটি, পানি, আগুন এবং বায়ু এই চাররকম বস্তুকে সমস্ত সৃষ্টির মূল বলে স্বীকার করেন। বস্তু থেকেই জীবনের সৃষ্টি। চেতনার কোনো দেহাতীত অস্তিত্ব নেই। মনুষ্য দেহ এবং তার চেতনা হচ্ছে মূল-সত্তা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের যৌগিক মিশ্রণের ফল। মন বা আত্মারও কোনো দেহাতীত অস্তিত্ব নেই। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে চেতনা বা আত্মারও মৃত্যু ঘটে। জীবন্ত দেহ মৃত হয়ে পরিশেষে তার মূল বস্তুতে পরিণত হয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আত্মার পুনর্জন্মকে সর্বকালের চার্বাকবাদীগণই অস্বীকার করেছেন। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে মূল পদার্থের আকস্মিক সংমিশ্রণে, কোনো অতি প্রাকৃতিক স্রষ্টার কারণে নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে মানুষ তার জ্ঞান লাভ করতে পারত। কিন্তু অনুমানের বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানুষের নেই। ভারতীয় দর্শনের ভাববাদ যেখানে জগৎকে মায়া এবং দুঃখপূর্ণ বলে অভিহিত করেছে চার্বাকবাদীগণ সেখানে জগৎ এবং জীবনকে আশাবাদের দৃষ্টিতে দেখেছেন। চার্বাকবাদীদের মতে জগৎ কেবল দুঃখপূর্ণ নয়। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সুখলাভ। সুখই হচ্ছে যথার্থ উত্তম। চার্বাকবাদীদের সুখলাভের তত্ত্বকে ভাববাদীগণ বিকৃত করে তাকে কেবলমাত্র স্থূল এবং অবিমিশ্র সুখের তত্ত্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'ঋণং কৃত্য ঘৃতং পিবেৎ' প্রবচনকে বিকৃতভাবে চার্বাকবাদীদের জীবনদর্শন বলে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু চার্বাকবাদীগণ অবিমিশ্র সুখের কল্পনাকে অসার বলেছেন। 'ঋণ করেও ঘৃত' খাবার নীতি দ্বারা চার্বাকগণ জীবনে দুঃখকে বড় না করে দুঃখের মধ্যেও জীবনকে আনন্দময় ভাবার চেষ্টা করতে বলেছেন। চার্বাকবাদীগণ সামাজিক শ্রেণীভেদকেও অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ কিংবা চণ্ডাল সকলের দেহের রক্তের রঙই লাল, এরূপ দ্বিধাহীন সাম্যমূলক উক্তি চার্বাকবাদীগণ করেছেন। বস্তুত ভারতীয় দর্শনে

চার্বাকবাদ কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির দর্শন নয়। প্রতি যুগের কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার প্রতিবাদই চার্বাকবাদ। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন যুগে ভাববাদী চিন্তা ধারাই প্রাধ্যান্য লাভ করেছে। প্রধান সেই ভাবধারা চার্বাকবাদী বা লোকায়ত চিন্তাধারাকে তার প্রতিপক্ষ মনে করে তাকে বিকৃত এবং নিষিদ্ধ করেছেন। চার্বাকবাদ কোনো প্রখ্যাত দার্শনিকের দর্শন হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ভাববাদী ধারার আক্রমণের ভিতরে তার অস্তিত্বের প্রমাণ স্পষ্ট।

Chinese Philosophy : চীনা দর্শন

চীনের দর্শনের ইতিহাস ভারত ও গ্রিক দর্শনের ন্যায়ই সুপ্রাচীন। খ্রিষ্টাব্দের হাজার বছর পূর্বেও চীনে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের দার্শনিক আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সময়ে চীনের দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল বস্তুবাদী। কিছু সংখ্যক দার্শনিক সূত্র এই সময়ে প্রচলিত ছিল। এই দার্শনিক সূত্রগুলির বক্তব্য ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির মূলে রয়েছে পঞ্চশক্তি যথা—পানি, আগুন, কাঠ, ধাতু এবং মাটি। সমস্ত সৃষ্টি এই পঞ্চশক্তির সম্মেলনেরই ফল। পরবর্তীকালে ইকিং বা পরিবর্তনের গ্রন্থে এই সূত্রগুলি গ্রথিত হয়। ইকিং-এ বিশ্বপ্রকৃতির মূল হিসাবে পাঁচটির বদলে আটটি বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়। ইকিং-এর বাইরে ইন এবং ইয়াং বলে আরও দুটি সূত্রের কথাও জানা যায়। ইন-এর অর্থ হচ্ছে স্থিতি এবং ইয়াং-এর অর্থ গতি। এদেরকে অনেক সময় যথাক্রমে প্রকৃতির অন্ধকার এবং আলো ; অস্তি এবং নাস্তি ; পুরুষ এবং স্ত্রী হিসাবে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। খ্রিষ্টাব্দ শুরু হওয়ার পূর্বে পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন চীনা দর্শন অধিকতর সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। এই সময়ে চীনা দর্শনের বিভিন্ন প্রাচীন মতবাদ বা শাখা বিকাশ লাভ করে। এদের মধ্যে তাও দর্শন এবং মোতিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাওজু এবং চুংজুকে তাও দর্শনের প্রধান ব্যাখ্যাতা বলা হয়। এঁরা বস্তুর অস্তিত্ব এবং চরিত্র ইত্যাকার দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করেন। অপরদিকে দার্শনিক মোতি এবং তাঁর অনুসারীগণ জ্ঞানের সমস্যা মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। এ আলোচনায় ভাববাদী ব্যাখ্যারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কুংসুঙলুন নামক দার্শনিক ভাবকে বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বস্তুনিরপেক্ষ ভাবের মিল দেখা যায়। নীতিগত এবং রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে কনফুসিয়াস এবং মেঙজুর মতের প্রসার ঘটে। প্রাচীন চীনা দর্শনের এ যুগকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই যুগের দার্শনিক আলোচনার বিষয় ছিল প্রধানত আকাশ 'মনের ভাব', ধর্মশক্তি, চরিত্র, বস্তুর মৌলিক গুণ ইত্যাদি। কনফুসিয়াস ও মেঙজুর মতামতের বৈশিষ্ট্য ছিল, একজন যেখানে মানুষকে স্বভাবগতভাবে ভালো মনে করেছেন, অপরজন সেখানে মানুষকে স্বভাবগতভাবে খারাপ মনে করেছেন। খ্রিষ্টাব্দের প্রথম শতকে চীনা দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব অধিকতর স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চীন ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্মের প্রসারও এই যুগে ঘটতে থাকে। কনফুসিয়াসবাদ এবং তাওবাদের সঙ্গে বৌদ্ধবাদ একটি তৃতীয় দার্শনিক মত হিসাবে অনুসৃত হতে শুরু করে। বৌদ্ধবাদীগণ জগৎকে মায়া বলে ব্যাখ্যা করেন। কনফুসিয়াস ও তাওবাদ ভাববাদী দর্শনের উদ্‌গাতা। কিন্তু কেবল ভাববাদী দর্শনই নয়—এই যুগের বিখ্যাত দার্শনিক হো

চেন তিয়েন এবং ফানচেন জগৎ, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, আত্মার অমরতা ইত্যাদি প্রশ্নে বস্তুবাদী মত প্রচার করেন। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকে চীনের সমাজ জীবনের পরিবর্তন তার ভাবাদর্শেও প্রকাশ পেতে শুরু করে। ভাব এবং বস্তুর প্রকৃতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনফুসিয়াস ও বুদ্ধের মতবাদের স্থানে নবকনফুসিয়াসবাদের উদ্ভব ঘটে এই সময়ে। এই যুগের অন্যতম দার্শনিক চুশী 'লী' এবং 'চী' অর্থাৎ ভাব এবং বস্তুর মধ্যে ভাবকে প্রধান বলে গণ্য করে ভাববাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। চীনের আধুনিক পর্বের শুরু হিসাবে আফিং যুদ্ধের বৎসর অর্থাৎ ১৮৪০ সালকে উল্লেখ করা যায়। এই সময় থেকে চীনের সমাজ জীবনে নতুন আলোড়ন ও পরিবর্তনের ধারা বইতে শুরু করে। একদিকে বৈদেশিক শক্তি চীনকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করার চেষ্টা করে। চীনের সঙ্গে আধুনিক জগতের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটতে শুরু করে। আবার অপরদিকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধাত্মক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হতে আরম্ভ করে। চীন ক্রমান্বয়ে আধা উপনিবেশে পরিণত হয়। কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ নতুন সংগ্রামী বস্তুবাদী চিন্তাধারারও পথ প্রশস্ত করে দেয়। তাণসেতুঙ এবং সানইয়াত সেনের ন্যায় অগ্রসরবাদী চিন্তাবিদ এবং নেতৃবৃন্দ প্রাচীন বস্তুবাদের ঐতিহ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচার এবং প্রয়োগ করতে শুরু করেন।

Christianity : খ্রিষ্টধর্ম

পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান ধর্মসমূহের একটি হচ্ছে খ্রিষ্টধর্ম। যিশু খ্রিস্টের উপদেশ এবং তাঁর মূল অনুসারীদের নতুন গ্রন্থ বা নিউটেস্টামেন্টে রক্ষিত কাহিনী ও কথামৃত হচ্ছে খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি।

খ্রিষ্টান ধর্মের উদ্ভব ঘটে পূর্ব রোমান-সাম্রাজ্যে নির্যাতিত দাস এবং দরিদ্র মানুষের মধ্যে। রোমান সম্রাটদের দ্বারা দাসদের বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হওয়ায় দাস এবং দরিদ্রের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়। কিন্তু হতাশার মধ্যে তারা এই বিশ্বাসও পোষণ করতে থাকে, কোনো এক উদ্ধারকারী মর্তে আগমন করে সকল অত্যাচার থেকে তাদের মুক্ত করবে। এমন পরিস্থিতিতে যিশু অত্যাচারিত মানুষের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হন বলে এই ধর্মের অনুসারীগণ বিশ্বাস পোষণ করেন। এরূপ কাহিনী আছে যে, জুডিয়ার রোমান শাসক পন্টিয়াস পাইলেট ক্রুশে বিদ্ধ করে যিশুকে হত্যা করে। কিন্তু যিশু মৃত্যুর পরে পুনরায় সশরীরে পুনরুত্থিত হন এবং স্বর্গে আরোহণ করেন। নির্যাতিতের কাছে অপর ধর্মসমূহের ন্যায় খ্রিষ্ট ধর্মেরও এই আশ্বাস যে, যারা সততার সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ভোগ করেও জীবনযাপন করবে স্বর্গে তাদের সুখ লাভ হবে। অপরাপর অনেক ধর্মের ন্যায় খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যেও অনুসারীদের জাতি, অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতির ভিত্তিতে মতামতের পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। এর ফলে কালক্রমে খ্রিষ্টান ধর্ম তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্যাথলিক ধর্ম, পূর্বাঞ্চলের মৌলবাদী খ্রিষ্টান ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ষোড়শ শতকে ইউরোপে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। (দ্র. প্রটেস্ট্যান্টবাদ ও মার্টিন লুথার)

Cicero : সিসেরো (খ্রি. পূ. ১০৬-৪৩)

প্রাচীন রোমের বাগ্মী, দার্শনিক এবং রাজনীতিক। প্লেটো যেরূপ সংলাপের আকারে রচিত গ্রন্থে তার দর্শনকে প্রকাশ করেছিলেন, সিসেরোও তেমন পদ্ধতিতে তাঁর দর্শন লিপিবদ্ধ করেন। সিসেরোর দর্শন প্রধানত সমন্বয়বাদী। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সিসেরোকে সন্দেহবাদের সমর্থক বলা যায়। তাঁর মতে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। রাজনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সিসেরোর এই শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রী, অভিজাততন্ত্রী এবং গণতন্ত্রী বৈশিষ্ট্যকে সম্মিলিত করা উত্তম বলে মনে করতেন। প্রাচীন রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এরূপ সম্মিলিত ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচীন রোমে, সিসেরোর জীবনকালে বিভিন্ন রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের বিরোধ, লড়াই এবং পারস্পরিক হত্যা রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। খ্রি. পূ. ৪৯-এ জুলিয়াস সিজারের হত্যার পরে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তাতে খ্রি. পূ. ৪৩ সনে সিসেরো ক্ষিপ্ত জনতার হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

Class : শ্রেণী

Class Struggle : শ্রেণী সংগ্রাম

কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণের ভিত্তিতে যে-কোনো সমষ্টিকে শ্রেণী বলে অভিহিত করা চলে। 'শ্রেণী' শব্দটি তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের বাইরে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। যুক্তিবিদ্যায় কোনো জাতিবাচক পদকে শ্রেণী বলা হয়। 'মানুষ', 'পশু', 'বাঙালি', 'হিন্দু', 'মুসলমান'—ইত্যাদি পদ শ্রেণীবাচক পদ। কোনো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তি বা উপাদানের উপর প্রযোজ্য নাম। মার্কসীয় তত্ত্বে 'শ্রেণী' শব্দের প্রধান ব্যবহার অর্থনৈতিক ব্যবহার। জীবন ধারণের সম্পদের মালিকানা এবং অ-মালিকানার ভিত্তিতে কোনো সমাজের মানুষকে চিহ্নিত করার তত্ত্ব। মার্কসবাদের মতে মনুষ্যসমাজের আদিতে সামাজিক সম্পদের কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। সে হিসাবে সেই আদি কালের মনুষ্যসমাজ শ্রেণীহীন ছিল বলে অনুমান করা চলে। জীবন যাপনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যখন সমাজের কোনো অংশের পক্ষে সম্ভব হয়, তখনই সমাজে এরূপ অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এবং তারপর থেকে সমাজ বিকাশের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে সম্পদের এরূপ মালিকশ্রেণী এবং সম্পদের মালিকানাবিহীন সম্পদহীন শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম কাজ করে আসছে বলে মার্কসবাদ মনে করে। এ হিসাবে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্ তাঁদের বিখ্যাত 'কমিউনিষ্ট ইশতেহারে' উল্লেখ করেন যে, 'মানবজাতির জ্ঞাত ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।' অবশ্য মার্কসবাদের অপর এক তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, মানুষের সমাজের বিকাশের পরিণতিতে ভবিষ্যতে সমগ্র সামাজিক সম্পদের উপর মানুষের সামাজিক মালিকানা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এরূপ বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক শ্রেণীর আর অস্তিত্ব থাকবে না।

Cognition : জ্ঞান প্রক্রিয়া

'আমাদের জ্ঞান আছে, আমরা জ্ঞান আহরণ করি' ইত্যাদি কথা আমরা সব সময়ই ব্যবহার করি। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ আদিকাল থেকে নিজের জীবন রক্ষা করে এসেছে, প্রকৃতিকে সে জয় করে চলেছে এবং মানুষের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। জ্ঞান বাদে মানুষ নাই। কিন্তু মানুষ কি করে জ্ঞানলাভ করে একটি দর্শনের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। জ্ঞানের সমস্যার ক্ষেত্রে ভাববাদী দার্শনিক জর্জ বার্কলের মত খুব পরিচিত। তিনি এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যদিচ মানুষ বস্তু জগৎকে জানে বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়, তবু যুক্তিগতভাবে মানুষ বস্তুকে আদৌ জানতে পারে না। মানুষ কেবল তার মনের ভাবকেই জানে। বস্তু কথাটিও মানুষের মনের ভাব। বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের মন জানতে পারে না। মানুষের জ্ঞান কতকগুলি প্রধান এবং অপ্রধান ধারণা দ্বারা গঠিত। প্রধান বা মৌল ধারণাগুলি বিশ্বচরাচরের বিধাতা মানুষের মনে সৃষ্টি করে দেন। সেগুলির ভিত্তিতেই মানুষ তার জ্ঞানের জগৎ তৈরি করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জ্ঞানপ্রক্রিয়ার এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করে। এই মতানুযায়ী মানুষের জ্ঞান হচ্ছে বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ামূলক সম্পর্কের ফল। মানুষ তার জন্ম থেকে জৈবিক তাড়নাতেই বাইরের বস্তুকে নিজের জীবনের স্বার্থে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে আসছে। বস্তুকে সে নিজের হাতে-পায়ে চোখে-কানে অনুভব করছে। এই প্রক্রিয়ায় বস্তু মানুষের দেহে এবং মস্তিষ্কের কোষে বিভিন্ন সাড়ার সৃষ্টি করেছে। এই মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক বিকাশলাভ করেছে। মানুষের মধ্যে বস্তু সম্পর্ক অনুধাবনের, বস্তুর উপর গুণ আরোপ করার এবং গুণের সাহায্যে বস্তুকে স্মরণ রাখার শক্তি জন্মেছে। বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের এই জটিল সম্পর্কই যেমন জ্ঞানের প্রক্রিয়া তেমনি এই প্রক্রিয়া থেকেই মানুষের জ্ঞানের সৃষ্টি। জ্ঞান বিধিদত্ত কোনো সম্পদ নয়। জ্ঞানকে মানুষই সৃষ্টি করেছে এবং করছে। বস্তু-বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান এবং জগৎ বলে কিছু নেই। মানুষের জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। বাস্তবকে জেনে জীবন রক্ষার স্বার্থে তাকে ব্যবহার করা, পরিবর্তন করা। জ্ঞান কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ বিষয় নয়। জ্ঞানের প্রশ্নের মানুষের সঙ্গে তার বাস্তব জগতের সক্রিয় সম্পর্ক সর্বদাই জড়িত। মানুষের বাস্তব জগৎ আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কাঠামো হিসাবে সংঘটিত। মানুষের জ্ঞানও তাই তার আর্থিক সামাজিক অবস্থার দ্বারা একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রিত অপরদিকে তেমনি মানুষের জ্ঞান দ্বারা বিশেষ পর্যায়ের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো নিজেও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবহার বাদে জ্ঞান অর্থহীন। মানুষ সতত যেমন তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করছে তেমনি নিয়ত সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা তার পরিবেশকে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছে।

Coherence : সামঞ্জস্য, সামঞ্জস্যবাদ

দর্শনে সত্যের মাপকাঠি নিয়ে তর্ক আছে। একটা কথা বা বক্তব্য সত্য—এরূপ দাবির অর্থ কি? কেউ যদি বলে, সে ভূত দেখেছে তা হলে তার সে কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করি। কিন্তু 'ওখানে একটি চেয়ার আছে' এ কথাকে আমরা সত্য বলি। কিসের ভিত্তিতে একটি বাক্য বা বক্তব্যকে সত্য বলা হবে? সত্যের মাপকাঠির এই প্রশ্নে দর্শনে দুটি প্রধান তত্ত্বের

সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে 'থিওরি অব করেসপণ্ডেন্স'। একে বাংলায় সাদৃশ্যের তত্ত্ব বলা যায়। অপররি হচ্ছে থিওরি অব কোহারেন্স। একে সামঞ্জস্যের তত্ত্ব বলা যায়। সাদৃশ্যের তত্ত্বের দাবি হচ্ছে যে, কোনো বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তব জগতে যদি কোনো অস্তিত্ব থাকে তবে সে বক্তব্যকে সত্য বলা হবে। 'ওখানে একটি চেয়ার আছে' এই বক্তব্য অনুযায়ী চেয়ার কথার সদৃশ কোনো বস্তুর যদি অস্তিত্ব বক্তব্যের মুহূর্তে থাকে তবে ওখানে একটি চেয়ার আছে কথাটি সত্য হবে।

সামঞ্জস্যবাদ ভিন্নতরভাবে সত্য নিরূপণ করতে চায়। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাদের মতে একটি বক্তব্যের বরাবর বাস্তব অস্তিত্ব সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। বিশ্লিষ্ট বা এ্যাবস্ট্রাক্ট বক্তব্যের বরাবর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আমরা পাইনে। দয়া একটি মহৎ গুণ। কিন্তু দয়ার অস্তিত্ব কোথায়? দয়ালু মানুষ আছে বটে। কিন্তু মানুষ নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পন্ন দয়াকে আমরা দেখতে পাইনে। কাজেই সাদৃশ্যের তত্ত্ব সমস্ত সত্যের ব্যাখ্যা করতে পারে না। সামঞ্জস্যবাদ অনুযায়ী সত্যের জগৎ হচ্ছে একটা সামগ্রিক সত্তা। তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সত্যই পরস্পর যৌক্তিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাই আমরা যখন কোনো কথা উচ্চারণ করি বা অভিমত পেশ করি তখন তার যথার্থতার বা সত্যের নিরূপণ হবে সত্যের সমগ্র সত্তার সঙ্গে সে সঙ্গতিময় কিংবা সঙ্গতিময় নয় তার বিচারে।

Comte, Auguste : অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রি.)

'পজিটিভিজম' বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁতের দর্শন এবং তাঁর রচনাবলীর দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে তাঁর যুগ পর্যন্ত জ্ঞানের সমগ্র বিকাশের একটা ইতিহাস তৈরির চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টায় ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করেন সে ব্যাখ্যাকে পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদ বলে তিনি আখ্যাত করেন। অগাস্ট কোঁতে জ্ঞানের বিকাশে তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের বিকাশের আদিযুগ হচ্ছে ধর্মীয় যুগ। এই যুগে রহস্যের ব্যাখ্যায় মানুষ অতি-প্রাকৃতিক শক্তি বা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জ্ঞানের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে দার্শনিক যুগ। এ যুগে দার্শনিক চরম কারণ বা চরম সত্তার অস্তিত্বের ভিত্তিতে মানুষ ও জগতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এটাকে কোঁতে ধর্মীয় যুগেরই প্রকারভেদ বলেছেন। জ্ঞানের তৃতীয় বা শেষ যুগ হচ্ছে পজিটিভিজম বা দৃষ্ট প্রকৃতির যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃষ্ট প্রকৃতিকে মানুষ চরম বলে স্বীকার করেছে। এ যুগে এসে মানুষ উপলব্ধি করেছে যে, প্রকৃতির বাইরে ঈশ্বর বা চরম সত্তার অনুসন্ধান নিরর্থক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা দৃষ্ট প্রকৃতিকে অতিক্রম করে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। দৃষ্ট প্রকৃতিই হচ্ছে চরমসত্তা। কাজেই বিজ্ঞান বা জ্ঞানপ্রক্রিয়ার কর্তব্য হচ্ছে বাস্তব জগতের দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা দান ; অভিজ্ঞতার গভীরে অপর কোনো সত্তার অনুসন্ধান করা নয়। জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস রচনার যে বিরাট চেষ্টা কোঁতে করেছেন সে চেষ্টায় তাঁকে আধুনিক ইতিহাসকারদের পথিকৃৎ বলা চলে। ধর্ম কিংবা দার্শনিক চরমসত্তার স্থানে প্রকৃতির প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টায়ও তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু মানুষের স্থান কেবল তার দৃষ্ট বস্তুপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—দৃষ্টের ভিত্তিতে অ-দৃষ্ট কোনো কিছু

সম্পর্কে অনুমানের ক্ষমতা মানুষের নাই, এ মত ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীত সীমান্তের আর এর চরম মত। এর ফলে অগাস্ট কোঁতের পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদকে চরম অভিজ্ঞতাবাদ বা ভাববাদের একটি প্রকারবিশেষ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক কোনো দর্শন বলে গ্রহণ করা চলে না।

Communist Manifesto : কমিউনিস্ট ইশতেহার

মার্কস এবং এঙ্গেলস রচিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেসটো' বা ম্যানিফেস্টো অব দি কমিউনিস্ট পার্টি ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনে নির্বাসিত সাম্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী 'লীগ অব কমিউনিস্টস' বা সাম্যবাদী সমিতি মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর উপর তাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করে একটি ইশতেহার রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে। এই দায়িত্ব হিসাবে আজীবন পরস্পরের সঙ্গী মার্কস এবং এঙ্গেলস ক্ষুদ্রাকারের হলেও অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং ব্যাখ্যামূলকভাবে এই ইশতেহারটি রচনা করেন। কালক্রমে এই ইশতেহার শ্রমিকশ্রেণীর সাম্যবাদী বিপ্লবী বিশ্বাসের অন্যতম মৌলিক দলিল হিসাবে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অনূদিত হয়েছে। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের পূর্বকার কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী চিন্তাবিদ যথা—সেন্ট সাইমন, ফৌরিয়ার প্রভৃতির ব্যাখ্যা থেকে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য 'কমিউনিস্ট' শব্দের ব্যবহার করেন। ইশতেহারের শীর্ষে তাঁরা 'দুনিয়ার সকল দেশের শ্রমিক এক হও' এই আহ্বান ঘোষণা করেন।

১. বুর্জোয়া এবং প্রলেটরিয়ানস বা সর্বহারা,
২. সর্বহারা এবং কমিউনিস্টগণ,
৩. সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য, এবং
৪. বিদ্যমান বিভিন্ন বিরোধীদলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক,

এরূপ চারটি প্রধান শিরোনামে মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের সাম্যবাদ দর্শন ব্যাখ্যা করেন। শ্রমিকশ্রেণীর সাম্যবাদী দলগুলিকে বিভিন্ন দেশে বেআইনী অবস্থায় গুপ্তভাবে তাদের আন্দোলনকে পরিচালনা করতে হত। ১৮৭২ সনে এর একটি জার্মান সংস্করণ এবং ১৮৮২ সনে রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সনে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সংস্করণ। মার্কস জীবিত থাকাকালে এসব সংস্করণের ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা তাঁদের উভয় দ্বারা যুক্তভাবে রচিত হয়। মার্কসের মৃত্যুর পরে ১৮৮৮ সনের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকার একস্থানে এঙ্গেলস লিখেছিলেন "যদিও এই ম্যানিফেস্টো আমাদের যৌথ রচনা, তবুও আমার একথা বলা আবশ্যক যে, এই ইশতেহারের মূল যে বক্তব্য তা মার্কসেরই চিন্তাপ্রসূত। এবং এই মূল বক্তব্য হচ্ছে এই দর্শন যে, ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং বিনিময়ের প্রধান যে ব্যবস্থা তার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সে যুগের রাজনৈতিক এবং বুদ্ধি বা ভাবগত ইতিহাস। এই মূল ভিত্তি দ্বারাই মাত্র এদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ফলত মানব জীবনের আদি গোষ্ঠীসমূহের জমির উপর যৌথ মালিকানার পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে শোষক এবং শোষিতের মধ্যকার শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এবং এই ইতিহাস এখন বিকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজ এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যেখানে আজকের যুগের শোষিত এবং নির্যাতিত প্রধান শ্রেণী তথা প্রলেটারিয়েট শ্রেণী তার শোষক এবং শাসক

বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য থেকে নিজের মুক্তি সমগ্র সমাজের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রেণী শোষণের বিলোপ সর্বকালের জন্য সাধন করা ব্যতীত অর্জন করতে পারে না।"

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভাষা যেমন সুনির্দিষ্ট তেমনি তার মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীর ভবিষ্যৎ অনিবার্য বিজয়ের আবেগময় বিশ্বাসের প্রকাশও সুস্পষ্ট। মানুষের সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়সমূহের উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ এবং সাম্যবাদী কর্মীদের করণীয়ের নির্দেশের পরিশেষে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর অন্তিম অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে রচনা করা হয়েছে; 'কমিউনিস্টরা নিজেদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে গোপন করতে ঘৃণা বোধ করে। একথা তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছে যে, তাদের লক্ষ্য কেবল বিদ্যমান সকল সামাজিক অবস্থার জোরপূর্বক উৎসাদনের মাধ্যমেই সম্ভব। শাসক শ্রেণীগুলি কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে কম্পিত হোক। তাদের নিজেদের শৃঙ্খলকে হারানো ব্যতীত সর্বহারার হারাবার কিছু নেই। তাদের লাভ করার আছে সমগ্র পৃথিবী। সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হও।"

Communism, Primitive : আদিম সাম্যবাদ

সমাজতাত্ত্বিক গবেষক, বিশেষ করে মার্কসবাদীদের মতে মানুষের প্রাথমিক সামাজিক সংগঠনের রূপ ছিল যৌথ এবং সাম্যবাদী। জীবন রক্ষার জন্য উৎপাদনের উপায়গুলো তখনো খুবই অনুন্নত। শ্রমের বিভাগও বিকাশ লাভ করে নি। নারী-পুরুষের কাজের মধ্যেও তেমন পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। এই পর্যায়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক ছিল অপরিহার্যরূপে সামাজিক ও সমষ্টিগত। উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ সুচালো পাথর, বর্শা, বল্লম ইত্যাকার উৎপাদনী যন্ত্রগুলি ছিল গোত্র বা গোষ্ঠীর যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং তার ব্যবহার ছিল সমষ্টিগত। উৎপাদিত বা সংগৃহীত খাদ্য সম্পদের ভোগও ছিল সমষ্টিগত। অবশ্য এই সামগ্রিক যৌথ ব্যবস্থার মধ্যেও ব্যক্তিগত মালিকানা যে কিছুই ছিল না, এমন নয়। দেহাবরণ অবশ্যই ব্যক্তিগত ছিল। উৎপাদনী যন্ত্র যে আদৌ ব্যক্তিগত থাকতে পারতো না এমনও নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাস্তব পরিস্থিতি এমন ছিল যে, গোত্র বা গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ এবং যৌথ চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত ব্যক্তির পক্ষেও খাদ্য সংগ্রহ করে এবং বৈরী প্রকৃতি ও বন্যপশুর বা প্রতিদ্বন্দ্বী মানবগোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে জীবন রক্ষা সম্ভব ছিল না। এর পরে সামাজিক পরিশ্রমে বিভাগ শুরু হয়। পশুপালন এবং কৃষিকাজ দুটি আলাদা জীবিকার রূপ গ্রহণ করে। এই বিভাগের ভিত্তিতে সমাজের উৎপাদনী ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণের তারতম্যে দ্রব্যবিনিময় শুরু হয় এবং সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানাও সম্ভব হতে শুরু করে। কালক্রমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণের পার্থক্যে অসাম্য উদ্ভূত হতে থাকে। গোত্রে গোত্রে লড়াই বা যুদ্ধের পরিণামে পরাজিত গোত্রের মানুষ বিজয়ী গোত্রের দাস বলে গণ্য হয়ে উৎপাদনের এক অভাবিতপূর্ব উপায়রূপে বিজয়ী গোত্রের কাছে কিংবা বিজয়ী গোত্রের শক্তিমান ব্যক্তিদের কাছে দেখা দেয়। এবার সামগ্রিকভাবে সামাজিক কাঠামোতে সাম্যবাদ বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দাস এবং উৎপাদনের যন্ত্রাদির ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন বৃদ্ধির যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয় পূর্বকার যৌথ ব্যবস্থাপনার অবস্থিতি যে সম্ভাবনার বিকাশের

প্রতিশক্তি বা শৃঙ্খলরূপে কাজ করতে থাকে। হস্তশিল্প থেকে কৃষিকাজের পৃথকীকরণ শ্রমের বিভাগকে বিস্তৃততর করে উৎপাদন ক্ষমতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার পরিণামে আদি সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রেরও সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে দাস ও প্রভুতে বিভক্ত সমাজ জন্মলাভ করে।

Copernicus : কপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রি.)

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক কপারনিকাসের জন্ম হয়েছিল পোলাণ্ডে। সৌরজগতের বর্তমান সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কপারনিকাস। এতদিন পর্যন্ত সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীর আবর্তনের ব্যাখ্যায় টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্বই ছিল স্বীকৃত তত্ত্ব। টলেমীর তত্ত্বানুযায়ী পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র। পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য-চন্দ্র প্রভৃতির আবর্তন। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ; দার্শনিক এ্যারিস্টটল-এর ব্যাখ্যা কিংবা টলেমীর তত্ত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সকলেই পৃথিবীকেই বিশ্বজগতের কেন্দ্র বলে মনে করেছে। এই প্রতিষ্ঠিত মতের ক্ষেত্রে কপারনিকাসের তত্ত্ব সাধারণ বিশ্বাসের একেবারে বিপরীত ছিল। প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিকদের পৃথিবীর আবর্তনের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে পূর্ণতর গবেষণায় কপারনিকাস টলেমীর তত্ত্বকে ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সূর্যই হচ্ছে কেন্দ্র। পৃথিবী হচ্ছে সূর্যের গ্রহ। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ৩৬৫ দিনে যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তেমনি নিজের মেরুদণ্ডের উপরও সে আবর্তিত হচ্ছে। কেবল পৃথিবী নয়, পৃথিবীর মতোই গ্রহ হচ্ছে মারস (মঙ্গল), মার্কারী (বুধ), ভেনাস (শুক্র), জুপিটার (বৃহস্পতি), স্যাটার্ন (শনি)। এরাও সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সূর্য থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে এদের সূর্য প্রদক্ষিণের কালেরও তফাৎ ঘটছে। মার্কারী ৮৮ দিনে, ভেনাস ২২৫ দিনে, মারস ৬৮৬ দিনে, জুপিটার ১২ বছরে এবং স্যাটার্ন ৩০ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এভাবে তৈরি হয়েছে সৌরজগৎ। কপারনিকাসের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ করে কেপলার, (১৫৭১-১৬৩০ খ্রি.) গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রি.) এবং নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রি.) গ্রহ-উপগ্রহগুলির পরিক্রমণ পথ আরো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করেন। কিন্তু পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণার উপর প্রথম আঘাত হানার কৃতিত্ব কপারনিকাসের। মানুষ যেখানে এর পূর্বে পৃথিবীকে সর্ববৃহৎ বলে কল্পনা করেছে আর এই পৃথিবীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে, সেখানে কপারনিকাস মানুষের জ্ঞানের সীমাকে পৃথিবীর বাইরে বৃহত্তর বিশ্বে অবারিত করেছেন। ধর্মের অন্ধ এবং অনড় বিশ্বাসের শেকল থেকে বিজ্ঞানের মুক্তিদাতার ভূমিকা তিনি পালন করেছেন। এ কারণে যাজক-সম্প্রদায় থেকে শুরু করে প্রচলিত ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী সকল মহলই কপারনিকাসের উপর সেদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

Corce, Benedetto : বেনেদাতো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২ খ্রি.)

আধুনিককালের প্রখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক। ক্রোচের দর্শন ভাববাদের প্রকার বিশেষ। অনেকে এ দর্শনকে ঐতিহাসিক ভাববাদ বলে আখ্যাত করেন। ক্রোচের রচনাসমূহে বিশ্লিষ্ট চিন্তার দুর্বোধ্য প্রকাশ করেছে। এসথেটিকস বা নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত আধুনিককালের, বিশেষ করে ভাববাদী শিল্প আলোচনায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।

ক্রোচের দর্শনের সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা দানের চেষ্টায় বলা যায় যে, এ দর্শনের মূল হচ্ছে ইন্টুইশন বা সজ্ঞা। বস্তু এবং মনের মধ্যে প্রধান শক্তি কে? এ প্রশ্নে ক্রোচে-দর্শনের জবাব হচ্ছে যে, মনই হচ্ছে আসল শক্তি। আর মনের সত্তা বা অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে তার ক্রিয়ায়। মনের ক্রিয়ার বাইরে মন বলে কিছু নেই। মানসিক ক্রিয়াই মন। ক্রোচের মতে মনের ক্রিয়া দুরকম তাত্ত্বিক এবং প্রযুক্তিক। তত্ত্বগত ক্রিয়ার মাধ্যমে মন বস্তুর সত্তাকে উপলব্ধি করে আপন সত্তায় তাকে লীন করে নেয় এবং প্রযুক্তিক ক্রিয়ায় মন সৃজনশীল হয়ে নতুন সত্তার সৃষ্টি করে। মনের ক্রিয়া ইন্টুইশন বা সজ্ঞা, কনসেপশান বা উপলব্ধি, বিশেষের এবং নির্বিশেষের ইচ্ছা—এই চার রকমে প্রকাশ পেতে পারে। এই চার রকম ক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের শিল্প, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং আর্থিক কর্মপ্রবাহের উদ্ভব। এই চার প্রকার সৃষ্টির একটি অপরটির বিরোধী নয়। এরা পরস্পর পরিপূরক। ক্রোচের মতে শিল্পবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান মাধ্যম। সৌন্দর্যবোধই হচ্ছে মানুষের আদিম বোধ। এ বোধ মানুষ বুদ্ধির মারফতে লাভ করতে পারে না। এ বোধ তার সহজাত বা সজ্ঞাজাত। কিন্তু সজ্ঞা কেবল মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সৌন্দর্য বা শিল্পসৌকর্য কেবল অনুভূতি নয়। এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে প্রকাশে। কোনো সৌন্দর্যানুভূতি অপ্রকাশিত থাকতে পারে না। প্রকাশই হচ্ছে মনের অনুভূতির ভাষা। মানুষের মুখের যে ভাষা তাও সেই সৌন্দর্যানুভূতিরই প্রকাশ। এদিক থেকে ভাষালোচনা এবং সৌন্দর্যালোচনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

Confucianism : কনফুসিয়াসবাদ

চীনের প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা কনফুসিয়াসের উপদেশাবলীকে কনফুসিয়াসবাদ বলা হয়। কনফুসিয়াসের জীবনকাল ৫৫১ থেকে ৪৭৯ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ বলে ধারণা করা হয়। কনফুসিয়াসের উপদেশাবলী মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীন সমাজে সামাজিক এবং শৃঙ্খলাবোধ আনয়নের প্রধান হোতা হিসাবে কনফুসিয়াসের খ্যাতি। তাই তিনি কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যত পরিচিত নন তার চেয়ে চীন সমাজের সংরক্ষণকারী হিসাবেই তাঁর ঐতিহাসিক পরিচয়। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে কিরূপ জীবন যাপন করবে এর প্রতিটি বিষয়ে কনফুসিয়াস তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমস্ত উপদেশের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করা।

পৃথিবীর উপরে যদি কাউকে মান্য করতে হয় তা হলে মানুষ মান্য করবে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের বিধানকে। যে-মানুষ মহৎ সে ঈশ্বরের বিধানেই মহৎ। যে-মানুষ অধম সে ঈশ্বরের বিধানেই অধম। এর কোনো পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে না। প্রশ্ন হচ্ছে সেই বিধানকে সুসঙ্গতভাবে মেনে চলা। যে রাজা, সে ঈশ্বরের বিধানেই রাজা। ছোটর কর্তব্য হচ্ছে বড়কে মানা। রাজা-প্রজা, পতী-পত্নী, পিতা-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, এই প্রকারের সম্বন্ধের ভিত্তিতেই সমাজ গঠিত। বিধির বিধানে যে-স্থানে যে অধিষ্ঠিত সেই স্থান অনুযায়ী দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা তার কর্তব্য। রাজার আদর্শ হবে উত্তম রাজা হবার এবং প্রজার আদর্শ হবে উত্তম প্রজারূপে তার দায়িত্ব পালন করা। কনফুসিয়াসের অনুসারিগণ বিভিন্নভাবে তাঁর অভিমতকে ব্যাখ্যা করেন। তার ফলে

কনফুসিয়াসবাদেও বিভিন্ন উপধারার উদ্ভব হয়। কনফুসিয়াসের অন্যতম শিষ্য মেঙজু মনে করতেন যে, সমাজে যে অসাম্য বিদ্যমান তা বিধাতারই বিধান। বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাখ্যায় কনফুসিয়াসের অপর এক অনুসারী সুনজু কিছুটা বস্তুবাদী মত প্রচারের প্রয়াস পান। তাঁর মতে ঈশ্বর প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির উর্ধ্ব কোনো সত্তা নয়। খ্রিষ্টাব্দের একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে চুশী এবং অন্য অনুসারীগণ নব কনফুসিয়াসবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে বিশ্বের মূলে রয়েছে 'লী' এবং 'চী'র দ্বন্দ্ব। 'লী' হচ্ছে ভাব, আর 'চী' হচ্ছে বস্তু। 'লী'র কারণেই মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের সৃষ্টি আর 'চী'র কারণে মানুষ লোভ, মোহ, ইন্দ্রিয় সুখ ইত্যাদির কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চীনে তিনটি ভাবাদর্শের উদ্ভব দেখা যায়। এই তিনটির একটি হচ্ছে কনফুসিয়াসবাদ এবং অপর দুটি হচ্ছে তাও এবং বৌদ্ধ ধর্ম।

Culture : সংস্কৃতি

মানুষের সর্বপ্রকার বৈষয়িক এবং আত্মিক সৃজন ও সম্পদের ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। অনেক সময় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সামাজিক আচরণ ও নীতি—অর্থাৎ মানুষের ভাবগত সৃষ্টিকর্মকে কেবল সংস্কৃতি বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টির সম্পূর্ণ অর্থে আর্থিক ও কারিগরি সৃজন কর্ম এবং তার ফসল অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্র, কলকারখানা এবং উৎপাদিত বৈষয়িক সম্পদ ও সৌধকেও একটা মানব সমাজের সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য করা উচিত। পার্থক্য হিসাবে ভাবগত সৃষ্টিকে 'আত্মিক সংস্কৃতি' এবং দেহগত সৃষ্টিকে 'বৈষয়িক সংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করা চলে। কিন্তু এরূপ পৃথকীকরণও কেবলমাত্র আপেক্ষিকভাবে স্বীকার্য। আত্মিক ও বৈষয়িক সংস্কৃতির মধ্যে কোনো চরম পার্থক্য বা বিরোধের অবকাশ নাই। কোনো আত্মিক সংস্কৃতি দেহ এবং বৈষয়িক অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। আবার কোনো বৈষয়িক কর্মই মনের কল্পনা বাদে সাধিত হতে পারে না। সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌথ ক্রিয়া-কাণ্ডের ফলে এর উদ্ভব। এ কারণে সমাজ-সংগঠনের বিশিষ্ট রূপ দ্বারা সমাজের সংস্কৃতির রূপ প্রধানত নির্দিষ্ট হয়। এক সমাজ থেকে আর এক সমাজের সংস্কৃতি এই ভিত্তিতেই পৃথক হয়। আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের সমাজের ইতিহাস শ্রেণীভেদের অবস্থাহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজ এবং তারপরে শ্রেণীভেদ-সম্পন্ন দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হিসাবে এ পর্যন্ত বিভক্ত হয়েছে। এই পর্যায় মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসকেও দাস সমাজের সংস্কৃতি, সামন্ত সমাজের সংস্কৃতি ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা হয়। এক একটা সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সংস্কৃতির এই পরিচয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দাস বা সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে তার অভ্যন্তরে বৈচিত্র, বিরোধ এবং বিভিন্নতাশূন্য একটি অখণ্ড সৃষ্টিকে বুঝায়। দাস সমাজে প্রভু এবং দাসের মধ্যে যে বিরোধ, সে বিরোধ প্রভুশ্রেণীর এবং দাসের বৈষয়িক ও মানসিক কর্মকাণ্ডেও প্রতিফলিত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও অনুরূপ। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানা, উৎপাদনের যৌথ প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত সম্পদের ভোগ থেকে অধিকাংশকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থায় যে শ্রেণীগত বিরোধ,

বৈষম্য, সংঘাত এবং ভাবভাবনার সৃষ্টি হয় তার প্রতিরূপ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতি, বিশেষ করে তার আত্মিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে—অর্থাৎ যে সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ শোষক এবং শোষিত হিসাবে বিভক্ত নয়, সে সমাজের সংস্কৃতিতে মৌল কোনো আর্থিক সংঘাতের প্রতিফলনের অবকাশ নাই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতিও বৈচিত্রহীন নয়। বিরোধাত্মক বৈচিত্র্যের স্থানে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সাধিত হয় সমাজের বিভিন্নমুখী উন্নতি সাধনের বিচিত্র সৃজনকর্মের মাধ্যমে।

Cynic : উদাসীন

Cynicism : ঔদাসীন্য, উদাসীনতাবাদ

ইংরেজি 'সিনিক' এবং 'সিনিসিজম' শব্দ দ্বারা জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েশ সব কিছুর প্রতি একটা কঠোর ঔদাসীন্য বুঝায়। ইংরেজি সিনিক শব্দের উদ্ভব গ্রিক 'কিওনস' থেকে। 'কিওনস' বলতে কুকুর বুঝাত। আর তাই 'কিনিকাল' বা 'সিনিকাল' দ্বারা কুকুরের ন্যায় অদমনীয় মনোভাব বুঝাত।

কিন্তু এই শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য গ্রিক দার্শনিক এ্যান্টিসথেনিস (খ্রি. পূ. ৪৩৫-৩৭০) এবং তাঁর অনুসারী ডায়োজেনিস, ক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকদের জীবন দর্শন এবং জীবনাচার থেকে উদ্ভূত। দাসদের শোষণের ভিত্তিতে গ্রিক গণতন্ত্র এককালে যে শৌর্য এবং বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন গ্রিক নগর রাষ্ট্রের আত্মঘাতী সংঘর্ষে সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমাজে অবিশ্বাস, অন্তর্ঘাত এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি করতে থাকে। সমাজের এই অস্থির অবস্থায় এমন একদল চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের উদ্ভব ঘটে যাঁরা মানুষের শান্তি সামাজিক ও রাজনীতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণে নয়, সমস্তরকম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং জীবনের আরাম আয়েশ বিলাস ব্যসন সব কিছু পরিত্যাগের মধ্যে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। এই মনোভাবের প্রাথমিক লক্ষণ মহৎ ব্যক্তি সক্রেটিসের জীবনাচরণ এবং অভিমতের মধ্যে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নয়, জ্ঞানের অন্বেষণ এবং সহজ জীবনযাপনের মধ্যেই তিনি ব্যক্তির মহৎ কর্তব্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। সহজ জীবন যাপনের সক্রেটিসীয় নীতি সিনিকপন্থীগণ অধিকতর কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনকে বাহুল্য বলে বর্জন করার চেষ্টা করে। 'অঞ্জলিতে যদি তৃষ্ণার পানি পান করা সম্ভব তা হলে পেয়ালা বাহুল্য। অতএব সে বর্জনীয়।' সিনিক দার্শনিক ডায়োজেনিস (খ্রি. পূ. ৪১২-৩২৩) সম্পর্কে এরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডার একদিন ডায়োজেনিসের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। ডায়োজেনিস তখন সূর্যালোকে উপবিষ্ট। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সূর্যের রশ্মিকে আড়াল করে ডায়োজেনিসের নিকটবর্তী হয়ে যখন দার্শনিককে বললেন 'আমি আপনার কি উপকার করতে পারি?' তখন দার্শনিক উত্তরে বললেন, 'আপনি আমার উপর নিপতিত সূর্যের রশ্মিকে আড়াল না করে একটু সরে দাঁড়াতে পারেন।'

সিনিক দার্শনিকদের সবকিছু বর্জন করার নীতির একটি রাজনীতির তাৎপর্য ছিল। শোষণ এবং অনাচারপূর্ণ তৎকালীন গ্রিক সমাজের সবকিছু বর্জন করে জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি অন্বেষণের নীতিকে সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও শোষণের সমালোচনা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সিনিকপন্থীগণ সমাজে দাস ও প্রভুর বৈষম্যকে স্বীকার করত না। সকল মানুষ সমান, এই মতাদর্শ তারা অনুসরণ করত। এই আদর্শ তৎকালীন মানুষের দৃষ্টিকে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের সংকীর্ণ প্রাচীর অতিক্রম করে বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের মধ্যে বিস্তারিত করার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। সিনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এ্যান্টিসথেনিস ছিলেন প্লেটোর সমকালীন। তিনি এরূপ অভিমত পোষণ করতেন যে, যিনি জ্ঞানী তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতার সর্বজনীন আদর্শকে অনুসরণ করা। তিনি আরো মনে করতেন, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ সভ্যতার কৃত্রিমতাকে বর্জন করে যত বেশি পশুর প্রাকৃতিক সহজ জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে তত সে স্বাভাবিক এবং উত্তম জীবনের অধিকারী হবে। এ্যান্টিসথেনিস 'সাইনো সারজেম' নামক স্থানে তাঁর দর্শন প্রচার করতেন। এই স্থান থেকেও 'সিনিক' শব্দের উৎপত্তি ঘটে থাকতে পারে। বিভিন্ন গ্রিক দর্শনের সঙ্গে দর্শনের প্রচার স্থানের নাম যুক্ত হতে দেখা যায়। একাডেমীয়া স্থান থেকে প্লেটোর একাডেমী। লাইসিউম থেকে এ্যারিস্টটলের লাইসিউম দর্শনপিঠের প্রসিদ্ধি।

D

D' Alembert : ডি, আলেম্বার্ট (১৭১৭-১৭৮৩ খ্রি.)

ফরাসি বিশ্বকোষিকদের অন্যতম দার্শনিক এবং গণিতশাস্ত্রবিদ ছিলেন ডি' আলেম্বার্ট। বৈজ্ঞানিক হিসাবে বায়ু প্রবাহের উপর তিনি ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বকোষ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ডিডেরটকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি নিরীশ্বরবাদী না হলেও ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী লাভে তিনি বিশ্বাস করতেন না। এরূপ অভিমত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের ইংরেজিতে 'ডিস্ট্' বা ঈশ্বরবাদী কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবাদী নয় বলে অভিহিত করা হয়। ডি' আলেম্বার্ট খ্রিষ্ট ধর্মের 'জেসুইট' এবং 'ক্যালভিনিস্ট' উভয় সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেন।

Dadaism : দাদাবাদ, খেয়ালবাদ

প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইউরোপে এবং পরবর্তী সময়ে আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছুসংখ্যক শিল্পী ও সাহিত্যিকের মধ্যে উদ্ভূত এক প্রকার শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলন। মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু সংখ্যক ফরাসি বুদ্ধিজীবী সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের নিজেদের মনের হতাশা এবং আতঙ্ককে শিল্প ও সাহিত্যে প্রকাশ করার জন্য তাঁরা অ-চিন্তিত এবং অসাধারণ মাধ্যমের আশ্রয় নেন। তাঁরা মনে করতেন সমাজে যুদ্ধ, ধ্বংস, অসাম্য, অত্যাচার—এসবের কারণ মানুষের নিজের চরিত্রে পাশবিক দিকের প্রাধান্য। মানুষ স্বভাবগতভাবে পশু। এজন্যই তাদের পরস্পরের প্রতি পাশবিক ব্যবহার। এটাকে স্বীকার করা ব্যতীত কোনো উপায়ন্তর নেই। সমাজ কোনো নীতি মেনে চলে না। শিল্পীর পক্ষেও তাই প্রচলিত কোনো নিয়ম-নীতি মেনে চলার প্রয়োজন নেই। মনে যা আসে তাই করো। শিল্পের মাধ্যম হিসাবে যা ইচ্ছা হয় তাই গ্রহণ করো। অক্ষরগুলো এ যাবৎ যেমন লেখা হয়ে আসছে, তেমন করে কেন লিখবো? অক্ষরগুলো উল্টিয়ে লিখলে ক্ষতি কি? এরূপ অরাজক মানসিকতা থেকে জাঁ ককতু, হান্স আর্প, মার্সেল দুকাম্প প্রমুখ সাহিত্যিক ও শিল্পী, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত সমস্ত নিয়মনীতিকে লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেন। কবি ও ঔপন্যাসিক জাঁ ককতুর মতে যে-কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মই বিশৃঙ্খলার অভিধানবিশেষ। দাদাবাদকে খেয়ালবাদ বলা যায়। বস্তুত ফরাসি 'দাদা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'খেয়াল ঘোড়া'। আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সার-রিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ নামক যে আর একটি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দাদাবাদ তার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। দাদাবাদ বা শিল্পে অরাজকতার এই মনোভাব ১৯২২ সালের দিকে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

Dante, Alighieri : দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রি.)

মধ্যযুগের ইতালির কবি দান্তে তাঁর 'ডিভাইন কমেডি' গ্রন্থের জন্য ইতিহাসে সুবিখ্যাত। কিন্তু কেবল কাব্য ও সাহিত্যকর্মে তিনি নিয়োজিত ছিলেন না। তৎকালীন ইতালির রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। সেকালে ইতালির রাজনীতি পোপ সমর্থক এবং পোপ বিরোধী, এই দুই প্রধান ধারায় বিভক্ত ছিল। খ্রিষ্ট ধর্মের ধর্মীয় গুরু পোপের সমর্থকরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার বিরোধী শক্তি বলে পরিগণিত হত। পোপের একচ্ছত্র এবং সমগ্র ইউরোপব্যাপী সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের শাসক তথা রাজাগণও অভিমত পোষণ করতেন। রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্য রাজার অধীনে কেন্দ্রীয় জাতীয় শাসনের তখন বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। কবি দান্তের নিজ নগর ফ্লোরেন্স থেকে পোপ বিরোধী অভিমতের কারণে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। তাঁর এই নির্বাসিত জীবনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচিত্র রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন। এই অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাঁর রাজনৈতিক অভিমত তিনি তাঁর রাজনৈতিক গ্রন্থ 'মনারকিয়া' বা 'রাজতন্ত্র' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। সেকালের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন যুক্তির পরিচয় থাকলেও এ গ্রন্থ একটি অগ্রসর চিন্তার বাহক হিসাবে কাজ করে। তখনো ইউরোপে বিগত রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে একটি সাম্রাজ্যের চিন্তা বিরাজ করত। অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপে এক সাম্রাজ্য এবং তার এক সম্রাট থাকবে। পোপের পক্ষের যুক্তি ছিল, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রোমের পোপ হবেন এই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র এবং ধর্মীয় ও জাগতিক সকল বিষয়ের শাসক। এক সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের কথা কবি দান্তেও তাঁর 'মনারকিয়া' গ্রন্থে স্বীকার করেন। কিন্তু জাগতিক ক্ষেত্রে পোপ নয়, রাষ্ট্রের শাসক তথা রাজা হবেন প্রধান—এই ছিল দান্তের অভিমত। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আইন কানুন, বিধিবিধানের প্রভাব সত্ত্বেও 'মনারকিয়া'র মধ্যে এইরূপ আধুনিক চিন্তারও প্রকাশ ঘটে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূল হচ্ছে ব্যক্তির মঙ্গল এবং রাষ্ট্রের পরিচালনাতে ব্যক্তিরও ভূমিকা থাকা আবশ্যক।

Darwin, Charles Robert : চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রি.)

উনবিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের অবিস্মরণীয় জীববিজ্ঞানী। জীবনের ঐতিহাসিক বিকাশবাদের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাকৃতিক জগতের রহস্যভেদ করার প্রবল আগ্রহ চার্লস ডারউইন কিশোর বয়স থেকেই বোধ করতেন। জীবন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে পারবেন মনে করে নিজের পাঠ্যকালে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করে। এর পরবর্তীকালে চার্লস ডারউইনের জীবনের যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য 'বিগল' জাহাজকে বিশ্ব অভিযানে প্রেরণ এবং চার্লস ডারউইনকে উক্ত জাহাজের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে নিয়োগ দান। 'বিগল'-এর অভিযান ডারউইনের জীবনে অকল্পিত এক সুযোগ এনে দেয়। এ অভিযান ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ অভিযানে ডারউইন পৃথিবীর এক প্রান্ত, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের, তার অভ্যন্তরের, মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপের এবং পৃথিবীর অপর প্রান্ত নিউজিল্যাণ্ডের অসংখ্য জীব-জন্তুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। প্রাচীনকালের অনেক বৃহদাকার জন্তুর

কঙ্কাল এবং ফসিলও তাঁর পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ঘটে। সমস্ত জায়গা থেকে জীব-জন্তুর নানা প্রকার নমুনা তিনি সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত জীব-জন্তুর সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, তাদের গঠনের সরলতা-জটিলতা ইত্যাদির উপর গবেষণা করে চার্লস ডারউইন অবশেষে ১৮৫৯ সালে জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পেসিস' প্রকাশ করেন। তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ছিল যে, পৃথিবীতে জীবনের যে বৈচিত্র্য রয়েছে সে বৈচিত্র্য কোনো একদিন একই সময়ে জগতে কোনো বিধাতা সৃষ্টি করে নি। জগতে জীবনের ক্ষেত্রে সতত পরিবর্তন চলছে। জীবনের গঠন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। অতীতকালের অতিকায় জন্তু-জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে, অথচ এসব প্রাণীর আজ অস্তিত্ব নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাবে ডারউইন বললেন, জীবনের ক্ষেত্রে আদিকাল থেকে বাঁচার সংগ্রাম চলছে। প্রকৃতি-জগতে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রাকৃতিক জগতের পরিবর্তন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে জীবন রক্ষা করার তাগিদ জীবমাত্রের মধ্যে স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টায় যারা বিফল হয়েছে তারা দেহে বিরাট হলেও জীবন রক্ষা করতে পারেনি এবং জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এই অভিমতের মূল তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, জীব-জগৎ সতত প্রবহমান পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজ থেকে জটিল হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। এই তত্ত্বের পরিপূরক হিসাবে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মানুষের জন্ম এবং বিকাশ সম্পর্কে ডারউইন 'ডেসেন্ট অব ম্যান' প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি দাবি করেন যে, মানুষের গঠনের সঙ্গে মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর সাদৃশ্য আছে। এ সাদৃশ্য থেকে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ, মানুষের চেয়ে সহজতর গঠনের জীবন থেকে পরিবর্তনের চরম অবস্থায় বিকাশ লাভ করেছে। মানুষও 'মানুষ' হিসাবে কোনো উর্ধ্বলোক থেকে নিক্ষিপ্ত হয় নি। চার্লস ডারউইনের বিকাশবাদের এই তত্ত্বের তাৎপর্য বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য ছিল অপরিসীম। একটি বিরাট সামাজিক বিপ্লবের ন্যায় ডারউইনের বিকাশবাদের তত্ত্ব প্রচলিত ধারণা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত কম্পিত করে তোলে। ডারউইনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করে। কিন্তু বাস্তব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অন্ধ বিশ্বাসের উপর ক্রমে জয়ী হয়ে আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডারউইনের তত্ত্বের মধ্যে জগতে যে সতত শক্তিতে শক্তিতে দ্বন্দ্ব চলছে এবং সেই দ্বন্দ্বের ভিত্তিতেই যে জীবন বিকাশ লাভ করে এবং সে বিকাশে পরিবর্তন চরম আকার লাভ করে নতুন অস্তিত্বের সৃষ্টি করতে পারে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই তত্ত্বেরও স্বাভাবিক স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়।

Decembrists : ডিসেম্বরপন্থী

১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুসংখ্যক সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এই অভ্যুত্থানকারীদের অনুসারীদের রুশ ইতিহাসে ডিসেম্বরপন্থী আখ্যায়িত করা হয়। রাশিয়ার জারের স্বৈরতন্ত্র এবং সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৮২৫ সালের ডিসেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানকে রুশ ইতিহাসকারগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ভি. আই. লেনিনের মতে রাজতন্ত্রের যুগে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে ডিসেম্বরপন্থীদের স্থান অনন্য। ডিসেম্বরের অভ্যুত্থান

সংঘটিত হয় ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের পরে। রুশ-ফরাসি যুদ্ধকালে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক অবস্থার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ পায়। ফলে উক্ত যুদ্ধের পরে রাশিয়ার অভ্যন্তরে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অধিকতর অনিবার্য রূপ লাভ করতে থাকে। সমাজের অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিবাসীগণই সামরিক বাহিনীর অফিসার সম্প্রদায়ের বৃহত্তম অংশ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও যুদ্ধ-পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামরিক বাহিনীর এই সমস্ত অফিসার গুপ্ত সমিতিতে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কিংবা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করতে শুরু করে। প্রথম আলেকজাণ্ডার তখন রাশিয়ার সম্রাট। সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ তাঁর মৃত্যুকালে একটি অভ্যুত্থান মারফত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করে। ১৮২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রথম আলেকজাণ্ডার মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বেশ পরিমাণ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক বাহিনীর শাসনতন্ত্রবাদী অফিসারগণ ২৬ ডিসেম্বর বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেশে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং নিকোলাসের পরিবর্তে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনস্টান্টাইনকে সম্রাট হিসাবে অধিষ্ঠিত করার দাবি জানায়। প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে নিকোলাস সম্রাট হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট নিকোলাস তাঁর অনুগত সাঁজোয়া বাহিনীর মারফত বিদ্রোহ দমন করেন। সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণে বহু অভ্যুত্থানকারী এবং সাধারণ মানুষ নিহত হয়। জার সরকার ৫৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করে বিদ্রোহী হিসাবে বিচার করে। এদের মধ্যে ৫ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, ৩১ জনকে যাবজ্জীবনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এভাবে ডিসেম্বরের অভ্যুত্থান পর্যুদস্ত হয়। ডিসেম্বর অভ্যুত্থান কেবল সামরিক বাহিনীর একটি অংশের আন্দোলন ছিল না। গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ তখন সমাজের বিভিন্ন অংশে প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। তখনকার রুশ সমাজের শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যাপকতম অংশ এই আন্দোলনে সমর্থন যোগাচ্ছিল। হারজেনের ন্যায় ইতিহাস-বিখ্যাত বিজ্ঞানীরও সমর্থন ছিল এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর। ডিসেম্বরপন্থী বলে তাই রুশ ইতিহাসে কেবল কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসারই পরিচিত নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম যুগের সমস্ত প্রগতিশীল অংশই এই নামে পরিচিত। একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে এই যুগের কবি-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-কর্মীদের মতামত রুশ ইতিহাসে আলোচিত হয়ে থাকে। ডিসেম্বর আন্দোলনের অনেক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকই সমাজ ও জীবনের ব্যাখ্যায় বস্তুবাদী প্রগতিশীল মত পোষণ করতেন। হারজেন এবং তাঁর সাথীরা বস্তুকে প্রধান বলে বিবেচনা করতেন। চিন্তা মানুষের মস্তিষ্কেরই বিশেষ শক্তি, মন নামক অপর কোনো সত্তার নয়, এরূপ অভিমতও তাঁরা পোষণ করতেন। এঁদের অনেকে ধর্মকে শোষকের হাতে শোষণের অস্ত্র এবং শোষিতের সান্ত্বনার আশ্রয় বলে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডিসেম্বরবাদীগণ বিপ্লবী ছিল না। তাদের অভ্যুত্থানের পেছনে ব্যাপক কোনো গণ-সংগঠন এবং গণ-ভিত্তি ছিল না। এ কারণে সামরিক বাহিনীর একটি অংশের অভ্যুত্থান গণ-বিপ্লবে প্রসারিত না হয়ে সরকারের নিষ্পেষণযন্ত্রে সহজেই পর্যুদস্ত হয়ে যায়। কিন্তু পরাজিত হলেও ডিসেম্বরের অভ্যুত্থান রাশিয়ার পরবর্তীকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভূতভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

Declaration of Independence : স্বাধীনতার ঘোষণা

ইংল্যাণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার উপনিবেশসমূহ ১৭৭৬ সনে ৪ জুলাই তারিখে যে ঘোষণা দ্বারা স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করে তা ইতিহাসে স্বাধীনতার ঘোষণা তথা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা নামে খ্যাতি লাভ করেছে। ঘোষণাটির মধ্যে টমাস জেফারসন, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাজনীতিকগণ স্বাধীনতার যে যুক্তি উল্লেখ করেন সে যুক্তি মানুষের রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার মৌলিক অধিকার তত্ত্বের তাৎপর্যে পূর্ণ। এই ঘোষণার মধ্যে দার্শনিক লকের বিখ্যাত গ্রন্থ 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' বা শাসনব্যবস্থার উপর দুটি নিবন্ধের গভীর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আমেরিকার তেরটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বসম্মত ঘোষণা' শিরোনামে উচ্চারিত ঘোষণার মুখবন্ধে বলা হয় : ইতিহাসের গতিপথে যখন একটি জনসমষ্টির জন্য অনিবার্যরূপে প্রয়োজন হয়ে পড়ে অপর একটি জনসমষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করে প্রকৃতি এবং বিধির প্রদত্ত মানুষের সার্বভৌম এবং সমঅধিকারকে স্থাপন করার, তখন সেই সম্পর্ক ছেদনের যুক্তিকে প্রকাশিত করারও প্রয়োজন উপস্থিত হয়। সেই প্রয়োজনের বোধ থেকে আমরা ঘোষণা করছি পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। এবং বিধাতা কতিপয় অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এই অধিকারের অন্তর্গত হচ্ছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অর্জন। মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য গঠিত হয় সরকার। এবং এই সরকার তথা শাসকের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতার উৎস হচ্ছে রাষ্ট্রের শাসিত তথা জনসাধারণ। এবং সেই কারণেই যখন কোনো সরকার শাসিতের এই মৌলিক অধিকারসমূহের ধ্বংসকারী হয়ে দাঁড়ায় তখন জনসাধারণের অধিকার থাকে সেই সরকারকে বিলুপ্ত কিংবা পরিবর্তিত করে নতুন সরকার গঠিত করার।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাবিদদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এখনও যুক্তরাষ্ট্রে ৪ জুলাইকে সাধারণ ছুটির মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

Deduction : সিদ্ধান্ত, অনুমান, অবরোহ

এক কিংবা একাধিক প্রতিজ্ঞা বা যৌক্তিক দত্তবাক্য থেকে তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো অনুমান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইংরেজিতে ডিডাকশান বলে। দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ; মনে হয় ওখানে আগুন লেগেছে। এখানে 'আগুন লেগেছে' এ সিদ্ধান্তটি ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এই দত্ত সত্যের ভিত্তিতে গৃহীত অনুমান। অনুমানকে যুক্তিশাস্ত্রে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কোনো সার্বিক বা সাধারণ সত্য থেকে কোনো বিশেষ সত্যের অনুমানকে অবরোহী অনুমান এবং বিশেষ সত্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ বা সার্বিক সত্যে পৌঁছাকে আরোহী অনুমান বলা হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী 'সকল মানুষ মরণশীল ; সক্রেটিস একজন মানুষ সুতরাং সক্রেটিসও মরণশীল', এই পদ্ধতিটিকে আরোহী অনুমান এবং 'রাম মরেছে, রহিম মরেছে, করিম মরেছে, সুতরাং সকল মানুষ মরবে বা সকল মানুষ মরণশীল', এ দৃষ্টান্তটিকে একটি আরোহী অনুমানের দৃষ্টান্ত বলা হয়। উপরোক্ত বিভাগ থেকে মনে হতে পারে যে, অবরোহী ও আরোহী অনুমান

পরস্পর পৃথক এবং আরোহী অনুমানই কেবল বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ অনুমান, অবরোহী অনুমান অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুমান নয়। কিন্তু অবরোহী এবং আরোহী অনুমানের এরূপ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। আরোহী এবং অবরোহী অনুমান পরস্পর নির্ভরশীল এবং সংযুক্ত। যুগব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারাই আমরা আমাদের জ্ঞানের সাধারণ সূত্র তৈরি করি। এই সূত্রগুলির আলোতেই আমরা বিশেষকে ব্যাখ্যা করি ; বিশেষ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভ করি। বিশেষের ভিত্তিতে নির্বিশেষ জ্ঞান লাভ এবং নির্বিশেষের প্রয়োগে বিশেষের অনুধাবন—জ্ঞানের এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া আদিকাল থেকেই মানুষ অনুসরণ করে আসছে। তবে এ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রথমে বিস্তারিতভাবে করেন গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কতকগুলি সূত্র ব্যাখ্যা করেন। এগুলিকে যুক্তিশাস্ত্রের এ্যারিস্টটলীয় বিধান বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ বিধানগুলি প্রধানত অবরোহী অনুমানের বিধান। এ জন্য অবরোহী অনুমানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এ্যারিস্টটলকে উল্লেখ করা হয়। অবরোহী অনুমানের সঠিকতা নির্ভর করে দত্ত সত্যের সঙ্গে অনুমিত সত্যের অন্তর্নিহিত সংযোগের উপর। দত্তবাক্য বা সত্যগুলি যদি পরস্পর সম্পর্কিত না হয় তা হলে তা থেকে কোনো সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না। এ নিয়মের অপর একটি তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অবরোহী অনুমানে দত্তবাক্য বা অনুমিত বাক্যের বাস্তব যথার্থতা বিচার্য বিষয় নয়। অবরোহী অনুমানের বিচার্য বিষয় হচ্ছে প্রতিজ্ঞা বা দত্তবাক্য যা আছে (সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক না কেন), তার ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে কিনা। এ নিয়মে 'সকল মানুষ অমর' এ দত্তবাক্য থেকে 'রহিম একজন মানুষ, সুতরাং রহিমও অমর', এ সিদ্ধান্তে আমরা গ্রহণ করতে পারি। গ্রিসের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশের অনুমান শাস্ত্রও অতি প্রাচীন। গ্রিক বৈজ্ঞানিক ইউক্লিডের জ্যামিতি অবরোহী অনুমানের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কিছু সংখ্যক আধুনিক দার্শনিক 'আঙ্কিক অনুমানের' বিশ্লেষণ দ্বারা অনুমানের ক্ষেত্রে নতুনতর বিকাশ সাধন করেছেন।

Definition : সংজ্ঞা

ইংরেজি 'ডেফিনিশন' শব্দটি ল্যাটিন 'ডিফিনিশিও' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'ডেফিনিশিও' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা। যে বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে একটি বিষয় আর সেই বিষয় বলে পরিচিত হতে পারে না, কেবলমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে—অপর কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। আমাদের জীবনে সংজ্ঞার আবশ্যকতা সমধিক। সংজ্ঞা একটি সংকেতবিশেষ। সংজ্ঞা দ্বারা আমরা নির্দিষ্ট বিষয়কে স্মরণ রাখি। বস্তুপুঞ্জকে সংজ্ঞা দ্বারা শ্রেণীবিভক্ত করি। সংজ্ঞাকরণের ক্ষমতা মানুষের জ্ঞানের বিকাশের একটি উন্নত স্তরের পরিচায়ক। মানুষ যখন তার মস্তিষ্ক দ্বারা বিশেষকে পর্যবেক্ষণ করে বিশেষে বিশেষে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য অনুধাবন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তখনি তার পক্ষে সংজ্ঞাকরণ সম্ভব হয়েছে। সংজ্ঞাকরণের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রথমে এ্যারিস্টটল করেছেন বলে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়। এ্যারিস্টটল সংজ্ঞাকরণের বিধান নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, সংজ্ঞাকরণের অর্থ হচ্ছে, সংজ্ঞেয় পদের জাতি এবং সহজাতির সঙ্গে তার পার্থক্যসূচক গুণের নির্দেশ করা। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি মানুষকে 'যুক্তিবাদী জীব' বলে উল্লেখ

করেছেন। মানুষ জীবের অন্তর্গত। অর্থাৎ জীব বা জন্তু হচ্ছে মানুষের জাতি এবং যুক্তিবাদিতা হচ্ছে তার সহজাতি কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি পশুর সঙ্গে তার পার্থক্যসূচক গুণ। এই বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিবাচক কোনো পদের সংজ্ঞা সম্ভব নয়। রহিম একটি ব্যক্তিবাচক পদ। একটি নাম। রহিম মানুষ হলে তাকে একজন মানুষ বলা যায় বটে—কিন্তু তাতে তার বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। যে বিশেষ গুণে রহিম করিম কিংবা যাদব নয়, সে গুণ রহিমকে একজন মানুষ বললেই স্পষ্ট হয় না। এজন্য বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর কোনো যৌক্তিক সংজ্ঞা হতে পারে না। সংজ্ঞা হতে পারে কেবলমাত্র জাতিবাচক পদের। কিন্তু যে জাতি পরিধিতে ব্যাপকতম কিংবা চরম, তারও সংজ্ঞা চলে না। কেননা চরম জাতিকে অপর কোনো বৃহত্তর জাতির অন্তর্ভুক্ত করে পরিচিত করা চলে না। মানুষকে জন্তুর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জন্তুকে প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। প্রাণকে বিকশিত বস্তুর অবস্থাও বলা চলে। কিন্তু বস্তুকে অপর কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত করে পরিচিত করা চলে না। তাই এ্যারিস্টটলের বিধান অনুযায়ী চরম জাতি এবং ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

Deism : ঈশ্বরবাদ

সৃষ্টির আদি কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এটি একটি দার্শনিক তত্ত্ব। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এর কিছুটা পার্থক্য আছে। ধর্মীয় ঈশ্বর কেবল আদি স্রষ্টা নন। তিনি তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট প্রত্যাদেশ মারফত তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। তিনি সৃষ্টির ধারক, বাহক, প্রতিপালক এবং বিচারক। দয়া-মায়া, কঠোরতা বিভিন্ন গুণে তিনি গুণান্বিত বলে মানুষ কল্পনা করে। তিনি সর্বশক্তিমান। এই প্রচলিত ধর্মীয় ঈশ্বরবাদের পরিবর্তে ইংল্যাণ্ডের হার্বার্ট (১৫৮৩-১৬৩৮ খ্রি.) দার্শনিক ঈশ্বরবাদের ব্যাখ্যা তৈরি করেন। দার্শনিক ঈশ্বরবাদের মতে সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু ধর্মীয় ঈশ্বর এবং সৃষ্টির আদি কারণরূপ ঈশ্বর এক নয়। দার্শনিক ঈশ্বর বিশ্বজগতের আদি কারণ মাত্র। তিনি জগতের সর্বকালের ধারক, বাহক কিংবা নিয়ন্তা নন। সৃষ্ট হওয়ার পরে সৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ব জগৎ তার আপন বিধান অনুযায়ী চলছে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী নয়। দার্শনিক ঈশ্বরবাদের প্রচারকালে এর একটি প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। প্রচলিত অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতিবন্ধকতার কাজ করছিল। কিন্তু বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রকৃতির মধ্যে একের পর এক মৌলিক বিধানসমূহের আবিষ্কার চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বীকৃতিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস জাগতিক জ্ঞানের বিকাশে যাতে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতে না পারে, সে জন্যই হার্বার্ট দার্শনিক ঈশ্বর তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেন। ঈশ্বরকে সামাজিকভাবে অস্বীকার করা চলে না, আবার ঈশ্বরকে জ্ঞানের পথে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় করেও রাখা যায় না—দার্শনিক ঈশ্বরবাদ এই মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত। এ তত্ত্ব অনুযায়ী যুক্তির মাধ্যমেই ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়। আবার যুক্তিগতভাবে এও স্বীকার করতে হয় যে, আদি কারণের অধিক কিছুর জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। এভাবে ঈশ্বর ও বিজ্ঞান উভয়কে রক্ষা করা সম্ভব বলে শুধু হার্বার্ট নন, তাঁর পরবর্তী ভলটেয়ার, রুশো, লক, নিউটন, অনেক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এই যুগে এই অভিমত পোষণ

করেছিলেন। আধুনিককালে অবশ্য ধর্মীয় ঈশ্বরবাদ এবং দার্শনিক ঈশ্বরবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই মূলত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তত্ত্ব বলে পরিচিত।

Democracy : গণতন্ত্র

আধুনিক রাষ্ট্রমাত্রেরই শাসন বা পরিচালনব্যবস্থার আরাধ্য পদ্ধতি হচ্ছে গণতন্ত্র। শব্দগতভাবেও গণের তন্ত্র বা ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র। যে শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলে। আধুনিক শাসনব্যবস্থার প্রধান রূপ গণতন্ত্র হলেও, গণতন্ত্র কেবল আধুনিক সভ্যতারই অবদান এমন কথা বলা যায় না। সীমিতভাবে হলেও, প্রাচীন নগর রাষ্ট্র এথেন্সের অ-দাস বা প্রভুশ্রেণীর অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ সভা সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করত বলে জানা যায়। গ্রিক শব্দ 'ডেমস' বা 'সাধারণ' থেকে ইংরেজি 'ডিমোক্রাসি' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে বলে রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ মনে করেন। এথেন্সের রাষ্ট্র পরিচালনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাধারণত নাগরিকদের গণসম্মেলন বা একলেসিয়াতে গৃহীত হতো বলে প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং আধুনিককালের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যবস্থাকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ইউরোপে। ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে প্রথমে সামন্তবাদ এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লড়াই এবং সংগ্রামের মাধ্যমে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আসলে প্রত্যেকটি শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিদ্যমান প্রধান অর্থনৈতিক বা উৎপাদনব্যবস্থার স্বার্থসাধনকারী পরিচালন বা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতকের এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবসমূহের মধ্যে সেকালের উদীয়মান নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা পণ্য উৎপাদনকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চাহিদারই প্রকাশ ঘটেছিল। এজন্য এই বিপ্লবসমূহকে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। এই নতুন শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রাপ্ত বয়স্কদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আইনসভা বা পার্লামেন্টের গঠন এবং পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পরিচালনায় দেশের শাসন। শাসনব্যবস্থার এই কাঠামোগত রূপ একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা—প্রভৃতি অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

আধুনিককালের রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান পদ্ধতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন তথা গণতন্ত্র হলেও পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও এরূপ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন পরিচালনায় ব্যাপকতর জনসাধারণের চেতনা ও শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় বলে কায়েমী স্বার্থ ও সংকীর্ণ চিন্তার বাহক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে অনেক সময়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নাকচ করে সামরিক-চক্র শাসন কায়েম করেছে। অবশ্য এমন সামরিক শাসকদের ক্ষমতা দখলের এই অজুহাতটি উল্লেখযোগ্য যে প্রায়শ এরা বলে

থাকে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে কিংবা দেশ গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয় নি কিংবা দেশে আর্থিক ও আইন শৃঙ্খলার সংকট তীব্র হয়েছে, সে কারণে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় এরা বাধ্য হয়েছে এবং পরিণামে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। অর্থাৎ সামরিক শাসকরাও গণতন্ত্রকে চূড়ান্তরূপে নাকচ করে দিবার ক্ষমতা রাখে না।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক আলোচনায় 'গণতন্ত্র' শব্দটি আবার ব্যাখ্যামূলকভাবেও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে আজ দুটি প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এদের একটি ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। অপরটি হচ্ছে যৌথ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার মুখপাত্রগণ সাধারণত প্রতিপক্ষীয় ব্যবস্থার পরিচালন বা শাসনকে যথার্থ গণতন্ত্র বলে স্বীকার করতে চায় না। মার্কসবাদীগণ পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের প্রধান তথা পুঁজিবাদী শ্রেণীর শাসন বলে অভিহিত করে ; সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন নয়। বিপরীতভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থকরা সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনব্যবস্থাকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা তথা দলের ডিক্টেটরশিপ বলে অভিহিত করে থাকে। এরূপ বিতর্কের একটি তাৎপর্য এই যে, গণতন্ত্র যেমন একটি শাসনব্যবস্থা, তেমনি একটি আরাধ্য আদর্শও বটে। এ কারণে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'গণতন্ত্র' দ্বারা হুবহু অভিন্ন কোনো শাসনব্যবস্থা বা কাঠামোকে বুঝান সম্ভব নয়।

Democratic Centralism : গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালন ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক শাসন ও অর্থনীতি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং তত্ত্ব। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা' শব্দগতভাবে পরস্পর বিরোধী বলে বোধ হতে পারে। গণতান্ত্রিক বললে কেন্দ্রিকতা বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন একটি অবস্থা, আবার কেন্দ্রিকতা বললে গণতন্ত্রের অভাব মনে হয়। আসলে নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিকতা উভয়ই সঙ্গতিপূর্ণ একটি সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান। মার্কসবাদের মতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সঙ্গতিবিহীন সমাজ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ প্রবল শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শাসনে পরিচালিত হয়। সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের সে সমাজে যথার্থ গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক উদ্যোগ থাকে না। শাসক এবং প্রবল শ্রেণীর কেন্দ্রীকতাই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কথা শ্রেণীহীন সমাজে একদিকে যেখানে সমাজের সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন, তেমনি সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষের সচেতন এবং সম্মতিসূচক অংশগ্রহণও আবশ্যক। এবং এ কারণেই কেন্দ্রীকতা এবং গণতন্ত্রের ভারসাম্য এবং সমন্বয় অপরিহার্য। এর যে-কোনো একটির ব্যত্যয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নানা বিচ্যুতি এবং সংকটের সৃষ্টি করতে পারে। এ দুটি উপাদানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি যেমন উপলব্ধি করা আবশ্যক, তেমনি বাস্তব জীবনে উভয়ের প্রয়োগের চেষ্টা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মার্কসবাদীগণ লেনিনের এরূপ উক্তির উল্লেখ করেন যেখানে লেনিন বলেছেন "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তর এবং ক্ষেত্রের উদ্যোগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনাকে সংযুক্ত করে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি এবং বিকাশকে সম্ভব করে।"

Democritus : ডিমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ.)

প্রাচীন গ্রিসের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের প্রথম বিশ্বজ্ঞানী হিসাবেও ডিমোক্রিটাস স্মরণীয়। পদার্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ন্যায়, গণিত, চিকিৎসা, কৃষি, চিত্রশিল্প, সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র এবং সামরিক কৌশল—এরূপ বিচিত্র বিষয়ের উপর ২৯০টি পুস্তক বা পুস্তকাংশ ডিমোক্রিটাস রচনা করেছিলেন বলে গবেষকগণ মনে করেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে প্রথম অণুতত্ত্ববিদ হিসাবে ডিমোক্রিটাসের স্বীকৃতি সর্বজনীন। তাঁর অণুতত্ত্বে আমরা সর্বপ্রথম বিশ্ব জগতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লাভ করি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টির মূল শক্তি হচ্ছে অণু এবং মহাশূন্যতা। অসংখ্য মৌলিক অণু মহাশূন্যতার মধ্যে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনে অণুতে অণুতে সংঘর্ষ ঘটছে ; অণুতে অণুতে সংযোগও সাধিত হচ্ছে। এই সংঘর্ষ এবং সংযোগের মাধ্যমে সৃষ্ট হচ্ছে সমস্ত রকম বস্তুপুঞ্জ। বস্তুর সৃষ্টির পেছনে আবর্তিত অণু ব্যতীত ঈশ্বর বা অণুর অতীত অপর কোনো সত্তা নেই। সংযুক্ত অণুর বিয়োজনে সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংস। অণুর নতুনতর সংযোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু আবার নতুনতর বস্তুরূপে সৃষ্ট হয়। অণুর মধ্যেই অণুর গতি। অণুর সঙ্গে অণুর পার্থক্য শুধু আকারে, অবস্থানে এবং পারস্পরিক সংযোগের প্রকারে। রঙ, স্বাদ কিংবা এরূপ অপর কোনো গুণ অণুর মধ্যে নেই। এ সমস্ত গুণ অণুর জটিল সংযোগক্রমে বস্তুর মধ্যে সৃষ্ট হয়। বিশ্ব চরাচরে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা অণুর কারণে অনিবার্যভাবে সংঘটিত হচ্ছে। বস্তুজগতে কারণহীনতা বলে কিছু নেই। আমাদের অজ্ঞানতা থেকেই আকস্মিকতা বা কারণহীনতার বিশ্বাস জন্মে। মানুষ আত্মাকে অ-বস্তু মনে করে। কিন্তু আত্মাও অণুর সংযোগ ফল। এ কারণে আত্মাও বস্তু, অ-বস্তু নয়। অণুর বিয়োজনে দেহের মৃত্যুর সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। আত্মার অমরতা অযৌক্তিক কথা। বস্তুজগতের বাইরে দেবতাদেরও অপর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। দেবতাদের অস্তিত্ব থাকলে তারাও জন্ম-মৃত্যুর নিয়মে আবদ্ধ। দেবতাদের অস্তিত্বের যে বিশ্বাস সাধারণ মানুষ পোষণ করে, তার মূলে রয়েছে ধূমকেতু, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, লাভার উদ্‌গীরণ ইত্যাকার বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জ সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও ভীতি। তৎকালীন গ্রিসের দাসভিত্তিক অভিজাততন্ত্রের সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন ডিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাসের বস্তুবাদের তত্ত্বকে আমরা পরবর্তী গ্রিক দার্শনিক এপিকুরাস এবং রোমান দার্শনিক লিউক্রেটিয়াসের মধ্যে অনসৃত হতে দেখি।

Derozio : হেনরি ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.)

উনিশ শতকে বঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে, বিশেষ করে কলকাতায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং মুক্তবুদ্ধির প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে নবজাগরণ সূচিত হয় তার অন্যতম প্রাণপুরুষরূপে স্মরণীয় হচ্ছেন হেনরি ডিরোজিও। ডিরোজিও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নিজেকে তিনি ভারতীয় বলে দাবি করতেন এবং বাংলার মনীষীগণও তাঁকে বাঙালি বলে গর্ববোধ করেন। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিনি আকস্মিকভাবে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁর এই স্বল্পকালের জীবনও মহৎ কর্ম এবং বিচিত্র উদ্যোগে এরূপ পূর্ণ ছিল যে, সে জীবনের স্মরণে উত্তর কালের মন শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ে ভরে ওঠে। ডিরোজিও "ইতিহাস, দর্শন এবং ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।" তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত এবং

যুক্তিবাদী। ১৮২৬ সনে তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। তাঁর চারিত্রিক উদারতা এবং সাহস, সংস্কার-মুক্ত মন এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর দখল তাঁকে তাঁর ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষকে পরিণত করে। তাঁর গৃহে ছিল ছাত্রদের অবাধ অধিকার। যুগের বিচারে নিষিদ্ধ দ্রব্য এবং চিন্তা উভয়েরই ছিল তাঁর গৃহে তাঁর তরুণ ছাত্রদের আপ্যায়নের উপাদান। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রচলিত সকল রকম সামাজিক, ধর্মীয় এবং বুদ্ধিগত সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব দ্বারা অণুপ্রাণিত করে তুলতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বিতর্ক এবং আলোচনা সমিতি বা সভাসমূহ সে যুগের কলকাতার বিদ্বৎ মহলের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ডিরোজিওর শিষ্যদের 'ইয়ং বেঙ্গল' বলা হতো। ডিরোজিও তরুণদের মধ্যে এরূপ বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন এবং প্রাচীনপন্থীদের বিরোধিতার কারণে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা থেকে ১৮৩১ সনের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এই সনেই ১ জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। (দ্র. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান ; গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা।)

Descartes, Rene : দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.)

সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী। কর্মজীবনের দেকার্ত প্রথমে স্বদেশের সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। সামরিক বাহিনীর চাকরিশেষে তিনি সে যুগে সর্বাধিক উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ হল্যাণ্ড গমন করেন এবং সেখানে প্রায় বিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক মতামতের জন্য হল্যাণ্ডের গোঁড়া ধর্মযাজকদের হাতে তাঁকে নানাপ্রকার নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। তাদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য দেকার্ত অবশেষে সুইডেনে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুইডেনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যামিতি এবং মেকানিক্স বা বলবিদ্যার ক্ষেত্রে দেকার্ত গতি ও স্থিতির আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কার করেন। সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে বস্তুবাদী মত তখনো অশ্রুত। এ ক্ষেত্রেও দেকার্ত বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস পান। বস্তুর ব্যাখ্যায় দেকার্ত এরূপ মত পোষণ করতেন যে, বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার স্থানভিত্তিক বিস্তার। বস্তুর বিভিন্ন গুণের মধ্যে বিস্তারের ক্ষেত্রে বস্তু অনন্যনির্ভর। অর্থাৎ বস্তুর স্বাদ, গন্ধ, রঙ ইত্যাকার অন্যান্য গুণ মানুষের মনের উপর নির্ভরশীল হলেও বস্তুর বিস্তার মনের উপর নির্ভর করে না। দেকার্তের বস্তুবাদ অবিমিশ্র নয়। বস্তুর অস্তিত্ব যেমন তিনি স্বীকার করেছেন, তেমনি বস্তুর গতির প্রশ্নে তিনি ভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর। ঈশ্বর গতি ও স্থিতি উভয়ই বস্তুর মধ্যে তৈরি করেন এবং গতি ও স্থিতির পরিমাণের অপরিবর্তনীয়তাও তিনি রক্ষা করেন। দেকার্তের এ মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা যায়। মানুষের দেহ এবং মনের ব্যাখ্যায়ও দেকার্ত দ্বৈতবাদী। মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন। দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা। দেহ আর মন চরিত্রগতভাবে পরস্পর-বিরোধী। এই দুই বিরোধী সত্তা পাইনিয়াল গ্লাণ্ড নামক একটি তন্ত্রীর মাধ্যমে মিলিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। বেকনের ন্যায় দেকার্তও প্রকৃতির কার্যকারণ জ্ঞাত হয়ে প্রকৃতিকে জয় করা এবং মানুষের চরিত্রকে উন্নত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। সঠিক জ্ঞানলাভের কি পদ্ধতি হবে? এর জবাবে দেকার্ত তাঁর বিখ্যাত

সন্দেহবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের জন্য এমন একটি ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে, যে-ভিত্তি সর্বপ্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে। যে সূত্র সন্দেহযোগ্য তার মাধ্যমে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দেকার্ত প্রচলিত সমস্ত সূত্রের উপর সন্দেহ পোষণ করতে করতে 'আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের ঊর্ধ্বে' বা 'কাজিটো আরগোসাম'—এই সিদ্ধান্তে আসেন। ব্যক্তি সব কিছুতেই সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু সে নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারে না। এ তত্ত্বের একটি অজ্ঞেয়বাদী তাৎপর্য আছে। কিন্তু দেকার্ত অজ্ঞেয়বাদী না হয়ে নিজের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, নিজের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত, এই সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করে আমরা জগতের সুনিশ্চিত জ্ঞানমণ্ডল আবার তৈরি করতে পারি। দেকার্তের এই জ্ঞানতত্ত্ব সাধারণত র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিতত্ত্ব নামে পরিচিত। তাঁর মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বের মতো আরো কতকগুলি জন্মগত সুনিশ্চিত সূত্র মানুষের আছে। এই সুনিশ্চিত সূত্রগুলির ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞানমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা। জন্মগত সুনিশ্চিত সূত্রগুলি ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে এ সূত্রগুলি সন্দেহাতীত এবং সন্দেহাতীত সূত্রের ভিত্তিতে যুক্তি পরম্পরায় লব্ধ যে-কোনো জ্ঞান সঠিক হতে বাধ্য। দেকার্ত তাঁর দর্শনে ও চিন্তায় যথার্থই দ্বৈতবাদী ছিলেন। এ কারণে একদিকে বস্তুবাদী মত দ্বারা তিনি যেমন গোঁড়ামির বেড়াজাল ভেঙে চিন্তার মুক্তিকে সাহায্য করেছেন, তেমনি অপরদিকে অতি-প্রাকৃতিক অস্তিত্বে জ্ঞানের মূল স্থাপন করে তিনি ইউরোপের আধুনিক দর্শনে ভাববাদী ধারারও প্রবর্তন করেন।

Determinism, Indeterminism : নির্ধারণবাদ, অনির্ধারণবাদ

জীবন ও জগতের সবকিছুই কার্যকারণের বিধান দ্বারা নির্ধারিত, এই তত্ত্বকে নির্ধারণবাদ বলা হয়। এর বিপরীতে, কোনো কিছুই কিছুর দ্বারা নির্ধারিত নয় কিংবা কোনো ঘটনা বা কার্য কিসের দ্বারা নির্ধারিত, তা ঈশ্বর বাদে কেউ জানে না এবং সে কারণে কোনো কিছু পূর্ব নির্ধারিত একথা মানুষ বলতে পারে না, এই বিশ্বাসকে অনির্ধারণবাদ বলা হয়। নির্ধারণবাদ এবং অনির্ধারণবাদ অনিবার্যতা এবং স্বাধীনতা কথাটিরই আর এক প্রকাশ। (দ্র. Freedom and Necessity : স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতা)।

Dewey, John : জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রি.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ জন ডিউইকে আমেরিকান প্রাগমেটিজম বা প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর এই দর্শনে এই অভিমতের উপর জোর দেন যে, কোনো ভাবের যথার্থতার মাপকাঠি হচ্ছে বাস্তব জীবনে তার প্রত্যাশিত ফল পাওয়া, না-পাওয়া। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কোনো ভাব বা তত্ত্ব ফলদায়ক না হলে সে তত্ত্বের কোনো মূল্য নেই। চিকাগোতে তিনি তার চিন্তাধারার পরীক্ষাগার হিসাবে শিশুদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে, 'দি স্কুল এ্যাণ্ড সোসাইটি', 'দি চাইল্ড এ্যাণ্ড দি কারিকুলাম' এবং 'হাউ ইউ থিঙ্ক'। 'ডিমোক্রাসি এ্যাণ্ড এডুকেশন' তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর প্রকাশকাল ১৯১৬। শিক্ষার সমস্যার উপর রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহে ডিউই শিশুদের শিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করা, কর্মের

ভিত্তিতে শিক্ষা প্রদান, খেলাধুলার সঙ্গে শিক্ষার যোগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিমতসমূহকে প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা সমাজকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রজ্ঞার যৌথ সম্মিলন ও প্রয়োগের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

Dhirendranath Datta : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) ১৯৪৮ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনই। তিনি পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। উর্দু এবং ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহারের অধিকার দাবী করেন। এটা পাকিস্তান শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি বলেই ১৯৪৮ সন থেকেই তিনি পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টির পাহারায় ছিলেন। তারই পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অকথ্য নির্যাতনের পর তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ : এ কথা ইতিহাসগতভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে।

Dialectics : দ্বন্দ্ব, দ্বান্দ্বিকতা

Dialectical Materialism : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

প্রাকৃতিক জগৎ, মানুষের সমাজ এবং চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বিধানসমূহের পরিচয় জ্ঞাপক তত্ত্ব। ইংরেজি 'ডায়ালেটিকস' শব্দ গ্রিক শব্দ 'ডায়ালোগ' থেকে উদ্ভূত। গ্রিক দর্শনে ডায়ালোগ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমাধান সন্ধানের পদ্ধতিকে গ্রিক দার্শনিকরা ডায়ালোগ বলতেন। প্রশ্ন, উত্তর বা পাল্টা প্রশ্নের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের অবস্থা বিরাজমান। এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাধানের পৌঁছার প্রক্রিয়ায় একটা গতির আভাসও বিদ্যমান। বস্তুত দ্বন্দ্ব, পরিবর্তন, গতি, এ কথাগুলি পরস্পরের ইঙ্গিতসূচক। যেখানে দ্বন্দ্ব আছে, সেখানে পরিবর্তন ও গতি আছে। প্রাচীন গ্রিসের একাধিক বস্তুবাদী দার্শনিক জগৎ সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যায় এই দ্বন্দ্ব গতি ও পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন। প্লেটো ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক হলেও তাঁর সংলাপসমূহ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উত্তম দৃষ্টান্ত। দ্বন্দ্ব কেবল প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে নয়। তার সংলাপে এরূপ আভাসও পাওয়া যায় যে, 'ভাব' বা চরম যে সত্তা তাকেও নির্দ্বান্দ্বিকভাবে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। চরম সত্তা একদিক দিয়ে যেমন অস্তিত্ব, তেমনি অপর দিক দিয়ে সে অনস্তিত্ব, একদিকে সে যেমন নিজে যা তাই, তেমনি সে নিজে যা নয় তা-ও বটে। সে অপরিবর্তনীয়, আবার পরিবর্তনীয়। যে-কোনো অস্তিত্বের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বকে অস্তিত্বের মূল বলে স্বীকৃতিদান এবং জগৎ, সমাজ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ব্যাপকতম প্রয়োগ ঘটেছে আধুনিককালে মার্কসীয় দার্শনিকদের দ্বারা। এ দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বিখ্যাত। মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিকতার পূর্ণতম ব্যাখ্যা হেগেল-এর দর্শনে ঘটেছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রাচীন দর্শনের পর হেগেলই সুস্পষ্টভাবে দ্বান্দ্বিকতার নীতি প্রকাশ করেছেন। হেগেলের মতে

আমাদের চিন্তাই যে কেবল অস্তি, নাস্তি এবং নাস্তির নাস্তিত্বের মাধ্যমে নতুনতর অস্তির উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয় তাই নয়, চরম সত্তাও অনুরূপ অস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নিজের সত্তাকে সৃষ্টি করে চলে। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও তাঁরা হেগেলের দর্শনকে গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে হেগেল একদিকে যেমন দ্বান্দ্বিক গতিকে স্বীকার করেছেন, অপর দিকে তেমনি চরম সত্তাকে ভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে বস্তু চরম ভাবের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার প্রকাশবিশেষ, বস্তু চরম সত্তা নয়। মার্কস এঙ্গেলস্ হেগেলের এই ভাববাদী তত্ত্বকে বর্জন করে ঘোষণা করেন যে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সতত এবং সর্বত্র যেমন ক্রিয়াশীল তেমনি চরম সত্তা হচ্ছে বস্তু, ভাব নয়। ভাব হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীল বস্তুরই বিকাশবিশেষ। এদিক দিয়ে মার্কসবাদ হেগেলের দর্শনের পরিপূর্ণ প্রতিপক্ষ। কাজেই হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস বা দ্বান্দ্বিকতার সঙ্গে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতার পার্থক্য আছে। মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা বস্তুর ক্রিয়াশীলতা এবং জ্ঞানের ক্রিয়াশীলতাকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে। বস্তু এবং বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করা যায় : বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ত বিদ্যমান। দ্বন্দ্ব থেকে গতির সঞ্চার। দ্বন্দ্বহীন এবং গতিহীন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই। দ্বন্দ্বমূলক গতিকে একটা বিশেষ অবস্থা থেকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, একটা বিশেষ অবস্থাকে যদি 'অস্তি' বলে বিবেচনা করা যায়, তা হলে দ্বন্দ্ব এবং গতির কারণে কালক্রমে 'অস্তি' নাস্তির সৃষ্টি করে, অস্তি ও নস্তির সংগ্রামে আবার কালক্রমে নতুনতর অস্তিত্বের সৃষ্টি হয় যার মধ্যে অস্তি ও নাস্তির অভিনব এবং উন্নততর সম্মেলন সংঘটিত হয়। ইংরেজিতে এই তিনটি অবস্থা 'থিসিস', 'এ্যান্টিথিসিস' এবং 'সিনথেসিস' বলে পরিচিত। দ্বান্দ্বিক গতির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিবর্তনের ক্রম সব সময় এক রকম থাকে না। পরিবর্তনের ক্রম বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অবস্থার ক্ষেত্রে একটা গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ বস্তুর ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিকতার নীতি প্রয়োগ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দ্বারা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আদি সাম্যবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের উত্তরণকে মার্কসবাদীগণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। এই নীতিতে কালক্রমে পুঁজিবাদী সমাজ নতুনতর সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবে বলেও মার্কস ও এঙ্গেলস্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্য অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন এবং অপরদিকে পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা চলছে, একেও দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের বাস্তব দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা হয়।

Dialogue : সংলাপ

সাহিত্যিক রচনায় দুটি চরিত্রের মধ্যকার কথোপকথনকে সংলাপ বলে। সাধারণ কথোপকথন থেকে সংলাপের বৈশিষ্ট্য এই যে, সংলাপ পূর্বপরিকল্পিত এবং এর মাধ্যমে রচনাকারী কোনো একটা প্রতিপাদ্যকে ধারাবাহিকভাবে প্রমাণের স্তরে নিয়ে যান। কোনো সমস্যা বা প্রশ্নের উভয় দিক উপস্থাপনের জন্য সাহিত্যিকগণ সংলাপকে সব যুগেই একটি উত্তম কৌশল বলে বিবেচনা করেছেন। লেখক প্রশ্নের পরস্পরবিরোধী দুটি দিক দুই চরিত্রের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থিত করেন যাতে যুক্তির খণ্ডনে যুক্তি অগ্রসর হতে হতে এমন সিদ্ধান্ত সমুপস্থিত হয়

যেখানে আর বিরোধের অবকাশ থাকে না। যে চরিত্র প্রতিপাদ্যের প্রতিপক্ষের ভূমিকা পালন করেছে সে চরিত্রও সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে। সংলাপমূলক রচনার উদ্ভব গ্রিক সাহিত্যে বলে অনেকে মনে করেন। সক্রেটিসকে প্রধান চরিত্র করে প্লেটো তাঁর সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বকে সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁর রচনা কেবলমাত্র দার্শনিক এই বিতর্কের জন্যই নয় ; তার নাটকীয়তা এবং রচনার মাধুর্যও অতুলনীয়। প্লেটোর সংলাপমূলক রচনাই সংলাপকে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত করেছে। কিন্তু গ্রিক সাহিত্যে প্লেটোর এই রচনাশৈলী কোনো উদ্ভাবন নয়। প্লেটোর পূর্বে গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে তত্ত্ব পেশ করার রীতি প্রচলিত ছিল। সক্রেটিস কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তিনি অপর চরিত্রের সঙ্গে জীবন ও জগতের সমস্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন। এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যের জন্য তা সক্রেটিসের সংলাপ বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক বিষয় পেশ করার জন্য সংলাপের স্থানে নিবন্ধই প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সংলাপ একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিক অন্যান্য শৈলীর সঙ্গে সংলাপের শৈলীও ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে দর্শনের ক্ষেত্রে জর্জ বার্কলের 'হাইলাস ও ফিলোনাস'—এর সংলাপ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

Dicast : ডাইকাস্ট

প্রাচীন এথেন্স নগর-রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রীয় পদের নাম। ডাইকাস্টকে জুরী বা বিচার-ব্যবস্থা বলে মনে করা যায়। এথেন্সের যারা নাগরিক অর্থাৎ যারা দাস কিংবা ঋণের দায়ে নাগরিকতা থেকে বঞ্চিত হয় নি এমন নগরবাসীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ছহাজার বিচারকের একটি তালিকা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হতো। এই বিচারক বা ডাইকাস্টগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা এবং বিরোধমূলক ঘটনার বিচার করতেন। গোড়ার দিকে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক না থাকলেও ডাইকাস্টদের জন্য পেরিক্লিস (খ্রি. পূ. ৪৯০-৪২৯) বেতন-দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এথেন্সের এই বিচার-ব্যবস্থা বা আদালতকে জনতার আদালত বলা যায়। কিন্তু এ বিচার-ব্যবস্থা এথেন্সের রাজনীতিক দলাদলি ও বিরোধ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হত। নিরপেক্ষ বিবেচনা বা বিচারের পরিবর্তে ডাইকাস্টের সদস্যগণ তাদের মনোভাব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা অধিক পরিচালিত হতেন। এথেন্সের বিচার-ব্যবস্থার এই দুর্নীতিকে বিষয় করে রচিত গ্রিক নাট্যকার এ্যারিস্টোফেনিসের 'ওয়াসপ্' বা বোলতা নামক নাটক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

Dictatorship of the proletariat : সর্বহারার একনায়কত্ব

সর্বহারার একনায়কত্ব কথাটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি ধারণা। মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর হাতে বিভিন্ন প্রকারে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার অস্ত্র। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, মানব সমাজে রাষ্ট্র অতীতের সর্বযুগে বিদ্যমান ছিল না এবং ভবিষ্যতেও একদিন থাকবে না। আদিম সাম্যবাদী মানব সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির একটা পর্যায়ে সমাজ যখন উৎপাদনের উপায়ের

কিছু সংখ্যক মালিক এবং উৎপাদনের উপায়হীন অধিক সংখ্যক মানুষে বিভক্ত হয়ে গেল, তখনি মাত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এই অবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের একচ্ছত্র মালিকদের আবশ্যক হয়ে পড়ে বঞ্চিতদের কাছ থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার। এজন্যই প্রয়োজন হয় আইন প্রণয়নের এবং আইনভঙ্গকারীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থার। প্রথম যুগের শ্রেণীবিভক্ত অর্থাৎ দাস সমাজের রাষ্ট্র আধুনিককালের রাষ্ট্র থেকে সহজতর হলেও মূলত উভয়ের চরিত্রই এক। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের মালিকদের মৌলিক স্বার্থ প্রতিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। মার্কসবাদী তত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-এর প্রত্যেকটি পর্যায়েই রাষ্ট্র হচ্ছে শাসকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারক ও বাহক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কথা বলা হলেও এর কোনো গণতন্ত্রই পুঁজিবাদের উচ্ছেদের জন্য বিপ্লব বা চরম প্রচেষ্টাকে স্বীকার করে না। কাজেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গণতন্ত্র, শাসক পুঁজিবাদী শ্রেণীর একনায়কত্বের স্বার্থে স্বীকৃত গণতন্ত্র, পূর্ণ গণতন্ত্র নয়। পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে রাশিয়ায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে অপর কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের রূপ কি? এ প্রশ্নের জবাবে মার্কসবাদের অন্যতম ব্যাখ্যাকারী এবং নেতা ভি.আই. লেনিন বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রও পরিপূর্ণরূপে শ্রেণীহীন রাষ্ট্র নয়। সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র। কৃষক শ্রেণী তার সহগামী। কিন্তু রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। এ কারণে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লব মারফৎ পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কোনো শ্রেণীই তার স্বার্থ বিনা প্রতিবাদে বা বিনা প্রতিরোধে প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দেয় না। জীবনের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। বিপ্লবের পূর্বে যেমন, বিপ্লবের পরেও তেমনি প্রকাশ্য-পরোক্ষ, সশস্ত্র-নিরস্ত্র এবং ভাবগত নানাভাবে পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বহির্দেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সহায়তায় উচ্ছেদ করে পুনরায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা সমাজতান্ত্রিক দেশে চলতে থাকা সম্ভব। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নির্বিকার থাকলে চলে না। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য তাকেও সংগঠনগত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন। এদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও একটি শ্রেণী-রাষ্ট্র। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রমিকশ্রেণীর একক নেতৃত্ব রক্ষাকারী সংগঠন। এ কারণে সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে সর্বহারার বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলা হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্থক্য এখানে যে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ হওয়ার কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষিত হওয়ার ন্যায় শ্রেণীর আর অস্তিত্ব থাকে না। কালক্রমে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এবং উৎসাদিত পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিরোধ বিলুপ্ত হলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকার প্রয়োজনও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সাম্যবাদী মানব সমাজে শ্রেণী হিসাবে কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার কোনো রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন আদৌ থাকবে না। রাষ্ট্র বলতে এখন যা বুঝায়, তেমন শক্তি প্রয়োগকারী সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মার্কসবাদের এই রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব থেকে দেখা যায় যে, সর্বহারার একনায়কত্ব পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌঁছার জন্য আবশ্যকীয় একটি অন্তর্বর্তী স্তরবিশেষ। ১৮৭০ সালে প্যারিস শহরের শ্রমিকরাও বিপ্লবের

মাধ্যমে প্যারিকম্যুন নামে একটি শ্রমিক-রাষ্ট্র কায়েম করেছিল। ফরাসি ধনীকশ্রেণী শক্তি প্রয়োগ করে সেদিন তাকে পর্যুদস্ত করে দেয়। কার্লমার্কস এবং এঙ্গেলস্ প্যারিকম্যুনের পরিণতি থেকে সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বহারার একনায়কত্বের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন।

Diderot : দিদেরত (১৭১৩-১৭৮৪ খ্রি.)

অষ্টাদশ শতকে ফরাসিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য 'বিশ্বকোষ' রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন মুক্তবুদ্ধির যে পথিকৃতরা তাঁদের অন্যতম ছিলেন দিদেরত। ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত সেকালের বিশ্বকোষের আদর্শে দিদেরত ফরাসি ভাষায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির উপর বিশ্বকোষ রচনার কথা চিন্তা করেন। এ কাজে তাঁর অপর এক সঙ্গী ছিলেন ডি' আলেম্বার্ট। বিরাট প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাঁরা জ্ঞান প্রচারের এই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে ১৭৫৯ সনে সামন্ততান্ত্রিক সরকার এ পরিকল্পনার কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এমন অবস্থায় অনেক সঙ্গী তাঁকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দিদেরত পরাজয় স্বীকার না করে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলে গোপনে যাতায়াত করে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর এই অদম্য চেষ্টা ক্রমান্বয়ে তাঁকে ফরাসি বিদ্বৎ মহলে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। অভিজাত শ্রেণীর উদারপন্থী ব্যারণ এবং লেখক ডি হলবাক তাঁর পৃষ্ঠপোষক হন। বিশ বছরের চেষ্টায় ফরাসি বিশ্বকোষের যে ১৭টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, সে জ্ঞানকোষ ফরাসি জনমানসে নতুন বৈজ্ঞানিক ও ইহজাগতিক এক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। দারিদ্র্যের কারণে নিজের অপরিসীম পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত তার গ্রন্থাগার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন গ্রন্থাগারটি ক্রয় করে, গ্রন্থাগারটিকে প্যারিস থেকে স্থানান্তর না করে প্যারিসে দিদেরতকে তার গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। বিশ্বকোষ তৈরির উদ্যোগের পূর্বে দিদেরত ফরাসি দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার অন্যায় এবং কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সরকার তা নিষিদ্ধ করে দিদেরতকে কারাগারে বন্দি করেছিল। কিন্তু কোনো নির্যাতন মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা দিদেরতকে দমিত করতে পারে নি। তাঁর জীবনকালেই তিনি ফরাসি দেশের অন্যতম অগ্রসর চিন্তানায়ক এবং লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

Diogenes : ডায়োজেনিস (খ্রি. পূ. ৪১২-৩২৩)

ডায়োজেনিস ছিলেন গ্রিসের সিনিক বা উদাসীন দার্শনিক (দ্র. Cynic : উদাসীন) ডায়োজেনিস সিনিক দর্শনের প্রবক্তা এ্যান্টিসথেনিসের শিষ্য ছিলেন। একবার সমুদ্রযাত্রায় জলদস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে কোরিন্থে দাস হিসাবে বিক্রিয় করে। কোরিন্থে তিনি জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত করেন এবং তাঁর আত্মসংযম ও কৃচ্ছ্রতাপালনমূলক দর্শনের প্রচার করেন। তাঁর সম্পর্কে নানা উপকথা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর কি উপকার করতে পারেন এরূপ প্রশ্নকালে তিনি ব্যঙ্গসহকারে বলেছিলেন : আপনি দয়া করে আমার সূর্যের আলোটুকু আড়াল না করে সরে দাঁড়াতে পারেন। ডায়োজেনিস মনে করতেন, জীবনের সার্থকতা ভোগে নয়, ত্যাগে এবং কষ্টভোগে, কৃচ্ছ্রতাসাধনে। কষ্ট এবং দুঃখভোগ উত্তম চরিত্র অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন এবং সহজ জীবনযাপনেই মাত্র মানুষের সকল

প্রকার রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি এবং অস্থিরতা থেকে মুক্তির পথ। ডায়োজেনিস প্লেটোর ভাব বা নির্বিশেষ সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর মতে বিকাশই একমাত্র অস্তিত্ব। নির্বিশেষ অস্তিত্বহীন।

Distribution of Terms : পদের বন্টন

যুক্তিবিদ্যায় একটি যুক্তির মধ্যে বাক্যের একটি টার্ম বা পদের সংখ্যা বা ব্যক্তার্থকে সামগ্রিকভাবে বুঝানো হলে বাক্যের সেই পদটিকে বণ্টিত পদ বা ডিস্ট্রিব্যুটেড টার্ম বলে। অবরোহ যুক্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যুক্তির মধ্যে পদের বন্টন এবং অ-বন্টনের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হয়। যৌক্তিক বাক্যকে সাধারণত চারভাগে ভাগ করা হয় যথা : সার্বিক এবং বিশেষ ; হাঁ বাচক এবং না বাচক। একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক হাঁ বাচক বাক্য তার উদ্দেশ্য পদকে, সার্বিক না বাচক তার উদ্দেশ্য বিধেয় উভয়পদকে, বিশেষ না বাচক কেবল তার বিধেয় পদকে বন্টন করে। কিন্তু বিশেষ হাঁ বাচক কোনো পদকেই বন্টন করে না। সকল মানুষ মরণশীল, এটি একটি সার্বিক হাঁ বাচক বাক্য। এখানে উদ্দেশ্যপদ 'মানুষ'-এর সংখ্যা বা ব্যক্তার্থের সমগ্রের উপর বক্তব্যটি প্রযোজ্য বলে উদ্দেশ্য পদটি বণ্টিত। 'কিছু মানুষ সৎ' এটি একটি বিশেষ হাঁ বাচক বাক্য। এখানে সকল মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সততার কথাটি প্রযোজ্য নয়, তেমনি সকল সৎ-এর উপরও এই বাক্যের 'কিছু মানুষ' পদটি প্রযোজ্য নয়। এ কারণে এই বাক্যের কোনো পদই বণ্টিত নয়। যুক্তির মধ্যে কোনো পদ বন্টন না করে সিদ্ধান্তে তাকে বন্টন করা হলে অবণ্টিত পদের বন্টনজনিত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

Divine Right : ঐশ্বরিক অধিকার

ঐশ্বরিক অধিকার একটি রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা বিধাতার প্রতিনিধি। রাজার আনুগত্য বিধাতার প্রতি। প্রজার আনুগত্য রাজার প্রতি। রাজার কোনো কাজের জন্য রাজা প্রজার নিকট দায়ী থাকবে না। সে দায়ী থাকবে বিধাতার নিকট। রাজার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে যুক্তিসঙ্গত এবং জোরদার করার জন্য এক সময়ে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অন্যায়। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লস এই তত্ত্ব এরূপ চরম আকারে রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রয়োগ করতে শুরু করেন যে, এর ফলে সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্ট ও জনসাধারণের বিরোধ তীব্র আকার গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বের বিশেষ প্রভাব ছিল। ফরাসি বিপ্লব এই তত্ত্বকে আঘাত করে বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত করে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

Dream : স্বপ্ন

স্বপ্ন বয়স নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রায় নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। 'নিদ্রার মধ্যে চেতনার একটি প্রকাশ' বলে স্বপ্নের একটি সংজ্ঞা দেওয়া চলে। সাধারণভাবে একথা সত্য যে, নিদ্রার মধ্যে দেহের সচেতন কার্যাবলী বন্ধ বা স্থগিত থাকে। নিদ্রার মধ্যে আমরা কোনো দ্রব্যকে চোখ দিয়ে দেখি না। হাত নেড়ে কোনো কাজ করি না। পা দিয়ে হাঁটি না। তাই মনে করা হয়, নিদ্রার মধ্যে

মস্তিষ্ক বিশ্রাম করে নিজের ক্ষয়কে পূরণ করে জাগরিত হয়ে পুনরায় কার্যে নিবদ্ধ হয়। কিন্তু নিদ্রার মধ্যে মস্তিষ্ক যে একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকে না তারই পরিচয় বহন করে মানুষের স্বপ্ন। আমরা বলি মানুষ স্বপ্ন দেখে। অবশ্যই আমরা চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সচেতন সময়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের একরূপ অভিজ্ঞতা ঘটে। 'স্বপ্ন' ব্যাপারটা পূর্বে ঐশ্বরিক এবং রহস্যজনক ব্যাপার বলে মনে করা হতো। যেমন প্রাচীনকালে তেমনি এখনো সাধারণ মানুষ তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য উদঘাটনের জন্য ধর্মীয় পুরুষ তথা পীর দরবেশ সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু আধুনিককালে স্বপ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানীগণ বিশেষ গবেষণা সম্পাদন করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে আজকাল স্বপ্নকে বাস্তব জীবনের অপূর্ণ কামনা বাসনার একরকম পূরণ বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বপ্নের বিষয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশুদের বেশিরভাগ স্বপ্নই তাদের সচেতন অবস্থার নানা আদর আবদার আঘাতের সঙ্গে জড়িত। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্পর্ক সহজে ধরা না গেলেও, যে কামনা বাসনা মানুষ তার সচেতন সামাজিক জীবনে নানা বাধা নিষেধ সংকোচ ও সংস্কারে পূরণ করতে পারে না সেসব কামনা বাসনা প্রত্যক্ষরূপে না হলেও পরোক্ষ এবং নানা প্রতীকে নিদ্রার মধ্যে যে তাকে কিছুটা তৃপ্ত করতে পারে, এ অভিমত আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে ইউরোপের চিকিৎসাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েডের গবেষণা ও প্রকাশনায়।ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুসারী মনোবিজ্ঞানীগণ মনকে চেতন, অবচেতন এবং অচেতন ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে মনের চেতন ভাগ তেমন বৃহৎ নয়। মানুষের আপাত বিস্মৃত এবং অবদমিত চিন্তা, ভাবনা, উদ্বেগ, কামনা অবচেতন এবং অচেতনে নিক্ষিপ্ত হলেও তারা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। প্রত্যেকটি কামনা একটি শক্তি বা এনারজিবিশেষ। যে-কোনোভাবে প্রকাশের মাধ্যমে তার পূর্তি না ঘটলে তার বিলোপ ঘটে না। ফ্রয়েড স্বপ্নকে মানুষের অবচেতন এবং অচেতন জগতের রহস্য উদ্ধারের একটি চাবিকাঠি বলে গণ্য করেন। এই তত্ত্বের উপরই আধুনিক মনঃসমীক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Dutt, Aswinikumar : অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩ খ্রি.)

বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অধিবাসী। অশ্বিনীকুমার দত্তের পৈতৃক বাড়ি এই জেলার বাটাজোড় গ্রামে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতার কর্মস্থল পটুয়াখালীতে। পিতা ব্রজমোহন দত্ত একজন সাবজজ ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃস্থানীয় পরিবার ছিল বরিশালের দত্ত পরিবার। অশ্বিনীকুমার দত্ত এম.এ.বি.এল. ছিলেন। ছাত্রজীবনের পরে কিছুকাল তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি শিক্ষকতার চাকুরি পরিত্যাগ করে বরিশালে ওকালতি ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কিন্তু ১৮৮২ সনে ওকালতি পরিত্যাগ করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পিতা ব্রজমোহনের নামে তিনি প্রথমে ব্রজমোহন তথা বি. এম. স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৪ সনে। ১৮৮৯ সনে ব্রজমোহন কলেজ বা বি.এম. কলেজকেও তিনি স্থাপন করেন। এই কলেজে তিনি পঁচিশ বছর কোনো বেতন গ্রহণ না করে অধ্যাপকের কাজ করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৮৭ সনে বাখরগঞ্জ (বরিশাল জেলার পুরাতন নাম) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপিত হয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী কর্মী ছিলেন। বরিশালের তিনি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ১৯০৬ সনে বরিশালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে অশ্বিনীকুমার দত্তসহ কংগ্রেসের বহু নেতা আহত হন। ১৯০৮-১৯১০-এ অশ্বিনীকুমার কারাগারে বন্দি ছিলেন। তার কর্মকাণ্ড কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজসেবামূলক কার্যে তাঁর সাংগঠনিক শক্তি তিনি নিয়োগ করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেছিলেন এবং সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে যে সকল পুস্তক রচনা করেন—সে সকল পুস্তক তাঁকে একজন বিশিষ্ট সাধক এবং চিন্তাবিদ হিসাবে বৃহত্তর জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রেম', 'আত্মপ্রতিষ্ঠা', 'ভারতগীতি' প্রভৃতি বিখ্যাত। বরিশালে বিখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক চারণ কবি ও গায়ক মুকুন্দ দাস (যজ্ঞেশ্বর দাস) অশ্বিনীকুমারের অনুপ্রেরণায় নিজের মুদী দোকানের ব্যবসায় পরিত্যাগ করে 'মুকুন্দ দাস' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর সমাজসেবা অশ্বিনীকুমারকে দেশব্যাপী মহৎ আত্মার অধিকারী বলে প্রতিষ্ঠিত করে। বরিশাল শহরে আজ অবধি বি.এম.স্কুল ; বি.এম. কলেজ এবং অশ্বিনীকুমার টাউন হল তাঁর কর্মোদ্যোগের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পাকিস্তান-শাসনকালে ষাটের দশকে প্রতিক্রিয়াশীল মহল অশ্বিনীকুমারের অবদান অস্বীকার করে বরিশাল শহরের 'অশ্বিনীকুমার টাউন হলে'র নাম পরিবর্তন করে 'আয়ুব খাঁ টাউন হল' রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজ ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনের সময়ে এই প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে টাউন হলের নাম 'অশ্বিনীকুমার টাউন হল' হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

E

Eclecticism : সারবাদ, সমন্বয়বাদ

তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেউ যদি একাধিক তত্ত্বের অংশবিশেষ গ্রহণ করে সবটা মিলিয়ে একটা তত্ত্বের আকার দেবার চেষ্টা করেন, তা হলে তাঁকে সারবাদী বা সমন্বয়বাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়। জ্ঞানের রাজ্যে বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে একটি মাত্র তত্ত্বই উদ্ভূত হয় নি। একই সমস্যার ব্যাপারে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বিভিন্ন মত উপস্থিত করেছেন। বস্তু, জীবন, জগৎ প্রভৃতির মূল চরিত্র কি? এ প্রশ্নে বস্তুবাদ মনে করে যে, বস্তুই সব কিছুর মূল। অপরপক্ষে ভাববাদ মনে করে মানুষের মনের ভাব কিংবা ব্যক্তির মন নিরপেক্ষ এক চরম ভাবই হচ্ছে সব কিছুর মূল। এ দুটো মত পরস্পর-বিরোধী। সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ মনে করে আর্থিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অর্থাৎ পুঁজিসম্পন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার অবাধ স্বাধীনতা এবং উদ্যোগই কাম্য। সমাজতন্ত্রবাদ মনে করে উৎপাদনের উপায়ের উপর সমষ্টির অধিকারই কাম্য, ব্যক্তিগত মালিকানা অসঙ্গত। এ দুটি মতও পরস্পর-বিরোধী। সাধারণত যে বস্তুবাদী, সে ভাববাদকে গ্রাহ্য করতে চায় না। যে পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রবাদকে পুরোপুরি নাকচ করে। যে-কোনো তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা অনুসারীর পক্ষে এটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ একটি তত্ত্ব সামগ্রিক তত্ত্ব হয়ে ওঠে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার দাবির ভিত্তিতে। সাধারণ মানুষ সবসময়ে কোনো একটি তত্ত্বের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করে না। দৈনন্দিন প্রয়োজনে এবং সমস্যার সাময়িক জবাবে বিভিন্ন তত্ত্বের, এমনকি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের পছন্দমতো অংশ সে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। এ প্রবণতা কেবল সাধারণের ক্ষেত্রে নয়। ইতিহাসে প্রখ্যাত অনেক চিন্তাবিদের মধ্যেও বিভিন্ন মত সমন্বয়ের প্রয়াস দেখা যায়। বিভিন্ন মতের সমন্বয়কে একটা প্রবণতা হিসাবে ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। সর্বমতের সমন্বয় মারফত কোনো ঐক্যবদ্ধ সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব দাঁড় করানো সম্ভব নয়। যাঁরা এরূপ চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে মানুষের কল্যাণ সাধনের একটা সহজ আবেগই বেশি কাজ করে। তাঁরা মনে করেন, সত্য কোনো একটি তত্ত্বের মধ্যে নিহিত না থেকে সমস্ত তত্ত্বেই আংশিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সত্যসন্ধানীর কাজ হবে সমস্ত ক্ষেত্র থেকে অংশসমূহকে একত্র করে সত্যের একটি সমগ্র-সত্তা তৈরি করা। এরূপ ইচ্ছার মধ্যে কল্পনার প্রকাশই বেশি। ফলে, সমন্বয়বাদী তত্ত্বের একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সমন্বয়বাদীর মতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, বস্তুবাদ ও ভাববাদ একই সময়ে গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। সমন্বয়বাদী মনে করে, সমাজতন্ত্রবাদ এবং পুঁজিবাদ মিলিয়ে সর্বসমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। আধুনিককালের ন্যায় দর্শনের ইতিহাসে অতীতকালেও এরূপ সমন্বয়বাদী লেখক ও দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের

বাগ্মী ও দার্শনিক সিসিরো (১০৬-৪৩ খ্রি. পূ.) এরূপ সমন্বয়বাদী বলে প্রখ্যাত। সমন্বয়বাদের মনোভাব থেকে তিনি মতামত-নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন গ্রিকদর্শনের সর্বপ্রকার দার্শনিক মতকে রোমকদের কাছে পেশ করার চেষ্টা করেন।

Economism : অর্থবাদ

শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিত্যাগ করে আংশিক আর্থিক দাবি আদায়ের প্রবণতাকে অর্থবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে আন্দোলনের মধ্যে অর্থবাদ একটি বিতর্কিত ধারা ছিল। লেনিনের অনুসারী বলশেভিকগণ নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অর্থবাদের অভিযোগ আনেন। এঁদের মতে অর্থবাদের অনুসারীগণকে সমাজতন্ত্রবাদী বলা চলে না। কেননা, সমাজতন্ত্রবাদের আন্দোলন কেবলমাত্র শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন নয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শ্রমিকদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও আন্দোলন। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন দ্বারা শ্রমিকদের মুক্তি সম্ভব নয়। রুশ বলশেভিক সংগঠনের মধ্যে কারা অর্থবাদী এবং তাদের মত কিরূপে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর, তার বিশ্লেষণ করে লেনিন 'কি করণীয়' নামক পুস্তক রচনা করেন। শ্রমিক আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম আজ অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ কারণে অর্থবাদ এবং তার প্রতিবাদী মত আজ কোনো বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একে একটি আন্তর্জাতিক ধারা বলে অভিহিত করা চলে।

Economic Determinism : অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ

মার্কসবাদের সমালোচকগণ ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে স্থূলভাবে 'অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ' বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে মার্কসবাদ ইতিহাসের মূল চালক-শক্তি হিসাবে কেবল আর্থনীতিক শক্তি তথা উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জোর দেয়, মানুষের উপর ভাব তথা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রভাবকে অস্বীকার করে। মার্কসবাদীগণ এরূপ সমালোচনাকে মার্কসবাদের স্থূল ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। মার্কস-এঙ্গেলস্ তথা মার্কসবাদের প্রবক্তাদের মতে মানুষের জীবনে এবং তার ইতিহাসের বিকাশে মানুষের জীবন ধারণ তথা তার জীবিকার ক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং বিকাশমান উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের সম্পর্ক মূল শক্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের জীবন স্থূলভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উৎপাদনের উপায়কে উন্নত এবং পরিবর্তিত করার জন্যই মানুষের চিন্তা ভাবনা এবং তার থেকে উদ্ভূত বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস। উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে এগুলি দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্ক যেমন সমাজের ভাবগত সৃষ্টিগুলির উৎস এবং তাদেরকে প্রভাবিত করে, মানুষের ভাবনা, চিন্তা, বিশ্বাস, আবিষ্কারও উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্ককে তেমনি প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত করে। কাজেই এ তত্ত্বকে কেবল অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ কিংবা মানুষের ভাবকে অস্বীকারমূলক তত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করা ভুল।

Eleatics : ইলিয়া-দর্শন

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে দক্ষিণ ইতালির ইলিয়া নামক দ্বীপটি প্রাচীন গ্রিক দর্শনচর্চার একটি কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে। জেনোফেন্স, পারমিনাইডিস, জেনো এবং মিলিসাস এই দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের দার্শনিক অভিমতসমূহ ইলিয়া দ্বীপের দর্শন নামে খ্যাতি লাভ করে। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে উপরোক্ত দার্শনিকদের মতের একটা ঐক্য এই ছিল যে, এঁরা সকলেই মনে করতেন, সৃষ্টির মূল সত্তা অপরিবর্তনীয়। বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর এটা বাহ্য এবং মায়া। পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূল সত্তার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। বিচিত্র বাহ্যবস্তুর মূলে একটিমাত্র সত্তা বিরাজমান। ইলিয়া দার্শনিকদের এই একত্ববাদী চিন্তা প্রাচীন দর্শনের ভাববাদী ধারার সূচনা করে। এতদিন পর্যন্ত গ্রিসের হিরাক্লিটাস এবং অন্যান্য দার্শনিক সৃষ্টির মূলে একটির বদলে একাধিক সত্তার কল্পনা করেছেন। বিশেষ করে মাটি, জল, বায়ু এবং অগ্নি প্রভৃতিকে সৃষ্টির মূল বলে তাঁরা আখ্যায়িত করেছেন। এই বহুত্ববাদী চিন্তাকে ইলিয়া দার্শনিকগণ নাকচ করে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সৃষ্টির মূল সত্তা এক, অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয়—স্থির এবং অসীম। ইলিয়া দর্শনের পরবর্তীযুগ খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতকে প্লেটো এই চিন্তাকেই অধিকতর সূক্ষ্ম যুক্তির মাধ্যমে এক অ-বস্তুমূলক, অসীম, অক্ষয় এবং অজ্ঞেয় ভাবকে সমস্ত প্রকাশের মূল বলে ঘোষণা করেন। ইলিয়ার দার্শনিকগণ বস্তুর বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনকে অস্বীকার করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি মাধ্যমের নির্ভরযোগ্যতাকে অস্বীকার করেন এবং জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে মনে করেন।

Einstein : আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রি.)

আধুনিক বিজ্ঞানের বিখ্যাত 'রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রবক্তা। ধর্মগতভাবে আইনস্টাইন ছিলেন ইহুদি। তাঁর পিতামাতা তার শিশু বয়সে জার্মানির মিউনিকে আসেন। পরবর্তীতে তাঁর পরিবার ইতালির মিলানে যান। শিক্ষা জীবনে অঙ্কশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল একটি স্কুলে অঙ্কের শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে বার্লিনে একটি পরিবারে গৃহশিক্ষকতাও করেন। ১৯০৫ সনে আইনস্টাইন আলোর রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন অব লাইট, অণুর মাত্রা বা মলিক্যুলার ডাইমেনশনস, গতিময় পদার্থের তড়িৎ প্রবাহ বা ইলেকট্রো ডাইনামিকস অব মুভিং বডিস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে নিবন্ধাদি প্রকাশ করেন। এই সূত্রে ম্যাক্স প্লাঙ্কের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটে। ১৯০৯ সনে আইনস্টাইন জুরিকে তাত্ত্বিক পদার্থের বিশেষ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সনে তিনি বার্লিনের কাইজার ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সনে হিটলারের নাজিবাদের ইহুদি বিদ্বেষের কারণে উক্ত পদ থেকে অপসারিত হন এবং জার্মানি ত্যাগ করে তিনি ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারও পরবর্তী সময়ে আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। আইনস্টাইনের তত্ত্ব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে, আলোর বিকিরণ তত্ত্বে তিনি সময় এবং স্থানের আপেক্ষিকতা দ্বারা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন।

তাঁর মতে সময় এবং স্থান কোনো দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্তা নয়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব আধুনিক দর্শন এবং বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করেছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের বাইরে সাধারণ পাঠকের জন্যও তিনি সমকালের বিভিন্ন সমস্যার উপর চিন্তা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল দ্বিধাহীন এবং সুস্পষ্ট। ১৯৩৩ সনে ফ্রয়েডের সঙ্গে যুক্তভাবে শান্তির উপর তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তার নাম 'যুদ্ধ কেন?' 'হোয়াই ওয়ার'। ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আমার দর্শন' নামক গ্রন্থ। প্রখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) তাঁর ইউরোপে গবেষণা কর্মে নিযুক্ত থাকা কালে আইনস্টাইনের সাহচর্যে আসেন। আইনস্টাইন ১৯২৪ সনে অধ্যাপক বসুর 'প্লাঙ্ক সূত্র এবং কোয়াণ্টাম প্রকল্প' প্রবন্ধটি পাঠ করে চমৎকৃত হন এবং সেটি নিজে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি বোস আইনস্টাইন সংজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

Elements : মূল, মূল উপাদান, মৌল পদার্থ

দৃশ্যত বস্তু বিভিন্ন আকারের এবং বহু প্রকারের। দূর অতীতেও মানুষ স্বাভাবিকভাবে এই বহুর পেছনে বহুর উৎস বা কারণ হিসাবে একটি মূলের সন্ধান করেছে। কিন্তু বিচিত্রের মূলে মাত্র একটি সত্তা আছে, এ সিদ্ধান্ত মানুষ শুরুতেই করতে পারে নি। তবে বাহ্যত যত প্রকার বস্তু দেখা যায়, সবই মূল নয়, এ ধারণা মানুষ বাহ্য বস্তুর দ্রুত পরিবর্তন, রূপান্তর বা বিলুপ্তি থেকে পোষণ করতে থাকে। এর ফলে মূল হিসাবে মানুষ ক্রমে এককের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এরূপ চেষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিশেষভাবে প্রাচীন গ্রিস এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ)-কে বিশ্বের মূল বলে মনে করতেন। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকগণ বস্তুর বদলে তাপ-শৈত্য, আর্দ্রতা-শুষ্কতা প্রভৃতি বিপরীত গুণকে সমস্ত সৃষ্টির একক বলে কল্পনা করেছেন। এই সমস্ত বিপরীত ধর্ম বা গুণের সংযোগে সমস্ত রকম বস্তু বা সৃষ্টির প্রকাশ। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে গ্রিক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস এবং এপিক্যুরাস বস্তুর মূলে অণুর অস্তিত্বের তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁদের মতে, অণু হচ্ছে বস্তুর সূক্ষ্মতম এবং অবিভাজ্য মৌলিক উপাদান। অণুর সংযোগই বস্তুর বৈচিত্রের সৃষ্টি। এ আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বস্তুর মূল সম্পর্কে ধারণা মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সাথে জড়িত। জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থাতে সৃষ্টির মূল উপাদান সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা ছিল, জ্ঞানের বিকাশ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সে ধারণা বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের একটা বিষয় লক্ষণীয়। বস্তুর মূল কি, অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃতি স্থির করার গবেষণায় মানুষ একদিকে যেমন জটিলতাহীন এবং অবিভাজ্য কোনো এককের সন্ধান লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে তেমনি গবেষণার বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষকে ক্রমান্বয়ে এই সত্য স্বীকারে বাধ্য করেছে যে, বস্তু এক অসীম জটিল অস্তিত্ব। কারণ, মানুষ মূলে অবিভাজ্য কোনো একককে আবিষ্কার করতে আজো সক্ষম হয় নি। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ধারণা ছিল যে, বস্তুর মূলে একক হিসাবে অপরিবর্তনীয় অবিভাজ্য কোনো উপাদান আছে। কিন্তু উনিশ

শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ, বিশেষ করে পদার্থ-বিজ্ঞান বস্তুর সেই পুরাতন ধারণাকে একেবারেই নাকচ করে দিয়েছে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের কাছে বস্তুর মূল বলে যে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন বিবেচিত হয়, তাদের গঠনও অশেষ জটিলতাপূর্ণ। আধুনিক দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বস্তুর মূল সত্তাকে সদা দ্বান্দ্বিক বা বিরোধাত্মক ধারায় পরিবর্তনশীল অস্তিত্ব বলে বিবেচনা করে। ভ্লাদিমির লেনিন তাঁর 'ম্যাটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে এরূপ উক্তি করেছিলেন যে, 'এ্যাটমের ন্যায় ইলেকট্রনও হচ্ছে অসীম সম্ভাবনাময় এবং বিশ্বজগতের কোনো শেষ নেই।'

Elite, Elitism : এলিট, অভিজাত, এলিটবাদ, নয়া-অভিজাতবাদ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাত্ত্বিকদের মধ্যে আলোচিত একটি তত্ত্ব হচ্ছে এলিট তত্ত্ব। 'এলিট' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এ থেকে এলিটবাদকে শ্রেষ্ঠত্ববাদ কিংবা নয়া অভিজাতবাদ বলেও অভিহিত করা চলে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবর্তক হিসাবে ইতালির ভিলফ্রেডো পারেটো (১৮৪৩-১৯২৩) এবং গায়টানো মসকা পরিচিত। এ সমস্ত চিন্তাবিদ প্রধানত অযুক্তি এবং শক্তিবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী। মানুষের চরিত্রের মধ্যে অযুক্তি এবং শক্তির প্রতি আকর্ষণমূলক প্রবণতার উপর এঁরা জোর প্রদান করেন। এঁদের মতে প্রকৃতি মানুষকে সমাজ হিসাবে তৈরি করে নি। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই নানা গুণের ভিত্তিতে 'এলিট' বা শ্রেষ্ঠ এবং 'অ-এলিট' বা 'অ-শ্রেষ্ঠ' হিসাবে বিভক্ত। এবং সমাজের নেতৃত্ব কিংবা রাষ্ট্র শাসন উভয় ক্ষেত্রে চিরকাল যারা বিদ্যা, বুদ্ধি, চাতুর্য, কূট-কৌশল দৈহিক শক্তি ইত্যাদি গুণে শ্রেষ্ঠ তারা শাসন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এরাই শাসন করবে। এই শ্রেষ্ঠ অংশ অবশ্যই সংখ্যালঘু। সংখ্যায় তারা অল্প। সেদিক থেকে অল্পরাই অধিকের উপর শাসন করে। এরূপ তত্ত্বের অপর এক সমর্থক রবার্ট মিশেল-এর মতে মানুষের জীবনে অল্পের শাসন হচ্ছে নিয়মের অমোঘ বিধান। তাঁর এরূপ অভিমত 'আয়রন ল অব অলিগার্কী' বা 'কতিপয়ের লৌহ বিধান' বলে পরিচিত। প্রাচীনকালে প্লেটো-এ্যারিস্টটলও মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিগত গুণের উপর জোর দিয়ে মানুষের একাংশকে অভিজাত বলে অভিহিত করতেন। তার ভিত্তিতে 'অভিজাততন্ত্র' বলে এক প্রকার শাসন ব্যবস্থাকেও তাঁরা নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু সে আভিজাত্য ছিল জ্ঞানের আভিজাত্য। তার মধ্যে একটা মহৎ গুণের অনুষঙ্গ থাকত। কিন্তু বর্তমান কালের এলিটবাদ বা শ্রেষ্ঠত্ববাদ কেবল মহৎ গুণের দ্বারা তৈরি হয় না। উল্লিখিত চিন্তাবিদদের মতে গুণ বা দক্ষতাকে ভালো-মন্দ হিসেবে বিভক্ত করা অর্থহীন। চোর কিংবা ডাকাতের দক্ষতাও দক্ষতা, রাজনীতিকদের মধ্যে বাগ্মী বা কৌশলী রাজনীতিকের দক্ষতাও দক্ষতা। এদিক থেকে মানুষের যে-কোনো পেশা বা গোষ্ঠীর মধ্যেই 'শ্রেষ্ঠ' 'অ-শ্রেষ্ঠ' বলে ভাগ থাকে। এবং প্রত্যেকটি অংশের শ্রেষ্ঠরাই তথা অল্পরাই শাসন করে এবং অ-শ্রেষ্ঠ তথা সংখ্যাধিকেরা শাসিত হয়। শাসনের ক্ষেত্রে এলিটদের দুই নামে অভিহিত করা চলে। যারা শাসকমণ্ডলীর অন্তর্গত তারা 'পাওয়ার এলিট' বা 'শাসক-এলিট' এবং যারা 'শাসনের বাইরে অবস্থিত' তারা 'অ-শাসক' বা 'নন পাওয়ার এলিট' বলে অভিহিত। এর ভিত্তিতে এদের তত্ত্বে 'এলিট সঞ্চালন' বা সারকুলেশন অব এলিট' কথাটি এসেছে। শাসনের বাইরের এলিটরা শাসনের

ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কালক্রমে শাসক-এলিটরা অ-শাসক এলিট দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। এই প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। সমাজকে শ্রেষ্ঠ, অ-শ্রেষ্ঠ এবং সংখ্যাল্প ও সংখ্যাধিকে বিভক্ত করার তত্ত্ব কোনো মৌলিক বা বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব নয়। এর মাধ্যমে মানুষের সমাজের সংকটের চরিত্র অনুধাবনে তেমন কোনো সুবিধা হয় না। বাহ্যত বিবরণমূলক এবং নীৎসের শক্তিবাদের সমর্থক এ তত্ত্বের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের আশাবাদী চিন্তাকে নস্যাৎ করা। এর আক্রমণের প্রধান বিষয় হচ্ছে আধুনিক গণতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী চেতনা। মার্কসবাদী শ্রেণী বিশ্লেষণকে এ তত্ত্ব নাকচ করার চেষ্টা করেছে। এবং শক্তিবাদী এই তত্ত্বের অনুসরণেই বিংশ শতকে ইতালি, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সামন্তবাদী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণীসমূহ ফ্যাসিবাদ, নাজীবাদ ও সমরবাদী রাষ্ট্র্যব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়।

Emergent Evolution : আকস্মিক বিকাশ, আকস্মিক বিবর্তন

দ্র : Accidental Evolution

Emotion : আবেগ, প্রক্ষোভ

ব্যক্তির মানসিক অবস্থাবিশেষ। ব্যক্তি তার পরিবেশ অর্থাৎ অপর ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে সতত একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানসিক অবস্থায় যখন কোনো ব্যতিক্রমের উদ্ভব ঘটায়, তখন তাকে মনের আবেগ বা প্রক্ষোভ বলে অভিহিত করা হয়। আবেগ মনোবিজ্ঞানের একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। এর মাধ্যমে আমরা পরিবেশ অর্থাৎ অপর ব্যক্তি এবং বস্তুজগৎ বা ঘটনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রতিক্রিয়াজনিত একটা অবস্থাকে বুঝাই। ব্যক্তি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। কিন্তু ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেবল যান্ত্রিক নয়। ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পেছনে মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সে ইচ্ছা-অনিচ্ছার আগ্রহ, তীব্রতাও কাজ করে। ব্যক্তির দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর প্রাচীন গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের জ্ঞানী এমপিডোকলিসকে আলোকপাত করতে দেখা যায়। যে-কোনো প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে আবেগের ভূমিকা মানুষের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় হিসাবে আবেগকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। আনন্দ উৎপাদক আবেগকে সক্রিয় আবেগ এবং নিরানন্দ বা বিমর্ষতা উৎপাদক আবেগকে নিষ্ক্রিয় আবেগ বলা হয়। আবেগ শুধু মনের ব্যাপার নয়। আবেগের ফলে মস্তিষ্ক এবং দেহের বিভিন্ন অংশে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেহের আভ্যন্তরিক এই প্রতিক্রিয়া ব্যতীত মনে আবেগের উদ্ভব সম্ভব নয়। মন যখন আনন্দিত হয় দেহের রক্ত সঞ্চালন, পেশির সম্প্রসারণ, ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি তখন বৃদ্ধি পায়। এর ফলেই সক্রিয় আবেগে মনের কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবে কার্যকর করতে দেহ অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। নিষ্ক্রিয় আবেগ দেহকে আড়ষ্ট করে তার প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। এ কারণে নিরানন্দ, কোনো দুঃখজনক বা ভীতিজনক

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি অনেক সময়ে যুক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে কিংবা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম হয়।

দেহের সঙ্গে আবেগের আত্যন্তিক সম্পর্ক আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারণযোগ্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়। আবেগকে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্ভুক্ত মেজাজ, আধান বা সঞ্চারণ, বৈশিষ্ট্য এবং অতিরাগ নির্দিষ্ট করা হয়। অতিরাগ আর মেজাজের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মেজাজের স্থায়িত্ব আধান ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চারী মানসিকতার চেয়ে অধিককাল স্থায়ী। প্রতিক্রিয়ার সিদ্ধান্তটি ক্ষণমুহূর্তের হতে পারে। বিশেষ মেজাজ অর্থাৎ আনন্দ-নিরানন্দজনক মানসিকতার মধ্যে বিশেষ সিদ্ধান্ত মুহূর্তের উদ্ভব হয়। অতিরাগ বা প্যাশনকে অধিকতর স্থায়ী আবেগ বলে মনে করা হয়। মানুষের আবেগ মহৎ কিংবা অমহৎ বলেও বিভক্ত হতে পারে। নীতিবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, আত্মোৎসর্গ, সমষ্টির জন্য ব্যক্তির স্বার্থ বিসর্জন, মর্যাদাবোধ ইত্যাদি হচ্ছে মানুষের উন্নত বা মহৎ আবেগ। সৌন্দর্যানুভূতি, জ্ঞানের জন্য আগ্রহ ইত্যাদিও মানুষের মহৎ আবেগ। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উইল হেলম ভুন্ড-কে (১৮৩২-১৯২০ খ্রি.) বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়। ভুন্ড-এর মতে ব্যক্তির যে-কোনো প্রতিক্রিয়া বা আচরণেই একটি আবেগগত দিক আছে। আধুনিক মনোসমীক্ষার মতে আনন্দ, বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, ঘৃণা বিদ্বেষ সবই আবেগ। এবং মানুষ যে কেবল সচেতন অবস্থাতেই আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাই নয়। কোনো আবেগকে দমন করার প্রচেষ্টাও যেমন ব্যক্তির জীবনে সেই আবেগের প্রভাব নির্দেশ করে, তেমনি কোনো অবদমিত আবেগ ব্যক্তির অগোচরে এবং তার অবচেতনে সক্রিয় থেকে তার কোনো বিশেষ বা সমগ্র জীবনকেও প্রভাবিত করতে পারে। অবদমিত যৌনানুভূতির ভিন্নতর প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে অনেক সময়ে কার্যকর হওয়া এর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মনসমীক্ষণবিদ ফ্রয়েডের গবেষণা মানুষের আবেগের জগৎকে মনোবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত করেছে।

Empedocles : এমপিডকলিস (৪৮৩-৪২৩ খ্রি.)

প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম কবি, বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুবাদী দার্শনিক। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এরূপ কাহিনী আছে যে, তিনি ইটনা পর্বতের গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। 'প্রকৃতি' নামে তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক কবিতার মধ্যেই এমপিডকলিস নিজের দার্শনিক অভিমতসমূহ প্রকাশ করেন। তাঁর দর্শনের মধ্যে পূর্বগামী দার্শনিক পাইথাগোরাস, হিরাক্লিটাস এবং পারমিনাইডিসের ভাবধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই সেকালের বস্তুবাদী বা প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ছিলেন। এঁদের সকলের মতামতই এমপিডকলিস কমবেশি গ্রহণ করেন। পারমিনাইডিসকে স্বীকার করে এমপিডকলিস বলেন : বস্তু হচ্ছে অ-সৃষ্ট অর্থাৎ বস্তুর কোনো স্রষ্টা নেই এবং বস্তুর কোনো বিলয় নেই। হিরাক্লিটার্স বলেছিলেন বস্তুর ক্ষেত্রে বিরামহীন গতি আর পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। বস্তু অ-সৃষ্ট এবং পরিবর্তনশীল এই দুই অভিমতকে সংযুক্ত করে এমপিডকলিস বলেন যে, দৃশ্যবস্তুপুঞ্জের মধ্যে পরিবর্তন আছে, তার সৃষ্টি এবং লয় দেখা যায় একথা সত্য ; কিন্তু দৃশ্যবস্তু মূলত যে সত্তা বা উপাদানে গঠিত

তার কোনো শুরু, শেষ বা পরিবর্তন নেই। বস্তুর মূলে রয়েছে চারটি সত্তা যথা, মাটি, পানি, বাতাস এবং আগুন। দৃশ্যবস্তুর সৃষ্টি, লয় এবং পরিবর্তন সাধিত হয় বস্তুর মৌলিক উপাদান মাটি, বায়ু, পানি আর আগুনের পারস্পরিক সংযোজন এবং বিয়োজনের মাধ্যমে। সংযোজন এবং বিয়োজন আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, প্রেম, অ-প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা বস্তুর মূল উপাদানের মধ্যে সতত সংঘাতের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল। সংযোজন, আকর্ষণ, প্রেম, ভালবাসা যেখানে জয়ী, সেখানে সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি। আর বিয়োজন, বিকর্ষণ, ঘৃণা যেখানে জয়ী সেখানে ক্ষয় এবং ধ্বংস। আকর্ষণ বিকর্ষণের তত্ত্বের ভিত্তিতে এমপিডকলিস প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাঁর বৃত্তের তত্ত্বও তৈরি করেন। আকর্ষণ বা প্রেম জয়ী হতে হতে ক্ষুদ্রকে মহৎ করে, অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করে। কিন্তু এ অবস্থাও স্থায়ী হতে পারে না। সম্পূর্ণের মধ্যে আবার বিকর্ষণ, ঘৃণা বা অ-প্রেম উদ্ভূত হয়। ক্রমান্বয়ে ঘৃণা প্রেমকে পরাভূত করে বৃহৎকে ক্ষুদ্র করে এবং সম্পূর্ণকে অসম্পূর্ণতে পর্যবসিত করে। এই তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতির জগতের দ্বান্দ্বিক গতির স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল চক্রাকারে আবর্তন নয়। এমপিডকলিস এরূপও মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক জগতের একটা বিকাশও আছে। স্বধর্মী অস্তিত্বের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও সংযোজন বিকর্ষণের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অস্তিত্ব সৃষ্টি করে, বিকর্ষণকে পরাভূত করে, আকর্ষণ ও প্রেম সৃষ্টিকে ধারাবাহিকভাবে রক্ষা করে চলে। এমপিডকলিসের এরূপ চিন্তার মধ্যে আধুনিক বিবর্তনবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

Empiricism : অভিজ্ঞতাবাদ

'অভিজ্ঞতাবাদ' হচ্ছে একটি জ্ঞান-তত্ত্ব। মানুষের জ্ঞানের উৎস কি এবং জ্ঞানের ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা কি, এ বিষয়ে দর্শনে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। সাধারণভাবে অভিজ্ঞতাবাদ বলতে এরূপ তত্ত্বকে বুঝায় যে, মানুষের ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তবে অভিজ্ঞতা কথাটি দর্শনে একটি ব্যাপক ব্যবহৃত শব্দ। ভাববাদ এবং বস্তুবাদ উভয় তত্ত্বে অভিজ্ঞতার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ভাববাদের অভিজ্ঞতার অর্থ এবং বস্তুবাদের অভিজ্ঞতার অর্থ এক নয়।

জ্ঞানের উৎস কি, এটি দর্শনের একটি মৌলিক প্রশ্ন। সাধারণত ভাবকে জ্ঞানের উৎস বলা হয়। কোনো বিশেষ বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন কোনো বক্তব্য প্রকাশ করি, তখন সেই বস্তুটির যে ভাব আমাদের মনে থাকে, সেই ভাবটি নিয়েই আমাদের বক্তব্য তৈরি হয়। 'ওখানে একটি টেবিল আছে'—এই বক্তব্যটি আমার মনে 'টেবিলরূপ' ভাব কিংবা ভাবসমূহের উপর একটি বক্তব্য। দর্শনে প্রথমে প্রশ্ন জাগে, মনের ভাবকে আমরা কিরূপে বা কোথা থেকে লাভ করি। এই প্রশ্নের চিরাচরিত জবাব দেকার্ত প্রমুখ যুক্তিবাদীগণ এভাবে দিয়ে আসছিলেন যে, মানুষের মনে জন্মগতভাবেই কতকগুলো মৌলিক ভাব থাকে। মানুষ এই মৌলিক ভাবগুলো বিধাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়। আর জন্মগত এই মৌলিক ভাবগুলোর ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞানমণ্ডল তৈরি হয়। এক কথায় এ তত্ত্ব হচ্ছে মনসর্বস্ব তত্ত্ব। আর এ তত্ত্বে মনের ভাবের উৎস বস্তু জগতের ঊর্ধ্ব কোনো লোক। বাস্তব অভিজ্ঞতা বা বস্তু জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব এ মতে অস্বীকৃত। বিজ্ঞানের

অগ্রগতি জ্ঞানের এ তত্ত্বকে ক্রমান্বয়ে অগ্রাহ্য করে তোলে। এবং এর জোরালো প্রতিবাদ আসে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), জন লক (১৬৩২-১৭০৪) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের কাছ থেকে। সপ্তদশ শতকের জন লককেই অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান প্রবক্তা মনে করা যায়। ভাব এবং জ্ঞানের উৎস কি এ প্রশ্নে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভাবের উৎস হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। জন্মগতভাবে মানুষের মন আদৌ কেনো ভাব লাভ করে না। জন্মের সময়ে শিশুর মন একখানি 'ট্যাবুলারাসা' বা 'নিদাগ শ্লেট' বৈ আর কিছু নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে এই 'নিদাগ শ্লেটে' ভাবের দাগ এঁকে দেয়। আর সেই ভাবের দাগ দিয়েই মানুষ তার জ্ঞানজগৎ তৈরি করে। জন লকের 'অভিজ্ঞতাবাদের' এই বিবরণটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত। আসলে তিনি অবিমিশ্র অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন না। অবিমিশ্র অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারা জ্ঞানের জটিল প্রশ্নের জবাব দানে অসমর্থ হয়ে তিনি মনের অন্তঃঅনুভূতিকেও ভাবের একটি উৎস বলে স্বীকার করেছিলেন।

এ আলোচনায় দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতাবাদ দুরকমের হতে পারে ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ এবং বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ।

বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদের মত অনুযায়ী আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হচ্ছে ভাবের বাহক এবং বস্তুজগৎ হচ্ছে ভাবের উৎসকেন্দ্র। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের মূল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোনো ভাবের সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই নিছক অভিজ্ঞতাবাদের দুর্বলতা এই যে, এরূপ তত্ত্ব দ্বারা মানুষের মনের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অনুমান প্রভৃতি জটিল ক্ষমতার ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উৎস বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার স্তূপই জ্ঞানজগৎ নয়। মানুষের মন ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভেঙেচুরে তার জটিল যোগবিয়োগ বস্তু জগতের জ্ঞান তৈরি করে। মানুষের মনের এই ক্ষমতাকেও স্বীকার করতে হয়। না হলে জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তূপে পর্যবসিত হয়।

ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদকে যুক্তিবাদ বলা হয়। ভাববাদের সমস্ত দার্শনিকই জ্ঞানের ব্যাপারে মূলত এই তত্ত্বকে অনুসরণ করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বার্কলের ন্যায় ভাববাদীর মতে মনের বাইরে জ্ঞেয় বলে কিছু নেই। মনের ভাবই জ্ঞানের একমাত্র বস্তু। আবার কাণ্ট এবং হেগেলের ন্যায় ভাববাদীদের মতে বস্তুজগৎ আছে বটে, আর সে বস্তুজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে, তাকে আলোড়িত করে, তাতে অনুভূতির সৃষ্টি করে কিন্তু এই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির সূত্র হচ্ছে স্থান, কাল, সম্পর্ক ইত্যাদি সূচক মনের এমন কতকগুলো ভাব যার উৎস হচ্ছে মানুষের অজ্ঞেয়, কিন্তু অনস্বীকার্য এবং অপরিহার্য এক সত্তা।

Empirio-Criticism : নব অভিজ্ঞতাবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে 'অভিজ্ঞতার সমালোচনা' নাম দিয়ে আভানারিয়াস (১৮৪৩-১৮৯৬) এবং ম্যাক (১৮৩৮-১৯১৬) একটি দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষ করে বস্তুর মৌল উপাদান সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানের

নবতম গবেষণাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্বকে আর স্বীকার করা চলে না। কাজেই বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, যুক্তিগতভাবে একথাও ঠিক নয়। মানুষের জ্ঞান কতকগুলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকস্মিক সংযোগ এবং বিয়োগ ব্যতীত কিছু নয়। বাস্তব জগতে মানুষ যে কার্যকারণের বিধান আরোপ করে তাও মানুষের মানসিক ব্যাপার—বস্তুগত অভিজ্ঞতা নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'চিন্তার মিতব্যয়িতা এবং অবিচ্ছেদ্যতার সূত্র' অবতারণা করে এই মতবাদীগণ বলেন যে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর অতি জোরের জন্য এই মতকে ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদও বলা চলে। তা ছাড়া জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার যে ব্যাখ্যা এঁরা উপস্থিত করতে চেয়েছেন তা ইংল্যাণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাববাদের ব্যতিক্রম বৈ নতুন কোনো তত্ত্ব নয়। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের পরে প্রতিক্রিয়ার পাল্টা আক্রমণের যুগে রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে এই চিন্তা প্রসারলাভ করাতে ভি.আই. লেনিন, ম্যাক এবং অ্যাভানারিয়েসের তত্ত্বকে তীব্রভাবে তাঁর 'ম্যাটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে সমালোচনা করেন। লেনিনের মতে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং সামাজিক জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির বিকাশের মুখে এ তত্ত্ব বিভ্রান্ত মধ্যবিত্তের ঈশ্বরবাদে প্রত্যাবর্তনের একটি আবরণ বিশেষ।

Encyclopaedists : বিশ্বকোষিকবৃন্দ

ফরাসিদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুক্তবুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য যাঁরা জ্ঞানকোষ রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের 'এনসাইক্লোপিডিস্টস্' বা বিশ্বকোষিকবৃন্দ বলা হয়। যুক্তি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের উপর এই ফরাসি বিশ্বকোষের ১৭টি খণ্ড এবং তিনটি সংযোজনী খণ্ড ১৭৫১-১৭৮০ সনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের ভাব ও আদর্শগত পথ উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকোষের এক ঐতিহাসিক অবদান ছিল। ডি. আলেম্বার্টের সহযোগিতায় চিন্তাবিদ এবং অদমনীয় উদ্যোগী পুরুষ ডিডেরট এই বিশ্বকোষ রচনা প্রচেষ্টার মূল শক্তি হিসাবে ১৭৭২ সন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। এই বিশ্বকোষিক চিন্তাবিদদের মধ্যে অপর যাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মন্টেসক্যু, রুশো, ভলটেয়ার, হলবাক এবং হেলভেটিয়াস।

Engels, Frederick : ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫ খ্রি.)

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কার্ল মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স-এর নাম যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়। চিন্তা, আদর্শ এবং সংগ্রামী আন্দোলনের ইতিহাসে যৌথ প্রয়াস এবং অবিচ্ছিন্ন সাথীত্বের এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। জার্মানিতে জন্ম হলেও এঙ্গেলস তাঁর সংগ্রামী জীবনের অধিকাংশকাল ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত করেন। ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের পারিবারিক একটি শিল্পে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন ব্যাপদেশে তিনি ইংল্যাণ্ড আগমন করেন এবং কার্ল মার্কস-এর (১৮১৮-১৮৮৩) সঙ্গে

পরিচিত হবার পর থেকে তাঁর আমরণ সংগ্রামী সাথীতে পরিণত হন। কার্ল মার্কস বিপ্লবী চিন্তা এবং আন্দোলনের জন্য জার্মানির তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই এঙ্গেলস চিন্তাধারায় বস্তুবাদী এবং সংগ্রামী অগ্রসর মানুষের পক্ষভুক্ত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর ভাববাদী দর্শনকে সমালোচনা করে একখানি বই লিখেন। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দ জার্মানিতে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষক ও শিল্পের শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের কাল ছিল। এই বিপ্লবী আন্দোলনের পরাজয়ের পরে তিনি দেশ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে ইংল্যাণ্ড তখন শীর্ষস্থানে। ইংল্যাণ্ডের শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাস্তব জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা এঙ্গেলসকে ধনতন্ত্রবাদের মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহরূপে প্রত্যয়ী করে তোলে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এঙ্গেলস 'ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' নামে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্কসের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রচনা করেন। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' ছিল তখনকার সাম্যবাদী দলগুলোর ঘোষণাপত্র। কমিউনিস্ট ইশতেহার তখন থেকে কেবল বিপ্লবী দলের ঘোষণাপত্র নয়, মার্কসবাদী তত্ত্বের স্পষ্টতম এবং অতুলনীয় ঘোষণাসার হিসাবে পৃথিবীময় পরিচিতি হয়ে আসছে। এঙ্গেলসের আর্থিক আনুকূল্য ব্যতীত মার্কসের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে জীবন ধারণ করা এবং তাঁর সমাজবাদী গবেষণা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার গ্রন্থরাজি হিসাবে মার্কসের 'পুঁজি' বা 'ক্যাপিটাল' সুবিখ্যাত। এ গ্রন্থসমূহের রচনাতে মার্কস এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং বাস্তব সাহায্য লাভ করেন। মার্কসের মৃত্যুর পরে তাঁর 'ক্যাপিটালের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনার কাজ এঙ্গেলস সমাধা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, 'এ্যান্টিডুরিং', 'লুডউইগ ফয়েরবাক', 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ এঙ্গেলস্-এর মনীষার উদাহরণ। তাঁর অনবদ্য আকর্ষণীয় রচনা-রীতি মার্কসবাদের সামাজিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক অভিমতসমূহকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিরাটভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি মার্কসবাদের প্রতিপক্ষীয়দের অভিমতকে খণ্ডন করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে মার্কসবাদের তত্ত্বে আপন মনীষার সংযোজন ঘটিয়েছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ধারণাকে সমালোচনা করে দেখান যে, দর্শনকে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা এরূপ অতি-বাস্তব উচ্ছ্বাসমূলক আখ্যাদান কৃত্রিম এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। দর্শন কোনো রহস্যলোক নয়। দর্শনের ভূমিকা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে সংযুক্ত করে জানার কৌশল উদ্ভাবনে মানুষকে সাহায্য করা, কোনো অতি-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার নয়। তাঁর সমস্ত গ্রন্থেই তিনি যে-কোনো যুগ বা ব্যক্তির দর্শনের শ্রেণীচরিত্র প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে ব্যাখ্যা করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, স্থূল বস্তুবাদ বা ইতোপূর্বকার যান্ত্রিক বস্তুবাদের সাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পার্থক্য আছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনকে যেমন বস্তুর অতিরিক্ত স্বাধীন কোনো সত্তা বলে স্বীকার করে না, মনকে বস্তুর জটিল বিকাশের বিশেষ পর্যায় বলে বিবেচনা করে, তেমনি মনকে অস্বীকারও করে না। বস্তুর সঙ্গে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ককে সে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে। সমাজের বিকাশে মানুষের জীবিকার ভূমিকা প্রধান ; কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকেও মার্কসবাদ নস্যাৎ

করে না। জীবিকা যেমন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আবার ব্যক্তিও তার মস্তিষ্ক ও মনের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা সেই বাস্তব জীবিকার অবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষমতা বহন করে। এঙ্গেলস-এর রচনাবলীতে বস্তু এবং গতি, সময় ও স্থানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, অজ্ঞেয়বাদের অসারতা, বস্তুর উপাদানের জটিল গঠন এবং তার অনুন্মোচিত অসীমতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং এ সব সমস্যায় তাঁর সুস্পষ্ট মার্কসবাদী অবদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

Enthymeme : উহ্যবাক্য-যুক্তি, সংক্ষিপ্ত যুক্তি

সংক্ষিপ্ত যুক্তিকে ইংরেজিতে 'এনথিমেমি' বলে। একে উহ্যবাক্যযুক্তিও বলা চলে। যুক্তিবিদ্যার অনুমানের, বিশেষ করে অবরোহী অনুমানের প্রধান রীতি হচ্ছে একটি সাধারণ বাক্যের সঙ্গে একটি সাধারণ বা বিশেষ বাক্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি অনুমান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইংরেজিতে একে সিলোজিজম বলা হয়।

সকল মানুষ মরণশীল
সক্রেটিস একজন মানুষ
সক্রেটিস মরণশীল

এই দৃষ্টান্তটি অবরোহ যুক্তির সিলোজিজম-এর একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমরা সব সময়ে এত সুশৃঙ্খল এবং ধারাবাহিকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করি না। অনেক সময়ে মানুষ সংক্ষিপ্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ সংক্ষিপ্ত যুক্তিতে পূর্ণাঙ্গ যুক্তির কোনো একটি অংশ উহ্য থাকতে পারে। উপরের যুক্তিটি যদি এভাবে বলা হয় যে

সকল মানুষ মরণশীল
সক্রেটিস মরণশীল

তা হলে যুক্তিটিকে সংক্ষিপ্ত যুক্তি বলা হবে। এখানে দ্বিতীয় বাক্য 'সক্রেটিস একজন মানুষ' উহ্য। এজন্য এরূপ যুক্তিকে উহ্যবাক্য-যুক্তিও বলা যায়। সিলোজিজমে সাধারণ বক্তব্যের বাক্যকে যুক্তির প্রধান বাক্য এবং সম্পর্কের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত বাক্যকে যুক্তির অ-প্রধান বাক্য বলা হয়। সংক্ষিপ্ত যুক্তির মধ্যে প্রধান, অ-প্রধান কিংবা সিদ্ধান্ত যে-কোনো বাক্যকে উহ্য রেখেও কেউ যুক্তি প্রকাশ করতে পারে। ইংরেজিতে প্রধান বাক্য উহ্যসূচক যুক্তিকে প্রথম স্তরের এনথিমেমি এবং অ-প্রধান বাক্যের উহ্যসূচক যুক্তিকে দ্বিতীয় স্তরের এনথিমেমি বলা হয়। সিদ্ধান্ত বাক্য উহ্য থাকলে, সেটি তৃতীয় স্তরের এনথিমেমি এবং কেবলমাত্র একটি বাক্য দ্বারা যুক্তি গঠন করার চেষ্টা করা হলে তাকে চতুর্থ স্তরের এনথিমেমি বলে।

Epicurus : এপিক্যুরাস (৩৪১-২৭০ খ্রি. পূ.)

প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিক এবং নীতিশাস্ত্রের এপিক্যুরিয়ানিজম বা প্রাচীন সুখবাদের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন গ্রিসে এপিক্যুরিয়ানিজম-এর প্রতিদ্বন্দ্বী মত ছিল স্টয়েসিজম বা বৈরাগ্যবাদ। এপিক্যুরাস একনিষ্ঠ জ্ঞান-গবেষক ছিলেন। ৩১০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তিনি

মাইটিলেন মানক স্থানে তাঁর দর্শনাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। সুখবাদ বলতে নির্বিচার ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং স্থূল সুখভোগের ধারণা এপিক্যুরাসের নীতিবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু এপিক্যুরাসের নিজের জীবনের মিতব্যবহার, সরল জীবন যাপন এবং সুখ সম্পর্কে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা এরূপ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রিসের সর্বস্থান হতে দর্শনশিক্ষার্থীগণ তাঁর শিক্ষাগারে এসে জমায়েত হতে থাকে। এদের মধ্যে প্রভুদের প্রাসাদের নর্তক এবং দাস সম্প্রদায়ের লোক, এমনকি মহিলাদের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়।

নীতিবাদই এপিক্যুরাসের দর্শনের মূল। তাঁর কারণ, এপিক্যুরাস মনে করতেন, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জীবনযাপনের এমন নীতি স্থির করা যে নীতিতে মানুষ সত্যকার শান্তিলাভে সক্ষম হবে। যথার্থ দর্শনের কাজ হবে মানুষের জীবনের যন্ত্রণা নিবারণ করা। মানুষের যথার্থ শান্তি কিসে? এ প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে স্থির করতে হবে মানুষের কর্মের মূল চালক কি? এপিক্যুরাসের মতে মানুষের কর্মের উৎস হচ্ছে সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখের পরিহার। মানুষ স্বভাবগতভাবেই সুখের কামনা করে, সুখের অন্বেষণ করে এবং দুঃখকে পরিহার করতে চায়। কিন্তু যে-কোনো সুখই সুখ নয়। আপাতদৃষ্টিতে যা সুখময় মনে হবে, তা পরিণামে সুখদায়ক না হয়ে যন্ত্রণার কারণও হতে পারে। এজন্য মানুষকে বিবেচক হতে হবে এবং যথার্থ সুখের অন্বেষণ করতে হবে। তাকে কোনো কিছু উপভোগের ফলাফল চিন্তা করতে হবে। প্রজ্ঞা বা বিবেচনাই হচ্ছে মানুষের জীবনের হিতের মহৎ উপায়। মানসিক সুখ আর দৈহিক সুখ বলে সুখকে বিভক্ত করে দৈহিক সুখকে স্থূল আর মানসিক সুখকে বিমল ভাবার কোনো কারণ নেই। সব সুখের উৎস হচ্ছে দেহ। ক্ষুধার তৃপ্তিতেই সুখের শুরু। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত না হলে মনের সুখ আদৌ আসতে পারে না। কিন্তু অবিমিশ্র মাত্রাতিরিক্ত দৈহিক সুখও যথার্থ সুখ নয়। কারণ অবিমিশ্র দৈহিক সুখ পরিণামে যন্ত্রণা ও ক্লেশের উদ্ভব ঘটায়। কাজেই দৈহিক সুখেরও পরিমাণ থাকতে হবে। বস্তুত পরিমিতি এবং ভারসাম্য বজায় রাখাই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কর্তব্য। জীবনের যে ক্ষুধা অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক কেবল তাকে তৃপ্ত করাই হবে মানুষের পক্ষে সঙ্গত। চরম সুখ, চরম উপভোগ নয়। চরম সুখ হচ্ছে সমস্ত প্রকার অভাব ও ক্লেশমুক্ত অবস্থা। এপিক্যুরাসের এই সুখতত্ত্ব যে আদৌ নির্বিচার ইন্দ্রিয় ভোগের তত্ত্ব নয়, একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বস্তুত এপিক্যুরাসের নীতি নির্দেশে যৌন ভোগ পরিহার করার উপদেশেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এপিক্যুরাস তাঁর বস্তুবাদী দর্শন ও যুক্তিবাদী মন দিয়ে সুখকে জীবনের প্রধান কাম্য মনে করলেও তিনি পিরহোর বৈরাগ্যবাদ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন আর তাই তাঁর নীতি দর্শনে তিনি মানুষকে জীবনের প্রয়োজন বৃদ্ধি করার বদলে সীমিত করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর অনুসারীদের তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় নিরত হতে এবং তার মধ্যে জীবনের শান্তি লাভের আহ্বান জানিয়েছেন। এপিক্যুরাসের নীতিবাদ কোনো সামাজিক তত্ত্ব নয়। এ তত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

সুখবাদ বা নীতি-তত্ত্ব এপিক্যুরাসের দর্শনের কেন্দ্র হলেও তাঁর মনের জিজ্ঞাসা ছিল বিচিত্রমুখী। সত্যের মাপকাঠি কি, বস্তুর মূল সত্তা কি, আত্মা কীভাবে গঠিত, ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ছিল। মানুষ দৃশ্য থেকে অদৃশ্য সম্পর্কে অনুমান করে।

মানুষের কাছে দৃশ্য এবং প্রত্যক্ষ হচ্ছে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রত্যক্ষ বলে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের যথার্থতা বা সত্যের পরিমাপক। মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়-লব্ধ অনুভূতির সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মন বিশ্লেষণ, পরিমাপ, তুলনা, অনুমান ইত্যাদির ক্ষমতা অর্জন করে। বস্তুর সার বা মূলের প্রশ্নে ডিমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ.) এর ন্যায় এপিক্যুরাসও অনুতত্ত্বের অভিমত প্রকাশ করেন। এপিক্যুরাসও মনে করতেন যে, বস্তুর মূলে আছে অচিন্তনীয় রূপে সূক্ষ্মাকারের অবিভাজ্য সংখ্যাহীন অণু। অণু পরিবর্তনীয় এবং দুর্ভেদ্য। অসীম শূন্যে ঘূর্ণ্যমান অণুর আকস্মিক সংযোগ এবং বিয়োগে সংখ্যাহীন বিচিত্র সৃষ্টির নিয়ত উদ্ভব এবং ধ্বংস সাধিত হয়। এপিক্যুরাস ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তিনি বলতেন, মানুষকে ভূত, ভগবান এবং পরকালের ভীতি থেকে মুক্ত করতে পারলেই তাঁর মধ্যে সত্যকার সৎচরিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হবে এবং মানুষ পরম শান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। ডিমোক্রিটাসের ব্যাখ্যাত মনোবিদ্যারও বিকাশ ঘটে এপিক্যুরাসের হাতে। তিনি মানুষের মন বা আত্মাকে দুইভাগে বিভক্ত বলে মনে করেন। এক ভাগে হচ্ছে তার যুক্তির ভাগ। এ ভাগের অবস্থান মানুষের হৃদয়ে। মানুষের এ অংশে বিচিত্র প্রকারের অণু জটিল গতিতে সংযোজিত হয়ে মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি বোধের সৃষ্টি করে। মনের অপর ভাগ হচ্ছে স্থূল বা অযুক্তির ভাগ। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে এ ভাগের গঠন এবং এর অণুগুলি তত দৃঢ় সংযোজনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু মানুষের এই দুই অংশ নিয়েই তার সমগ্র কাঠামো গঠিত। মৃত্যুর পরে আত্মার অণুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার বিলোপ ঘটায়। কাজেই মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। দর্শনের ইতিহাসে এপিক্যুরাসের নাম সঙ্গতিপূর্ণ বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম দার্শনিক হিসাবে প্রখ্যাত হয়ে আছে।

Epistemology : জ্ঞানতত্ত্ব

দর্শনের আলোচ্য বিষয়কে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয় জ্ঞানতত্ত্ব, পরাতত্ত্ব বা চরম সত্তার তত্ত্ব এবং নীতি বা মূল্যতত্ত্ব।

জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে জ্ঞান বলতে কি বুঝায়। জ্ঞান কি প্রকারে অর্জিত হয়? মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে কিংবা নেই ইত্যাদি। দর্শনের উল্লিখিত বিভাগগুলি তেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। জ্ঞানতত্ত্বেই যে কেবল জ্ঞানের প্রশ্ন নিহিত আছে, অপর বিভাগে নেই, একথা ঠিক নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জ্ঞানের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু দর্শনের মূল প্রশ্নগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপরোক্ত বিভাগগুলি চিহ্নিত করা চলে।

দর্শনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানের প্রশ্নেও কোনো একক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নেই। বিশ্বরহস্যের আলোচনায় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদী এবং বস্তুবাদী যে দুটি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারই অনুসরণে জ্ঞানের প্রশ্নেও দুটি প্রধান মত বিকাশ লাভ করেছে। একটি যুক্তিবাদী ; অপরটি অভিজ্ঞতাবাদী। 'যুক্তিবাদী জ্ঞানতত্ত্ব' কথাটিতে 'যুক্তি' বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যুক্তি বলতে এখানে মন বুঝান হয়। যুক্তিবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা হিসাবে ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০)-এর নাম বিখ্যাত।

ইউরোপে মধ্যযুগ অতিক্রান্ত হলে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নকে আলোচ্য বিষয় করে তোলে। বাস্তবভাবে বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্ব সম্পর্কে নানা জ্ঞানে শক্তিশালী করে তুললেও দার্শনিকগণ প্রশ্ন তোলেন, জ্ঞান বলতে কি বুঝায়? ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ কতকগুলি অনুভূতি লাভ করে। সেই অনুভূতির সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে যে কার্যকারণ, অতীত-ভবিষ্যৎ নানা বিষয় সম্পর্কে অনুমান গ্রহণ করে। জ্ঞানের প্রধান উপায় অনুমান। কিন্তু অনুমান মানসিক ব্যাপার। সেই অনুমান-দত্ত জ্ঞানের যথার্থতার নিশ্চয়তা কি? পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে—এ সিদ্ধান্ত মানুষের অনুমান। ইন্দ্রিয় মানুষকে অসংখ্য অনুভূতি দেয়। কিন্তু সেই অনুভূতিই কি জ্ঞান? বস্তুর অনুভূতি আর বস্তু কি এক? যদি এক না হয়, তা হলে অনুভূতির ভিত্তিতে বস্তু সম্পর্কে যে অনুমান গ্রহণ করা হয়, সে যে যথার্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা অনুমান অনুযায়ী কোনো বস্তুর যে অস্তিত্ব আছে, তার প্রমাণ কি? জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নগুলি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব বিভিন্নভাবে দেওয়া যায়। রেনে দেকার্ত, জর্জ বার্কলে, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ দার্শনিকের রচনায় জ্ঞানের এই প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবে এঁদের মতে জ্ঞান একান্ত করে মনের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে সেই অনুভূতির বিন্যাস করে মন, কতকগুলি সাধারণ সূত্রের মাধ্যমে। আর এই সূত্রগুলির উৎস মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়। স্থান, কাল, পাত্র, সম্পর্ক, কার্য-কারণ, নিয়মানুবর্তিতার বোধ ইত্যাদির সূত্র অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। এগুলি মানুষের জন্মগত এবং এদের উৎস অতিজাগতিক, অতিপ্রাকৃতিক, অদৃশ্য এবং অজ্ঞেয় কোনো সত্তা। কাজেই মানুষের জ্ঞানের নিশ্চয়তা ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতায় নয়। মানুষের জ্ঞানের নিশ্চয়তা নির্ভর করে বিধাতা কিংবা অজ্ঞেয় সত্তার উপর।

বেকন, হবস, লক প্রমুখ দার্শনিকগণও জ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে পূর্বোক্ত দার্শনিকদের ন্যায়ই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের জবাব অভিজ্ঞতাবাদ বলে পরিচিত। এঁদের মধ্যেও পারস্পরিক পার্থক্যের চেয়ে মিল এবং ঐক্যের সূত্র অধিক প্রবল। এঁদের মতে, জ্ঞানের উৎপত্তি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের যেরূপ উৎস, তেমনি সমস্ত অনুমানের যথার্থতা কিংবা অযথার্থতার পরিমাপকও হচ্ছে অভিজ্ঞতা।

জ্ঞানের এই তত্ত্বে গোড়ার দিকে অনেক অসঙ্গতি ছিল। এই ধারার কোনো কোনো দার্শনিকের তত্ত্ব কেবল ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়েছে। কেউ কেউ অনুমান বা বিমূর্ত ধারণাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়ে জন্মগত বা বিধিদত্ত ভাবেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিকাশ জ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বে পরিণত করেছে। কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, ভি.আই. লেনিন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবর্তক ও ব্যাখ্যাতাগণ জ্ঞানের সমস্যাটি ঐতিহাসিক বিকাশের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের মূল মাপকাঠি। কিন্তু অসংযুক্ত খণ্ড খণ্ড বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জ্ঞান নয়। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করেছে এবং ক্রমাধিক পরিমাণে বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার সংযোজন, বিয়োজন, শ্রেণীকরণ ইত্যাদি বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতার উদ্ভব মানুষের

মধ্যে ঘটেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকশিত মানুষের বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা—উভয় দিকের নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, আন্দাজ, অনুমান, প্রয়োগকরণ, প্রমাণকরণ—মোটকথা প্রমাণ পরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে চলে। জ্ঞানের জন্য মানুষ বিধাতার দয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের জীবন এবং বিশ্বজগতের ন্যায় মানুষের জ্ঞানের কোনো সীমা মানুষের জন্য চিরস্থায়ীরূপে চিহ্নিত করা চলে না।

Essence and Appearance : মূল ও প্রকাশ

মূল ও প্রকাশ একটি দার্শনিক প্রশ্নের প্রকাশ। অস্তিত্ব বা সত্তার মূল চরিত্র এবং তার সৃষ্টি বা প্রকাশের মধ্যকার সম্পর্ক এবং উভয়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ দর্শনের একটি আবহমান প্রয়াস। মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতার সম্পর্কে জড়িত হয়, তাকে সে অপর কোনো কিছুর প্রকাশ মনে করে। গভীরতর কোনো অস্তিত্ব এবং সাধারণভাবে দৃশ্যমান তার প্রকাশের পার্থক্য-বোধ মানুষের মধ্যে দৃশ্যমান বস্তু জগতের সতত পরিবর্তন থেকেই প্রথমে উদ্ভূত হয়। দৃশ্যমান জগতের অনেক কিছুই ক্ষণকালের। এই আছে, এই নাই। কিন্তু ক্ষণকালও আপেক্ষিক কথা। পরিবর্তমান জগতের কারুর স্থিরতা মুহূর্তকালের, কারুর স্থিরতা বা স্থায়িত্ব যুগব্যাপী। যে যত বেশি স্থায়ী তাকে তত বেশি মৌলিক এবং যে যত ক্ষণকালের তাকে স্থায়ী অস্তিত্বের প্রকাশমাত্র বলে মানুষ বিবেচনা করেছে। অধিকতর স্থায়ী বা স্থিরকে অধিক মূল্যদান মানুষের জীবনের প্রয়োজনের দিক থেকে স্বাভাবিক। ক্ষণকাল থেকে অধিককাল স্থায়ী অস্তিত্বের কল্পনার সঙ্গে মানুষ বস্তুর পরিবর্তনের হ্রাসবৃদ্ধিকেও যুক্ত করেছে। মানুষ মনে করেছে, যে বস্তু যত অধিককাল একরূপে স্থায়ী, তার পরিবর্তন ক্ষণকালের বস্তুর চেয়ে কম। এই পরিমাণ-বোধ থেকে মানুষ কল্পনা করার প্রয়াস পেয়েছে : এর চরম মূলে আছে যে অস্তিত্ব, সে-ই চিরস্থায়ী এবং সে অস্তিত্বের আদৌ কোনো পরিবর্তন নেই।

শুধু অপরিবর্তনীয় নয়। নিত্যকালের স্থায়ী অস্তিত্ব আদৌ বস্তু নয়। বস্তু সতত পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন কালের প্লেটো কিংবা আধুনিক কালের কান্ট, হেগেল এঁরা চিরস্থায়ী কিংবা অপরিবর্তনীয় স্থির অস্তিত্বকে পরমভাব কিংবা অজ্ঞেয় সত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকে আবার চিরস্থায়ীকে একমাত্র সত্য এবং প্রকাশকে অসত্য বা মায়া বলে বিবেচনা করেছেন। কেউ কেউ মূল এবং প্রকাশের পার্থক্য অস্বীকার করে মুহূর্তের দৃশ্য প্রকাশকেই একমাত্র সত্য অস্তিত্ব বলে ঘোষণা করে মূলের অস্তিত্ব নাকচের প্রবণতা দেখিয়েছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অস্তিত্বের মূল এবং প্রকাশকে বৈজ্ঞানিক এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এই মত অনুযায়ী মূল এবং প্রকাশ পরস্পর নির্ভরশীল অস্তিত্ব। বীজ থেকে অঙ্কুর হয়। অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ। এখানে বৃক্ষের মূল অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের মূল বীজ—একথা বলা অসঙ্গত নয়। বস্তুত প্রত্যেক অস্তিত্বেরই দুটি দিক আছে : একটিকে অন্যটির তুলনায় মূল অথবা প্রকাশ বলা চলে। মূল এবং প্রকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। মূল ব্যতীত প্রকাশ নেই। প্রকাশ বলতেই কোনো কিছুর প্রকাশ। আবার

কোনো মূলই প্রকাশহীন হতে পারে না। চরম স্থির মূল বলেও কোনো অস্তিত্ব নেই। বস্তু হচ্ছে চরম অস্তিত্ব। কিন্তু কোনো প্রকাশ বা কোনো প্রকাশের মূলই অপরিবর্তনীয় নয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারকে স্বীকার করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে, বস্তুর মূল যে উপাদান ইলেকট্রন-নিউট্রন-প্রোটন, সে উপাদানও জটিল, নিয়ত গতিময় ও পরিবর্তনশীল।

Ether : ঈথার

মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত পদার্থ বিশেষকে পূর্বে ঈথার নামে আখ্যায়িত করা হত।

পৃথিবীর নিকটমণ্ডলে বাতাস আছে। কিন্তু যত ঊর্ধ্বে যাওয়া যায়, তত বাতাস হ্রাস পেয়ে এক পর্যায়ে শূন্য হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা প্রাচীন মানুষেরও ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, পৃথিবীর অতি ঊর্ধ্বের বায়ুহীন স্তর কি পদার্থহীন শূন্যতা, না মাটি, জল, বায়ু, আগুন এই পরিচিত পদার্থের অতিরিক্ত অপর কোনো পদার্থের অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে। জগতের কোথাও বস্তুহীন শূন্যতা যে বিরাজ করতে পারে না, এ ধারণা কেবল আধুনিক বিজ্ঞানের নয়, প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞানীদের রচনাতেও এ ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গ্রিকগণ প্রথমে মনে করত যে, পৃথিবীর ঊর্ধ্বলোকও বায়ুশূন্য নয়। তবে অতি ঊর্ধ্বের বায়ু অতিরূপে পরিশুদ্ধ। আর এ বায়ুর জীবন আছে এবং সে স্বর্গীয়। মহাশূন্যের ব্যাখ্যা প্রথমে দেন দার্শনিক এনাক্সাগোরাস (৫০০-৪২৮ খ্রি. পূ.)। তিনি বলেন, বিশ্বের বহির্মণ্ডলে ঈথার পরিব্যাপ্ত এবং শূন্যতা বলে বিশ্বের কোথাও কিছু নেই। ডিমোক্রিটাস তাঁর অণুতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেন, শূন্যতা যে নেই তা নয়। শূন্যতা আছে। কিন্তু শূন্যতা ঈথাররূপ অণু দ্বারা পূর্ণ। এবং ঈথার অণুর গতির মাধ্যমেই গ্রহ এবং তারকারাজির আবর্তন সম্ভব হচ্ছে। এ্যারিস্টটল ঈথারকে বায়ু, অগ্নি, পানি এবং মাটির সঙ্গে পঞ্চম পদার্থ বলে অভিহিত করেন। সপ্তদশ শতকের দার্শনিক এবং অঙ্কবিদ দেকার্ত বস্তুর আলোচনায় বলেন, বস্তুর মৌলিক চরিত্র হচ্ছে স্থানিক। অর্থাৎ স্থানের মধ্যে বস্তু পরিব্যাপ্ত। এ অভিমতের একটি গভীর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ছিল। এর ফলে কোনো স্থানকে আর মানুষের পক্ষে বস্তুশূন্য বলে কল্পনা করা সম্ভব হলো না। স্থান মানে বস্তু, তবে মহাশূন্যের বস্তুর প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা তখনো চলতে থাকে। মহাশূন্যের বস্তুকে দেকার্ত অন্যান্য বস্তু থেকে সূক্ষ্মতর বলে কল্পনা করেছিলেন। পৃথিবীর ঊর্ধ্বলোকে বাতাস নেই। কিন্তু সেই বায়ুশূন্য স্তর অতিক্রম করেও সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছে। আলো কোনো মাধ্যম ব্যতীত এই পথ অতিক্রম করতে পারে না। কাজেই মহাশূন্যে কোনো মাধ্যম অবশ্যই আছে। কিন্তু সে মাধ্যম জল, বায়ু বা ধাতব কোনো পদার্থ হতে পারে না বলে এই অনস্বীকার্য মাধ্যম ঈথার বলে আধুনিক বিজ্ঞানেও অভিহিত হয়েছে। তবে পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তে মহাশূন্যকে ঈথারমণ্ডল না বলে একটা বস্তুক্ষেত্র বলে অভিহিত করা হয়।

Ethics : নীতিশাস্ত্র

নীতিশাস্ত্র দর্শনের একটি শাখার নাম। মানুষের ব্যবহারগত সম্পর্কের তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছে।

নীতিশাস্ত্রের দুটি দিক প্রধান। একটি হচ্ছে নীতির তত্ত্বের দিক। অর্থাৎ ভালোমন্দ কাকে বলে ; মানুষের কর্মের পেছনে একটা চালক শক্তি আছে, এ কথার তাৎপর্য কি ইত্যাদি প্রশ্নের তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক আলোচনা হচ্ছে নীতি-তত্ত্বের বিষয়। নীতিশাস্ত্রের অপর দিকে হচ্ছে তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক। মানুষের কোনো ব্যবহার সৎ বা ভালো এবং কোনো ব্যবহার মন্দ ; মানুষের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক থাকা সঙ্গত ; ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো নীতির বন্ধন কাম্য এবং কোনো আদর্শ অনুসরণ সঙ্গত—এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রে বা নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগের শাখায় অধিক পরিমাণে করা হয়।

ন্যায়-অন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত, উচিত-অনুচিতের বোধ মানুষের জীবনে গোড়া থেকেই বিদ্যমান। মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করে প্রাক-সভ্যতার সেই আদি যুগেও ব্যক্তির কোনো আচরণ গোষ্ঠীর ক্ষতিকর হলে গোষ্ঠী সে ধরনের কাজকে অসঙ্গত বলেছে। আবার গোষ্ঠীর কোনো অনুশাসন ব্যক্তির নিরানন্দ, দুঃখ কিংবা লাঞ্ছনার কারণ হলে সে অনুশাসনকে ব্যক্তি অনুচিত মনে করেছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্যমূলক সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নানা নীতি ও অনুশাসনে পারস্পরিকভাবে আবদ্ধ থাকলেও তখন নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয় নি। নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সভ্যতার বিকাশে এবং সর্বপ্রথম দাস-প্রভুতে বিভক্ত এবং রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোতে সংগঠিত সমাজে। এই সময় থেকে নীতিশাস্ত্র কেবল ব্যক্তির মনোভাব নয়। নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিরোধাত্মক সম্পর্কের তীব্রতা প্রশমিত করার জন্য তথা প্রভু শ্রেণীর সমাজ-ব্যবস্থা ও স্বার্থ রক্ষার দিক থেকে সমাজে ব্যক্তির আচরণের নীতিগত আলোচনা ও নীতি-নির্ধারক অনুশাসনের প্রণয়ন শুরু হয়। এই ধারায় ক্রমান্বয়ে ব্যক্তির কর্মের পেছনে অতিমানবিক রহস্যময় এক আদর্শের আকর্ষণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হতে থাকে। তত্ত্বগতভাবে কেউ বলতে থাকেন, এক অজ্ঞেয় অলভ্য চরম মহৎকে সামনে রেখেই মানুষ জীবন যাপন করবে। তার দৈনন্দিন সুখ-দুঃখভোগ ন্যায় বা অন্যায় আচরণ সব কিছুরই পরিমাপক হবে সেই পরম মহৎ-এর নৈকট্যলাভের প্রয়াস। আবার কেউ ব্যক্তিক এবং দৈহিক সুখলাভ বা উপভোগকে সমস্ত কর্মের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

প্রাচীন ভারতের চার্বাকপন্থীগণ, চীনের কনফুসিয়াস, ইয়াংচু, লাওজে, গ্রিসের ডিমোক্রিটাস, এপিক্যুরাস, এ্যারিস্টটল প্রমুখ জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ মানুষের জীবনের নীতিগত দিকের বিশেষ আলোচনা করেছেন।

ইউরোপে পুঁজিবাদী সমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন একদিকে বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ, শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের দাসের মতো যূথবদ্ধভাবে উৎপাদন, অপর দিকে নগণ্য সংখ্যক ধনপতির সমস্ত সম্পদের ভোগ—ইত্যাকার অবস্থা মিলে যে অভূতপূর্ব জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে ন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত, শান্তি-অশান্তির প্রশ্নও নানারূপে মাথা তুলতে শুরু করে। এই পর্যায় থেকে নীতি-শাস্ত্রের আলোচনায় বস্তুবাদী এবং ভাববাদী বৈশিষ্ট্য অধিকতর পরস্পর-বিরোধী রূপ গ্রহণ করে। ভাববাদী নীতিশাস্ত্রের চরম প্রকাশ দেখা যায় ইমানুয়েল কান্টের রচনায়। তিনি মানুষের নীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি 'ক্যাটেগরিকাল ইম্পারেটিভ'

বা 'শর্তহীন বিধান' প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে এই বিধানগুলি মানুষ মেনে চললে সমাজে যে অন্যায়, বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তা বিদূরিত হবে। তাঁর নীতি-বিধানের অন্যতম বিধান বাস্তব সমাজের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং বাস্তব সমাজের বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত। ইংল্যাণ্ডের জেরমী বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) এবং জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) নীতির ক্ষেত্রে 'হিতবাদ বা উপযোগবাদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত। তাঁরা বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সুখ লাভকে ব্যক্তি ও সমাজের কাম্য আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। বৃহত্তম মানুষের উপর অনুষ্ঠিত অসঙ্গত আচরণ থেকে তাঁদের এ নীতি উদ্ভূত হলেও তাঁদের এ ঘোষণারও তেমন কোনো ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল না। তাঁদের মতে যত বিমূর্ত মহৎ আদর্শের কথাই নীতির ক্ষেত্রে কেউ প্রচার করুক না কেন, তার বাস্তব তাৎপর্য সেই সময়ের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামো দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে সে বাস করে। কিন্তু সেই সমাজ ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত সমাজের শাসক শ্রেণীর ব্যবস্থাদি রক্ষণের জন্যই সেই সমাজের বিশেষ নীতিশাস্ত্র রচিত হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য জীবন ধারণের ও বিকাশের সঙ্গত অবস্থা সৃষ্টিকে মানুষের কাম্য নৈতিক আদর্শ বলে মনে করে।

Euclid : ইউক্লিড (৩৩০-২৭৫ খ্রি. পূ.)

প্রাচীনকালের গ্রিক অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যামিতিক। জন্ম আলেকজান্দ্রিয়ায়। জীবন-বৃত্তান্ত তেমন জানা যায় না। কিন্তু আধুনিককাল পর্যন্ত তাঁর জ্যামিতিক তত্ত্বসমূহ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের মূল পাঠ্য হিসাবে চলে এসেছে। কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে তাঁর তত্ত্বসমূহের পরিবর্তে নতুন তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে। ইউক্লিডের জ্যামিতিক তত্ত্ব অবরোহী বা ডিডাকটিভ অনুমানের প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। ইউক্লিড তাঁর 'ডাটা' বা 'ডিডোমেনা' গ্রন্থে ৯৫টি থিওরেম পেশ করেছেন। এসব থিওরেমের প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই তত্ত্ব যে, কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করলে তার ভিত্তিতে একাধিক সিদ্ধান্তকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আলেকজান্দ্রিয় যুগটি অঙ্কশাস্ত্রের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে বলে মনে করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার একাডেমীর অন্যতম অঙ্কবিদ ছিলেন ইউক্লিড। ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস অব জিওমেট্রি' সম্পর্কে এরূপ বলা হয় যে, তাঁর এই গ্রন্থ আধুনিককাল পর্যন্ত যে-বিপুল সংখ্যায় পঠিত হয়েছে সে সংখ্যা কেবল খ্রিষ্টানধর্মের 'বাইবেল' পাঠের সংখ্যার সঙ্গেই তুলনীয়।

Eratosthenes : এরাটোস্থেনিস (২৭৬-১৯৪ খ্রি. পূ.)

আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক এবং ব্যাকরণবিদ। প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বলেও পরিচিত। 'কেবল যে গ্রন্থাগারিক এবং ব্যাকরণবিদ তাই নয়। ভূগোলবিজ্ঞানেও তাঁর অবদান স্বীকৃত। তিনি সেকালে পৃথিবী গ্রহকে পরিমাপেরও একটি সূত্র আবিষ্কার করেন।

Eudemonism : সুখবাদ, হিতবাদ

নীতিশাস্ত্রের একটি মতকে সুখবাদ বা হিতবাদ বলা হয়। প্রাচীন গ্রিসের ডিমোক্রিটাস, এপিক্যুরাস, সক্রেটিস এবং এ্যারিস্টটলের রচনায় এবং ভারতের চার্বাকপন্থীদের আলোচনায় এই নীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, মানুষের কর্মের নিয়ামক হচ্ছে সুখ। সুখ ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক হতে পারে। ইতিহাসের আধুনিক যুগে ইউরোপে ফরাসি দেশের হেলভেটিয়াস, ডিডেরট এবং ইংল্যাণ্ডের বেনথাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলকে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসাবে দেখা যায়। প্রাচীন কিংবা আধুনিক সুখবাদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এ তত্ত্বের প্রবর্তকগণ কোনো অতিজাগতিক নীতি বা আদর্শকে মানুষের কর্মের নির্ধারক বলেন নি। স্বর্গলোকে নয়, এই পৃথিবীতে মানুষ কীভাবে সুখময় জীবন যাপন করতে পারে সে কথা এঁরা আলোচনা করেছেন। এ দিক থেকে সুখবাদ বস্তুবাদী তত্ত্ব। কিন্তু বাস্তব সামাজিক-আর্থিক অবস্থা নিরপেক্ষভাবে সুখকে কাম্য বললেই ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে সুখ প্রতিষ্ঠিত হয় না। মহৎ সুখকে আদর্শ বলে যদি ব্যক্তি কল্পনা করে, তা হলেও সে সুখ তার লাভ না হতে পারে। সুখের প্রতিষ্ঠা সম্ভব সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণের মাধ্যমে। কাজেই মহৎ সুখ কি এবং কি করে তা লাভ করা যায়, তার আলোচনা কোনো বিশেষ যুগের সমাজ ব্যবস্থার আলোচনা এবং তার অসঙ্গতি দূরীকরণের উপায় নির্দেশ ব্যতীত অবাস্তব এবং অসার্থক হতে বাধ্য। এ কারণে এপিক্যুরাস, সক্রেটিস কিংবা আধুনিক হিতবাদীদের নীতি-তত্ত্বের কোনো বাস্তব ব্যবহারিক তাৎপর্য দেখা যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব নির্বিচার দৈহিক সুখলাভের বিকারে পর্যবসিত হয়েছে। সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও তা নিরসনের উপায়ের ইঙ্গিত না থাকাতে প্রতিপক্ষীয়গণ এঁপিক্যুরাসের মতকে যদৃচ্ছা সুখ ভোগ এবং চার্বাকবাদীদের মতকে 'ঋণং কৃত্য ঘৃতং পিবেৎ'-এর তত্ত্ব বলে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে।

Evolution and Revolution : বিবর্তন এবং বিপ্লব

বিবর্তন ও বিপ্লব বিকাশের অবিচ্ছেদ্য দুটি দিক। বিবর্তন বলতে কোনো অস্তিত্ব বা বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তনের ধারাবাহিক এবং পরিমাণগত বৃদ্ধিকে বুঝায়। বিপ্লব বলতে বিকাশের কোনো পর্যায়ে অস্তিত্বের মধ্যে দ্রুত এবং আকস্মিক পরিবর্তন বুঝায়।

বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যকার সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য, এটি আধুনিক বিজ্ঞানের এবং সমাজবিজ্ঞান, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব। পূর্বে মানুষ বিবর্তন ও বিপ্লবকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিরোধাত্মক ব্যাপার বলে মনে করত। পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল যে, বিবর্তন হচ্ছে স্বাভাবিক এবং বিপ্লব অস্বাভাবিক। যেখানে বিবর্তন ঘটছে, সেখানে কেবল বিবর্তনই ঘটতে থাকবে ; অর্থাৎ পরিবর্তনের কেবল পরিমাণগত বৃদ্ধি হতে থাকবে, অস্তিত্বে নতুন কোনো গুণের উদ্ভব হবে না। এ ধারণায় অস্তিত্বের বিকাশে বিবর্তন একমাত্র প্রক্রিয়া। এ ধারণায় বিপ্লব কেবল জবরদস্তির নামান্তর। অস্তিত্বের অভ্যন্তরে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না ; বিপ্লব অস্তিত্বের বহির্ভূত কোনো শক্তি হিসাবে বাইরে থেকে অস্তিত্বকে পরিবর্তিত করতে চায়। আধুনিক বিজ্ঞান অস্তিত্বের বিকাশের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। পানি যখন উত্তপ্ত

হতে থাকে, তখন পানির মধ্যে বিন্দু বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। কিন্তু পরিবর্তনের এই বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট কালের জন্য কেবল পরিমাণেই সীমাবদ্ধ থেকে পানিকে পানি হিসাবে বজায় রেখে এগোয় না। পরিবর্তনের পরিমাণগত বৃদ্ধির একটা চরম বিন্দুতে পানির পুরাতন অস্তিত্বের আমূল রূপান্তর সংঘটিত হয়। পানি বাষ্পে পরিণত হয়। পানি থেকেই বাষ্প ; কিন্তু পানি এবং বাষ্পকে আমরা দৃশ্যত এক অস্তিত্ব মনে করি না। এখানে পানির বিকাশে বিবর্তনের একটা স্তরে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, এ কথা বলা যায়। প্রাকৃতিক জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

সামাজিক জীবনে বিবর্তন ও বিপ্লব প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ঘটেছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং মার্কসবাদের হাতে। মার্কসবাদের প্রবক্তাগণ প্রাকৃতিক জগতের অস্তিত্বে সক্রিয় পরিবর্তনের নিয়মকে সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলেন যে, সমাজ-দেহেও পরিবর্তনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে একটি চরম পর্যায়ে বিপ্লব সংগঠিত হয়। বিপ্লব কোনো অস্বাভাবিক কিংবা অস্তিত্বের বহির্ভূত ব্যাপার নয়। বস্তুগত কিংবা সামাজিক সমস্ত অস্তিত্বই সতত গতিশীল। অস্তিত্ব মাত্রের গতি সৃষ্টি হয় তার আভ্যন্তরিক বিরোধের ভিত্তিতে। অস্তিত্বের অন্তর্গত দ্বন্দ্বমান শক্তির বিরোধ বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পেতে পেতে একটা বিস্ফোরণের মুহূর্তে উপস্থিত হয়। এই বিস্ফোরণই বিপ্লব। বিপ্লবের ফলে অস্তিত্বের এমন সব চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চরিত্রগুলি বিপ্লবের পূর্বে অস্তিত্বের মধ্যে সুপ্ত কিংবা স্বল্প প্রকাশিত ছিল ; কিন্তু এরূপ প্রবল এবং প্রধান হয়ে কার্যকর হয় নি।

বিবর্তন শব্দের একটা সাধারণ ব্যবহার আছে। সমাজের বিবর্তন, বিশ্ব জগতের বিবর্তন। এরূপ ব্যবহারে কোনো ক্ষেত্রের বিবর্তন ও বিপ্লবসহ পরিবর্তনের সমগ্র বিষয়টিকেই বুঝান হয়।

বিপ্লব শব্দের অনেক বিকৃত এবং সংকীর্ণ ব্যবহারও দেখা যায়। বিপ্লবের মৌলিক অর্থ অস্তিত্বে অদৃষ্টপূর্ব নতুন চরিত্রের উদ্ভব। কিন্তু অনেক সময়ে কোনো রাষ্ট্রকাঠামোতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জবরদস্তি ক্ষমতা দখলকেও বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে শাসনযন্ত্রের অধিকারীর ক্ষেত্রে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির রদ-বদল সংঘটিত হয়েছিল। এই ঘটনায় পাকিস্তানের সামাজিক চরিত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু শাসকগণ একে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছিল। জবরদস্তি এবং রক্তপাত মাত্রকেই বিপ্লব বলা যায় না। বাস্তব সমাজের মধ্যে মৌলিকভাবে নতুন চরিত্রের উদ্ভব বিপ্লবকে সূচিত করে।

Existence : অস্তিত্ব

সাধারণ 'অস্তিত্ব' দ্বারা স্থায়ী, অস্থায়ী, স্থির এবং অস্থির সমস্ত সৃষ্টিকেই বুঝায়। তা হলেও অনেকে আবার অস্তিত্বকে সার-অস্তিত্ব এবং অসার-অস্তিত্ব বলে বিভক্ত করেন। যাঁরা এরূপ করেন, তাঁরা মনে করেন যে, সাধারণভাবে দৃষ্ট এবং জ্ঞাত অস্তিত্বের গভীরে এক মূল অস্তিত্ব বিরাজমান। দৃশ্য বা দৃষ্ট অস্তিত্ব সদা পরিবর্তমান। কিন্তু মূল অস্তিত্বের কোনো পরিবর্তন নেই। এঁদের মতে মূল অস্তিত্ব বা সার-অস্তিত্বকে মানুষ জানতে পারে না। এরূপ চিন্তা

ভাববাদী চিন্তা। অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থে সার এবং অসারের পার্থক্য চিন্তা করা চলে। তুলনামূলকভাবে যা গভীরে, দৃষ্টির আড়ালে এবং অপর অস্তিত্বের ধারক হিসাবে কাজ করে, তাকে সার-অস্তিত্ব এবং যে অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সদা পরিবর্তনশীল, অস্থির এবং আকস্মিক, তাকে অসার-অস্তিত্ব বলা চলে। কিন্তু সার এবং অসার মিলেই সমগ্র অস্তিত্ব। অসারের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য গতিহীন এবং অপরিবর্তনীয় কোনো সার-অস্তিত্বের কল্পনা করা চলে না। অস্তিত্বমাত্রই গতিময় এবং পরিবর্তনশীল।

অস্তিত্বের আর একটি বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় অস্তিত্ববাদী দর্শনে। এ দর্শনের মূল হচ্ছে 'অস্তিত্ব'। আর এ অস্তিত্ব বলতে বুঝাবে মানুষ বা ব্যক্তির অলব্ধ সুপ্ত সম্ভাবনা। ব্যক্তিকে ঘিরে আছে যে পরিবেশ বা বাস্তব জীবন, সে অস্তিত্ব হচ্ছে অনিত্য অস্তিত্ব। কিন্তু নিত্য-অস্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনা। এ অস্তিত্বের মূলে আছে কোনো এক রহস্যময় বিধাতা বা শক্তি। প্রতিনিয়ত যে-ব্যক্তিরূপে আমরা জীবন যাপন করি, সে ব্যক্তি বাস্তব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি। এ অসার। এখানে তার নিজের শক্তির কোনো প্রকাশ নেই। কিন্তু কোনো সংকটকালে পরিবেশকে উপেক্ষা কিংবা অতিক্রম করে যে অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্তির সেই অস্তিত্বই সার বা মূল অস্তিত্ব। ব্যক্তির এ অস্তিত্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। কোনো সংকটমুহূর্তে মানুষ এর আলোতে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

Existentialism : অস্তিত্ববাদ

অস্তিত্ববাদ আধুনিক দর্শনের একটি চিন্তাধারা। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানি এবং ফরাসি দেশে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের বিপর্যস্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই চিন্তার উদ্ভব এবং বিস্তার দেখা যায়।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ এবং বিশেষ করে ব্যক্তির অস্তিত্ব। কিন্তু এ প্রশ্নের আলোচনাকারীদের মধ্যে মতামতেরও পার্থক্য আছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের সৃজনশীল গল্প, উপন্যাস, কবিতায় অস্তিত্ববাদী মতের প্রকাশ ঘটেছে। এঁদের রচনার প্রচার এবং পরিচয়ের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শন আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কিছুটা প্রসার লাভ করেছে ; এই সমস্ত লেখকের মধ্যে কার্ল জাসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬২), জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) ফ্রাঞ্জ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারাকে বুঝার জন্য উনিশ শতকের ইউরোপে উদ্ভূত 'জীবনের দর্শন' নামক তত্ত্বটির পরিচয় থাকা আবশ্যক। বস্তুত 'জীবনের দর্শন'ই অস্তিত্ববাদের উৎস এবং পটভূমি। উনিশ শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে জীববিদ্যায় এবং মনোবিজ্ঞানে যে বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ সংঘটিত হয়, তাতে জীবন ও জগতের এতদিনকার সহজ এবং যান্ত্রিক ব্যাখ্যা অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। জীবন ও জগৎ বস্তু বটে কিন্তু সে বস্তু সহজ নয়, সে বস্তু জটিল। তার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা মানুষের মনের বহু প্রশ্নের জবাব দানেই অক্ষম। এতদিনকার ভাববাদী কিংবা অষ্টাদশ শতকের যান্ত্রিক বস্তুবাদী

ব্যাখ্যার বিফলতার প্রতিক্রিয়ায় একদল চিন্তাবিদের কাছে জীবন এক অজ্ঞেয় রহস্যের আধার বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। জীবন হচ্ছে এক অসীম শক্তির উৎস ; এ না বস্তু, না চেতনা। এর গতি আছে, এর প্রকাশ আছে। কিন্তু সে গতি বা প্রকাশ আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তযোগ্য নয়। একে মানুষ কেবল তার সহজাত সজ্ঞা, ইনট্যুইশন বা সম্মোহিত অনুভূতির মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে পারে। আর যেহেতু সজ্ঞা বা সম্মোহিত অবস্থা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই জীবনের উপলব্ধি ব্যক্তিগত ছাড়া সমষ্টিগত জ্ঞানের ব্যাপার হতে পারে না। জীবনের কোনো বিজ্ঞান তৈরি করা সম্ভব নয়, জীবন কেবল অনুভূতি বা উপলব্ধির বিষয়। জীবনের এরূপ ব্যাখ্যাই শপেনহার (১৭৮৮-১৮৬০) এবং হেনরী বার্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১) প্রমুখ দার্শনিকের তত্ত্বে দেখা যায়। ডেনমার্কের আত্মবিমোহিত বুদ্ধিজীবী সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫)-এর রচনায়ও এই 'জীবনদর্শনের' সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিয়ের্কেগার্ডকে অস্তিত্ববাদের সাক্ষাৎ পূর্বসূরি বলে মনে করা হয়। কিয়ের্কেগার্ড দর্শনের ক্ষেত্রে চরম ভাববাদ কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় যাজকদের ব্যাখ্যা কোনোটাকেই স্বীকার করতে পারেন নি। নিজের জীবনে কিয়ের্কেগার্ড ছিলেন অস্বাভাবিকরূপে আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিবাদী। এই জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিন্তা ও রচনায়। তাঁর মতে এই জগতে ব্যক্তির অস্তিত্বই হচ্ছে কেন্দ্র-কথা। ব্যক্তি তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করে সংকটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। জীবন তার কাছে 'হয়/নয়' রূপ সংকটরূপে প্রতিভাসিত। সর্বক্ষণ সে সংকটের মুখোমুখি। হয় তাকে এ পথ গ্রহণ করতে হয়, নয় ওপথ ; হয় তাকে এটা করতে হবে, নয় ওটা। সংকটের মোকাবেলাতেই ব্যক্তি তার অস্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিয়ের্কেগার্ডের মতে সামগ্রিকভাবে দেখলে মানুষের জীবনে দুটি সংকট প্রধান। হয় সে পরিবেশকে গ্রহণ করে নিজের অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দেবে, জীবনের ভোগে-দুর্ভোগে, আনন্দ-কষ্টে নিমজ্জিত হবে ; নয়তো সে পরিবেশকে উপেক্ষা করে বিধাতার নিকট আত্মসমর্পণ করে সেই উপেক্ষার শক্তিতে আর আত্মসমর্পণের স্বাধীনতায় নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবে। কিয়ের্কেগার্ড তাঁর একখানি গ্রন্থের নামকরণই করেছিলেন 'হয়/নয়' রূপে।

অস্তিত্ববাদের মতে দর্শনের করণীয় হচ্ছে বিষয় এবং বিষয়ীকে অবিভাজ্য এবং সামগ্রিক সত্তা হিসাবে ব্যাখ্যা করা। বিষয় এবং বিষয়ী, জ্ঞান এবং জ্ঞাতার অবিচ্ছেদ্য সত্তাই হচ্ছে অস্তিত্ব। এ অস্তিত্বকে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের সংকট সীমায় দাঁড়িয়ে। মৃত্যু, যন্ত্রণা, পাপবোধ, অসন্তোষের মধ্যেই ব্যক্তি সেই সংকট সীমায় উপনীত হতে পারে। বুদ্ধি বা যুক্তির মাধ্যমে এ অস্তিত্বকে জানা সম্ভব নয়।

অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক প্রবক্তা কিয়ের্কেগার্ডের সিদ্ধান্তে ধর্মীয় ভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু সাম্প্রতিক অস্তিত্ববাদীগণ ধর্মের প্রচলিত অর্থে ধার্মিক নন। সার্ত্রে, কাম্যু প্রমুখ অস্তিত্ববাদীগণকে সাধারণত নাস্তিক বলে মনে করা হয়। এঁদের ভাবধারার মধ্যে নিট্‌শের দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। নিট্‌শে 'ঈশ্বর'কে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন। সার্ত্রের বক্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেই ব্যক্তিকে বাঁচতে হবে। আর ঈশ্বরই হচ্ছে ব্যক্তির জীবনে সমস্ত বন্ধনের মূল। সেই ঈশ্বরই যখন অস্বীকৃত, ব্যক্তি তখন অবাধ-স্বাধীন। তার নিজের

কাছে ছাড়া অপর কারুর কাছে তার কোনো জবাবদিহি করার নেই। অপর কারুর কাছে দায়িত্ব বা কর্তব্যে সে দায়ী নয়। সবার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। সব কিছুকে, সব আইন-কানুন, ভালো-মন্দ, নিয়ম-নীতি, প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, দান-গ্রহণ সব কিছুকে অস্বীকার করার চেষ্টায় এবং সে চেষ্টার সফলতার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব নিহিত। সেই চেষ্টাতেই ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি। জগৎ আর ব্যক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তি। এ জগতে ব্যক্তি বহিরাগত। অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে সমধিক পরিচিত আলবেয়ার ক্যামু তাঁর এক উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'বহিরাগত' বা 'আউটসাইডার'। তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্লেগ' উপন্যাসেও পরিবেশের সমস্ত ঘটনা, দুর্ঘটনা, ভয়, আতঙ্ক, মৃত্যু, প্রেমিকার আহ্বান সব কিছুর প্রতি অত্যদ্ভুত এক নির্লিপ্ততা সহকারে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের আকর্ষণীয় চিত্র নায়কের চরিত্রে অঙ্কিত হতে দেখা যায়। আলবেয়ার ক্যামুর আর একখানি উপন্যাস 'মিথ অব সিসিপাস'-এর প্রতিপাদ্য ছিল : আত্মহত্যার যদি কোনো যুক্তি না থাকে, বেঁচে থাকারও কোনো যুক্তি নেই। অতএব যুক্তিগতভাবে ব্যক্তি যখন আত্মহত্যা করতে পারে না কিংবা বাঁচতেও পারে না, তখন 'কেবল বাঁচার জন্য বাঁচা' ব্যতীত ব্যক্তির জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

আধুনিক পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা, পুঁজিবাদের চরম উন্নতি ঘটে ঊনবিংশ শতকে। তার বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয় তার তীব্র ক্ষয়ের যুগ। এখন সেখানে সম্ভাবনা কেবলমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, কেবলমাত্র শ্রেণীর হাতে শ্রেণীর শোষণ নয়। এখন মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা জাতিতে জাতিতে বৈরীর, ধ্বংসযজ্ঞের, মিথ্যার বেসাতির এবং যে মানুষ এই আশ্চর্য মানব সভ্যতা সৃষ্টি করেছে সেই মানুষের হাতে তার নিশ্চিহ্ন বিলোপের সম্ভাবনার এক অযৌক্তিক, অসঙ্গত এবং ভীতিজনক অবস্থা। এরই প্রকাশ হিসাবে প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে। এই বিপর্যস্ত অবস্থায় যে-বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্য মুক্তির এবং অগ্রসরের আর কোনো পথ আবিষ্কার করতে অক্ষম তার পক্ষে নৈরাজ্যিক মনোভাব নিয়ে চরম ব্যক্তিবাদী হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। এ সত্য যে, মানুষের সভ্যতার চরম বিপর্যয়ে চিন্তাবিদ মাত্রই অস্তিত্ববাদী হয় নি। পৃথিবীর মানুষ প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার বিপর্যয়কে মানুষের জন্য চরম বলে স্বীকার করে নি ; সংঘবদ্ধ চেষ্টায় সে এমন এক নতুন সঙ্গত সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে যেখানে ব্যক্তি, সমষ্টির মধ্যেই নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবে। সে হিসাবে অস্তিত্ববাদ সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। অস্তিত্ববাদ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিপর্যস্ত মনের প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে চরম আত্মরতিমূলক প্রতিক্রিয়া।

Fa Chia : ফাচিয়া

প্রাচীন চীনের একটি অগ্রসরকামী চিন্তাধারা। এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হিসাবে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমরা শাঙচুন এবং হানফিজু নামক দুজন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাই।

আলোচ্য সময়ে চীনের সমাজ-দেহ একটা পরিবর্তনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের অর্থনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজতর বিনিময় পদ্ধতির উদ্ভবে সমাজে নতুনতর শক্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। এর ফলে এতদিনকার অনড় সীমাবদ্ধ মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী-সমাজ বিচলিত হয়ে উঠল। তার স্থানে ব্যাপকতর এলাকাভিত্তিক নতুন অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস পেতে লাগল। ফাচিয়া সীমাবদ্ধ গোষ্ঠী-সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নতুনতর অভিজাত তন্ত্রেরই আদর্শগত হাতিয়ার। ফাচিয়া মতের অনুসারীগণ গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিভাগের স্থানে ঐক্যবদ্ধ চীন গঠনের এবং সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের পক্ষপাতী ছিল। হানফিজু ছিলেন এই নতুন বিকাশের দার্শনিক। তিনি বলতেন, বস্তুজগতের নিয়ামক হচ্ছে 'তাও' বা প্রাকৃতিক বিধান। কোনো অতিপ্রাকৃতিক বিধাতা নয়। তেমনি সমাজের নিয়ামক হিসাবেও থাকবে সামাজিক বিধান বা 'ফা'। সামাজিক বিধান দ্বারাই মানুষ সংগ্রাম করবে রক্ষণশীল শক্তির বিরুদ্ধে। হানফিজু এবং ফাচিয়ার অন্যান্য অনুসারীরা ধর্মান্ধতা, রহস্যবাদ এবং কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

Fabian Society, Fabianism : ফ্যাবিয়ান সমিতি, ফ্যাবিয়ানবাদ

প্রাচীন রোমের বিখ্যাত সমরবিদ ফ্যাবিয়াস-এর নামের ভিত্তিতে উনবিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একদল গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তাবিদের প্রতিষ্ঠিত সমিতি 'ফেবিয়ান সোসাইটি' নামে পরিচিত। রোমের সমরবিদ ফ্যাবিয়াসের নাম গ্রহণ করার কারণ, এই সমরবিদ সেকালে (খ্রি. পূ. ৩২২-২৯৫) কারথেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধে যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন সে কৌশলের বৈশিষ্ট্য ছিল 'বিলম্বিতকরণ'। ল্যাটিন শব্দ 'কাংটেটর'-এর অর্থ হলো বিলম্বকারী। ফ্যাবিয়াসকে তাই 'কাংটেটর' বলা হতো। ফ্যাবিয়াস কার্থেজের প্রখ্যাত সমরবিদ হানিবলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে যুদ্ধ প্রলম্বিত করে পরিশেষে হানিবলকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। আধুনিককালে, উনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন যখন বিস্তার লাভ করতে থাকে তখন ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্রবাদী বেশ কিছু সমাজবাদী পুঁজিবাদের সঙ্গে সরাসরি মারাত্মক সংঘর্ষ বা বিপ্লবকে পরিহার করে ক্রমান্বয়ে প্রচারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। তাঁদের তত্ত্বের সারমর্মকে প্রকাশের জন্য 'ফ্যাবিয়াস' নামের ভিত্তিতে তাঁদের সমিতিকে ফ্যাবিয়ান সমিতি বলে অভিহিত করেন। এই সমিতির সূচনাকালের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ, সিডনী ওয়েব, সিডনী অলিভার এবং গ্রাহাম

ওয়ালাস। ১৮৮৯ সনে 'ফ্যাবিয়ান নিবন্ধাবলী' বা 'ফ্যাবিয়ান এসেজ' নামক গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই সমিতির উদ্যোগে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই কমিটি থেকে ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টির উদ্ভব ঘটে। প্রায় ১৯১৪ সন পর্যন্ত ফ্যাবিয়ান সমিতির কার্যক্রমে জোর ছিল। এই সময়ে সমিতির সদস্যসংখ্যা ২৫০০ এবং স্থানীয়ভাবে প্রায় ১০০০টি সমিতিতে পৌঁছেছিল। ১৯২০ ও ত্রিশের দশকে সমিতির কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। ১৯৩৯ সনের দিকে এ্যাটলী, জি.ডি.এইচ. কোল প্রমুখ রাজনীতিক নেতা এবং লেখকের উদ্যোগে সমিতিটিকে পুনর্গঠিত হতে দেখা যায়। এর পরেও সমিতিটির কার্যক্রমের, বিশেষ করে এদের 'ক্রমান্বয়বাদী' সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রকাশ নানা সম্মেলন আহ্বান, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে ঘটতে দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টিকে ফ্যাবিয়ান সোসাইটির প্রধান ফলশ্রুতি এবং উত্তরাধিকারী বলে বিবেচনা করা চলে। বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১৩০ জন সদস্য ফ্যাবিয়ান সমিতিভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে হ্যারল্ড উইলসনের নাম উল্লেখযোগ্য। (দ্র. Socialism, ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্র)।

Fall of Bastil : বাস্তিলের পতন

ফ্রান্সের বিপ্লব-এর সময়ে ১৪ জুলাই, ১৭৮৯ সালে বিদ্রোহী জনতা বাস্তিল দুর্গ অধিকার করল। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাঁর স্নেহাস্পদ কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শীনিকে পত্রাকারে লিখেছেন "বাস্তিলের পতন ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সারাদেশ ব্যাপী বাস্তিলের পতন ছিল মহাবিদ্রোহের সংকেত। এর অর্থ দাঁড়াল, ফ্রান্সে প্রাচীন রীতি সামন্তপ্রথা রাজার একাধিপত্য এবং সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ অধিকারের পরিসমাপ্তি। ১৪ই জুলাই ক্রুদ্ধ জনতার কাছে বাস্তিল দুর্গের পতন হল।"

Family : পরিবার

বিবাহ-বন্ধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি সামাজিক সম্পর্কের উৎস হচ্ছে পরিবার। পরিবার হচ্ছে মানুষের একটি ঐতিহাসিক সামাজিক সংস্থা। এর বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয় মানুষের জৈবিক প্রয়োজন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং তার নৈতিক ও মানসিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা।

মানুষের সামাজিক সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হলেও মানুষের জীবনের আদিতে পরিবারের অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের জীবনের বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে পরিবারের উদ্ভব ঘটে। মানুষের প্রয়োজনবোধ থেকেই যে-কোনো সামাজিক সংস্থার সৃষ্টি। মানুষের যৌন সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই পরিবারের সৃষ্টি। আদিতে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক ও সামাজিক কোনো বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব ছিল না। এই বিধি-নিষেধের প্রথম উদ্ভব ঘটে গোত্রতান্ত্রিক সমাজে। মানুষ এতদিনে যাযাবার শিকারী জীবনের বদলে নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য যৌন সম্পর্ক ছাড়া জীবিকার উপায় এবং সম্পত্তির উপর অধিকারের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনও মানুষ

অনুভব করতে শুরু করেছে। এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই প্রথম পরিবারের উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে পরিবারের উদ্ভব ঘটে মাতৃতান্ত্রিক রূপে। সন্তানের জনক সমাজে তখন তত সুনির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু সন্তানের জননী সুনির্দিষ্ট। জননীর মাধ্যমেই তাই বংশের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা সহজ ছিল। আর্থিক বিকাশেও তখন পর্যন্ত নারী-পুরুষে কাজের বিভাগ তত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় নি। কালক্রমে নারী-পুরুষে কাজের বিভাগ এবং সম্পত্তির ভোগ সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজনে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। এই পরিক্রমায় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সৃষ্টি হয়। এ বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে ঘটে নি। আজো মানব সমাজের কোনো কোনো অংশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্যও যুগ এবং সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিবারের আভ্যন্তরিক বৈশিষ্ট্য পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের পরিবার থেকে অনেক বিষয়ে, বিশেষ করে সমাজের আর্থিক জীবনে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকা নগণ্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে নারী আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ দ্বারা।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের নিয়ামকও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ভোগ ও রক্ষাই যে একমাত্র নিয়ামক হবে—এমন কোনো চরম কথা নেই। জীবন ধারণের উপায় যখন ব্যক্তি এবং পরিবারের জন্য কোনো সমস্যামূলক প্রশ্ন থাকবে না, তখন পরিবারের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে নতুনতর রূপান্তর সংঘটিত হবে। সংকীর্ণ আর্থিক স্বার্থকে অতিক্রম করে নতুনতর মানবিকতা বোধ তখন পরিবারের আভ্যন্তরিক সম্পর্কের মূল নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াবে। নারী ও পুরুষ তখন সমান সুযোগ ও অধিকার-ভোগী মানুষে পরিণত হবে। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ পরিবারের এইরূপ রূপান্তরকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করে এবং এই আদর্শ অর্জনকে সামাজিক বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে।

Fascism : ফ্যাসিবাদ

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া মহাজনী মূলধনের চরম জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ও সন্ত্রাসমূলক প্রকাশ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে এবং ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ফ্যাসিবাদ চরম জাতীয়তাবাদ, অযৌক্তিক ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষ এবং উদ্দেশ্য সাধনে চরম বর্বরতার আদর্শ প্রচার করে। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের চরম সংকটের পরিচয়বাহক। সাম্রাজ্যবাদী যুগ হচ্ছে পুঁজিবাদের চরম যুগ। জাতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ যখন নিঃশেষিত, তখন পুঁজিবাদ নিজের শোষণমূলক ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদী যুগেরও পরিণামে পুঁজিবাদ সামাজিক সংকটের ফলে বিপ্লব এবং নিজের উচ্ছেদ অত্যাসন্ন দেখে জাতীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সকল ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে স্বৈরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদের মূল প্রতিশক্তি। এ জ্ঞান থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে ফ্যাসিবাদ তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করে। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শ ও সংগঠনকে ব্যর্থ করার জন্য একদিকে তার উপর সে চরম অত্যাচারের

নীতি যেমন গ্রহণ করে, তেমনি তার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য 'জাতির উর্ধ্বে কিছু নেই', 'আমার জাতি সবার সেবা', 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি ভাবধারা প্রচারের সর্বপ্রকার মাধ্যম গ্রহণ করে। ফ্যাসিবাদের আক্রমণ জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। বর্বরতা, অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও অন্ধ জাতীয়তাবাদ দ্বারা সঙ্কটের সমাধান করতে না পেরে ফ্যাসিবাদ অপর জাতি ও দেশকে আক্রমণ করতে শুরু করে। দেশের মানুষের দৃষ্টিকে আভ্যন্তরিক সংকট থেকে এভাবে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্যাসিবাদী জার্মানির পরদেশ আক্রমণ ও দখলের বেপরোয়া জঙ্গী নীতি থেকেই শুরু হয়। পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদী ইতালি এবং জাপান জার্মানির সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী অক্ষ তৈরি করে। বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব ক্ষয়-ক্ষতি ও জীবন বিনাশের পরে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরাভূত হয়। ফ্যাসিবাদী আদর্শের স্থায়ী উচ্ছেদ সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক বিপ্লব ব্যতীত সম্ভব নয়। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ সংকট থেকে পরিত্রাণের শেষ উপায় হিসাবে এখনো ফ্যাসিবাদী চরিত্র গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

Fatalism : অদৃষ্টবাদ

মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই তার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়, এরূপ বিশ্বাসকে অদৃষ্টবাদ বলে। প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে এই ধারণা এরূপ ব্যাপক ছিল যে, কেবল মানুষ নয়, অলিম্পিয়া পাহাড়ের অধিবাসী দেবতাগণও স্বাধীন নয়। তাদের জীবনও উর্ধ্বতর অপর কোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস একটি সাধারণ এবং প্রায় সর্বজনীন বিশ্বাস। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে না হলেও সাধারণ মানুষ মনে করে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ, সামাজিক বিপ্লবের ন্যায় বিরাট ঘটনাসমূহ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা তার কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে না। বিশ্ববিধাতার ইচ্ছানুযায়ী এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। অদৃষ্টবাদের বিশ্বাস একেবারে নেতিবাচকও হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে মানুষ মনে করে যে, বিশ্বের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মানুষ একেবারে অসহায়। আবার এ বিশ্বাস যুক্তিগত হতে পারে। যুক্তিগত বিশ্বাসে মানুষ এরূপ যুক্তি দেবার চেষ্টা করে যে, স্রষ্টার দ্বারা যখন সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার হাতে বিশ্বের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। যুক্তিগত অদৃষ্টবাদ কোনো কোনো ব্যাখ্যায় 'নির্ধারিত ভবিষ্যৎ'-এর তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আবার কেউ একে 'ইচ্ছাবাদ' বলেও অভিহিত করেছেন। 'ইচ্ছাবাদের' দাবি হলো যে, বিশ্বের মূল হচ্ছে ইচ্ছা। ইচ্ছার কারণেই বিশ্বের সৃষ্টি। বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহ কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এক অলৌকিক ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত। মানুষের ইচ্ছা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের ইচ্ছারও মূল হচ্ছে সেই অতিপ্রাকৃতিক আদি ইচ্ছা। এখানে অবশ্য আদি ইচ্ছা বলতে প্রকারান্তরে বিধাতাকেই বুঝান হয়। ইতিহাসে অদৃষ্টবাদ সব সময়েই জ্ঞান এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদিকে অদৃষ্টবাদ মানুষকে ঘটনা-প্রবাহের নিষ্ক্রিয় দাসে যেমন পরিণত করতে পারে, তেমনি অদৃষ্টবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং অন্ধ জাতীয়তা ও ফ্যাসিবাদ সমাজকে গ্রাস করতে পারে। ভাগ্য আমাদের বিশ্ব-শাসনের জন্য নির্বাচিত করেছে, আমরা নির্বাচিত জাতি—এ বিশ্বাসেই ফ্যাসিবাদের জন্ম।

Federalism : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

'ফেডারেশন' থেকে 'ফেডারেলিজম'। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভাষা, জাতি বা অঞ্চলগত বৈচিত্র্যকে সমন্বিত করে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করা হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অভিহিত করা হয়। এর বিপরীতে ইউনিটারী বা এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলে কথাটি প্রচলিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এরূপ যে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলির কিছুটা স্বকীয় সংগঠন ও ক্ষমতার বিধান থাকে। অঙ্গরাজ্যগুলির কি ক্ষমতা এবং সংগঠন থাকবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তা সমগ্র রাষ্ট্রের মূল সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাখা হয়। এরূপ সংবিধানে অনেক সময়ে কেন্দ্রীয়ক্ষমতা, অঙ্গরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং যৌথ তথা অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রের যুক্তক্ষমতা বলে ক্ষমতার তিনটি তালিকারও উল্লেখ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোথাও কোথাও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অঙ্গরাষ্ট্রীয় নাগরিকতারও বিধান থাকে। সাধারণত সমগ্র দেশের রক্ষাব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। অঙ্গরাষ্ট্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারসমূহের ক্ষমতা প্রয়োগে বিরোধ দেখা দিলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট তার নিস্পত্তি করে। এবং তার রায়কে সকলের জন্য মান্য বলে বিবেচনা করা হয়। মূল সংবিধানের ব্যাখ্যার দায়িত্বও সুপ্রিম কোর্ট পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এরূপ একটি শর্ত সংবিধানে রাখা হয় যে অঙ্গরাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে সংবিধানের সংশোধন করা হবে না।

আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম উদ্ভব দেখা যায় আমেরিকাতে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধকালে উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে আপন আপন স্বকীয়তা বা অধিকার বজায় রেখে একটি 'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা' বা 'আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র' নামে তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। পরবর্তীতে আবার দাস সমস্যার মীমাংসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্র, বিশেষ করে দাসদের মুক্তির সমর্থক উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দাসব্যবস্থা বজায় রাখার সমর্থক দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির আপসহীন মতবিরোধের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। (দ্র. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ)।

সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অভিন্ন নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি প্রধান সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সেখানে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা করার সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। বাস্তবে অবশ্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঙ্গরাষ্ট্র এই অধিকারকে ব্যবহার করে নি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দাবির ভিত্তিতে জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত রিপাবলিক ইউক্রেন এবং বাইলোরুশিয়ার প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করা হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্রে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের চাইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের বৈশিষ্ট্যই প্রবল। অবশ্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গবেষকদের মতে রাষ্ট্রনির্বিশেষে বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। (নব্বই-এর দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভেঙে যাওয়ার ঘটনা স্মরণযোগ্য)।

Fetishism : বস্তুরতি

প্রাকৃতিক কোনো বস্তুর পূজা বা আরাধনাকে বস্তুরতি বলা হয়। বস্তুরতি আদিম সমাজের ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল। প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন বস্তুর রহস্য মানুষের তখনো অজানা ছিল। পাহাড়, পর্বত, ঝড়ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ যাবতীয় শক্তিশালী বস্তুরই কৃপার পাত্র ছিল মানুষ। ফলে আরাধনা ও পূজা দ্বারা এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করে প্রাকৃতিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব বলে মানুষ মনে করত। বস্তুরতি থেকে গোত্র প্রতীকবাদের উদ্ভব ঘটে। প্রাচীনকালে গোত্র দেবতা হিসাবে প্রাকৃতিক কোনো বিশেষ বস্তু বা বস্তুকে এক একটি গোত্র বিশেষভাবে মান্য করত। তার পূজা করত। এবং সেই বস্তু বা জন্তুর প্রতীক বহন করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করত। এই বস্তুরতির রেশ আধুনিক কালেও যে সমস্ত ধর্মে মূর্তিপূজা, ক্রশ ধারণ, পাথর চুম্বন প্রভৃতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। 'বস্তুরতি' শব্দ আজকাল কিছুটা ব্যাপকতর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোনো কিছুর উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করাকে বস্তুরতি বলা হয়। এই অর্থে আধুনিক অর্থনীতিতে 'পণ্যপূজা' বা 'পণ্যরতি' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

Feudalism : সামন্তবাদ

মানুষের সামাজিক আর্থিক বিকাশের একটি পর্যায়। মানুষের সামাজিক বিকাশ তার জীবিকার উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ভিত্তিতে প্রধানত নির্দিষ্ট হয়। জমির কর্ষণ থেকে জীবন ধারণের প্রধান উপায় শস্য লাভের কৌশল মানুষের আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দাস সমাজের ভাঙনের মধ্য দিয়ে নতুন সামন্ত সমাজের উদ্ভব হয়। সামন্ত সমাজের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি জমি। জমির মালিকানার ভিত্তিতে জমির প্রভু বা সামন্ত-প্রভু সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রাচীন দাস সমাজের পরে সামন্ত সমাজের বিকাশ ঘটেছে। উৎপাদনের উপায়ের নতুনতর বিকাশে সামন্ত সমাজের স্থানে আধুনিক কালে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিবাদের পরবর্তী ঐতিহাসিক পর্যায় সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রও পৃথিবীর একাধিক দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমাজের বিকাশ ও রূপান্তর যান্ত্রিক নয়। সমাজতন্ত্রের যুগেও অনেক দেশে সামন্ততন্ত্রের রেশ দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব অর্থাৎ ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের স্থায়িত্বের কাল ধরা হয়। সামন্ততন্ত্রে জমির সাক্ষাৎ উৎপাদনকারী কৃষকের নিকট থেকে নানাপ্রকার কর আদায় করত। এই করের পরিমাণ অনেক সময় তার উৎপাদিত সমস্ত সম্পদকে গ্রাস করত। এমনকি, উৎপাদনের পরিমাণ নির্বিশেষে তার উপর খাজনা ধার্য হতো। ফলে অনেক স্থানে কৃষক দৈহিক যাতায়াতের স্বাধীনতা হারিয়ে ভূমির সীমানায় বন্দি ভূমিদাসে পরিণত হতো। সামন্ত সমাজের শাসক ও শোষক শ্রেণী রাজা, সামন্ত-প্রভু, জমিদার এবং ধর্মযাজকদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু সমাজ বিরোধ-শূন্য ছিল না। শাসক শ্রেণীসমূহ অর্থাৎ রাজা, সামন্ত-প্রভু ও ধর্মযাজক এদের মধ্যে যেমনি নিরন্তর ক্ষমতার অন্তর্বিরোধ চলত, তেমনি সমগ্র শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত কৃষক সমাজের বিদ্রোহের প্রয়াস সামন্ত সমাজের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

Feuerbach, Ludwig : লুডউইগ ফয়েরবাক (১৮০৪-৭২ খ্রি.)

জার্মানির বস্তুবাদী দার্শনিক। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বস্তুবাদী চিন্তাধারার জন্য ১৮৩০ সালে ফয়েরবাককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা এবং ধর্মের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার জন্য ফয়েরবাক এঙ্গেল্‌স, মার্কস্ এবং সমসাময়িক অন্যান্য বস্তুবাদী চিন্তাবিদদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ফয়েরবাকের চিন্তাধারা এবং রচনাসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের বিশ্লেষণ করে ভাববাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রমাণ করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার মূল চরিত্র যে ভাববাদ তাও ফয়েরবাক বিশ্লেষণ করে দেখান। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি অজ্ঞেয়বাদের বিরোধিতা করেন। জ্ঞানের উৎস হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে যেয়ে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা অস্বীকার করেন নি। মানুষের জ্ঞান ও চেতনা কেবল ব্যক্তিক নয়। ফয়েরবাক মনে করতেন জ্ঞান এবং জ্ঞাতা, বিষয় ও বিষয়ীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই জ্ঞানের উদ্ভব। কাজেই জ্ঞান হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মার্কস্ এবং এঙ্গেলস-এর মতে ফয়েরবাক উনিশ শতকের বস্তুবাদীদের পথিকৃৎ হলেও তাঁর চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা ছিল। ইতিহাস ও সমাজের মধ্যে তিনি যেমন ধর্মের উৎপত্তি নির্দেশ করে সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করছেন, তেমনি আবার ধর্মকে মানুষের অচেতন আত্মচেতনার প্রকাশ বা নিজের চরিত্রের বাস্তব রূপায়ণ বলে তিনি ধর্মের ভাববাদী ব্যাখ্যার রহস্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। মানুষের নীতিবোধকেও তাই তিনি বাস্তব পরিবেশ ও সমাজনির্দিষ্ট বিষয়ের চেয়ে মানুষের চিরন্তন সুখান্বেষী স্বভাবের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফয়েরবাক নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সাক্ষাৎ পূর্বগামীদের অন্যতম ছিলেন।

Fichte : ফিকটে (১৭৬২-১৮১৪ খ্রি.)

জার্মান ভাববাদী দর্শনে কান্টের পরেই ফিক্টের স্থান। দরিদ্র ঘরের সন্তান ফিক্টে কিশোর বয়স থেকেই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেন। তাঁর জীবনে প্রথম খ্যাতি আসে আকস্মিকভাবে। ১৭৯০ সালে কান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি বেনামীতে কাণ্টীয় দর্শনের ব্যাখ্যামূলক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বুদ্ধিজীবী মহল একে কান্টের নিজের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু কাণ্ট বললেন, এ লেখা তাঁর নয়। প্রবন্ধের লেখকের নাম প্রকাশিত হলে লেখক ফিক্টে জার্মানির সাহিত্যিক ও দার্শনিক মহলে প্রখ্যাত হয়ে পড়েন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারা, বিশেষ করে বুদ্ধির মুক্তির জোয়ার ফিক্টেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা জন্মগত। এই অভিমত প্রচার করে ফিক্টে দুখানি পুস্তিকা লেখেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বয়স যখন মাত্র ৩১ বৎসর, তখন ফিক্টে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন। কিন্তু ছাত্র এবং তরুণদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং ধর্মের নীতিগত ব্যাখ্যার কারণে ফিক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে দর্শন বিভাগ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কান্টের পরবর্তীকালে ফিক্টের দর্শনের গভীরতাই উনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপে

জার্মানিকে দর্শনের বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত করে। ফিক্টে ভাববাদী হলেও তিনি কাণ্টের দর্শনের অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যের সমালোচনা করেন। কাণ্ট তাঁর দর্শনকে বুদ্ধি, বিচার এবং নীতি এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। ফিক্টে সমালোচনা করে বলেন, কাণ্টের বিভাগগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ফিক্টের মতে দর্শনের এরূপ বিভাগ অসঙ্গত। দর্শন হচ্ছে অবিভাজ্য এক সত্তা। মানুষের বুদ্ধি, বিচার এবং নীতি সবই সেই অবিভাজ্য সত্তারই প্রকাশ। কাণ্টের সত্তার সত্তা বা 'থিং ইন ইটসেলফ্'-এর তত্ত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন। মানুষের জীবনের নিয়ামক অবাস্তব চিন্তা নয়, বাস্তব কর্মই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের বাস্তব কর্ম নির্দিষ্ট হবে মানুষের নীতিবোধ দ্বারা। জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই মানুষ বাস্তব জীবন যাপন করবে। সত্তার প্রকাশ এবং অপ্রকাশ এ দুই-এর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। আসলে এরূপ দ্বৈত অস্তিত্বের কোনো সত্তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ফিক্টের ভাববাদকে আত্ম-ভাববাদ বলা চলে। চরম আত্মাই সব সৃষ্টির মূল। চেতনার চরম নৈতিক উপলব্ধি হচ্ছে চরম আত্মা। ব্যক্তিক আত্মা চরম আত্মার অনুকূল। ফিক্টের নীতি-দর্শনের একটি মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যক্তির স্বাধীনতার সমস্যা। ফিক্টে মনে করতেন, ব্যক্তি স্বাধীন বলতে এ কথা বুঝায় না যে ব্যক্তি আদৌ কোনো বিধানের অধীন নয়। স্বাধীনতা বা স্বতঃস্ফূর্ততার অর্থ কারণহীনতা নয়। বিধানের অনিবার্যতার উপলব্ধিতেই ব্যক্তির স্বাধীনতা নিহিত। ইতিহাসের কোনো বিশেষ যুগে ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে যুগের বাস্তব অবস্থার উপর। ফিক্টের মধ্যে জার্মান ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের বৈপরীত্যগুলির প্রকাশ দেখা যায়। বুদ্ধির মুক্তি এবং বাস্তব জীবনের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তিনি অগ্রসর চিন্তাবিদ। কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাখ্যায় তিনি ভাববাদের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ।

Fideism : বিশ্বাসবাদ

যুক্তি নয়, বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ চরম সত্যকে লাভ করতে পারে, এই মতকে বিশ্বাসবাদ বলা হয়। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দর্শনের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসবাদের প্রকাশ দেখা যায়। বিশেষ করে ভাববাদী দর্শনের মৌলিক কোনো প্রশ্নের সমাধানে পরিণামে বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ একটি সাধারণ সত্য। ধর্মীয় বিশ্বাসেরও কিছু রকম-ভেদ দেখা যায়। এর একটি প্রকাশকে চরম বিশ্বাস বলা যায়। চরম বিশ্বাস যুক্তিবিরোধী। চরম বিশ্বাস বিজ্ঞানের সার্থকতা অস্বীকার করে। এজন্য চরম বিশ্বাসবাদ যুক্তিবিরোধী। অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিশ্বাসবাদী কিয়ের্কেগার্ড এবং অন্যান্য দার্শনিক অ-যুক্তি বা যুক্তির ঊর্ধ্বে কোনো মাধ্যমকে চরম জ্ঞানের উপায় বলে মনে করেন। এঁদের একটি কথা আছে 'যা অবিশ্বাস্য তাকেই আমি বিশ্বাস করি।' এর অর্থ, বিশ্বাস্য হচ্ছে সাধারণ। অবিশ্বাস্য হচ্ছে অসাধারণ। আর অসাধারণের মধ্যেই সত্য, সাধারণের মধ্যে নয়। কিন্তু সেন্ট অগাস্টিনের ন্যায় ধর্মীয় দার্শনিকগণ যুক্তির তাৎপর্য পুরাপুরি অস্বীকার করেন না। এ জন্য তাঁদের মতকে নরমপন্থী বিশ্বাসবাদ বলা হয়। সেন্ট অগাস্টিন বলতেন, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে আমরা সত্যের অনুসন্ধান শুরু করি। কিন্তু অনুসন্ধানের শেষে দেখতে পাই যে, কেবল যুক্তিতে চরম সত্য লাভ সম্ভব নয়। বিশ্বাসেই চরম সত্য লাভ করা যায়। দর্শনের বিশ্বাসবাদ সাক্ষাৎভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারে।

অজ্ঞেয়বাদী হিউম বলতেন মানুষ বস্তু, কার্যকারণ, স্থানকাল কোনো কিছুর অস্তিত্বই জানতে পারে না। মানুষ কেবল বিশ্বাস করে যে, এসব সত্যের অস্তিত্ব আছে। জর্জ সান্তায়ানা মনে করতেন যে, মানুষের অস্তিত্বের মূলে যে বিশ্বাস তা না যুক্তিগত, না ধর্মীয়। কতকগুলি মৌলিক জান্তব বিশ্বাস বা ধারণার উপরই মানুষ জীবনযাপন করে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল মনে করতেন যে, বিশ্বাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করা মানুষের অসাধ্য। বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলি ভিত্তিও বিশ্বাস, যুক্তিগত প্রমাণ নয়। দ্বন্দ্বমূলক বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বিশ্বাসকে অস্বীকার করে না সত্য। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে বিশ্বাস হচ্ছে জ্ঞানের সদা বিকাশমান প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু তাই বলে যুক্তি এবং বাস্তব অনুসন্ধানের বাইরে জ্ঞান লাভের বিশ্বাসরূপ কোনো অনন্যনির্ভর মাধ্যম থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব বিশ্বাস অজ্ঞানতার আকর, জ্ঞানলাভের কোনো মাধ্যম নয়।

Filmer, Robert : রবার্ট ফিলমার (১৫৮৯-১৬৫৩ খ্রি.)

সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একজন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। রবার্ট ফিলমার অবশ্য অধিক খ্যাতিলাভ করেন তাঁর মৃত্যুর পর। ১৬৪৯-এর গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্ট-পক্ষের বিজয় এবং রাজার বিচার ও রাজার শিরচ্ছেদ ঘটলেও ক্রমওয়েলের পার্লামেণ্টীয় শাসনের পরে ইংল্যাণ্ডে পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে। সেই সময়কার ইংল্যাণ্ডে রাজা বনাম পার্লামেন্টের বিতর্কের সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রে ক্যাথলিক বনাম প্রটেস্ট্যান্টবাদও একটি বড় রকমের আলোড়নকারী বিতর্ক ছিল। ইংল্যাণ্ডের কোনো রাজা ক্যাথলিকবাদী হতে পারবে না—নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা একটি সামাজিক ধর্মীয় বিধান বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চার্লসের আসন্ন মৃত্যুর কালে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে এই বিতর্ক পুনরায় জাগরিত হয়। তা ছাড়া গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ইংল্যাণ্ডের রাজা যখন নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করার প্রবণতা দেখাতে পুনরায় শুরু করে তখন কে সার্বভৌম : রাজা, না পার্লামেন্ট তথা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, এই প্রশ্ন রাজনৈতিক বিতর্কে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে আবার একপক্ষ রাজতন্ত্র তথা রাজার সার্বভৌমত্বের উপর যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। অপর পক্ষ জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব উপস্থিত করে। রবার্ট ফিলমারের খ্যাতি তখন এই কারণে ঘটে যে তিনি তাঁর জীবিতকালে 'প্যাটরিয়ারকা' বা 'ন্যাচারাল পাওয়ার অব কিংস'—অর্থাৎ রাজার ক্ষমতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে যে পুস্তক রাজার পক্ষীয়গণ তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করে। এই গ্রন্থে ফিলমার একদিকে যেমন ধর্মীয় যুক্তিতে আদমকে ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রথম রাজা এবং আদমের পুত্র হিসাবে পার্থিব রাজাকে ঈশ্বরসৃষ্ট রাজারই উত্তরাধিকারীরূপে সার্বভৌম বলে মত প্রকাশ করেন, তেমনি জনসাধারণের সার্বভৌমত্বকে যাঁরা প্রকৃতির বিধান এবং সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে সমর্থন করেন, তাঁদের যুক্তিকে বেশ জোরের সঙ্গে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। ফিলমারের মতে 'জনসাধারণ' কথাটাই বাস্তবতাহীন। জনসাধারণ কোনোকালে চুক্তি করে সম্মতি জানিয়ে রাষ্ট্র এবং রাজা তৈরি করেছিল—এটা না ঐতিহাসিক, না যুক্তিভিত্তিক। জনসাধারণ আসলে 'মুণ্ডবিহীন একটা সংখ্যা ব্যতীত' আর

কিছু নয়। তাঁর কথায় 'হেডলেস মালটিচুড'। জন লক তাঁর ঐতিহাসিক 'টু ট্রিটিজেস অব সিভিল গভর্নমেন্ট'—নামক গ্রন্থে রবার্ট ফিলমারের যুক্তিকে খণ্ডন করেন। রাজনৈতিক এ সকল বিতর্কের একটি বাস্তব সমাধান ঘটে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক রাজার শাসনের শর্তাবলী নির্ধারণপূর্বক পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ঘোষণার মাধ্যমে।

Form and Content : আকার ও বস্তু ; আধেয় ও আধার

কোনো বস্তু বা অস্তিত্বের সামগ্রিক চরিত্র উপলব্ধির দার্শনিক সূত্র। আধেয় বলতে কোনো অস্তিত্বের অন্তর্গত বস্তুপুঞ্জকে বুঝায়। আধার বলতে আধেয়র অন্তর্গত বস্তুপুঞ্জের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক রূপকে বুঝায়। একটি টেবিলের বস্তু বা আধেয় বলতে টেবিলটা যা দিয়ে তৈরি আমরা তাকে বুঝি। টেবিলের আধার বা আকার বলতে বস্তুর সাংগঠনিক রূপ বুঝি। আকার ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি দার্শনিক প্রশ্ন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে আকার ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। এই দর্শন অনুযায়ী আকার ও বস্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্বের মূল হচ্ছে অস্তিত্বের বিকাশে আকার ও বস্তুর ভূমিকার পার্থক্য। বস্তুই হচ্ছে বিকাশের মূল। আকার হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বের সাংগঠনিক রূপ। ভাববাদী দর্শনে আকারকে বস্তুনিরপেক্ষ শক্তি বলে মনে করা হয়। প্লেটো, কাণ্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ভাববাদী দার্শনিকের মতে বস্তু হচ্ছে আকারের প্রকাশ। বস্তুর পরিবর্তন বা বিকাশও তাই আকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই দর্শনে আকারই মূল, বস্তু নয়। চরম আকার অদৃশ্য এবং অজ্ঞেয়। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনে করে যে, বস্তুর নিজস্ব গতি আছে। আকার বস্তুর বিকাশে প্রায় ক্ষেত্রে সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক শক্তি হিসাবে কাজ করে। বস্তুর আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের ফলেই তার আকারের পরিবর্তন ঘটে। সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে বস্তু ও আকারের এই বিরোধাত্মক সম্পর্কের উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমাজের মানুষ, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, সম্পদ হচ্ছে সমাজের বস্তু। সমাজের আকার হচ্ছে উৎপাদনের উপায়ের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক। সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সামাজিক বস্তুর পরিবর্তনে আকার এক সময়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আবার বস্তু পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আকারের পরিবর্তন ঘটে না। পুরাতন আকারের রেশ কিছুকাল চলতে থাকে। কিন্তু পুরাতন আকার স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে না। বস্তুর পরিবর্তনে আকারও পরিশেষে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

Fourier : ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭ খ্রি.)

ফ্রাঙ্কো-ম্যারি-চার্লস ফোরিয়ার ছিলেন বিখ্যাত ফরাসি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী। ফোরিয়ার একটি অর্থবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পরে নিজে যথেষ্ট অর্থের মালিকও হন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গণ্ডগোলে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ফোরিয়ার প্রথমে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। পরে তিনি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়ে নিজের জীবিকানির্বাহ করেন। সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রথম বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ ১৮০৮ সনে প্রকাশিত হয়। একদিকে ফরাসি বিপ্লবের সাম্যমৈত্রীর আদর্শ,

অপর দিকে ধনতন্ত্রের বাস্তব জীবনে শোষক ও শোষিতের ব্যবধান ফোরিয়ারকে সমাজের এই বৈপরিত্যের বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে। ফোরিয়ার অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে সমাজের এক শ্রেণীর সম্পদ এবং অপর শ্রেণীর দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কন করেন। এই অসঙ্গতি তাঁকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পথে নিয়ে যায়। এই বৈষম্যের কারণ কি? মানুষ কি স্বভাবগতভাবে কেউ শোষক এবং কেউ শোষিত হবে? এ প্রশ্নের জবাবে ফোরিয়ার ফরাসি বস্তুবাদীদের দর্শনকে সমর্থন করে বলেন যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে শোষক বা শোষিত নয়। মানুষের কোনো প্রবৃত্তিই তার মনজাত নয়—তা তার সমাজ বা পরিবেশজাত। যে চরিত্র অধিকাংশ মানুষের জন্য অমঙ্গলকর তা দূরীকরণের উপায় হচ্ছে বাস্তব পরিবেশকে পরিবর্তন করা। সুখ কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক। প্রয়োজন হচ্ছে এমন এক সমাজ সৃষ্টির যে সমাজে প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা চরিতার্থ হতে পারবে। ফোরিয়ারের মতে এ সমাজ সৃষ্টিতে বিপ্লব বা জবরদস্তির কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্য আবশ্যক মানুষের বৃহৎ সমাজকে স্বল্পসংখ্যক (চারশত পরিবারের) উৎপাদনশীল কতকগুলি ফ্যালাঞ্জ বা বাহিনীতে বিভক্ত করা। ফোরিয়ারের মতে এরূপ স্বল্পায়তন এককই ভবিষ্যৎ সমাজের মূল কোষ হিসাবে কাজ করবে। ফ্যালাঞ্জ-এর সদস্যরা গৃহের ন্যায় স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করবে। পরিশ্রমের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং শ্রমের বিভাগও এই ফ্যালাঞ্জ সমাজে এরূপ হবে না যে, একজন উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্যের মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে জড়িত থাকবে। আধুনিক শিল্পোৎপাদনের এই চরম শ্রমবিভাগ শ্রমকে অর্থহীন একঘেঁয়েমিপূর্ণ যাতনাকর দৈহিক শ্রমে পর্যবসিত করেছে। পরিকল্পিত সমাজে একজন শ্রমিক শুধু এক রকম নয়, সব রকম উৎপাদনের সঙ্গেই জড়িত থাকবে। ফ্যালাঞ্জ-এর সদস্যদের দৈনন্দিন শ্রম এরূপভাবে সংগঠিত হবে যাতে একজন শ্রমিক একটা নির্দিষ্ট সময় (দেড় ঘণ্টা থেকে দুঘণ্টা) একটা নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকার পরে ভিন্নতর কাজে নিযুক্ত হবে। এভাবে সংকীর্ণ পেশাদারী চরিত্র কারুর মধ্যে জন্মলাভ করতে পারবে না। সবাই উৎপাদনের সামগ্রিকরূপের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। এভাবে ফ্যালাঞ্জ-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফ্যালাঞ্জ-এর সম্পদে প্রাচুর্য আসবে। উৎপাদিত সম্পদ ফ্যালাঞ্জ-এর সদস্যদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ দক্ষতা এবং শ্রমের ভিত্তিতে বন্টিত হবে। ফোরিয়ার শহর এবং গ্রাম এবং দৈহিক শ্রম এবং মানসিক শ্রমের মধ্যকার পুঁজিবাদী সমাজের বিরোধ দূর করার প্রয়োজনের উপরও জোর দিয়েছিলেন। ফোরিয়ারের এসব মানবতাবাদী কল্পনার মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তনে শ্রমিক শ্রেণী যে অগ্রসর ভূমিকা পালন করবে—এ সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। অন্যান্য কল্পনাবাদী সমাজতান্ত্রিকের মত ফোরিয়ারও পুঁজিবাদীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন।

Freedom and Necessity : স্বাধীনতা ও অনিবার্যতা, নিয়মাধীনতা

মানুষের ক্রিয়াকর্ম এবং সমাজ ও প্রকৃতির বিধানের মধ্যকার সম্পর্কের সমস্যাসূচক দার্শনিক ধারণা। মানুষ তার কর্মের ক্ষেত্রে কি স্বাধীন, না প্রকৃতি ও সমাজের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? মানুষ স্বাধীন না নিয়মের দাস? স্বাধীনতার অর্থ কি? নিয়ম-নিরপেক্ষ কোনো স্বাধীনতার

অস্তিত্ব কি সম্ভব? এই প্রশ্নগুলি দর্শনে বিশেষ আলোচিত প্রশ্ন। ভাববাদী দর্শনে স্বাধীনতা ও নিয়মাধীনতা বা অনিবার্যতাকে পরস্পর-বিরোধী ধারণা বলে মনে করা হয়। এই দর্শনের মতে স্বাধীনতা হচ্ছে আত্মা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার সঙ্গে আত্মার বহির্গত কোনো অবস্থা কিংবা বিধানের সম্পর্ক নেই। মানুষের ইচ্ছা কোনো অবস্থা বা বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। মানুষের আত্মা বা ইচ্ছা হচ্ছে চরম আত্মা বা চরম ইচ্ছার প্রকাশ। চরম আত্মা চরমভাবে স্বাধীন। ব্যক্তির মধ্যে তার প্রকাশও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। কারণ মানুষের ইচ্ছা যদি পরিবেশের অধীন হয়, তা হলে মানুষের উপর কোনো কাজের নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করা চলে না। মানুষ ইচ্ছার ক্ষেত্রে স্বাধীন বলেই তার কাজের নীতিগত বিচার সম্ভব। কাজেই মানুষের স্বাধীনতার কোনো নিয়ন্ত্রণ হতে পারে না। এই নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতার একেবারে বিপরীত প্রান্তের মত হচ্ছে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ। যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদের মতে, মানুষের স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকতে পারে না। মানুষ হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধানের দাস। তার প্রতিটি আচরণ ও তার কাজ অনিবার্যভাবে এই বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ দর্শনে তাই মানুষ প্রাকৃতিক বিধানের অসহায় ক্রীড়নক বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু ভাববাদী স্বাধীনতা আর যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ উভয়ই স্বাধীনতা ও নিয়মাধীনতা বা অনিবার্যতার অবৈজ্ঞানিক একতরফা ব্যাখ্যা। স্বাধীনতা ও নিয়মাধীনতা পরস্পর সম্পর্কিত সত্য। উভয়ের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উপলব্ধির মধ্যেই এদের যথার্থ চরিত্র বোঝা সম্ভব। এই সম্পর্ক উপলব্ধির প্রথম প্রয়াস দেখা যায় স্পিনোজার দর্শনে। তিনি কোনো বিধান বা অবস্থার অপরিহার্যতার উপলব্ধিকে ব্যক্তির স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ মাধ্যাকর্ষণের অধীন। মানুষ এমন কোনো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না, যে স্বাধীনতায় সে মাধ্যাকর্ষণকে অস্তিত্বহীন বলতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন উপলব্ধি করে, কেন সে মাধ্যাকর্ষণের অধীন তখনি মাত্র সে মাধ্যাকর্ষণের অধীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম বা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি সে অর্জন করতে পারে। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব বিধানের অপরিহার্যতার কারণ সচেতনভাবে উপলব্ধির মধ্যেই মানুষের স্বাধীনতা নিহিত। মানুষ প্রকৃতির পরিপূর্ণ দাস ছিল সেই আদিম যুগে, যখন সে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে অক্ষম ছিল। তখন সে প্রকৃতির বিধানকে জানত না। আজ মানুষ ক্রমাধিক পরিমাণে প্রকৃতির প্রভু হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রকৃতির বিধানকে লঙ্ঘন করে নয়, প্রকৃতির বিধান সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমেই। বিধানহীন চরম স্বাধীনতা বলে মানুষের কিছু থাকতে পারে না। আবার বস্তুজগতের সে অসহায় ক্রীড়নকও নয়। মানুষ বস্তু, জগৎ ও সমাজের বিধান যত জ্ঞাত হতে পারে, বস্তু, জগৎ ও সমাজকে পরিবর্তন করার স্বাধীনতাও সে তত অর্জন করতে পারে।

French Revolution : ফরাসী বিপ্লব

Paris Commune : প্যারিসের কমিউন শ্রমিকদের বিপ্লবী ব্যবস্থা। কিন্তু শাসকশ্রেণীর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছিল। ১৫ই মার্চ থেকে ২৫শে মে পর্যন্ত প্যারিস কম্যুনের অস্তিত্ব ছিল। তথাপি শ্রমিকদের বিপ্লবী ক্ষমতা দখল হিসাবে 'প্যারিস কম্যুনকে' মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়।

Freud, Sigmund : সিগমাণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯ খ্রি.)

সিগমাণ্ড ফ্রয়েড মনোসমীক্ষণের প্রবক্তারূপে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত। অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়াতে ফ্রয়েডের জন্ম। অধ্যয়নজীবনে আইন থেকে বিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৪ সনে ফ্রয়েড ভিয়েনার হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সনে ফ্রয়েড ফরাসি স্নায়ুতন্ত্রবিদ চারকটের সংযোগে আসেন। চারকট মনে করতেন মৃগীরোগের মূলে মানসিক কারণ নিহিত। চারকটের নিকট থেকে মনোসমীক্ষার আগ্রহ নিয়ে ফ্রয়েড ভিয়েনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৩ সালে ফ্রয়েড ক্রয়ারের সহযোগিতায় 'স্টাডিয়েন উবার হিস্টোরি' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, হিপনোসিস বা সংবেশনের মাধ্যমে রোগীর অচেতন মনের অবদমিত ভাবকে অর্গলমুক্ত করে মৃগীরোগীকে রোগমুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু এমন চিকিৎসার ফল তেমন স্থায়ী হয় না দেখে ফ্রয়েড পরবর্তীকালে হিপনোসিস বা সংবেশন পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন। এর পরে তিনি এককভাবে তাঁর মনোসমীক্ষণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর স্বপ্নের তত্ত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্রয়েড মনে করতেন স্বপ্নের মধ্যে অচেতন জগতে অবদমিত বাসনা আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব। মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডের প্রধান অবদান হচ্ছে তাঁর 'আনকনসাস' বা অচেতন মনের ব্যাখ্যা (দ্র. Unconscious অচেতন)। ফ্রয়েডের তত্ত্বে অচেতনকে 'ইড' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। 'ইড' হচ্ছে ব্যক্তির আত্মস্বার্থ রক্ষামূলক সকল কামনা বাসনা প্রবৃত্তির সমাহার-সত্তা। মানসিক রোগ যে দেহের রোগ নিরপেক্ষভাবে হতে পারে এই তত্ত্বই যে ফ্রয়েড প্রবর্তন করেন, তাই নয়। তিনি আরো বলেন, সকল মানসিক রোগের মূলে আছে যৌনকামনা বা প্রবৃত্তির অবদমন। যৌনাবেগ হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল আবেগ। কিন্তু সমাজে এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত পূরণ সম্ভব নয়। বিভিন্নভাবে যৌন আবেগ ও ইচ্ছাকে অবদমিত করা হয়। এই অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে মনের বৃহত্তর এবং অচেতন ভাগের সংগঠন। অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ এবং আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা এবং সচেতন মন বিবেক বা সেন্সরের প্রহরা ও প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। দ্বন্দ্বের তীব্রতায় ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড ১৮৮৯ সালে ঘোষণা করেন, যৌনানুভূতি কেবল যে মৌলিক অনুভূতি তাই নয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, যৌনানুভূতি বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম লাভ করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন, বয়ঃপ্রাপ্তিতে নয়, ব্যক্তির জন্ম থেকেই যৌনানুভূতির জন্ম। ফ্রয়েডের তত্ত্বের অভিনবত্ব সমকালীন চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন এবং প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ফ্রয়েডের পূর্বে মনের এরূপ গভীর বিশ্লেষণ আর কেউ করেন নি। তা ছাড়া যৌনানুভূতি যে ব্যক্তি চরিত্রের একটি শক্তিশালী নিয়ামক তা আজ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। কিন্তু ফ্রয়েড তাঁর এই তত্ত্বে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে যৌন অনুভূতিকে সব বিকারের একমাত্র কারণ বলে নির্দিষ্ট করার যে প্রবণতা দেখিয়েছেন তাকে গ্রাহ্য বলে অনেকে মনে করেন না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বের অভিনবত্বে কিছুটা বিমোহিত হয়ে কল্পনাবাদীতে পরিণত হয়েছেন। মানসিক রোগের

কারণকে তিনি ব্যক্তির দেহ এবং সামাজিক পরিবেশ বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে মানসিক রোগ নিরাময়ের সমাজ বিচ্ছিন্ন যে পদ্ধতির তিনি আবিষ্কার করেছেন তা দ্বন্দ্ব সংঘাতময় সমাজে অসহায় ব্যক্তির মানসিক বিকারের নিরসনে খুব কার্যকর কোনো ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় নি।

১৯০৩ সালে তিনি ভিয়েনাতে 'মনোসমীক্ষণবিদ চক্র' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন দেশে এই সংগঠনের শাখা প্রসার লাভ করে। তাঁর উদ্যোগে ১৯০৮ সালে সুইজারল্যাণ্ডের সালজবার্গে প্রথম আন্তর্জাতিক মনোসমীক্ষণ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সালে তাঁর আবিষ্কারের বিকৃতি নিবারণের উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোসমীক্ষণ সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে ফ্রয়েডের আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে ফ্যাসিস্ট হিটলারের বাহিনী ভিয়েনা দখল করার পরে ফ্রয়েড নিরাপত্তার জন্য লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৯ সনে লণ্ডনেই মারা যান।

Futurism : ভবিষ্যবাদ

১৯০৯—১১ সালে ইতালির কবি মারিনেতী (১৮৭৬-১৯৪৪) শিল্প এবং সাহিত্যে 'যন্ত্রই সব' এরূপ একটি নতুন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। মারিনেতী তাঁর 'মেনিফেস্টি দাল ফিউচারিজমো' নামক গ্রন্থে ঘোষণা করেন : 'যন্ত্রই আমাদের আরাধ্য। যন্ত্রকে আমরা শীর্ষে স্থাপন করব। আমরা যন্ত্রের গুণ কীর্তন করব।' শিল্পবোধে নতুনত্ব আমদানি করে মারিনেতী বলেন : একটা বিদ্যুৎগতি মোটর গাড়ি একটি তথাকথিত সুন্দর ভাস্কর মূর্তির চেয়ে আমাদের নিকট অনেক বেশি সুন্দর। ১৯১১ সালে মারিনেতী ইতালির পাঁচজন তরুণ শিল্পীর একটি চিত্রপ্রদর্শনী সংগঠিত করেন। এই শিল্পীগণ তাঁদের ঘোষণাপত্রে নিজেদের বিপ্লবী ঘোষণা করে বলেন যে, প্রতিষ্ঠিত শিল্পবোধের তাঁরা বিরোধী। 'আমরা গতির শিল্পী। গতিকে আমরা মূর্ত করে তুলব। চিত্রকলা আর ইন্দ্রিয়ানুভূতি অচ্ছেদ্য। একটি খণ্ডকে অঙ্কন করা যথেষ্ট নয়। যেটা আবশ্যক সে হচ্ছে সেই বস্তুর মধ্যে যে গতি আছে তাকে অঙ্কন করা।' কবি মারিনেতীর এ ধারাটি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী এই ধারাটির মধ্যে অতীতের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার এবং আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার যন্ত্রশক্তির অনিবার্য প্রভাবের সচেতন স্বীকৃতির একটা প্রয়াস দেখা যায়। ভবিষ্যবাদের আর একটি দিক আছে। যন্ত্রকে একমাত্র আরাধ্য করার মধ্যে এই যন্ত্রের সত্যকার স্রষ্টা যে শ্রমজীবী মানুষ তার গুরুত্বের যেমন স্বীকৃতি নেই, তেমনি এই শ্রমজীবী মানুষের যে দুর্দশা যন্ত্র দ্বারাই অনড় করে রাখার সুকৌশল চেষ্টা চলছে তার উপলব্ধির সাক্ষাৎও ভবিষ্যবাদের প্রবক্তাদের চিন্তায় পাওয়া যায় না। বস্তুত ভবিষ্যবাদ প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের সৃষ্টি যান্ত্রিক শক্তিবাদের পরিপোষক।

G

Galaxy : ছায়াপথ

সূর্যসহ জ্যোতির্মণ্ডলের দশ হাজার কোটি তারকার সমবায়ে গঠিত জগৎকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ ছায়াপথ বলে অভিহিত করেন। ছায়াপথ হচ্ছে তারকারাজি ও নীহারিকার পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতে গঠিত ঘূর্ণ্যমান এক জটিল মণ্ডল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা ছায়াপথের পরিধি আলোক বৎসরের হিসাবে পরিমাপ করেন। সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিসম্পন্ন আলো এক বৎসরে যতটা পথ অতিক্রম করতে পারে, তাকে আলোক বৎসর বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মনে করে যে, একটা ছায়াপথের পরিধি এমনি একশ হাজার বা একলক্ষ আলোক বৎসরের পরিমাণ। জ্যোতির্মণ্ডলে ছায়াপথ কেবল একটি নয়। কয়েক শ কোটি থেকে কয়েক লক্ষ কোটি তারকার সমন্বয়ে গঠিত একাধিক ছায়াপথ নিয়ে তৈরি হয় অধিছায়াপথ। জ্যোতির্বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টিকে সীমাহীন দিগন্তে প্রসারিত করে দিয়েছে। মহাবিশ্বের বিপুলতার কিছুটা ধারণা মানুষ ছায়াপথের বিবরণ থেকে করতে পারে।

Galen : গ্যালেন (১৩০-২০১ খ্রি.)

চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রাটিসের পরেই চিকিৎসাবিদ গ্যালেনের স্থান। প্রাচীন এশিয় মাইনরের পারগামসে গ্যালেনের জন্ম। পারগামস, কোরিনথ্ এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নের পরে গ্যালেন রোম গমন করে এবং পরবর্তীকালে রোমের সম্রাট মারকাস অরেলিয়াস-এর চিকিৎসাবিদ হিসাবে নিযুক্ত হন। হিপোক্রাটিস ব্যতীত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপর কেউ গ্যালেনের মতো সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন নি। ষোড়শ শতকের ভেসালিয়াসের পূর্বে গ্যালেনের ন্যায় শারীরবিদ বা এ্যানাটমিস্ট যেমন অপর কেউ ছিলেন না, তেমনি সপ্তদশ শতকের হারভের পূর্ব পর্যন্ত এমন দক্ষ ফিজিওলজিস্ট বা দেহতত্ত্ববিদও ছিলেন না। প্রাচীনকালের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর মতো অবিরল রচনাকারও কেউ ছিলেন না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর তাঁর রচনার সংখ্যা গবেষকদের মতে ছিল ১৩০ এবং দর্শন, আইন এবং ব্যাকরণের উপর তাঁর সংখ্যা ছিল ১২৫।

Galileo : গেলিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রি.)

গেলিলী গেলিলিও ছিলেন ইতালির পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এ্যারিস্টটলের অনড় অভিমত এবং মধ্যযুগের বন্ধ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলিলিও ছিলেন বিদ্রোহী পথপ্রদর্শক। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির প্রবক্তা এবং আপেক্ষিকতা ও 'ল অব ইনারসিয়া' বা বস্তুর

জাড্যতার বিধানের আবিষ্কারক। গেলিলিওর গবেষণা কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিকতার তত্ত্বকে সুপ্রমাণিত করে বিশ্ব সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। এই আঘাতে যাজক সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হয়ে ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, কপারনিকাসের তত্ত্ব ঈশ্বরের বাণীর বিরোধী। তাই কোনো দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক কপারনিকাসের তত্ত্ব সঠিক বলে কোনো অভিমত প্রকাশ করতে পারবে না। তেমন অভিমত কেউ প্রকাশ করলে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। এর ফলে গেলিলিও দীর্ঘকাল নীরব থাকতে বাধ্য হন। গেলিলিওর বিশ্বদৃষ্টি ছিল সুস্পষ্টরূপে প্রগতিশীল। তিনি মনে করতেন, বিশ্ব হচ্ছে অসীম এবং বস্তু হচ্ছে শাশ্বত। বিশ্ব প্রকৃতি অণুর নির্ভুল নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রকৃতিকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা।

Ghose, Aurobindo : অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রি.)

বিশিষ্ট বাঙালি চিন্তাবিদ, এককালের রাজনৈতিক নেতা এবং শেষ বয়সে যোগী। শিক্ষাজীবনের পর অরবিন্দ স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৮ সালে তিনি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার এবং বে-আইনিভাবে বোমা তৈরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। অরবিন্দ এবং অন্যান্য গোপন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে, 'আলীপুর বোমার মামলা' বলে বিখ্যাত মামলা দায়ের করা হয়। বোমার মামলা থেকে মুক্ত হয়ে অরবিন্দ রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্ম-সাধানায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত দার্শনিক ধারণা প্রচারের জন্য অরবিন্দ দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিচেরিতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অরবিন্দ বেদান্ত দর্শনের নতুন ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেন। তাঁর ব্যাখ্যাকে সমন্বিত বেদান্ত দর্শন বলা হয়। তাঁর এই ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভারতের বেদান্ত দর্শন এবং ইউরোপীয় আধুনিক দর্শন, বিশেষ করে হেগেল, ব্রাডলে, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের ভাবসমূহের মিশ্রণ দেখা যায়। অরবিন্দ মানুষের ইতিহাসকে চেতনার স্তর-ক্রমিক বিকাশ বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অর্ধ-চেতন, এবং অতি-চেতন মানুষের চেতনা এইরূপ বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। সামাজিক বিকাশে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র কোনোটাকে শ্রেয় মনে করতে না পেরে অরবিন্দ বিকাশের এক তৃতীয় পথের কল্পনা করেন। অরবিন্দের দর্শন প্রধানত ভাববাদী।

Gandhism : গান্ধীবাদ

অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রখ্যাত রাজনীতিক মোহন দাস করমচান্দ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি.) সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অভিমত গান্ধীবাদ বলে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত। গান্ধীবাদ রাজনীতি ও সমাজনীতির সাথে ধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত। গান্ধীবাদ বলতে অহিংসাবাদও বুঝায়। কারণ গান্ধী অহিংসাকে কোনো লক্ষ্য সাধনের কেবল উপায় নয়, অহিংসাকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তাঁর মতে অহিংসা ও নৈতিক শক্তি হচ্ছে সকল পরিবর্তনের মূল উপায়। অহিংসা নিছক একটা কর্মকৌশল নয়। অহিংসা মানবজীবন ও সমাজের মূল ভিত্তি। গান্ধীর অহিংসাবাদের সঙ্গে কাউন্ট লিও টলস্টয়ের নৈরাষ্ট্রবাদী মতের

মিল ছিল। বস্তুত গান্ধীর সমাজদর্শনে টলস্টয়ের সমাজদর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'হরিজন' পত্রিকা এবং আপন স্মৃতিকথা ও তাঁর অপরাপর গ্রন্থে গান্ধীবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গান্ধী তাঁর অহিংসাবাদ বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে অহিংস অসহযোগিতার নীতি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর অহিংসাবাদ বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে অহিংস অসহযোগিতার নীতি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর রাজনীতিক জীবনের শুরুতে প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতালাভের উপায় হিসাবে ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীবাদের প্রয়োগ অবিমিশ্র এবং সর্বদা সার্থক না হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব, সারল্য এবং অনমনীয়তা ভারত ভূখণ্ডের জনসাধারণের, বিশেষ করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে ইংরেজ শাসকদের কাছে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। গান্ধীবাদ একান্তই ব্যক্তিবাদী ধর্মাশ্রয়ী বুর্জোয়া কল্পনাবিলাসী দর্শন। সমাজের বৈষম্যের জন্য দুঃখবোধ করলেও গান্ধীবাদ সেই বৈষম্যের মূল কারণ বিশ্লেষিত হয় নি। ফলে অহিংসার মাধ্যমে সব বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা বাস্তবে স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধীর মৃত্যুর (১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি গোঁড়া হিন্দু বিনায়ক গডসের গুলিতে নিহত হন) সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রভাব ভারতীয় সমাজ জীবন হতে হ্রাস পেতে থাকে। গান্ধীবাদের কোনো শক্তিশালী উত্তরাধিকার ভারতীয় সমাজে দৃষ্ট হয় না।

General Will : সাধারণ ইচ্ছা

রুশোর রাষ্ট্র-তত্ত্বমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট' বা 'সমাজ চুক্তি' কিংবা 'সামাজিক চুক্তি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে 'জেনারেল উইল' বা 'সাধারণ ইচ্ছা'। এই পদের মাধ্যমে রুশো একদিকে যেমন অষ্টাদশ শতকে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতার লড়াইতে ব্যক্তির সার্বভৌমত্বের উপর জোর প্রদান করেছেন, অপরদিকে তেমনি তিনি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কোনো বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছা বা স্বাধীনতা যে মূল নয়, মূল যে মানুষের যৌথ স্বেচ্ছায় সৃষ্ট সমাজসত্তা, তাকেও যুক্তিগতভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষেত্রে রুশো ব্যক্তি ইচ্ছাকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। ব্যক্তির সার্বভৌম ইচ্ছার ভিত্তিতে সৃষ্ট যৌথ সত্তা হচ্ছে রাষ্ট্র বা সমাজ। এই সমাজ একটি ক্রিয়াশীল অস্তিত্ব। এ অস্তিত্বেরও 'ইচ্ছা'রূপ শক্তি আছে। এবং এই ইচ্ছা'র উৎস হচ্ছে ব্যক্তির সমাজ বা রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে ঐকমত্য। রাষ্ট্র বা সমাজ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ইচ্ছা। এবং এই ইচ্ছাই হচ্ছে ব্যক্তির ইচ্ছার 'সাধারণ' রূপ। সাধারণ বা জেনারেল এই অর্থে যে এ ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির ইচ্ছাই এক। সকলের ইচ্ছা অভিন্ন। সকলে মিলে যৌথ জীবন যাপনের ইচ্ছা। এবং সমাজ জীবনে এই অভিন্ন ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌম। 'ব্যক্তির ইচ্ছার ভিত্তিতে সমাজ বা রাষ্ট্রের ইচ্ছা' এই তত্ত্বের কারণেই রুশোকে 'জনগণের সার্বভৌমত্বের' প্রবক্তা বলা হয়। কিন্তু ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে, প্রতিমুহূর্তের কার্যে যে ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে সে হচ্ছে ব্যক্তির বিশেষ বা 'পারটিকুলার' ইচ্ছা। অনেক সময়ে ব্যক্তির এই বিশেষ ইচ্ছার সঙ্গে তার সাধারণ ইচ্ছার বিরোধ ঘটে। ব্যক্তি যখন সচেতন বা অচেতনভাবে যৌথের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত

হয় তখনি ব্যক্তির ইচ্ছার এই বিরোধের দিকটি প্রকাশিত হয়। রুশো তাঁর 'সোস্যাল কণ্ট্রাক্ট' গ্রন্থে এই তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসঙ্গতির প্রকাশ ঘটেছে। তথাপি 'সাধারণ ইচ্ছার' তত্ত্ব যে রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু এবং রাষ্ট্রদর্শনে এটি যে তাঁর অনন্য অবদান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (দ্র. Rousseau : রুশো ; Social Contract : সামাজিক চুক্তি)।

Gibbon : গিবন

Gibbon Edward (1737-94) বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে রোম ভ্রমণকালে গিবন প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেন। তাঁর রচিত রোমের এই ইতিহাসই ইংরেজি সাহিত্যের অতুলনীয় এক রোম সাম্রাজ্যের পরিচিতি লাভ করে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থের নাম রাখেন রোমসাম্রাজ্যের ক্ষয় এবং পতনের ইতিহাস (১৭৭৬-৮৮) ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই ইতিহাস গ্রন্থে গিবন প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারা বিবরণী তৈরি করেন। এই বিবরণে খৃষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, টিউটনদের উদ্ভব, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মের যুদ্ধ (ক্রুসেড) ইত্যাকার সব কিছুর বিবরণ গিবন অন্তর্ভুক্ত করেন।

Good and Evil : ভালো এবং মন্দ

মানুষের সামাজিক আচরণের লক্ষ্য এবং লক্ষ্য সাধনের উপায়ের মূল্যায়নসূচক নীতিবাদী সূত্র। একটা বিশেষ সমাজে যে আচরণকে বাঞ্ছিত ও অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় তাকে ভালো এবং যা অবাঞ্ছিত ও পরিত্যজ্য তাকে মন্দ বলে চিহ্নিত এবং অভিহিত করা হয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়—এই নীতিবাদী সূত্রকাল ও সমাজ নিরপেক্ষ সূত্র নয়। আদি গোত্রতান্ত্রিক সমাজে এর প্রথম উদ্ভব। ব্যক্তির সমন্বয়ে গোত্র কিংবা সমাজ। কিন্তু গোত্র সমাজভুক্ত ব্যক্তি যদি নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করতে থাকে তা হলে আর গোত্র বা সমাজ সংবদ্ধ থাকতে পারে না। তখন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আচরণের বিরোধ ও সংঘর্ষে সমাজ ভেঙে যায়। কিন্তু সমাজ বাদে ব্যক্তির জীবন ধারণ সম্ভব নয়। মানুষের এই মৌলিক অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যক্তির আচরণের সামাজিক মূল্যায়ন এবং সমাজের সংগঠন ও শৃঙ্খলার সহায়ক আচরণ বাঞ্ছিত ও কাম্য বা ভালো এবং সমাজের অহিতকর আচরণ মন্দ বলে অভিহিত হতে শুরু করে। সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমান্বয়ে যখন রাষ্ট্রীয় সংগঠন উদ্ভূত হয় তখন 'ভালো', 'মন্দ', 'ন্যায়', 'অন্যায়' প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় বিধান হিসাবে করণীয়, অকরণীয়, শাস্তিযোগ্য, পুরস্কারযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এই পর্যায় থেকে সামাজিক ভালো-মন্দ বোধগুলি শ্রেণী চরিত্রও লাভ করতে শুরু করে। সমাজের ভালো-মন্দ এখন থেকে শাসক শ্রেণীর ভালা-মন্দ হিসাবে প্রচারিত এবং প্রযুক্ত হতে শুরু করে। শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হতে থাকে। ভালো-মন্দের দার্শনিক আলোচনায় দুটি প্রধান ধারা লক্ষণীয়। এর একটি হচ্ছে ভাববাদী ধারা। ইমানুয়েল কান্টের রচনায় এর প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এই মত অনুযায়ী ভালো-মন্দ

সমাজ ও কাল-নিরপেক্ষ এক অলৌকিক আদর্শ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে ভালোত্বর যে বোধ আছে এটা তার সহজাত ধারণা। তার এ ধারণা হচ্ছে চরম অলৌকিক ভালোর প্রকাশ। মানুষের এই ভালোত্ববোধের জন্ম কোনো বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে না। বস্তুবাদী ধারণা এর বিপরীত। বস্তুবাদ, বিশেষত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে ভালোমন্দ বোধ মানুষের জীবন যাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনবোধ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। যে আচরণ জীবনের সহায়ক তাই ভালো। যা জীবনের জন্য ক্ষতিকর তাই মন্দ। এই ভালো-মন্দর ধারণা যুগ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং চরম ভালো বলে কোনো অলৌকিক আদর্শ নেই। এই দুই ধারার মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিক ভালো-মন্দর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রিসের এরিসটিপাস এবং এপিকুরাস বলতেন, যে আচরণ মানুষের জন্য সুখ আনয়ন করে সেই আচরণ বা বস্তু ভালো এবং যা মানুষের দুঃখের কারণ তা মন্দ। এজন্য তাঁদের নীতিবাদকে সুখবাদ বলে অভিহিত করা হয়।

Generalisation : সামান্যীকরণ, সাধারণীকরণ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষার প্রয়োজনীয় স্তরসমূহের মধ্যে সাধারণীকরণ অন্যতম। জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে এভাবে বিবৃত করা যায় : কোনো প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা প্রথমে প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করি ; এটি প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে পর্যবেক্ষিত বস্তু বা ঘটনাকে তুলনা ও বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষিত বস্তু বা ঘটনা এবং অনুরূপ অপর বস্তু বা ঘটনার উপর প্রয়োগযোগ্য একটি ব্যাখ্যা বা সমাধান তৈরি করি। এই স্তরটি সাধারণীকরণের স্তর। সাধারণীকরণ দ্বারা বা সাধারণ ধারণাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্তের সঠিকতা কিংবা বেঠিকতাকে আমরা যাচাই করি। বাস্তব অভিজ্ঞতা গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তটি সঠিক প্রমাণ করলে সাধারণ ধারণাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্তের সঠিকতা কিংবা বেঠিকতাকে আমরা যাচাই করি। বাস্তব অভিজ্ঞতা গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তটি সঠিক প্রমাণ করলে সাধারণ সিদ্ধান্তটি একটি নিয়ম বা বিধানের মর্যাদা লাভ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণের অনুসন্ধানের উল্লেখ করা যায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ জানার জন্য প্রথম স্তরে এই জ্বরে আক্রান্ত একাধিক রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণের পরে রোগীদের মধ্যকার সাধারণ বা সর্বদা উপস্থিত অবিচ্ছেদ্য বিষয় বা উপাদান (এনোফেলিস মশার কামড়) বিশ্লেষণের মারফত নির্দিষ্ট করে এই জ্বরের কারণ সর্বদাই যে এনোফেলিস মশার কামড়, সেরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী স্তরে সিদ্ধান্তটিকে বাস্তবে আরো প্রয়োগ ও পরীক্ষার মাধ্যমে তার নিসংশয়তা স্থির করা হয়। জ্ঞানের বিকাশে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের একটি উন্নততর স্তরকে চিহ্নিত করে। মানুষ আদিতেই বস্তুপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করে তাকে তুলনা ও বিশ্লেষণ করে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে নি। তার জন্য তার মনন ক্ষমতার অধিকতর বিকাশের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সাধারণ ধারণায় আমরা যেমন বস্তুর সারকে জানার চেষ্টা করি, তেমনি আবার বিশেষ বস্তুর যে বৈচিত্র্য, সাধারণ সিদ্ধান্তে তার অনুপস্থিতি ঘটে। আমরা

একত্রে সন্নিবেশিত বৃক্ষরাজিকে পর্যবেক্ষণ করে তাকে সামগ্রিকভাবে বন বলে আখ্যায়িত করি। বৃক্ষরাজির সম্মেলনে বন তৈরি হয় ; সে 'বনে'র একটি সাধারণ রূপ আছে—বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের বৈচিত্র্য তাতে নেই।

Genetic Method : জনিতপদ্ধতি

কোনো বস্তু বা বিষয়ের উদ্ভব এবং বিকাশের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত গবেষণার পদ্ধতিকে জনিত বা জনিতপদ্ধতি বলা হয়। একে ঐতিহাসিক পদ্ধতিও বলা চলে। সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকাশের তত্ত্ব যখন প্রাধান্য পেতে শুরু করে, তখন থেকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জনিতপদ্ধতির ব্যবহার ও প্রয়োগ শুরু হয়। এর পূর্বে দর্শন বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে বিশ্লেষক পদ্ধতিরই প্রাধান্য ছিল। বিশ্লেষক পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা সমাধানে বস্তু বা বিষয়ের চরিত্র বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হয়। কোনো সমস্যার চরিত্র যে তার উদ্ভব এবং বিকাশ দ্বারা নির্দিষ্ট, এই সত্যের স্বীকৃতি বিশ্লেষক পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। ফলে, বিশ্লেষক পদ্ধতির বিষয় জ্ঞান ও কালনিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্লেষক পদ্ধতির তাই সিদ্ধান্ত অনেক সময়ে কাল্পনিক, অবাস্তব এবং জ্ঞানের বিকাশের প্রতিকূল। দর্শনে প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিশ্লেষক পদ্ধতিই ছিল প্রধান পদ্ধতি। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসার এবং জনিতপদ্ধতির কার্যকারিতায় অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় দর্শনও জনিতপদ্ধতি গ্রহণ করতে শুরু করে। বস্তুত দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের আজ জনিতপদ্ধতি জ্ঞানের বিকাশে অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি বলে বিবেচিত। জনিতপদ্ধতি কোনো সমস্যার বিচারে তার উদ্ভবকালের অবস্থা, তার পরবর্তী বিকাশের পর্যায়সমূহ এবং এই বিকাশের অন্তর্নিহিত ধারা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। জনিতপদ্ধতির মৌলিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, সমস্যা, বস্তু বা বিষয়মাত্রেরই উদ্ভব এবং বিকাশ আছে। তার আভ্যন্তরিক বিধান ও চরিত্র কেবলমাত্র বিবেচ্য সমস্যাকে স্থান ও কালের সঙ্গে সংযুক্ত করেই নির্ধারণ করা সম্ভব। জনিতপদ্ধতির যেমন কার্যকারিতা আছে তেমনি তার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। জনিতপদ্ধতি বলতে যদি কেবল বিকাশের বিবরণ বুঝায়, তা হলে সে পদ্ধতি বিবরণকে অতিক্রম করে কোনো বস্তু বা বিষয়ের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দানে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং বিকাশের বিবরণেই তা পর্যবসিত হয়ে পড়ে। সে জন্য প্রয়োজন বিকাশকে বিশ্লেষণ করা। এ কারণে কার্যকর জনিতপদ্ধতি বলতে এমন পদ্ধতি বুঝায়, যে পদ্ধতি সমস্যার উদ্ভব এবং বিকাশকে যেমন বিবেচনা করবে, তেমনি বিশ্লেষণের সাহায্যে এই বিকাশের ধারা উদ্‌ঘাটিত করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

Gettys Burg Address : গেটিস বার্গ-ভাষণ (১৮৬১-১৮৬৫)

আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলীয় এবং উত্তর অঞ্চলীয় এবং উত্তর অঞ্চলীয় ব্রিটিশ কলোনিসমূহের মধ্যে দাসপ্রথার পক্ষ ও বিপক্ষ হিসাবে বিভক্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির পাঁচ বছরব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বলা হয়।

উত্তর অঞ্চলের জয়লাভের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধ শেষে মৃত সৈনিকদের সম্মানে গেটিস বার্গে যে শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন যে

শোকভাষণ দেন সে ভাষণ তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ঐতিহাসিক ভাষণ তথা গেটিসবার্গ ভাষণ নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

আব্রাহাম লিংকনের ভাষণটি যেমন ছিল ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম ভাষণসমূহের অন্যতম একটি ক্ষুদ্র ভাষণ, তেমনি বক্তব্যের তাৎপর্যেও ভাষণটি ছিল যথার্থই একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ।

একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় সমাবেশ যখন অধীর আগ্রহের সঙ্গে লিংকনের ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছিল, তখনি তারা দেখল আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ শেষ হয়ে গেছে।

মাত্র উনিশটি বাক্যে প্রদত্ত ভাষণটির শেষ কয়েকটি বাক্য ছিল এরূপ : "... that from these honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion ; that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain ; that this nation, under God, shall have a new birth of freedom ; and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

গৃহযুদ্ধের অবসানের পরবর্তীতে ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে গুপ্তঘাতকের গুলিতে আব্রাহাম লিংকন নিহত হন। তখন লিংকনের বয়স ছিল মাত্র ৫৬ বৎসর। (দ্রষ্টব্য : আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।)

Godwin, William : উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬ খ্রি.)

ইংল্যাণ্ডের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং ঔপন্যাসিক। কবি শেলী তাঁর জামাতা ছিলেন। গডউইনের খ্যাতি এ কারণে যে, তিনি জীবনের প্রথম দিকে একজন ধর্মযাজক থাকলেও ফরাসি দার্শনিকদের রচনাপাঠে প্রভাবিত হয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে ধর্ম সম্পর্কে সমালোচনাবাদী হয়ে ওঠেন এবং গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'রাজনৈতিক ন্যায়ের বিষয়ে' বা 'কনসারনিং পলিটিক্যাল জাসটিস' তাঁর শ্রেণীগত চিন্তাবিদদের চিন্তার ব্যতিক্রমী চিন্তা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই গ্রন্থের অভিমতসমূহ ফরাসি বিপ্লবের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ পায়। ইংল্যাণ্ডের প্রগতিবাদী চিন্তারও তিনি সমর্থক হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তায় ক্রমান্বয়ে কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীয় এবং নৈরাষ্ট্রবাদী ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি বলেন রাষ্ট্রে মানুষ বাস করে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র মানুষের শেষ লক্ষ্য নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে জবরদস্তির প্রতীক। মানুষের লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে সামাজিক জীবনযাপন করা। জোর বা জবরদস্তির মৌল বিরোধিতার ভিত্তিতে একের শ্রমের দ্বারা অপরের জীবনযাপন তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিনি বিরোধিতা করেন। মানুষ প্রকৃতির বিধানে সমান। এবং সে কারণে মানুষে মানুষে সম্পদে অসাম্য থাকা অসঙ্গত। মানুষের সমাজে বিদ্যমান অসঙ্গতির মূলে হচ্ছে অজ্ঞতা। অশিক্ষা দূর হলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যকার অসাম্য, অবাঞ্ছিত আইন-কানুন, সরকারের শক্তিপ্রয়োগ প্রভৃতির বিলোপ ঘটবে। গডউইনের এরূপ চিন্তায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কল্পনাবাদী টমাস মুরের চিন্তার মিশ্রণ দেখা যায়। যুক্তিবাদী হিসাবে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। ধর্ম মানুষকে পরলোকবাদী করে তার জাগতিক শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিভ্রান্ত এবং বিনষ্ট করে। খ্রিষ্টধর্মকেও তিনি এই

কারণে ক্ষতিকর বলে সমালোচনা করেন। নিজের বৈবাহিক জীবন থাকলেও বৈবাহিক রীতির প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর এসব চিন্তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিবাদী অভিমত প্রকাশিত হয়। এ কারণে তাঁর সমকালীন স্বীকৃতি এবং জনপ্রিয়তা ইংল্যাণ্ডের চাইতে ফ্রান্সে অধিক ঘটে। ফ্রান্সের সেন্ট সাইমন এবং প্রুধো তাঁর চিন্তাধারার সমর্থক হন।

Great Leap Forward (1958) : আধুনিক চীনের শিল্পায়নে দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা

উৎপাদনের পরিমাণে বিরাট পরিমাণ ধার্য করা এবং কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে একই সাথে তা পূর্ণ করার চেষ্টা ঘোষণা করা হয়। কৃষিতে কম্যুন ব্যাপক সংখ্যায় সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উচ্চমান অর্জন করতে না পারায় পরিকল্পনা বিফল হয়। জাতীয় নেতা মাওসেতুঙের উপর এই বিফলতার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এবং মাওসেতুঙ দ্রুত উন্নয়নের এই পরিকল্পনায় ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচনার পাত্র হতে শুরু করেন।

Great Wall of China : চীনের প্রাচীর

উত্তর চীনে আত্মরক্ষামূলক এক বিরাট ঐতিহাসিক দেয়াল। দৈর্ঘে ছিল ৪২০০ মাইল। এই দেয়াল তৈরি করা শুরু হয় মিং রাজবংশের শাসনকালে ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং সমাপ্ত হয় ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে। আত্মরক্ষামূলক হলেও চীনের এই বিরাট দীর্ঘ দেয়ালের উপর দিয়ে মানুষও চলাচল করতে পারত। অদ্যাবধি চীনের এই দেয়াল চীন ভ্রমণকারীদের একটি অন্যতম দ্রষ্টব্যের বিষয় হিসাবে বিরাজ করছে।

Green, T.H. : টি.এইচ.গ্রীন (১৮৩৬-১৮৮২ খ্রি.)

উনবিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক ছিলেন টমাস হিল গ্রীন। টমাস হিল গ্রীন এবং তাঁর সমকালের এবং একই চিন্তার অধিকারী দার্শনিক ব্রাডলে এবং বোসাঙ্কোয়েটকে সাধারণত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নব ভাববাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়। গ্রীনের রচনাবলীর মধ্যে নীতিশাস্ত্রের উপর 'প্রলেগোমেনা টু এথিক্স' এবং রাজনীতির উপর 'প্রিন্সিপল্‌স্ অব পলিটিক্যাল অবলিগেশন' বিশেষভাবে পরিচিত। ফরাসি বিপ্লবোত্তর কালে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে যেসব আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার উদ্ভব হয় গ্রীন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাকে তাঁদের নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করেন। এই বিচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা এ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর মতো, রাষ্ট্রকে যেমন একটি নৈতিক সংস্থা বলে বিবেচনা করেন, তেমনি রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তিরূপে গোড়ার দিকে যেখানে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতা এবং ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার উপর জোর ছিল, সেখানে উনবিংশ শতকের অবস্থাতে এই তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি যে একটি যৌথ সংস্থা, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁদের মতে ব্যক্তি বাদে যেমন রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্র বাদেও তেমনি ব্যক্তি নয়।

উভয়ই নৈতিক সত্তা। এবং নৈতিক সত্তার আসল বিচার সে কি করে, তার চাইতে কি তার করা উচিত তথা তার লক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির লক্ষ্য নৈতিক প্রাণী হিসাবে অধিকতর উত্তম প্রাণী হিসাবে বিকাশ লাভ করা। এ বিকাশ ব্যক্তি এককভাবে সাধন করতে পারে না। নৈতিকতার বোধটিই হচ্ছে একটি সামাজিক বোধ। সমাজ-শূন্য কোনো ব্যক্তি কাল্পনিক ব্যক্তি, বাস্তব অস্তিত্ব নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে গঠিত যে রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্রও একটি নৈতিক সংস্থা। রাষ্ট্রেরও নৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে উন্নততর রাষ্ট্র হওয়া। কিন্তু রাষ্ট্রের উন্নতি, ব্যক্তির উন্নতি বাদে সাধিত হতে পারে না, যেমন, ব্যক্তির উন্নতি রাষ্ট্রের উন্নতি বাদে সাধিত হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের যেমন লক্ষ্য হবে ব্যক্তির উন্নতির সাধন দ্বারা রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করা, ব্যক্তিরও লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রের উন্নতির মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নতি অর্জন করা। এই অবস্থাটিকে প্রকাশ করে গ্রীন বলেছেন, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির সম্মতি বা 'উইল', শক্তি তথা ফোর্স নয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে ব্যক্তির জীবনে এমন বাস্তব অবস্থা তৈরি করা যে বাস্তব অবস্থায় ব্যক্তি নৈতিক প্রাণী হিসাবে যা তার করা উচিত সে তাই করতে পারে। এই প্রসঙ্গে গ্রীন 'পজিটিভ' এবং 'নেগেটিভ' ফ্রিডম-তথা বাস্তব স্বাধীনতা এবং অবাস্তব স্বাধীনতার ধারণাটি তৈরি করেন। তিনি বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করে দেখান যে অন্নহীন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে কোনো নৈতিক বা স্বাধীন ব্যক্তি বলা যায় না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি অপরের খাদ্য দ্রব্য 'চুরি' করলে তাকে অপরাধী বলে বিচার করা চলে না। কারণ, বুভুক্ষু ব্যক্তির যেখানে চুরি করে খাদ্য সংগ্রহ করা ব্যতীত উপায় নেই, সেখানে তার এমন বাধ্যতামূলক কার্যকে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কৃত কার্য বলা চলে না। আসলে আধুনিক ধনবাদী সমাজের তথাকথিত স্বাধীনতা হচ্ছে প্রধানত এরূপ অসহায় ব্যক্তির জন্য অবাস্তব বা নেগেটিভ স্বাধীনতা। এরূপ অসহায় ব্যক্তি প্রাচীনকালের শেকলবদ্ধ দাসের অধিক স্বাধীন নয়। প্রাচীনকালের দাসগণ যদি লোহার শেকলে আবদ্ধ থাকত, বর্তমান সমাজের এমন দাসরা ক্ষুধার শিকলে আবদ্ধ। এরা পুরো নাগরিক বা 'সিটিজেন' নয় এদেরকে বলা উচিত "ডেনিজেন" বা অ-নাগরিক। ধনতান্ত্রিক সমাজের অসঙ্গতির এরূপ তাত্ত্বিক জোরালো সমালোচনার মধ্যে উনিশ শতকে ক্রমবর্ধমানরূপে প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়। গ্রীনের মতে, এ কারণে, রাষ্ট্রকে নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। কোনো ব্যক্তি যেন তার অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির একচেটিয়া মালিকানার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদের অপব্যবহার দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তিকে মানবেতর প্রাণীতে পর্যবসিত করতে না পারে, রাষ্ট্রকে তা দেখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। এরূপ বিচারে গ্রীন সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হলেও তিনি পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না। তিনি একদিকে যেমন ব্যক্তিবাদী তথা ব্যক্তির উন্নতিকে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য বলেছেন, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন, তার পুরো বিলোপের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করেন নি। এ কারণে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী চিন্তাবিদদের চিন্তাকে 'ব্যক্তিবাদ তথা উদারনীতিবাদের ভাববাদী সংশোধন' বা 'আইডিয়ালিস্ট রিভিশন অব লিবারেলিজম' বলে অভিহিত করা হয়।

Haridas Bhattacharyya : হরিদাস ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫৫ খ্রি.)

অবিভক্ত ভারতের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, অধ্যাপক ও বাগ্মী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তার গোড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠক-ভাইস চ্যান্সেলর পি.জে. হারটগের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সঙ্গে আলাপক্রমে সংগৃহীত বিশিষ্ট অধ্যাপকদের একজন ছিলেন তরুণ অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগকে সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়ে তিনি 'রিডার' হিসাবে ১৯২১ সনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় গমন করেন। হরিদাস ভট্টাচার্য বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় দক্ষ এবং ওজস্বিনী রীতিতে বক্তৃতাদানের তিনি ক্ষমতা রাখতেন। নিজে পরিবারগতভাবে নদীয়ার গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। প্রথিতযশা দার্শনিক হলেও নিজের পৈতৃক ধর্মের সকল আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস ও পালন করতেন। কিন্তু সংকীর্ণমনা ছিলেন না। ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবির তাঁর গুণমুগ্ধ ছিরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীতে খ্যাতিমান বহু প্রখ্যাত দার্শনিক এবং সাহিত্যিক তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর উদার দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে তাঁর বিশিষ্ট গবেষণা গ্রন্থ 'ফাউণ্ডেশনস অব লিভিং ফেইথ্স' বা 'প্রচলিত ধর্মসমূহের ভিত্তি'। এই গ্রন্থের মধ্যে ইসলাম ধর্মের দর্শন এবং তার অন্তর্গত সমস্যাসমূহ সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের প্রথম দিকে অধ্যাপনাকালে হরিদাস ভট্টাচার্য প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের প্রশংসাধন্য একজন তরুণ সহকর্মী ছিলেন।

Harvey William : উইলিয়াম হারভে (১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রি.)

ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হারভে একজন চিকিৎসাবিদ। উইলিয়াম হারভে দেহের রক্তসঞ্চালন সত্যের আবিষ্কারক। শিক্ষাজীবনে তিনি নিজ দেশের ক্যান্টারবেরি এবং ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর ফ্রান্স এবং জার্মানি পরিভ্রমণ করে তৎকালে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইতালির পদুয়াতে গমন করে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তাঁকে অধ্যাপনা এবং চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করে এবং বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করে। ১৬১৬ সনে হারভে তাঁর একটি নিবন্ধে তাঁর 'রক্ত সঞ্চালন' তত্ত্ব প্রকাশ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতিতে হারভের 'রক্ত সঞ্চালন'

তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি তাঁর তত্ত্বে দেখান যে রক্ত প্রথমে ডানদিকের অরিকলে বা অলিন্দে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ডান ভেনট্রিকলে বা নিলয়ে অন্তর্গত হয়। এই রক্ত তখন পালমুনারী বা ফুসফুসের শিরার মাধ্যমে ফুসফুসে সঞ্চালিত হয় এবং সেখান থেকে ভেনট্রিকলে প্রবেশ করে। এর পরে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই রক্ত পুনরায় আরটারি বা ধমনীর মাধ্যমে এবং শিরার দ্বারা ফুসফুসে প্রেরিত হয়ে একটা পুরো বৃত্ত তৈরি করে। এ বিবরণ আমাদের নিকট জটিল বলে বোধ হলেও এই তত্ত্ব আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় সূত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করে উইলিয়াম হারভেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

Hedonism : সুখবাদ

সুখবাদ হচ্ছে নীতিবাদের একটি তত্ত্ব। মানুষের জীবনে চরম কামনা কি এবং মানুষের সামাজিক আচরণের মূল প্রেরণা কি, এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব মানুষ বিভিন্নভাবে দেবার চেষ্টা করেছে। সুখবাদ এই সমস্ত জবাবের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এটি একটি প্রাচীন তত্ত্ব। গ্রিসের দার্শনিক এপিকুর্যাসের রচনায় এই তত্ত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আধুনিক ইউরোপের মিল, বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিকের উপযোগবাদ বা হিতবাদ নামক নীতিতত্ত্বের উৎস হিসাবে এপিকুর্যাসের অভিমতকে উল্লেখ করা হয়।

প্রেরণা বাদে মানুষ কোনো কাজই সম্পাদন করতে পারে না। সুখবাদের প্রতিপাদ্য হলো, আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে মানুষের সকল কাজের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। কিন্তু সুখ বলতে কি বুঝবে, এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন, সুখ হচ্ছে দৈহিক সুখ। আবার কেউ বলেছেন, দেহের সুখই একমাত্র সুখ নয়। ন্যায় ও ধর্মের কারণে দৈহিক সুখের বিসর্জনও মানুষের জন্য সুখকর এবং কাম্য হতে পারে। ব্যাখ্যার এই পার্থক্যের ভিত্তিতে সুখবাদকে মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিগত সুখবাদ এই দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের মতে, মানসিক সুখ হচ্ছে সকল কাজের মূল। মানুষ যখন কোনো বিশেষ সুখকে বিসর্জন দেয় তখনও সে অপর কোনো সুখলাভের কথা মানসিকভাবে কল্পনা করে। নীতিবাদী সুখবাদের মতে সুখের কামনা মানুষের কেবল ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়। সুখের কামনা মানুষের একটি দায়িত্ব বা কর্তব্য। কেননা সুখলাভের কামনা ব্যতীত মানুষের জীবন আদৌ ক্রিয়াশীল হতে পারে না। সুখের ক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে : সুখ কি ব্যক্তিগত হবে , না সমষ্টিগত হবে। এ প্রশ্নে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সুখবাদ বলে দুটি উপধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত সুখবাদে ব্যক্তির কাছে নিজের সুখ হচ্ছে চরম কথা ও একমাত্র কাম্য। সমষ্টির সুখ যদি ব্যক্তির সুখের পরিপোষক হয় তবেই ব্যক্তি সমষ্টির সুখেরও কামনা করতে পারে। ব্যক্তির সুখের পরিপন্থী হলে নয়। অনেকে এপিকুর্যাস এবং এরিসটিপাসকে ব্যক্তিগত সুখবাদের প্রবক্তা মনে করেন। কিন্তু সুখের ব্যাখ্যায় এপিকুর্যাস এবং এরিসটিপাসের মধ্যেও পার্থক্য আছে। এরিসটিপাস যেখানে মুহূর্তের সুখকেই প্রধান মনে করেছেন, এপিকুর্যাস সেখানে মুহূর্তের বাইরে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের সুখকে ব্যক্তির লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন। মিল ও বেন্থামের

উপযোগবাদ সমষ্টিগত সুখবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপযোগবাদ বা হিতবাদের একটি বহুল উল্লিখিত বাক্য হচ্ছে : 'বৃহত্তম সংখ্যার বৃহত্তম পরিমাণ সুখ হবে মানুষমাত্রের লক্ষ্য'। মিল অবশ্য বৃহত্তম পরিমাণ সুখ বলতে কেবল সুখের পরিমাণই বুঝাতে চান নি। তিনি সুখের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন এবং গুণগতভাবে যে সুখ কাম্য তাকে পরিমাণ নির্বিশেষে কাম্য বলে মনে করতেন।

Hegel : হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রি.)

জর্জ উইলহেলম ফ্রেডারিক হেগেলের মধ্যে জার্মান ভাববাদী দর্শনের চরম প্রকাশ ঘটে। ভাবের বাস্তব তত্ত্বের জন্য অনেকে তাঁর দর্শনকে 'বাস্তব ভাববাদ' বলেও আখ্যায়িত করেন। হেগেল কাণ্টের দর্শনের সমালোচনার ভিত্তিতে নিজের দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এতে কাণ্টের নিকট হেগেলের ঋণ প্রমাণিত হয়। কাণ্টের অভিমতের উল্লেখ ব্যতীত হেগেলের চিন্তার বিকাশ বুঝা সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে কাণ্ট ও হেগেলের দর্শনের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দিষ্ট করা যায় : (১) কাণ্ট তাঁর দর্শন দ্বারা এই কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন যে, মানুষের কাছে দৃশ্য বা জ্ঞেয়জগৎ মানুষের বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। বুদ্ধির সূত্র হচ্ছে মানুষের কাছে জ্ঞানের একমাত্র সূত্র। বুদ্ধির মাধ্যমে জগৎ মানুষের কাছে যেভাবে উপস্থিত হয় মানুষ জগৎকে সেইভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই জ্ঞেয় বা দৃশ্য জগৎই একমাত্র জগৎ নয়। বুদ্ধির অগম্য এবং মানুষের অজ্ঞেয় আর একটা জগৎ আছে—যাকে বলা যায় আসল জগৎ বা সত্তার সত্তা। হেগেল কাণ্টের বুদ্ধির সূত্র স্বীকার করে বলেন : বুদ্ধি দ্বারাই আমরা জগৎ বা সত্যকে জানি। বস্তুত বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাই মানুষের জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম। বুদ্ধি অগম্য এবং মানুষের অজ্ঞেয় আসল জগৎ বলে কিছু আছে এরূপ কথা মানুষ বলতে পারে না। মানুষের জ্ঞেয় জগৎই একমাত্র জগৎ। (২) কাণ্ট বুদ্ধিকে বোধ এবং প্রজ্ঞা বলে দুভাগে ভাগ করে বোধকে আংশিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাতা এবং প্রজ্ঞাকে চরম সত্য উপলব্ধির মাধ্যম হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। হেগেল বলেন, বুদ্ধির মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য করা গেলেও সমগ্র, বুদ্ধিদত্ত যে সত্য তার মধ্যে কোনো বিভাগ করা চলে না। সত্যের কোনো ভাগ নেই : সত্য সমগ্র, সমগ্রই সত্য। (৩) কাণ্ট মানুষের জ্ঞানের সীমা জ্ঞেয় বা দৃশ্যজগতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। হেগেল বলেন, আমাদের জ্ঞানের জগৎকে আমরা দৃশ্য জগৎ বা মায়া বলি কারণ আমরা এই জগতের প্রকাশের সামগ্রিকতকে উপলব্ধি করতে পারি নে। দৃশ্য জগতের প্রকাশের কারণ যখন আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তখন আর দৃশ্য জগৎ আংশিক বা মায়া বলে বোধ হয় না। তখন আমরা বুঝতে পারি, এটাই একমাত্র জগৎ (৪) নীতির ক্ষেত্রে কাণ্ট এমন এক মহৎ বা আদর্শের কল্পনা করেছেন যে আদর্শ কখনো বাস্তবায়িত হতে না পারলেও মানুষ তাকে একমাত্র বাস্তব বলে ভাবতে বাধ্য। হেগেল বলেন, আমরা আদর্শের বিকাশের পর্যায়গুলি বুঝতে সক্ষম বলেই কোনো আদর্শ আমাদের কাছে অন্যায় ও অবাস্তব বলে বোধ হয়। আদর্শের বিকাশের পর্যায়কে সম্যকভাবে উপলব্ধি করলে বাস্তব-অবাস্তবের বিরোধ দেখা দিতে পারে না। (৫) কাণ্ট জ্ঞানের সূত্রকে বিকাশের সম্ভাবনাহীন

অনড় স্থির সূত্র বলে মনে করেছেন। কান্টের কাছে জ্ঞান-সূত্রের উৎস মানুষের কাছে অজ্ঞেয়। অজ্ঞাত কোনো শক্তি মানুষের জন্য অপরিহার্য এই জ্ঞানসূত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। হেগেল মনে করেন, জ্ঞানের সূত্রগুলি অপরিহার্য বটে। কিন্তু এগুলি বিকাশের সম্ভাবনাহীন, অনড় বা এর উৎস অজ্ঞেয় নয়। হেগেলের মতে দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞানসূত্রের উৎসের এই রহস্য ব্যাখ্যা করা। দর্শন আমাদের বলবে, যে সূত্রগুলি আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি সেগুলি আমরা কেনইবা ব্যবহার করি এবং সূত্রগুলি কীভাবে মানুষের জীবনে বিকশিত হয়েছে।

কান্টের সঙ্গে নিজের দর্শনের এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করে হেগেল ভাবের বিকাশের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব তৈরি করেন। দ্বন্দ্বই হচ্ছে ভাব বা অস্তিত্বের বিকাশের মূল কারণ। অস্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর 'হাঁ' এবং 'না'-এর দ্বন্দ্ব চলছে। বিকাশের এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় হেগেল 'পরিমাণ থেকে গুণের' তত্ত্বও উপস্থিত করেন। অস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে বিশেষ পর্যায়ে নূতন গুণের উদ্ভব ঘটায়।

সমাজের ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিকাশকে অগ্রসর সচেতন চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করে হেগেল এই তত্ত্ব তৈরি করেন। কিন্তু হেগেল কান্টের সমালোচনা করলেও তিনি ভাববাদকে অতিক্রম করতে পারেন নি। জগৎ বা সত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয়-র দ্বৈত রূপ হেগেল অস্বীকার করলেও হেগেলের নিকটও মূল হচ্ছে ভাব ; বস্তু নয়। যা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্য সর্বই হচ্ছে ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ। এ ছাড়া ভাবের চরম বিকাশ জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রে ঘটেছে বলে হেগেলের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। বস্তুত হেগেল-দর্শন থেকে উত্তরকালে দুটি পরস্পর-বিরোধী ধারার বিকাশ ঘটেছে : এর একটি হচ্ছে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ; অপরটি হচ্ছে নবভাববাদ ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ।

Heidegger : হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬ খ্রি.)

হাইডেগার জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ফ্যাসিবাদের পোষকতা করে ১৯৩৩ সালে ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরে উক্ত পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয়। অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারায় হাইডেগার কিয়ের্কেগার্ডের অনুসারী। তবে কিয়ের্কেগার্ড যেখানে অন্ধবিশ্বাসের হাতে আত্মসমর্পণকে ব্যক্তির জন্য একমাত্র গ্রহণীয় পথ বলে চিহ্নিত করেছেন, সেখানে হাইডেগার নাস্তিকতার মনোভাব পোষণ করেন। হাইডেগারের দর্শনের মূল হচ্ছে মুহূর্তবাদ-এর তত্ত্ব। তাঁর মতে মানুষের অস্তিত্বের মূল হচ্ছে তার অচেতন স্বতঃস্ফূর্ত, অমূর্ত উপলব্ধির মুহূর্ত। উদ্বেগ, আশঙ্কা, ভীতি এগুলি হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের সহজাত স্মারক। এগুলির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব। নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্য মানুষের প্রয়োজন হচ্ছে বাস্তব জগতের সমস্ত লক্ষ্য ও আদর্শের চিন্তা পরিত্যাগ করে জীবনের ভঙ্গুরতা, মৃত্যু, অনিত্যতা— এই মূল সত্যের মুখোমুখি হওয়া। জাগতিক দায়-দায়িত্ব, কামনা, স্বপ্ন অস্তিত্বের এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি ব্যাহত করে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েই মাত্র মানুষ নিজের অস্তিত্বের

মুহূর্তকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিজ্ঞানের বিরোধিতা এবং জীবন সম্পর্কে গভীর হতাশা হচ্ছে হাইডেগারের অস্তিত্ববাদের বৈশিষ্ট্য।

Heliocentricism and Geocentricism : সূর্যকেন্দ্রিকতা ও ভূকেন্দ্রিকতা

পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার সম্পর্ক এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী বৈজ্ঞানিক অভিমত। সূর্যকেন্দ্রিকতাই হচ্ছে বর্তমানে গৃহীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবী নিজ কক্ষে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। সূর্যকেন্দ্রিকতার তত্ত্ব কেবল আধুনিককালে প্রমাণিত ও সত্য বলে গৃহীত হলেও প্রাচীনকালেও বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে এই তত্ত্বের অনুসরণ দেখা যায়। বিশেষ করে ৩১০-২৩০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টার্কাস এবং তাঁর পরবর্তী নিকোলাস স্পষ্টরূপেই মনে করতেন যে, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু প্লেটো, এ্যারিস্টটল ভূকেন্দ্রিকতার তত্ত্বের পরিপোষক ছিলেন। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল এবং পরবর্তীকালের টলেমীর ব্যাখ্যার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসযুক্ত হয়ে ভূকেন্দ্রিকতার তত্ত্বকে বহুকাল যাবৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রেখেছিল। আধুনিককালে এর উপর প্রথম আঘাত হানেন কপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রি.)। কপারনিকাস আঙ্কিকভাবে সূর্যকেন্দ্রিকতার তত্ত্ব প্রমাণিত করেন। পরবর্তীকালে গেলিলিও, কেপলার ও নিউটন এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী করেন। সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্য বিশ্বের একমাত্র কেন্দ্র নয় ; সূর্য কেবলমাত্র সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র ; মহাবিশ্বব্যাপী এরূপ আরো সূর্য আছে এবং তাদের কেন্দ্র করে অগণিত মণ্ডলেরও অস্তিত্ব রয়েছে।

Heracleides : হেরাক্লিডাস (৪০০ খ্রি. পূ.)

হেরাক্লিডস্ ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের একজন দার্শনিক। প্লেটোর একাডেমীর সদস্য এবং তাঁর শিষ্য হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক মতামতের ক্ষেত্রে হেরাক্লিড্সের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। পদার্থবিদ্যা, সঙ্গীত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনার নমুনা গবেষকগণ আবিষ্কার করেন। বিশ্বজগতের মূল গঠনের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অণুবাদী। তাঁর মতে, 'নাউস' বা এক বিশ্বপ্রজ্ঞা জগতের মূল অণুগুলিকে সৃষ্টি করেছে। জ্যোতির্মণ্ডলের ব্যাখ্যায় হেরাক্লিডাস্-এর মধ্যে সূর্যকেন্দ্রিকতার আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে সূর্যকেন্দ্রিকতার তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে এরিস্টার্কাস পোষণ করতেন। কিন্তু তার প্রাথমিক আভাস হেরাক্লিড্স-এর রচনাতেও দেখা যায়। হেরাক্লিড্স মনে করতেন পৃথিবী নয়, সূর্য হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র। হেরাক্লিড্স অবশ্য সূর্যের আবর্তন অনুমান করতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

Heraclitus : হেরাক্লিটাস (৫৩৫-৪৭৫ খ্রি. পূ.)

প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন হেরাক্লিটাস। বিরামহীন পরিবর্তনের

ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচয়। এক নদীতে কেউ দুবার অবগাহন করতে পারে না, এ উক্তি বিখ্যাত হেরাক্লিটাসের বলেই পরিচিত। হেরাক্লিটাস মনে করতেন, বিশ্বের মূল বস্তু হচ্ছে আগুন। আগুন প্রবাহ ও পরিবর্তনের উত্তম দৃষ্টান্ত। সমগ্র বিশ্ব এবং তার অভ্যন্তরের বিশেষ বিশেষ বস্তু, কিংবা আত্মা সবকিছুর উৎপত্তি ঘটেছে আগুন থেকে। বিশ্বের সৃষ্টি অলৌকিক কোনো দেবতা দ্বারা ঘটে নি। আগুনের আকারে বিশ্ব বা বস্তু সব সময়েই ছিল এবং সব সময়েই থাকবে। এই অস্তিত্বের মূলে আছে বিশ্বের নিজস্ব 'লগোস' বা বিধান। হেরাক্লিটাস বিশ্বের প্রবাহকে মনে করতেন চক্রবৎ। এক চক্র বা এক কাল সমাপ্ত হলে বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ আগুনে রূপান্তরিত হয়ে আর এক পরিক্রমা শুরু করে। নিয়ত পরিবর্তমান বস্তুপুঞ্জ নিজ নিজ অস্তিত্ব থেকে তার বিপরীতে পরিবর্তিত হতে থাকে। গরম ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা গরমে রূপান্তরিত হয়। বস্তুর বিপরীতে পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সংঘর্ষ। বিপরীতের সংঘর্ষেই বস্তুর পরিবর্তন ও প্রবাহ। এই নিয়ত পরিবর্তন ও প্রবাহের ফলে জগতের কোনো কিছুই অপর কিছু থেকে বিযুক্ত নয়। সব কিছুর সঙ্গে সব কিছু যুক্ত। কাজেই সব কিছুই আপেক্ষিক। জ্ঞানের প্রশ্নেও হেরাক্লিটাস ছিলেন বস্তুবাদী। তাঁর মতে ইন্দ্রিয় হচ্ছে জ্ঞানের মূল। ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং যুক্তি বা বুদ্ধি দ্বারা মানুষ সব রহস্যকেই ভেদ করতে পারে। মানুষের কাছে অজ্ঞেয় অলৌকিক কোনো জগৎ নেই। 'প্রকৃতি' সম্পর্কে হেরাক্লিটাসের বিখ্যাত রচনাংশ থেকে গবেষকগণ তাঁর দর্শন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সব দার্শনিকের চিন্তাধারার বিরোধী ছিল হেরাক্লিটাসের চিন্তাধারা।

Heredity : বংশগতি, বংশানুক্রমিতা

জন্ম থেকে সন্তানে জীবনের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতাকে বংশগতি বলা হয়। জীববিদ্যায় বংশগতির মাধ্যমের প্রশ্ন একটি বিতর্কিত এবং বিশেষ আলোচিত প্রশ্ন। বিপরীত যৌনের সম্মেলনে জীবের উৎপাদন। কিন্তু জনকের গুণ সন্তানে কীভাবে প্রবাহিত হয় তার ধারণা পূর্বে স্পষ্ট ছিল না। কোষময় জীবের সৃষ্টি ধারায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সাধারণভাবে এই বলা যায় যে, বংশক্রম বা বংশগতির মূল হচ্ছে জীবের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক এবং উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব। যে-কোনো শ্রেণীর জীবের জন্য তার পরিবেশই প্রধান। পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তিত করে কিংবা নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে পরিবর্তিত করে জীবমাত্র জীবন ধারণ করার প্রয়াস পায়। এই প্রক্রিয়ায় জীবের যে চরিত্র, বৈশিষ্ট্য বা দেহগত কাঠামো বাঁচার অনুকূল বলে প্রমাণিত হয় সেই চরিত্র বা কাঠামো স্বভাবগত নির্বাচনের মাধ্যমে জীব নিজের অস্তিত্বের ধারাবাহিক অংশ হিসাবে তৈরি করে নেয় এবং যে চরিত্র বা কাঠামো বাঁচার প্রতিকূল হয় তা বর্জিত হয়ে অস্তিত্ব থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবের বিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে এই পরিবর্তন এবং স্বভাবগত নির্বাচনের জৈবিক ক্ষমতা।

Hieroglyphs, Theory of : প্রতীকবাদ

জ্ঞানের প্রশ্নে একটি বিশেষ তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মাধ্যমে আমরা বস্তু জগতের

প্রতিচ্ছবি লাভ করি। এই প্রতিচ্ছবি মিলিয়ে মন বস্তু জগতের জ্ঞান তৈরি করে। এটি হচ্ছে জ্ঞানের সাধারণ গৃহীত তত্ত্ব। কিন্তু প্রতীকবাদ জ্ঞানের এই তত্ত্বকে স্বীকার করে না। প্রতীকবাদের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের মনে বস্তুর হুবহু প্রতিচ্ছবি তৈরি করে না, সে মনের মধ্যে কতকগুলি প্রতীক বা সঙ্কেতের সৃষ্টি করে। এই প্রতীক বা সঙ্কেতগুলির সঙ্গে বস্তুর চরিত্রের কোনো সাদৃশ্য নেই। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুশ দার্শনিক প্লেখানভ জ্ঞানের প্রশ্নে 'প্রতীক' শব্দের ব্যবহার করেন। প্রতীকবাদ জ্ঞানের প্রশ্নে অজ্ঞেয়বাদে পর্যবসিত হতে পারে। কারণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি যদি বস্তুর চরিত্রকে মনের মধ্যে প্রতিফলিত না করে কেবল কতকগুলি বৈশিষ্ট্যহীন প্রতীক মাত্র সৃষ্টি করে তা হলে বস্তুর চরিত্র জানা মনের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মনের কাছে বস্তু অজ্ঞেয় থেকে যায়। দ্বন্দ্বমূলক বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ প্রতীকবাদকে সঠিক মনে করে না। ইন্দ্রিয়ানুভূতি মনে বস্তুজগতের হুবহু প্রতিচ্ছবি তৈরি না করলেও ইন্দ্রিয় হচ্ছে বস্তুজগৎ ও মনের মধ্যকার সাক্ষাৎ যোগসূত্র। ইন্দ্রিয়দত্ত অনুভূতিগুলি হচ্ছে মনের নিকট বস্তুজগতের জ্ঞান তৈরির স্থূল কাঁচামাল বিশেষ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুজগতের সঙ্গে মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে মনের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, অনুমান ইত্যাকার বিভিন্ন ক্ষমতা বিকাশ লাভ করেছে। মন ইন্দ্রিয়ের দেওয়া অনুভূতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি মারফত বস্তুজগতের ধারণা তৈরি করে। এ ধারণা বা জ্ঞান কোনো সময়ে চরম এবং অপরিবর্তনীয় নয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন ও বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যেমন নিরন্তর চলছে তেমনি বস্তুজগৎ সম্পর্কে মনের জ্ঞানও বিকশিত হচ্ছে।

Hinduism : হিন্দু ধর্ম

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম। বর্তমানকালেও পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহের অন্যতম ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। 'হিন্দুদের ধর্ম' হিসাবেও শব্দটির ব্যবহার করা হতো। এবং এদিক থেকে 'ইণ্ডাস' অঞ্চলের অধিবাসীদের 'ইন্দুস' বা হিন্দুস বলে অভারতীয়রা মনে করত। সে হিসাবে 'হিন্দুস্তানের' অধিবাসীদের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলা হতো। এ থেকে বুঝতে পারা যায় হিন্দু ধর্ম দ্বারা কোনো সীমাবদ্ধ সুনির্দিষ্ট একক বিশ্বাসের বদলে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং যুগের অধিবাসীদের নানা প্রকার বিশ্বাস, আচার, আচরণ ও চিন্তাকে সামগ্রিকভাবে বুঝানো হতো। প্রাচীনকালে এই সমস্ত বিশ্বাস ও দর্শন আর্যদের ধর্মগ্রন্থ চার বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব বেদ। আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বেও ভারতে এক বিকশিত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। অনুমান করা হয় খ্রি. পূ. ১৮০০-১৫০০ শতকের সময়কালে ভারতের বাইরে থেকে আগত আর্যদের সঙ্গে আদি ভারতবাসী তথা অনার্যদের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ এবং সমন্বয় প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। কালক্রমে আদি ভারতবাসীদের দেবদেবী বিশ্বাসও আর্যদের দেবদেবী ও বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হয়ে এক বিস্তারিত এবং মিশ্র এক ধর্ম ব্যবস্থা বিকশিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন শক্তি হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মূল অলৌকিক শক্তি। ভারতীয় দর্শন এবং ভারতীয় ধর্ম, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর। কর্মের ভিত্তিতে বারংবার পুনর্জন্ম এবং এই ধারায় ক্রমান্বয়ে কর্মের বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি, হিন্দু ধর্মের অন্যতম দার্শনিক বিশ্বাস। হিন্দু ধর্মের

সমাজব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল চার বর্ণাশ্রমব্যবস্থা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

আদিতে জীবিকার বিভাগ হিসাবে এই ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং একটির চেয়ে অপরটি উত্তম কিংবা অধম বলে বিবেচিত হয়। এই বর্ণাশ্রমে সবচেয়ে নিম্নে অবস্থিত শূদ্র এবং হরিজন। তারা উচ্চতর, বিশেষ করে উচ্চতম শ্রেণী ব্রাহ্মণের কাছে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হতো। সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমের এই ভেদ ভারতবর্ষে আজও বিলুপ্ত হয় নি। এই ভেদাভেদের মূল ভিত্তি যে উচ্চতর অর্থনৈতিক শ্রেণীর সঙ্গে নিম্নতর বিত্তহীন মানুষের স্বার্থ এবং অধিকারের বৈষম্য এবং সংঘর্ষ, তা আধুনিককালে বুঝতে অসুবিধা হয় না। মহাত্মা গান্ধী সামাজিক বিপ্লবের পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রেম ও দয়ার কথা প্রচার করে এই বর্ণভেদের বৈষম্যকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর সে ব্যক্তিভিত্তিক মহৎ চেষ্টা তেমন সফল হতে পারে নি।

Hippocratis : হিপোক্রাটিস (৪৬০-৩৭৫ খ্রি. পূ.)

প্রাচীন গ্রিসের চিকিৎসাবিদ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলে তিনি পরিচিত। সততার সঙ্গে মানুষের সেবাই হবে একজন চিকিৎসকদের নীতি বা ধর্ম—এই মর্মে চিকিৎসকের শপথ নেওয়ার যে কথা তিনি বলেছিলেন তা আজো 'হিপোক্রাটিসের শপথ' বলে সম্মানিত। তাঁর জীবনকালে তিনি গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণ হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রথম শর্ত। সেকালেও রোগের ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের তিনি একজন প্রবক্তা ছিলেন। মানুষের রোগের মূলে রয়েছে দেহের রক্তের সংশ্লেষণ ব্যত্যয়ের উদ্ভব এরূপ অভিমত পোষণ করে দেহের জলীয় পদার্থকে তিনি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। ধীর, স্থির চরিত্রের অধিকারী হিপোক্রাটিসের মন তাঁর রোগীদের জন্য যেমন সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, তেমনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান দ্বারা তাঁর সহকর্মী ও উত্তরাধিকারী চিকিৎসক-সমাজও যেন লাভবান হতে পারে, তেমন একটি দার্শনিক এবং সহৃদয় বোধ দ্বারা হিপোক্রাটিস উদ্বুদ্ধ ছিলেন। বিজ্ঞানের সেই সূচনাকালে যেখানে কল্পনা এবং দর্শনেরই ছিল প্রাধান্য সেখানে হিপোক্রাটিস সেই পথিকৃৎদের অন্যতম যাঁরা যুক্তিকে বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রয়োগ করে প্রমাণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বস্তুত হিপোক্রাটিসের অনুসৃত পদ্ধতিই আরোহী বিজ্ঞান তথা 'ইনডাকটিভ সায়েন্স'-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ কারণে হিপোক্রাটিস এবং তাঁর অনুসারীদের রচনাসমূহের তাৎপর্য কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেকালে হঠাৎ মূর্ছা যাওয়া এবং অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিকে ভৌতিক বা অলৌকিক বলে সাধারণ মানুষ ধারণা করত। রোগের কার্যকারণবোধ স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু এই কালেই হিপোক্রাটিসের একজন অনুসারী মূর্ছা যাওয়ার ঘটনাকে কার্যকারণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে হিপোক্রাটিসের রচিত 'অলৌকিক রোগ' বা 'সেকরেড ডিজিজ' নামক রচনায় তার নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যময় উক্তি বলে বোধ হয়

"যেসব রোগকে অলৌকিক বলে অভিহিত করা হয় তারাও কারণবিহীন নয়। অন্য রোগের মতো এ সকলেরও উৎস হচ্ছে দেহের মধ্যে শৈত্য, তাপ, বায়ু এবং এরূপ নিত্য-অস্থির উপাদানসমূহের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ। সব ঘটনারই পূর্ব ঘটনা থাকে। যে তার অন্বেষণ করে সে অবশ্যই তার সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হয়।" (দ্র. A Short History of Scientific Ideas to 1900 by Charles Singer. Oxford University Press 1959.)।

Hippocratic Oath : হিপোক্রাটিসের শপথ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের চিকিৎসাবিদ হিপোক্রাটিস অসুস্থ মানুষের সেবায় নিঃস্বার্থ এবং সততার সঙ্গে চিকিৎসকমাত্রের করণীয় হিসাবে যে শপথনামা তৈরি করেছিলেন তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে পৃথিবীব্যাপী হিপোক্রাটিসের শপথ বা 'হিপোক্রাটিক ওথ' নামে পরিচিত। হিপোক্রাটিসের শপথের মর্মকথা ছিল এরূপ : "যে গুরু আমাকে শিক্ষাদান করেছেন মহৎ এই শাস্ত্র, তিনি আমার পিতার মতো : আমার জীবন তাঁর জীবনেরই অঙ্গস্বরূপ আমার যা কিছু সুখ, তাকে আমি ভোগ করব আমার সেই পিতার সঙ্গে মিলিতভাবে। তাঁর সন্তানরা আমার নিজের সহোদর সম। আমার কতর্ব্য আমার এই সহোদরদের শিক্ষাদান করা আমার গুরুর প্রদত্ত এই শাস্ত্র-কৌশলকে। এই শাস্ত্রকে আয়ত্ত করার অধিকার কেবল তাদেরই যারা এই শাস্ত্রের নীতিকে মান্য করার প্রতিশ্রুতিতে স্বইচ্ছাতে আবদ্ধ। আমার জ্ঞান, ক্ষমতা এবং বিবেচনাবোধ দ্বারা আমি আমার রোগীদের তেমন নিরাময়পত্রই প্রদান করব, যা তাদের মঙ্গল সাধন করবে, উপশমে সাহায্য করবে এবং ক্ষতির কোনো কারণ হবে না। কোনো মারাত্মক ঔষধ যা আমার রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে, আমি তেমন কোনো ঔষধের ব্যবস্থা আমার রোগীকে প্রদান করব না কিংবা মাতার গর্ভজাত ভ্রূণকে বিনষ্টকারী কোনো উপায়েরও আমি উৎস হবো না। আমার জীবনের এবং এই শাস্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা হবে আমার পালনীয় ব্রত। আমার রোগীর দেহে বিষাক্ত পদার্থের বিমোক্ষণে শল্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব কেবল এমন ক্রিয়ার বিশেষজ্ঞেরই : অবিশেষজ্ঞের নয়। আমার রোগীর গৃহে প্রবেশ ঘটবে তার উপশম এবং মঙ্গলের জন্য : স্ত্রী কিংবা পুরুষ, দাস কিংবা অ-দাস কারুর প্রতি কোনো মোহাকর্ষণ আমার জন্য অপবিত্র। আমার চিকিৎসাকর্মকালে আমার রোগীর যা কিছু তথ্য আমার জ্ঞানের মধ্যে আসুক না কেন তাকে গোপন রাখা এবং প্রকাশ না করা হবে আমার শাস্ত্রীয় কর্তব্য। আমার এই অনুগত্যই হবে আমার জীবনের সকল সুখ ও সম্মানের একমাত্র ভিত্তি। এবং এর কোনো ব্যত্যয় নিয়ে আসবে আমার জীবনে এর বিপরীত তথা অভিশাপ এই হোক আমার জীবনের প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা।"

History, Economic Interpretation of : ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে অনেক সময়ে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত মার্কসবাদের মূল সূত্র তিনটি বলে পরিচিত ১. বস্তুবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ২. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ; ৩. সমাজের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। মার্কস মানুষকেই ইতিহাসের নির্মাতা বলেছেন। তাঁর মতে মানুষই ইতিহাস তৈরি করে। কিন্তু যে-কোনো ব্যক্তি-মানুষের ইচ্ছামাফিক নয়। মানুষ ইতিহাসের বিধানকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা দ্বান্দ্বিকভাবে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে ইতিহাস নির্মাতার ভূমিকা পালন। এর অর্থ, ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের বিকাশের বিধান আছে। এই প্রসঙ্গে মার্কস বলেছিলেন, এ যাবৎকালের দর্শনের ইতিহাসের বিকাশের বিধান আছে। এই প্রসঙ্গে মার্কস বলেছিলেন, এ যাবৎকালের দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, দার্শনিকগণ নানাভাবে জীবন ও সমাজকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেন মানুষের ব্যাখ্যা করার অধিকতর কোনো ভূমিকা নেই। 'আসলে প্রয়োজন এখন কেবল ব্যাখ্যার নয়, প্রয়োজন সমাজকে পরিবর্তনের।' এমন কথা দ্বারা মার্কস ইতিহাসের বিকাশে ইতিহাসের বিধানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষের সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর প্রদান করতে চেয়েছেন। মার্কসীয় সূত্রের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, ১. বস্তু হচ্ছে মূল সত্তা ; ২. বস্তুমাত্রই দ্বন্দ্বমূলক গতিসম্পন্ন ; ৩. মানুষও বস্তুর দ্বন্দ্বমান বিকাশের প্রকাশ এবং মানুষের সামাজিক জীবনের ইতিহাসও হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ ; ৪. মানুষের সমাজ-জীবনের মূল হচ্ছে মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য কর্মকাণ্ড তথা তার অর্থনৈতিক কার্যাবলী। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রধান হচ্ছে জীবিকা সংগ্রহের হাতিয়ার বা উপায় এবং এই হাতিয়ার বা উপায়সমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সম্পর্ক। এর একটিকে উৎপাদনের শক্তি এবং অপরটিকে উৎপাদনের সম্পর্ক বলে অভিহিত করা চলে। উৎপাদনের উপায় বা শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে না। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তারা পরিবর্তিত হয় এবং আদিমকাল থেকে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রবহমান। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার পর থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের পরে, সমাজ উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং অ-মালিক, এরূপ আর্থিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। পুনরায় অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজ অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দ্বমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং এই সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। মানব সমাজের ইতিহাসের এরূপ ব্যাখ্যা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হিসাবে পরিচিত। (দ্র. Dialectical Materialism : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ)।

Historicism : ঐতিহাসিকতাবাদ

ইতিহাসের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তু বা বিষয়ের উদ্ভব এবং বিকাশের অনুধাবন। ঐতিহাসিকতাবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি মৌলিক পদ্ধতি। জগৎ ও সমাজের প্রশ্নে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল দার্শনিক কল্পনা ও বিশ্লেষণ। এ পদ্ধতিতে সমস্যামাত্রকে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন মনে করা হতো। ফলে, বাস্তব অবস্থা, অতীত ঘটনা ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে দার্শনিকগণ যে-কোনো সমস্যার রহস্যোদ্ঘাটন এবং সমাধান সম্ভব বলে মনে করতেন। অনেকে ইতিহাসকে মনে

করতেন একটা চক্রের আবর্তন। এরূপ আবর্তনে সমাজে এবং জগতে নতুনের কোনো বিকাশ সম্ভব বলে মনে করা হয় না। চক্রের আবর্তনে একই ঘটনা, সমস্যা বা বিষয় বারবার আবির্ভূত হয়। ইতিহাস ও জগতের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সমাজ ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকাশকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। ঐতিহাসিকতাবাদ দার্শনিক সেই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে সমাজ ও ইতিহাসের সর্বত্র আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোনো বস্তু বা ঘটনাই কালনিরপেক্ষ নয়। তার বর্তমান চরিত্র নির্দিষ্ট হচ্ছে তার অতীত উদ্ভব এবং বিকাশ দ্বারা। তার ভবিষ্যৎও নির্দিষ্ট হবে সেই বিকাশের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বর্তমান দ্বারা। সমাজের কোনো অবস্থারই হুবহু পুনরাবর্তন সম্ভব নয়। ইতিহাসকে সদা নতুন দিগন্তে অগ্রসরমান রথ বলে মনে করা চলে, তাকে শুধু চক্র বলে মনে করা চলে না। অতীতই ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে ; কোনো অতীত ভবিষ্যৎ ফিরে আসতে পারে না। জীবনের জন্ম ও বিকাশকে চার্লস ডারউইন ঐতিহাসিকতার তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে অবারিত করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিকতাবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করে মার্কসবাদ মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তৈরি করেছে।

Hitler Adolf : এ্যডলফ হিটলার

হিটলারের (১৮৮৯-১৯৪৫) পার্টির নাম ছিল ফ্যাসিস্ট পার্টি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে হিটলারের বিরোধী সমাজতান্ত্রিক পার্টি ছিল জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি। জার্মান রাইখকে বলা হত পার্লামেন্ট। হিটলারের পার্টি রাইখে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করে কমিউনিস্টদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করতে থাকে। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে হিটলারের আসল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ আক্রমণ করার পরে ১৯৪১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সর্বগ্রাসীভাবে আক্রমণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতা স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আমরণ প্রতিরোধ করতে থাকে। হিটলারের বাহিনী মস্কো ঘেরাও করে ফেললেও মস্কো দখল করতে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েট সৈন্য পাল্টা আক্রমণ করে ফ্যাসিস্ট বাহিনী পরাজিত করে বার্লিন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মিত্রপক্ষের রুজভেল্ট এবং ইংল্যান্ডের নেতা উইনস্টোন চার্চিলের মিলিত সভায় হিটলারের বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনী।

Hobbes, Thomas : টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রি.)

টমাস হবস ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের বস্তুবাদী দার্শনিক। ইংল্যাণ্ডে এই সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। ধানতান্ত্রিক বিপ্লবের এই পরিবেশ টমাস হবসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হবসকে যান্ত্রিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যাতা বলা হয়। তাঁর মতে সমগ্র জগৎ হচ্ছে বস্তুর সমষ্টি। মানুষও বস্তুমাত্র। জগৎ ও সমাজ, সর্বক্ষেত্রে একটি মাত্র মৌলিক বিধান কার্যরত রয়েছে। সে বিধান হচ্ছে বস্তুর যান্ত্রিক গতি। মানুষ কিংবা অপরাপর জন্তু

বস্তুর জটিল গ্রন্থনে সৃষ্ট যন্ত্রবিশেষ। কোনো যন্ত্র যেমন বাইরে থেকে দেওয়া শক্তির জোরে চলতে থাকে, মানুষ এবং জন্তুও বাইরের শক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছে। কাজে কাজেই মানুষ বা অপর প্রাণীর মধ্যে দেহের অতিরিক্ত অস্তিত্বসম্পন্ন আত্মা বলে কিছু নেই। বিধাতাকে আত্মার স্রষ্টা বলা হয় ; কিন্তু বিধাতা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি বৈ কোনো অস্তিত্ব নয়। বস্তু থেকে বস্তুর পার্থক্য কেবল সংখ্যা বা পরিমাণগত। হবস বিধাতাকে কাল্পনিক বলে বস্তুবাদের পরিপোষক হয়েছেন, কিন্তু বস্তুর গতি বস্তুর বাইরে থেকে আসে মনে করে বস্তুকে আর এক কাল্পনিক শক্তির উপর নির্ভরশীল করেছেন। বস্তু যে আপন শক্তিতেই গতিসম্পন্ন, এ ধারণা হবসের ছিল না। জ্ঞানের প্রশ্নে হবস দেকার্তের জন্মগত ভাব বা ধারণাকে অস্বীকার করেন। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞান তৈরি হয়, অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে বা সহজাত কোনো ভাবের মাধ্যমে নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রশ্নে হবস রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্বকে নাকচ করে সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব সমর্থন করেন। তাঁর মতে মানুষের সম্মিলিত চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ তৈরি হয়েছে এবং রাজাও চুক্তির ভিত্তিতে রাজ্য শাসন করেন। রাজার হাতে চুক্তির ভিত্তিতে অধিকার সমর্পণ করার পরে নাগরিকের রাজাকে অমান্য করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। একচ্ছত্র রাজতন্ত্র ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠিত হয় না, সমাজ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং জনসাধারণের জন্য একমাত্র রাজতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসন-ব্যবস্থা। কারণ, সমাজের ব্যক্তিমাত্রই স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর এবং অপরের অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। এর ফলে শক্তিশালী শাসক ব্যতীত সমাজে অরাজকতা বিরাজ করারই আশঙ্কা। শাসকের শক্তি সীমাবদ্ধ হলে শাসক সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে। মূলত একচ্ছত্র শাসন সমর্থন করলেও হবস মনে করতেন, ব্যক্তি তার জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বিদ্রোহের অধিকারী। হবসের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বের বিস্তারিত প্রকাশ ঘটেছে 'লেভিয়াথান' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে।

Holbach : হলবাক (১৭২৩-১৭৮৯ খ্রি.)

ফরাসি বিপ্লব-পূর্বকালের বস্তুবাদী দার্শনিক। ফরাসি বিশ্বকোষকারকদের নাম জ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত। হলবাককে এই বিশ্বকোষকারকদের কেন্দ্রীয় শক্তি বলে মনে করা হতো। তাঁর 'লা সিস্তেম দা লা ন্যাচার' নামক গ্রন্থ প্যারিস পার্লামেন্টের আদেশে ১৮৭০ সালে ভস্মীভূত করা হয়। হলবাকের মতামত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্ম এবং ভাববাদী দর্শনের তিনি ছিলেন বিরোধী। তাঁর মতে ধর্মের উৎপত্তি অধিকাংশ মানুষের অজ্ঞতা, ভয় এবং কিছু সংখ্যক সচেতন লোকের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক অভিসন্ধির মধ্যে নিহিত। হলবাক ধর্মযাজক বার্কলে ব্যাখ্যাত ভাববাদের তীব্র সমালোচনা করে ভাববাদকে মানুষের সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী এক অবাস্তব তত্ত্ব বলে অভিহিত করেন। বস্তুর বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই ; বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে আমাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি করে। বস্তুর মৌল পদার্থ হচ্ছে অবিভাজ্য অণু। হলবাকের মতে বস্তুর গতি আছে কিন্তু সে গতি যান্ত্রিক। মানুষ প্রকৃতির অংশ এবং প্রাকৃতিক বিধানে সে আবদ্ধ। মানুষ প্রাকৃতিক বিধানের অধীন—এ তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা হলবাক করেন তাতে মনে হয় যেন মানুষ অসহায়ভাবে নিয়ন্ত্রণবাদের দাস।

Hsun Tzu : সুনজু (২৮৯-২৩৮ খ্রি. পূ.)

প্রাচীন চীনের একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন সুনজু। তাঁর সময়কার প্রচলিত চিন্তাধারার তিনি ছিলেন বিরোধী। সমগ্র বিশ্বকে বস্তু হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছে—এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি প্রকৃতির ক্ষেত্রে দুটি শক্তি অস্তি (ইয়াং) এবং নাস্তি (ইন) এর তত্ত্ব তৈরি করেন। বিশ্বের সব কিছুই নিয়ত 'ইয়াং' এবং 'ইন'-এর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত এবং পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাঁর মতে জ্ঞানের শুরু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে। কিন্তু শুধু অনুভূতি জ্ঞান নয়। মানুষের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির ভিত্তিতে প্রকৃতির জ্ঞান তৈরি করে। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। মানুষের মধ্যে যার যা-কিছু মহৎ তা শিক্ষার দ্বারাই সৃষ্ট হয়। চীনের দর্শনের পরবর্তী বিকাশ সুনজুর চিন্তাধারা দ্বারা বিরাটভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

Hume, David : ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৬৬ খ্রি.)

ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম মনোবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। জ্ঞানের সমস্যার যে ব্যাখ্যা হিউম উপস্থিত করেন তা পরবর্তী ভাববাদী-দর্শনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। 'জ্ঞানের মূল হচ্ছে ভাব'—এই তত্ত্ব দুটি ধারার সৃষ্টি করে। জন লক বলেছেন, ভাবের মূল হচ্ছে অভিজ্ঞতা। বার্কলে বলেছেন, ভাবের মূল হচ্ছে মন। ভাব মনকে অতিক্রম করে বস্তু বা অভিজ্ঞতায় আদৌ পৌঁছতে পারে না। এ তর্কে হিউম যোগদান করে বললেন, এই বিরোধিতায় জ্ঞানের মূল সমস্যার কোনোরূপ মীমাংসা আদৌ সম্ভব নয়।

'বস্তু আছে, কি নেই' এরূপ প্রশ্নের সমাধান তা হলে ভাবের তত্ত্ব দ্বারা কোনোরূপে সম্ভব নয়। হিউমের মতে আসলে মানুষ বস্তুর জ্ঞান আদৌ লাভ করতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে, 'বস্তু নেই' একথা মানুষ জানতে পেরেছে। বস্তু আছে কিংবা নেই জ্ঞান দ্বারা মানুষ এর কোনো উত্তরই দিতে পারে না। বস্তুর সঠিক জ্ঞান বলতেও কিছু নেই। সঠিক জ্ঞান কেবলমাত্র অঙ্কশাস্ত্রেই সম্ভব। কারণ, অঙ্কের কারবার বস্তু নিয়ে নয়, সংখ্যা নিয়ে, সূত্র নিয়ে। সংখ্যা বা সূত্র কোনো বস্তু নয়। জ্ঞানের মূল কাজ বস্তুর অস্তিত্ব নির্ণয় করা নয়। জ্ঞানের কাজ হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সহায়ক মাধ্যম হওয়া। ভাবের প্রবাহ বা ধারা নিয়ে আমাদের সাধারণ জ্ঞান তৈরি হয়। কিন্তু ভাবের মূল কি, তা মানুষের অজ্ঞেয়। বস্তু আছে কিংবা নেই—দুটোই আমাদের অবিশ্বাসের ব্যাপার, প্রমাণের বিষয় নয়। আমরা বিশ্বাস করি, ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কোনো ঘটনাকে কোনো ঘটনার কারণ কিংবা ফল হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি। কিন্তু ঘটনার মধ্যে কারণ কিংবা ফল আছে বলে প্রমাণ করা চলে না। মানুষের মধ্যে যে সময়-বোধ আছে, তা থেকে মানুষ ঘটনাসমূহকে কালের বুকে পূর্বাপর হিসাবে কল্পনা করতে পারে ; কিন্তু তার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করে তার ভিত্তিতে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সে করতে পারে না। মানুষ অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেবল আশা করতে পারে যে, অতীতে যা ঘটেছে ভবিষ্যতেও তা ঘটবে। কিন্তু অনিবার্য পুনরাবৃত্তির নিয়ম সে আবিষ্কার করতে পারে না। হিউম অবশ্য মানুষের ভাবের রাজ্যকে অরাজক বলতে চান নি। মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক ভাবকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে

সংঘটিত হতে দেখে। কিন্তু কার্যকারণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস এক কথা, আর তার অস্তিত্বে প্রমাণ আর এক কথা। মোট কথা, জ্ঞানের সমস্যার বিশ্লেষণে হিউম দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের পক্ষে জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুর জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। এই জন্য হিউমকে অজ্ঞেয়বাদী বলে অভিহিত করা হয়।

Hunger-strike : অনশন

অনশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করা। উপবাসে থাকা। বিভিন্ন ধর্মে কোনো কোনো উপলক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপবাস করার নিয়ম দেখা যায়। এরূপ অনশন দ্বারা মানুষ মনের শান্তি লাভ করতে চায় এবং ধর্মের অনুশাসন পালন করে। কিন্তু আধুনিক কালে অনশন একটি রাজনৈতিক অর্থ বহন করে। বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে অনশনকে সংগ্রামের একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভারত উপমহাদেশ যখন ইংরেজ শক্তির শাসনে ছিল তখন ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে এবং কারাগারে বন্দিদের উপর নানারূপ নির্যাতন করার নীতি অনুসরণ করেছে। কারাগারে আবদ্ধ এরূপ বন্দি নিতান্তই অসহায়। বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে তার দৈহিকভাবে সংগ্রাম করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এমন অবস্থাতেও যে বন্দি তার বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপায় বার করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত ভারতের কারাগারে আবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীগণ বহুবার স্থাপন করেছেন। তাঁরা কারাগারে নিজেদের জন্য রাজনৈতিক ও মানবিক মর্যাদা আদায়ের জন্য এবং সরকার কিংবা কারাগারের কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশ ও আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক উপায় হিসাবে খাদ্যগ্রহণ করতে অস্বীকার করার নীতি গ্রহণ করেন। ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ অনশন বা এরূপে স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ না করে বন্দিশালায় বহু বন্দি মৃত্যুও বরণ করেছেন। তাঁদের সেই মৃত্যু দেশের ব্যাপকতর জনসাধারণের মনে আবেগের সঞ্চার করেছে এবং দেশের মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করেছে। এভাবে কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও নিজেদের জীবনদান করে রাজবন্দিরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অগ্রসর করে দিয়েছেন। এরূপ ঘটনা ও জীবনদানের কাহিনীর মধ্যে লাহোর দুর্গে বন্দি বাংলার বিপ্লবী নেতা যতীন দাসের ১৯২৯ সনে ৬৩ দিনের অনশন এবং এই অনশনে তাঁর মৃত্যু একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারাগারে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু ঐ সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ যতীন দাসের মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন এবং জনসাধারণের প্রতিবাদ সভায় যোগদান করেছিলেন। আন্দামান দ্বীপে কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দিরাও একাধিকবার সে যুগে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন এবং তাতে জানা-অজানা বহু বন্দি মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তান শাসনকালেও বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে শত শত রাজবন্দি আমরণ অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে ১৯৪৯-৫০ সনে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অবলম্বিত ৫৮ দিনের অনশন ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনশনে কুষ্টিয়ার শ্রমিকনেতা শিবেন রায় নিহত হন। কারাগারের বাইরেও রাজনৈতিক

নেতাদের দ্বারা অনশন করার দৃষ্টান্ত আছে। এরূপ অনশনের দৃষ্টান্ত প্রথম স্থাপন করেন ভারতের অহিংস আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী। তিনি অনেকবার ঘোষণা করে অনশন করেছেন। কেবল ইংরেজ শক্তির কোনো নীতি বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে নয়। নিজের 'আত্মাকে শুদ্ধ' করার উদ্দেশ্যে বা দেশবাসীর কোনো অবাঞ্ছিত আচরণের প্রতিবাদেও অনির্দিষ্টকালের জন্য কিংবা 'আমরণ' অনশনের ঘোষণা দ্বারা তিনি অনশন করেছেন। বাংলাদেশের জননেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও গান্ধীজির অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে অনশন করেছেন।

ভারতের বাইরে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রাজবন্দিদের অনশন সাম্প্রতিককালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৮২ সনে এরূপ অনশনে একাধিক রাজবন্দি মৃত্যুবরণ করেছেন।

Hypothesis : প্রকল্প, আন্দাজ

কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে কোনো একটিকে নির্বাচন করে প্রমাণ ও পরীক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিকে প্রকল্প বা আন্দাজের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া বলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রকল্প একটি প্রয়োজনীয় স্তর। মঙ্গল গ্রহে জীবন আছে কিনা এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর সম্ভব। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট জবাব বাছাই করে এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিককে অগ্রসর হতে হয়। একটি প্রকল্প সাধারণত সরাসরিভাবে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয় না। প্রকল্প প্রমাণের পদ্ধতিটি এইরূপ যদি গৃহীত আন্দাজ বা প্রকল্পটি সঠিক হয় তা হলে বাস্তব ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিফল দৃষ্ট বা সংঘটিত হবে। অনুমিত পরিফল বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং গৃহীত প্রকল্পটি সত্য বলে প্রমাণিত হলো। একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান স্তরগুলিকে নিম্নোক্তভাবে নির্দিষ্ট করা যায় কোনো সমস্যার বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রথমে পর্যবেক্ষণ দিয়ে শুরু হয়। এ-টি প্রথম স্তর। পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণে যদি একাধিক সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে একটি সমাধান বাছাই করা হয়। এটি গবেষণার দ্বিতীয় বা প্রকল্পের স্তর। একাধিক সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে একটি সমাধান নির্বাচনের প্রধান শর্ত হচ্ছে নির্বচিত প্রকল্পটিকে সর্বোত্তম বিবেচনা করতে হবে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিধানসমূহের বিরোধী কোনো প্রকল্পকে গ্রহণ করা চলবে না। প্রকল্পটি প্রমাণযোগ্য হতে হবে। নির্বাচিত প্রকল্পের ভিত্তিতে গবেষণার প্রমাণ ও প্রয়োগ অর্থাৎ তৃতীয় স্তর শুরু হয়। প্রমাণ ও প্রয়োগে নির্বাচিত প্রকল্পটি সঠিক দেখা গেলে প্রকল্পটি প্রকল্প বা আন্দাজ হিসাবে না থেকে সঠিক সমাধান বলে বিবেচিত হয়। অপর দিকে প্রমাণ ও প্রয়োগে নির্বাচিত প্রকল্প নাকচ হলে গবেষণাকে নতুন আর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে প্রমাণ ও প্রয়োগের অধ্যায় পুনরায় শুরু করতে হয়। নির্বাচিত প্রকল্পকে কার্য-যোগ্য প্রকল্প বলেও অভিহিত করা হয়।

Ibn Khaldun : ইবনে খলদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)

আরব সভ্যতার ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসের দার্শনিক হিসাবে ইবনে খলদুনের নাম সুবিখ্যাত। উত্তর আফ্রিকার তিউনিসে তাঁর জন্ম। তাঁর শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র প্রধানত উত্তর আফ্রিকা। মাত্র বিশ বছর বয়সে দেশের সুলতানের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি নিযুক্ত হন। তারপর কখনো সুলতানের কর্মসচিব, কখনো কাজি, কখনো রাষ্ট্রদূত হিসাবে বিচিত্র দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাঁর জীবনে উত্থান-পতন কম ছিল না। সুলতানের বিরাগভাজন হওয়াতে দুবার তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। মঙ্গোল বাদশাহ্ তৈমুর লঙ-এর দিগ্বিজয়ের অভিযানে সিরিয়া আক্রান্ত হলে মিসরের সুলতানের সঙ্গে যে যুদ্ধ ঘটে তাতে তৈমুর লঙ-এর বাহিনীর হাতে ইবনে খলদুন বন্দি হন। তাঁকে তৈমুর লঙ-এর দরবারে হাজির করা হয়। তৈমুর লঙ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্ত করে মিসরে প্রেরণ করেন। ইবনে খলদুন কায়রোর আল-আজহার মসজিদের শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। কায়রোতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আত্মজীবনী ব্যতীত ইবনে খলদুনের প্রধান এবং সুবিপুল ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'কিতাব উল ইবার ওয়া দেওয়ান উল মুবতাদা ওয়া আল খবর ফি আয়াম-উল আরব ওয়া আল্ আজম ওয়া আল বারবার'। এই গ্রন্থে ইতিহাসের বিবরণগত অংশ লেখক প্রথমে আরব এবং তার প্রতিবেশী জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তার পরে বারবার এবং উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই বিবরণের পূর্বে তিনি ইতিহাস পাঠের তত্ত্বগত যে ভূমিকা বা 'মুকাদ্দিমা' রচনা করেন তা ইতিহাস তত্ত্বে এক আশ্চর্য অমর অবদান বলে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। মুকাদ্দিমার মধ্যে ইবনে খলদুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মূল কি এবং কোনো স্থান বা রাষ্ট্রের অধিবাসীর চরিত্র তাদের চারিপাশের জলবায়ু এবং জীবিকার্জনের উপায় দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত ও গঠিত হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানে কীভাবে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার মৌলিক এবং বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করেন। সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এরূপ বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আলোচনা জ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম। এ কারণে ইবনে খলদুন সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের দর্শনের অবিসংবাদী জনক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ইবনে খলদুনের বিবরণ আরব দেশসমূহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসাবে তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম ইতিহাসকার আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর সুবিখ্যাত 'স্টাডি অব হিস্টরি' গ্রন্থে ইবনে খলদুনের মূল্যায়ন করে বলেছেন, 'খলদুনের ইতিহাসের দর্শন জ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অনতিক্রান্ত সৃষ্টির মর্যাদায় মহিমান্বিত'। জর্জ সারটন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইনট্রোডাকশন টু দি হিস্টরি অব সায়েন্স' গ্রন্থে

এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, কেবলমাত্র মধ্যযুগেরই নয়, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের পর ম্যাকিয়াভেলী পর্যন্ত ইতিহাসের তত্ত্ব এবং মানুষের অভিজ্ঞতার দর্শনের ক্ষেত্রে ইবনে খলদুনের সমকক্ষ অপর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি।

ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগের এক পর্বে আরবি ভাষার রচনাবলী লাতিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার মরসুম শুরু হয়েছিল। এই সময়ে অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপ আরবি সভ্যতার মহৎ সৃষ্টি এবং প্রাচীন গ্রিসের দর্শনের পরিচয় লাভ করে। ইবনে খলদুনের জন্ম অনুবাদের এই মরসুমের পরে ঘটায় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইবনে খলদুনের আরবি রচনাবলী ও তাঁর উৎকর্ষ ইউরোপে ছিল অপরিচিত। ১৮৬২-৬৮ সালের দিকে ফরাসি দেশে ফরাসি ভাষায় সর্বপ্রথম তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ইংরেজি অনুবাদ ঘটে মাত্র অতি সাম্প্রতিককালে ১৯৫৮ সালে।

Ibn Rushd : ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)

আরব সভ্যতার বিখ্যাত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক। ইউরোপে তিনি 'আভারস' নামে পরিচিত। জন্ম মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত স্পেনের কর্ডোভা শহরে। আইন, ধর্মতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

ইবনে রুশদের দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইসলামের ধর্মীয়বোধের বিরোধিতা না করেও গ্রিসের দার্শনিক এ্যারিস্টটলের দর্শনের বস্তুবাদী দিক বিকশিত করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, বস্তু এবং গতির কোনো স্রষ্টা নেই। আত্মার অমরতা এবং পরকালকে ইবনে রুশদ অস্বীকার করেন। আল-গাজ্জালীর ধর্মীয় রহস্যবাদকে ইবনে রুশদ তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের সঙ্গে ইউরোপের সাক্ষাৎ পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম ছিলেন ইবনে রুশদ। এ্যারিস্টটলের দর্শনের যে ব্যাখ্যা তিনি রচনা করেন তার মাধ্যমে ইউরোপের জ্ঞানজগৎ গ্রিক দর্শনের পরিচয় লাভ করে। ইবনে রুশদের দর্শন এবং তাঁর অনুসারীগণ মুসলিম এবং খ্রিষ্টীয় ধর্মের গোঁড়াপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয় ; গোঁড়াপন্থীদের এই তীব্র বিরোধিতা ইবনে রুশদের দর্শনের শক্তি এবং প্রভাবের পরিচায়ক। কেবলমাত্র মুসলিম সাম্রাজ্য নয়, ত্রয়োদশ শতকের ফরাসি চিন্তাধারার উপরও ইবনে রুশদের অগ্রসর চিন্তার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইতালিতে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইবনে রুশদের চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইবনে রুশদের দর্শনের প্রধান অভিমত হচ্ছে বিশ্ব চিরস্থায়ী এবং আত্মাও দেহের ন্যায় মরণশীল। ধর্মের সঙ্গে বিরোধ এড়াবার জন্য ইবনে রুশদ দ্বৈত সত্যের তত্ত্ব রচনা করেন। তিনি বলতেন, সত্য দুই প্রকার দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য যেমন ধর্মের কাছে গ্রাহ্য নয়, তেমনি জগৎ সম্পর্কে ধর্মের ব্যাখ্যাও বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রহণীয় হতে পারে না। মধ্যযুগে বিজ্ঞান যখন গোঁড়ামির শেকল ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে তখন ইবনে রুশদের দার্শনিক রচনার মধ্যে এ্যারিস্টটলের দর্শনবিষয়ক তাঁর তিন খণ্ডের বক্তব্য সমধিক পরিচিত। এ ছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর তিনি সাত খণ্ডে 'কিতাব-উল-কুললিয়াত' নামে যে বিশ্বকোষ রচনা

করেন তাও জ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই বিশ্বকোষে ইবনে রুশদ শরীরাংশ, দেহতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, সাধারণ চিকিৎসা, খাদ্য ও ঔষধপথ্য ব্যবস্থা এবং আরোগ্য বিজ্ঞানের সুবিস্তারিত বিবরণ পেশ করনে।

Ibn-Sina : ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)

মধ্য এশিয়ার বুখারার আবু আলী ইবনে সিনা ইউরোপে দার্শনিক আভিসেনা নামে পরিচিত ; দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী এবং কবি ইবনে সিনার জীবন ছিল বিপুল জ্ঞানরাশিতে সমৃদ্ধ এবং ঘটনায় বিচিত্র। অতি অল্প বয়সে তাঁর বুদ্ধির আশ্চর্য দীপ্তি প্রকাশ পায়। দশ বছর বয়সে তিনি হাফেজে কোরান এবং ষোল বছরে চিকিৎসার একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবে সকলের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সতেরো বছর বয়সে বুখারার আমীর তাঁকে দরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই আমীরের পতনের পর ইবনে সিনার জীবনেও অনিশ্চয়তা নেমে আসে। এরপর থেকে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে তাকে জীবন কাটাতে হয়। এক সময়ে ইবনে সিনা কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হন। কারাগারে থেকে পলায়ন করে তিনি ইস্পাহান যান।

আরব সভ্যতায় প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনকে সংযোজিত করে আরব সভ্যতার মাধ্যমে ইউরোপে সেই অমর জ্ঞান সম্ভারকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইবনে সিনার অবদান অতুলনীয়। ইবনে সিনা ইউক্লিডের জ্যামিতিকে আরবি ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন এবং এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার নতুনতর বিকাশ সাধন করেন। ইবনে সিনার দর্শনে ভাববাদী এবং বস্তুবাদী উভয় ধারারই আমরা পরিচয় পাই। ইবনে সিনা, গতি, শূন্যতা, তাপ, আলো, স্থানিক আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণা করেন। সে-যুগে প্রচলিত আলকেমি বা কিমিয়া বিদ্যার ধাতু রূপান্তরবাদকে তিনি অস্বীকার করেন।

ইবনে সিনার অবদানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর রচিত তাঁর বিশ্বকোষ 'কানুন'। চিকিৎসার তত্ত্ব, অমিশ্র বা সহজতর ঔষধাদি, রোগের সাধারণ প্রকার, রোগের নিরাময় ব্যবস্থা এবং মিশ্র ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর পাঁচ খণ্ডে রচিত সুবিপুল 'কানুন'-এ ইবনে সিনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব এরূপভাবে পেশ করেন যে, তাঁর এই গ্রন্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরু বলে পরিচিত গ্যালেনের গ্রন্থসমূহকে অতিক্রম করে যায় এবং পাঁচ শতাধিক বছর ধরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানগ্রন্থ বলে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বস্তুত চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে সিনার কানুন এরূপ অভ্রান্ত বলে গৃহীত হতে থাকে যে, এর বাইরে যে অপর কোনো তথ্য বা তত্ত্ব থাকতে পারে একথা মানুষ বিশ্বাস করতে চাইত না। এর ফলে পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধিকতর বিকাশের ক্ষেত্রে ইবনে সিনার 'কানুন' প্রতিবন্ধকতার দুর্গ হয়ে দাঁড়ায়।

Idea : ভাব

'ভাব' বলতে সাধারণত কোনো কিছু সম্পর্কে মানুষের মনের ধারণা বুঝায়। এই শব্দ বা পদটি বহুল পরিচিত এবং ব্যবহৃত হলেও দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে 'ভাব'-এর

কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায় না। 'ভাব' মনের ব্যাপারে, একথা স্বীকার করলেও ভাব কীভাবে তৈরি হয় এবং 'ভাব' ও ভাবের 'উৎস'—এ দুয়ের মধ্যে কি পার্থক্য, কি সম্পর্ক এবং কে প্রধান, এ প্রশ্নে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ভাবের আলোচনা দুভাবে করা যায়। একটি হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অপরটি দর্শনের, বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে। মনোবিজ্ঞানে ভাব দ্বারা মানসিক ক্রিয়া বুঝানো হয়। জ্ঞানতত্ত্বে ভাব হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যম। ভাবের মাধ্যমে আমরা জগৎকে জানি। এজন্যই আমরা বলি, এই বস্তুটি কিংবা ঐ বস্তুটি সম্পর্কে আমার ধারণা বা ভাব হচ্ছে এই ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো বস্তু সম্পর্কে আমাদের মন যখন চিন্তা করে তখন বস্তু দৈহিকভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। বস্তু থেকে আমাদের ইন্দ্রিয় যে সমস্ত বোধ বা অনুভূতি লাভ করে সেই অনুভূতিসমূহের মাধ্যমে মন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করে। যুক্তিবিদ্যায় ভাব বা পদকে ব্যক্তিবাচক, সাধারণ, বস্তুবাচক, গুণবাচক প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়।

দর্শনের ইতিহাসে ভাবের তিনটি ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত এবং প্রাচীন তত্ত্ব হচ্ছে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.) তত্ত্ব ; দ্বিতীয় হচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদী এবং বিশেষ করে ইংরেজ দার্শনিক জন লকের ব্যাখ্যা, তৃতীয়টি জার্মান দার্শনিক হেগেলের।

প্লেটো 'ভাব' বলতে কেবল মনের সৃষ্টি বুঝতেন। বস্তু ভাবকে মনের মধ্যে তৈরি করে কিংবা ভাবের উৎস হচ্ছে বস্তু, সাধারণ এই মতকে অস্বীকার করে প্লেটো বলেন, এতে মনে হতে পারে যে, বস্তু হচ্ছে প্রধান, ভাব অপ্রধান এবং ভাব বস্তুর উপর নির্ভরশীল। প্লেটোর মতে মনের বাইরে ভাবের নিজস্ব একটা সত্তা আছে। ভাবের সেই সত্তাই মনের সব ভাবের উৎস। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জ্যামিতির 'ত্রিভুজ' সম্পর্কে মানুষ কথা বলে। ত্রিভুজের ভাব সে মনে ধারণ করে। 'ত্রিভুজ' মানুষের বস্তুজগতের জ্ঞানের একটি মাধ্যম। কিন্তু বস্তুজগতে 'ত্রিভুজ'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজেই একথা বলা চলে না যে, 'ত্রিভুজ' নামক কোনো বস্তু মানুষের মনের 'ত্রিভুজ' ধারণার সৃষ্টি করে। প্লেটোর মতে 'ত্রিভুজ' হচ্ছে একটি স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন ভাব। এই ভাবই মানুষের মনের 'ত্রিভুজ' ভাবের সৃষ্টি করে। কাগজের পৃষ্ঠায় কিংবা মাটির বুকে অঙ্কিত কোনো ত্রিভুজের সম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণতা এই স্বাধীন 'ত্রিভুজ' ভাবের সঙ্গে তুলনাক্রমেই মানুষ স্থির করে। প্লেটোর এই ব্যাখ্যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ব্যাখ্যানুযায়ী কেবল জ্যামিতির ত্রিভুজ নয়, বস্তুজগতের সমস্ত কিছুরই মূল হচ্ছে ভাব। দার্শনিক যদি বিশ্বচরাচরের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চায় তবে তাকে এই ভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে ; ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। প্লেটোর এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দর্শনের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাববাদ। বস্তুত ভাববাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিভূ হিসাবেই প্লেটোর পরিচয়।

অভিজ্ঞতাবাদী জন লকের মতে মানুষ যা কিছু সম্পর্কে চিন্তা করে তাই তার মনের ভাব। একটা টেবিল সম্পর্কে যখন আমি চিন্তা করি তখন 'টেবিল'টা আমার মনের ভাব ; একটা চেয়ার সম্পর্কে যখন চিন্তা করি তখন 'চেয়ার'টা আমার মনের ভাব। এই অর্থে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুপুঞ্জই আমার মনের ভাব। এবং বস্তুপুঞ্জ বা অভিজ্ঞতাই হচ্ছে ভাবের

উৎস। কিন্তু তাই বলে চেয়ার নামক ভাবটাই বস্তু নয়। চেয়াররূপ ভাব বস্তু নয়, কিন্তু তার উৎস। বস্তু—ভাবের এই দ্বৈত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে ভাববাদ উদ্ভূত হয় তাকে অনেক সময় অভিজ্ঞতাবাদ বা ব্রিটিশ ভাববাদ বলে অভিহিত করা হয়।

ভাবের তৃতীয় প্রধান ব্যাখ্যা দেন হেগেল। হেগেলের মতের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্লেটোর ব্যাখ্যার সাদৃশ্য আছে। হেগেল বলেন : বস্তুপুঞ্জের কোনো একটির তাৎপর্য বস্তুপুঞ্জের আর সকল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অংশের সাথে অংশের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত সমগ্রের উপলব্ধির মাধ্যমেই এই সমগ্রের কোনো অংশবিশেষেরও তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক সংখ্যা '৩'-কে। সংখ্যা '৩'-এর নিজস্ব অনন্যনির্ভর কোনো অর্থ নেই। '৩' ২ এবং ৪-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই সম্পর্ক বুঝার মাধ্যমেই মাত্র '৩'-এর তাৎপর্য বুঝা সম্ভব। কিন্তু এই সমগ্রের উপলব্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব নয় এই সমগ্র হচ্ছে মনের উপলব্ধি। অন্য কথায় এই সমগ্র বস্তুপুঞ্জ হলেও কেবলমাত্র বস্তুপুঞ্জ নয়। এই সমগ্র হচ্ছে মনের ভাব এবং আমাদের উপলব্ধ বস্তুপুঞ্জ হচ্ছে এই ভাবেরই সংবদ্ধ প্রকাশ। বাস্তব জগৎ ভাবের প্রকাশমাত্র নয়, বাস্তব জগৎই ভাব এরূপ অর্থ প্রকাশ পায় বলে হেগেল-এর এই ভাববাদকে অনেকে বাস্তব ভাববাদ বা অবজেকটিভ আইডিয়ালিজম বলে অভিহিত করেন।

মনের ভাবের সৃষ্টি এবং বস্তুজগতের সঙ্গে তার সম্পর্কে প্রশ্নটি বিশেষ জটিল প্রশ্ন। দর্শনের ইতিহাসে যে সমস্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার কোনোটিতে ভাব প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অন্য কোনোটিতে, বিশেষ করে বস্তুবাদের ব্যাখ্যায়, ভাব ও মন অস্বীকৃত হয়ে সবকিছু অনড় বস্তুপুঞ্জে পর্যবসিত হয়েছে। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে মন এবং বস্তু উভয়ের স্বীকৃতিসহ একটি সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই মত অনুযায়ী ভাব এবং বস্তুর মধ্যে বস্তু অবশ্যই প্রধান। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং মস্তিষ্কের কোষে বস্তুর আঘাতজনিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মনে বস্তুর ছবি বা ভাব সৃষ্টি হয়। মানুষের মনও গতিময় বস্তুর বিকাশের ফলশ্রুতি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বস্তু প্রধান হলেও বস্তুপুঞ্জ এবং মনের যে পারস্পরিক ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান সেখানে বস্তু যেমন মনের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ভাবের সৃষ্টি করে, ভাবও তেমনি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয়ে বস্তু এবং পরিবেশকে পরিবর্তনে মানুষের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

Idealism : ভাববাদ

Objective Idealism : বাস্তব ভাববাদ

দর্শনের দুটি প্রধান ধারার একটি হচ্ছে ভাববাদ। অপর একটি বিপরীত ধারা হচ্ছে বস্তুবাদ। বিশ্ব রহস্যের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে : বস্তু প্রধান, না মন বা ভাব প্রধান?

এই প্রশ্নে ভাববাদের সাধারণ জবাব হচ্ছে মন বা অ-বস্তুই হচ্ছে প্রধান, বস্তু প্রধান নয়। কারণ, সাধারণ চোখে মানুষ দেখতে পায় যে, বস্তুর পরিবর্তন, ক্ষয় এবং বিলুপ্তি আছে। এবং যার পরিবর্তন বা বিলুপ্তি ঘটে সে নিশ্চয়ই শক্তিশালী বা মূল বলে স্বীকৃত

হতে পারে না। এই স্থূল মত অনুযায়ী মন বা ভাবের কোনো ক্ষয় বা পরিবর্তন নেই। কারণ মন বা ভাব অ-বস্তু। কাজেই ভাব হচ্ছে বস্তুর চেয়ে শক্তিশালী। ভাববাদের এই সাধারণ ব্যাখ্যার সঙ্গে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ধর্মীয় বিশ্বাসে সব কিছুর যে স্রষ্টা এবং চালক সে বস্তু নয়। সে বস্তু হতে পারে না। সে বস্তুর ঊর্ধ্বের কোনো শক্তি।

অতীন্দ্রিয় এবং অ-বস্তুমূলক কোনো কিছুকে মূল বলে ঘোষণা করার একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। বস্তুর সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সম্পর্ক সাক্ষাৎ। বস্তু চোখে দেখা যায়, তাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। বস্তুকে জীবনের মূল শক্তি বলে স্বীকার করলে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্পর্কের তাৎপর্যকে স্বীকার করতে হয় এবং সাধারণ মানুষ বস্তুকে পরিবর্তন করে তার সামাজিক ও জাগতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এ কথাও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরূপ স্বীকৃতি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শাসক শ্রেণীর স্বার্থবহ হতে পারে না। এ কারণে ভাববাদ অর্থাৎ সমস্ত শক্তির মূল হিসাবে অতীন্দ্রিয় এবং অ-বস্তুমূলক কোনো সত্তার তত্ত্ব শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বজনীন বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এসেছে।

দর্শনে ভাববাদকে দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয় ; (১) বাস্তব ভাববাদ, (২) মনময় ভাববাদ। বাস্তব ভাববাদে ব্যক্তির মনের বাইরে একটি অতিব্যক্তিক এবং অতিপ্রাকৃতিক কোনো ভাবকে সব কিছুর মূল বলে মনে করা হয়। মনময় ভাববাদে মনের চেতনাকে অস্তিত্বের মূল বলে নির্দিষ্ট করা হয়। মনময় ভাববাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন জর্জ বার্কলে। বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বার্কলে বলেন, মনের ভাবের বাইরে কোনো বস্তুর অস্তিত্বের কথা ব্যক্তি জানতে পারে না। ব্যক্তির কাছে সকল অস্তিত্বই তার সচেতন মনের উপলব্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মন যা উপলব্ধি করে, ব্যক্তির কাছে শুধু তাই অস্তিত্বময়। বার্কলের মতে জগৎ আছে বলে যে মানুষ তাকে দেখে একথা ঠিক নয় ; মানুষ দেখে বলে জগৎ আছে। অবশ্য বাস্তব ভাববাদ এবং মনময় ভাববাদ যে একেবারে পরস্পর বিরোধী তা নয়। বাস্তব ভাববাদ ব্যক্তির মনের ভাবকে অস্বীকার করে না। ব্যক্তির মনের ভাব অতিব্যক্তিক স্বাধীন ভাবের ছায়া বা প্রকাশ বলে বাস্তব ভাববাদীর অনেকে মনে করেছেন। আবার মনময় ভাববাদ পাছে চূড়ান্তরূপে ব্যক্তিক মনময়তায় পর্যবসিত হয়, এ কারণে মনময় ভাববাদ ব্যক্তির মন-নিরপেক্ষ ভগবান বা অনুরূপ কোনো সর্বময় মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রকারান্তরে বাস্তব ভাববাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

বাস্তব ভাববাদের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রাচীনকালের দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে এবং আধুনিক কালের জার্মান দার্শনিক হেগেলের চিন্তাধারায়। প্লেটোর 'ভাব' কোনো ব্যক্তির মনের ভাব নয়। এ ভাব সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এই ভাবের আংশিক প্রকাশ হচ্ছে ব্যক্তির মনের ভাব এবং জগতের সব বস্তু। হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদের ব্যাখ্যায় জগতের কোনো কিছুই, সে ব্যক্তির মনের ভাব হোক কিংবা বহির্জগতের কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনা হোক, পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো কিছুর তাৎপর্য বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সবকিছু নিয়ে সমগ্র এবং সমগ্রের মধ্যে সবকিছু। কিন্তু এই সমগ্র ব্যক্তির

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই সমগ্র ব্যক্তির কেবল বুদ্ধি, যুক্তি ও মন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। এই সমগ্র কোনো বিশেষ বস্তু নয়। আবার কোনো বিশেষ বস্তু এই সমগ্রের বাইরে নয়। এই সমগ্র কোনো ব্যক্তির মনের কল্পনাও নয়। আবার ব্যক্তি মন ছাড়া এ সমগ্রের উপলব্ধি করতেও অক্ষম। হেগেল সমগ্রের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে দ্বন্দ্বমূলক বললেও সমগ্রকে যেহেতু তিনি বস্তু বলতেও অস্বীকার করেছেন এবং তাকে ব্যক্তিক মনের বাইরের অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন—একারণে হেগেলের ভাববাদকে বাস্তব ভাববাদ বলে অভিহিত করা হয়। ভাববাদী দর্শনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যে সমস্ত নতুনতর তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার মধ্যে পজিটিভিজম বা দৃষ্টসত্তাবাদ, নিওরিয়ালিজম বা নব্যবাস্তববাদ, এক্সিটেনশালিজম বা অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তিত্ববাদ, জীবনের দর্শনবাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

Idealistic Understanding of History : ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা

সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় ইতিহাস। ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভের জন্য তাই আবশ্যক ইতিহাস অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের মূল শক্তি কি তা জানার। ইতিহাসের পরিবর্তন কে সংঘটিত করে? যুগের মহামানব, মানুষের চেতনা, অতিপ্রাকৃত বিধাতা? অথবা সমাজ ও সভ্যতা পরিবর্তিত হয় সামাজিক কোনো বিধান বলে? এই প্রশ্ন মনুষ্য সমাজের উদ্ভবকাল থেকে চলে এসেছে। এ প্রশ্নের দুটি প্রধান জবাবের সাক্ষাৎ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে : সমাজ ও সভ্যতার মূল চালক হচ্ছে মানুষের চেতনা। এই চেতনার মূলে আছেন বিধাতা। বিধাতার নির্বাচিত সম্রাট ও মহামানবগণ সমাজ ও সভ্যতার মূল চালক হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের ইচ্ছাতেই সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ কিংবা বিলয় ঘটে। এই ব্যাখ্যা ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা বলে পরিচিত। সম্রাট ও মহামানবদের আগমন ও তিরোধান এবং বৃহৎ বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠী বা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন আদিকাল থেকে সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যজনক এবং দুর্বোধ্য বলে বোধ হয়েছে। বিরাট ও বিপুল কিছুর তাৎপর্য চিন্তা ও যুক্তির মারফত বিভিন্ন ঘটনার সংশ্লেষণ ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই দুঃসাধ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেক সমাজের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র ও শিক্ষাযন্ত্র ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে রহস্যাবৃত করে রাখার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা এই চেষ্টারই পরিপোষক। ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যার এটাই ছিল প্রধান ধারা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ফরাসি বিপ্লব এই ব্যাখ্যাকে অসার প্রতিপন্ন করে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে ইতিহাসের মূল চালক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কোনো বিশেষ যুগের ও সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক যে-কোনো ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তা যে ঐশ্বরিক কোনো বিধানও নয়, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকগণ তা বিশ্লেষণ করে দেখান। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হচ্ছে ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যার বিরোধী অপর প্রধান ব্যাখ্যা।

Identity : অভিন্নতা

Law of Identity : অভিন্নতার বিধান

কোনো দুটি বিষয়, ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য বা মিল থাকলে তাদের অভিন্ন বলা হয়। 'অভিন্নতা' কথাটি তুলনার ক্ষেত্রে এবং বস্তুর ধারাবাহিকতা বুঝাবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ক এবং খ উভয়ের মধ্যে যদি একই গুণের অস্তিত্ব দেখা যায় তবে ক এবং খ-কে অভিন্ন বলা হবে।

কিন্তু বাস্তব জগতে অভিন্নতা আদৌ কল্পনা করা যায় কিনা এটি দর্শনের একটি প্রশ্ন। প্রাচীন গ্রিসের হেরাক্লিটাস এবং অন্যান্য বস্তুবাদী দার্শনিক থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, কোনো দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বই অভিন্ন হতে পারে না। একই নদীতে কেউ দুবার নামতে পারে না, হেরাক্লিটাসের এরূপ উক্তিতে বস্তুজগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রবাহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কিছুকেই অপর কিছুর সঙ্গে তুলনা করে অভিন্ন বলা চলে না। কারণ ক এবং খ-কে অভিন্ন বলার পূর্বে তাদের উভয়ের চরিত্র পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাদের সাদৃশ্য নিরূপণ করতে হবে। এটি একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সমাধা করতে কিছু না কিছু সময়ের আবশ্যক। কিন্তু সময়ের ব্যবধান তুলিত বস্তুর মধ্যে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। সে কারণে যারা তুলিত এবং যাদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা পরিশেষে গ্রহণ করি তারা একই সত্তা—এরূপ বলা যায় না। কেবল একাধিক বস্তুর মধ্যে অভিন্নতা আরোপের ক্ষেত্রে নয়। নির্দিষ্ট কোনো একটি ব্যক্তি বা বস্তুর উপরও অভিন্নতা আরোপ করা চলে না। সক্রেটিস ৪৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করে ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মারা গিয়েছিলেন, এরূপ কখনও বলা সম্ভব নয়। কারণ, এরূপ বিবৃতির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ৪৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যে-সক্রেটিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অভিন্নরূপে সেই সক্রেটিস ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু চরমভাবে দেখতে গেলে ৪৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সক্রেটিস অভিন্নভাবে ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন নি। এঁরা দুজন ভিন্ন ব্যক্তি।

পরিবর্তনের এই প্রবাহকে চরমভাবে সর্বদা গ্রহণ করলে মানুষের পক্ষে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত এই পর্যায়ে জ্ঞানের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে চরম অভিন্নতা যেরূপ অকল্পনীয়, তেমনি চরম ভিন্নতাও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। দর্শনে তাই অভিন্নতার বিধান বলতে চরম অভিন্নতার বদলে আপেক্ষিক অভিন্নতাকে বুঝানো হয়। আপেক্ষিক অভিন্নতায় তুলিত বস্তুর সাদৃশ্যকে সময় ও বিষয় নিরপেক্ষভাবে কল্পনা করে বিশেষ বস্তুর উপর প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে ৪৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সক্রেটিস ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সক্রেটিসের সঙ্গে চরমভাবে অভিন্ন না হলেও উভয়ের মধ্যে সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং এ-কারণে তারা উভয়েই সক্রেটিস একথা বলা যায়। এবং এরূপ না বললে মানুষের পক্ষে বস্তুর জ্ঞান অর্জন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তিশাস্ত্রে অভিন্নতার বিধানের শর্ত হচ্ছে এই যে, একটি নির্দিষ্ট যুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত ভাব বা পদকে একই অর্থে ব্যবহার করতে হবে।

Immediate Inference : প্রত্যক্ষ অনুমান

Immediate Knowledge : প্রত্যক্ষ জ্ঞান

প্রচলিত যুক্তিশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ অনুমান বলতে সেই সিদ্ধান্ত বা অনুমানকে বুঝানো হয় যে অনুমান একটিমাত্র হেতু বা দত্ত বাক্য থেকে গৃহীত হয়। যেমন :

সকল মানুষ মরণশীল
∴কোনো মানুষ অমর নয়।

এখানে একটিমাত্র হেতুবাক্য 'সকল মানুষ মরণশীল' থেকে সুতরাং 'কোনো মানুষ অমর নয়' সিদ্ধান্তটি অনুমান করা হয়েছে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই দৃষ্টান্তটির দত্তবাক্যের বিধেয় পদ মরণশীল এর বিপরীত পদ 'অমর'কে সিদ্ধান্ত বাক্যের বিধেয় পদ হিসাবে ব্যবহার করে এবং দত্তবাক্য যেখানে 'হাঁ' বাচক সেখানে সিদ্ধান্ত বাক্যকে 'না' বাচক করে অনুমানটি গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় আবর্তন বা ইংরেজিতে কনভারশন। একটিমাত্র বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আরো কয়েকটি কৌশল বা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ অনুমানকে অবভারশন বা পরিবর্তন, কন্ট্রাপজিশন বা প্রতি আবর্তন প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

প্রত্যক্ষ অনুমানের বিপরীত হচ্ছে পরোক্ষ অনুমান। অনুমানের প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে পরোক্ষ অনুমান। পরোক্ষ অনুমান একাধিক হেতু বা দত্তবাক্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত বা অনুমান গৃহীত হয়। যেমন :

সকল মানুষ মরণশীল
সক্রেটিস একজন মানুষ
সক্রেটিস মরণশীল।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলতে প্রত্যক্ষ অনুমানের ন্যায় কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতীত অর্জিত জ্ঞান বুঝানো হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পূর্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই জ্ঞানের প্রধান উপায় বলে মনে করা হতো। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আবার অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই দুইভাগে ভাগ করা হতো। প্লেটো, দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ এই সমস্ত দার্শনিক বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। এঁদের মতে অঙ্ক ও জ্যামিতি শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধগুলি বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উত্তম দৃষ্টান্ত। কেননা এই সত্যগুলিকে মানুষ কোনো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য বলে উপলব্ধি করে না। এগুলি মানুষের সহজাত। মানুষ তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধির আলোকেই এগুলি সত্য বলে বুঝতে পারে।

আধুনিককালে জার্মান দার্শনিক হেগেল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ধারণাটি সমালোচনা করেন। হেগেল পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অসম্ভব বলে মনে করেন। তাঁর মতে জ্ঞান হচ্ছে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বোধ বা অনুভূতি পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হয়ে জ্ঞান-সমগ্রকে তৈরি করে। কিন্তু হেগেলের জ্ঞানতত্ত্বও শেষাবধি বস্তুবাদী থাকে নি। তিনি মনে করতেন যে, বস্তু, ব্যক্তি, সমাজ,

ইতিহাস, জ্ঞান সবই হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কিত এবং সবটা মিলিয়ে যে সত্তা সে হচ্ছে ভাব, বস্তু নয়। কেননা ভাব বা জ্ঞানের মাধ্যমেই সে বোধ্য, অপর কোনো উপায়ে নয়। জ্ঞানতত্ত্বের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হেগেলের বস্তুবাদী ধারার অনুসরণকারী মার্কসবাদীগণের ব্যাখ্যাত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে। এই মত অনুযায়ী অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণের উর্ধ্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে বস্তুজগতের জ্ঞানলাভের কোনো উপায় থাকতে পারে না। যাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয় সে হচ্ছে মানুষের যুগ যুগের অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা ও প্রমাণের ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান যা আর নতুন কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

Imperialism : সাম্রাজ্যবাদ

সাধারণ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বলতে কোনো রাষ্ট্র বা জাতি কর্তৃক অপর কোনো রাষ্ট্র বা জাতির উপর শাসন ও প্রভুত্ব বুঝায়।

এই ব্যাপক অর্থে ইতিহাসের প্রাচীন কালেও সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে সুমেরীয়, মিসরীয়, আসিরীয়, পারস্য, রোম এবং চীন সাম্রাজ্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ইতিহাসে ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। অপরের উপর নিজের শাসন ও সভ্যতা বিস্তার মারফত প্রভুত্ব কায়েম করা, অসম আচরণ ও অত্যাচার ও শোষণের মাধ্যমে অধীনস্থ জাতির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী রাখার ইচ্ছা, ব্যবস্থা ও কৌশলে প্রাচীন ও আধুনিক সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। অতীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের একটা প্রধান প্রেরণা ছিল কোনো বিশেষ সম্রাট বা জাতির নিজের ক্ষমতার পরিচয় দানের ইচ্ছা। অপর জাতির শোষণ ও দমনের মধ্যে প্রভু জাতি ও তার সম্রাট আপন শৌর্য-বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখতে পেত।

এই মিল সত্ত্বেও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ আর প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ এক নয়। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস, তার প্রভুত্ব রাখার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি পররাজ্য গ্রাসের কারণ প্রাচীন কালের তুলনায় ভিন্নতর এবং জটিল। আধুনিক কালের সাম্রাজ্যবাদের যথোপযুক্ত সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন রুশ বিপ্লবের নেতা ভি. আই. লেনিন। তিনি তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের চরম স্তর' নামক গ্রন্থে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়ে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত ; (২) পুঁজিবাদের জাতীয় ভিত্তিক বিকাশ নিঃশেষ হলে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে পুঁজিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রূপ গ্রহণ করে ; (৩) সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ও পুঁজি কেন্দ্রীভূত হতে হতে গুটি-কয় একচেটিয়া অর্থনৈতিক পরিবার বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের করায়ত্ত হয়ে পড়ে ; (৪) কালক্রমে একচেটিয়া ব্যাঙ্কপুঁজি একচেটিয়া শিল্পপুঁজির সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থনৈতিক স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায় (৫) অধীনস্থ দেশে উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানির স্থলে পুঁজি

রপ্তানি ক্রমান্বয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ; (৬) বিভিন্ন সাম্রাজ্যের একচেটিয়া পুঁজিপতিগণ সম্মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বের সমস্ত দুর্বল জাতিকে শোষণ ও শাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার চেষ্টা করে। লেনিন মনে করতেন যে, পুঁজিবাদের এরূপ বিকাশ তার অর্থনীতির আভ্যন্তরিক সংকটের পরিচায়ক। যে পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসে এক সময়ে সম্ভাবনাময় অগ্রসর শক্তির কাজ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদের স্তরে সে পুঁজিবাদের বিকাশ-সম্ভাবনা নিঃশেষিত। সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজিবাদের সংকট অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকারী বিপ্লবী অবস্থার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আধুনিক কালের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়লেও তাদের অস্তিত্ব আজো বিলুপ্ত হয় নি। তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার নতুন নতুন কৌশল তারা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে।

Imperialism, the Highest Stage of Capitalism : 'সাম্রাজ্যবাদ : ধনতন্ত্রবাদের চরম স্তর'

ধনতন্ত্রবাদের উনবিংশ এবং বিংশ শতকের বিকাশের বিশ্লেষণমূলক যে গ্রন্থ লেনিন ১৯১৬ সনে রচনা করেন, সেই গ্রন্থের নাম 'ইম্পেরিয়ালিজম, দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম' বা সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রবাদের চরম স্তর'। ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে বিপ্লবী আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতৃত্বদানের জন্য লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনসমূহের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর পরবর্তীকালে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের বৈশিষ্ট্য এবং তার বিদ্যমান দ্বন্দ্বসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। (দ্র. Imperialism : সাম্রাজ্যবাদ)

Independence, Concept of Independence : স্বাধীনতা, স্বাধীনতার ধারণা

ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা : এই প্রত্যয়গুলির উদ্ভব এবং বিকাশ প্রধানত আধুনিক কালে। প্রাচীন কালেও মানুষ গোত্রবদ্ধ এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রবদ্ধভাবে গোত্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার অধীনে জীবন যাপন করেছে। রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সেকালের 'স্বাধীনতার' মধ্যে বর্তমানকালের আবেগের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নেও ব্যক্তি নিজেকে যতটা সমাজ বা রাষ্ট্রের অধীনে থাকার অনিবার্যতা স্বীকার করে নিত, ব্যক্তির নিজের অধিকার এবং স্বাধীনতা বোধের তত প্রকাশ ছিল না। প্রাচীন গ্রিসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে। এথেন্সের দার্শনিকগণ, বিশেষ করে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল একালে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রভৃতি প্রশ্নের দার্শনিক আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁদের দর্শনেও অধিক জোর ছিল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র বা সমাজের উপর ; ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতার উপর নয়। প্রাচীন ভারতীয় ও চীনা দর্শনে এই প্রবণতা অধিক প্রবল ছিল। ইউরোপে রিনাইসেন্স

বা নব জাগরণ বলে অভিহিত যুগের সূচনা থেকে চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতক থেকে ভূখণ্ড ও ভাষাভিত্তিক কেন্দ্রীয় শাসনবদ্ধ রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটি নতুন অর্থ লাভ করতে থাকে। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের চাইতে শৌর্যে-বীর্যে প্রধান এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কেবল শাসকের স্বাধীনতা এবং গৌরবের ব্যাপার নয়, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীরই আরাধ্য ব্যাপার, এরূপ ধারণা বিকশিত হতে থাকে। এরূপ ধারণার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে সমাজের অর্থনৈতিক রূপান্তর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্রম প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে ইউরোপে, ইতালি, ফরাসি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের পরে এই ধারণা অধিকতর সর্বজনীনতা প্রাপ্ত হয়। এইসঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতাবোধও বিকশিত হতে থাকে। কালক্রমে ভাষা, ধর্ম, ঐতিহাসিক একাত্মতাবোধ ইত্যাদি জাতি এবং রাষ্ট্রের প্রধান ঐক্যসূত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐক্যবোধেরই অপর নাম জাতীয়তাবাদ। এই সময় থেকে মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা প্রবল হতে থাকে যে, ভাষা-ধর্ম ঐতিহাসিক ঐক্যবোধসম্পন্ন মানুষের অধিকার আছে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বাধীন শাসন ও রাষ্ট্র তৈরি করার। আমেরিকার ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি অষ্টাদশ শতকে এরূপ ঐক্যবোধ থেকে 'আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র' নামক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলেও এরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্র তৈরি হতে থাকে।

Independence of Bangladesh : বাংলাদেশের স্বাধীনতা

ভারতীয় উপমহাদেশ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতক থেকে ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের প্রত্যক্ষ দখল এবং শাসনের অধীনে আসতে থাকে। ভারতবর্ষের প্রধান দখলদারি ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল ইংল্যাণ্ড। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে ইংরেজদের হাতে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও নিহত হওয়ার ঘটনাকে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষভাবে ইংল্যাণ্ডের শাসনাধীনে যাওয়ার একটি তারিখ বলে উল্লেখ করা হয়। সময় ও ঘটনার ক্রমবিকাশে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন অল্প থেকে অধিকে নানা ঘটনা ও আন্দোলনের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত সমাজের জটিলতা ক্রমান্বয়ে, বিদেশী শক্তির প্ররোচনা, সহায়তা এবং বিকাশমান ভারতীয় ধনিক সমাজ, যাদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াও কার্যকর ছিল, তাদের দুর্বলতায় প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতের ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িক, উচ্চবিত্ত এবং সামন্ততান্ত্রিক নেতৃবর্গ মুসলমান সমাজের অধিকারের কথা এবং ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করতে থাকেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই আত্মঘাতী বিভক্তি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনকে বিলম্বিত করে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইংরেজশক্তি ১৯৪৭ সনে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাদের ভারত ত্যাগের ভিত্তি হয় মুসলিম-প্রধান এলাকাসমূহ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্রের পত্তন।

কিন্তু আধুনিক কালে কোনো ধর্মের ভিত্তিতে, বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রধান দুটি অংশ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতায়, একটি সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় নীতি ও কাঠামোগত ক্ষমতা সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব-প্রধান পাকিস্তানের ছিল না। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংকীর্ণ এবং পূর্ববঙ্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নীতির কারণে পূর্ববঙ্গে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ১৯৫২ সনের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের পর থেকে তীব্র হতে থাকে। গোড়া থেকে স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যভাবে উচ্চারিত না হলেও ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের অনুভূতিকে দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা নিবৃত্ত করতে চায়। পালাক্রমে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সনের সংবিধানও বাতিল করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রদান সম্ভব নয়। এই কালের ইতিহাস পাঠে তা জানা যায়। ১৯৬৯ সনে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সর্বত্র, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, গণ জাগরণ শুরু হয়। এই গণ জাগরণই কালক্রমে ১৯৭১ সনে নানা ঘটনা এবং বিশেষ করে পাকিস্তান সরকারের সামরিক আক্রমণ এবং গণহত্যার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। এককালের আওয়ামী লীগের যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাহসিকতা, বারংবার কারা নির্যাতন ভোগ এবং সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। তিনি 'বঙ্গবন্ধু' বলে অভিহিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে আপস-আলোচনা ভেঙে দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু এবং মুসলমান, রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশ্বের প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন গোড়া থেকেই পূর্ববঙ্গের এই আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন প্রদান করে। দেশে দেশে পূর্ববঙ্গের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনকারী সংস্থাসমূহ গঠিত হতে থাকে। ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই ঘোষণার সূচনা অবশ্য ১৯৭১ সনের ৭ মার্চ ঢাকার বিপুল জনসমাগমসমৃদ্ধ সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা তথা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম', উচ্চারণের মধ্যে ছিল। এপ্রিল মাসে 'মুজিব নগরে' আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গোড়াতেই এই সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দান করেন এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মার্কিন সরকার এবং চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, গণহত্যা অব্যাহত রাখায় এবং পরিশেষে ভারতের উপর আক্রমণ করায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ডিসেম্বর '৭১-এ আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর তারিখে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর নিকট পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ভুটান, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

ব্যতীত অপরাপর অনেক রাষ্ট্র ডিসেম্বর, জানুয়ারি '৭২-এর মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের ক্রমপ্রসারের পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ধর্ম বনাম ভাষা : আধুনিক মানুষের জীবনে কোন্‌টি অধিক প্রবল শক্তি তার একটি বাস্তব বিতর্ক এবং দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে পাওয়া যায় বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অবশ্য ভাষার পেছনেও প্রধান শক্তি হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন : অর্থনৈতিক সমস্যা। সমাজে কোনো একটি উপাদান মাত্র কাজ করে না। আবার সকল উপাদান সকল সময়ে সমানভাবে শক্তিমান বলেও বোধ হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। ১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলের মানুষের জীবনে একটি নবতর পর্যায়ের সূচনা ঘটেছে। ১৯৭১ এর পরবর্তী ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়েও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপাদান পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কার্যরত রয়েছে। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরের গুটিকতক সশস্ত্র ব্যক্তির আকস্মিক আক্রমণে যে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন, পরবর্তীতে বিভিন্ন সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে যে সামরিক সরকার গঠিত হয় সেসব সরকার কর্তৃক রাজনীতি কখনো নিষিদ্ধকরণ এবং কখনো নিয়ন্ত্রিতভাবে গণতন্ত্র প্রদানের কথা উচ্চারণ, সংবিধানের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদকে কার্যত অস্বীকারকরণ, মধ্যপ্রাচ্যের অর্থানুকূল্যে ইসলামের ধর্মীয় মৌলবাদী ও রক্ষণশীলদের, সরকারি আনুকূল্যে, কার্যক্রমের বৃদ্ধি এ সকলই বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের জটিলতারই প্রকাশ।

Indian philosophy : ভারতীয় দর্শন

ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্ব ও তার ব্যাখ্যাকে প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় দর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন বিশ্বের প্রাচীনতম দর্শনসমূহের অন্যতম। খ্রিষ্টপূর্ব দশ কিংবা পনের শতকের ইতিহাসেও এই দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শনকে সাধারণত বেদান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য এবং যোগ এই ছটি শাখায় বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। অনেকে আবার সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে সনাতনী এবং অ-সনাতনী এই দুটি বিভাগে বিভক্ত করে দেখান। এই অভিমতে বেদান্তে, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য এবং যোগ এই আদি শাখাগুলি হচ্ছে সনাতনী শাখা। এর পরবর্তী বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক বা লোকায়ত শাখাগুলি হচ্ছে অ-সনাতনী ধারা। ভারতীয় দর্শনের এরূপ বিভাগকরণের কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও এ বিভাগ কৃত্রিম। কেননা বস্তুবাদী বা লোকায়ত চিন্তার উদ্ভব সনাতনী ধারার পরে ঘটেছে, এ কথা ঠিক নয়। আদিকাল থেকেই সনাতনী চিন্তাধারার বিরোধী চিন্তা হিসাবে বস্তুবাদী চিন্তা-ধারারও অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

ভারতীয় দর্শনের উল্লিখিত ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসাবে বলা যায়

১. বেদান্ত : বেদের অন্ত বা শেষ অর্থে 'বেদান্ত'। বেদের উপর উপনিষদের ব্যাখ্যা নিয়ে বেদান্ত তৈরি। ব্রহ্ম বা বিশ্বাত্মা কিংবা পরমাত্মা ও বিশেষ আত্মার তত্ত্ব বেদান্ত ধারার

বৈশিষ্ট্য। বস্তুত পরমাত্মা ও বিশেষ আত্মার যে ব্যাখ্যা উপনিষদসমূহে দেওয়া হয়েছে তার গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতেই পরবর্তী ভারতীয় দর্শনের ধারাগুলির বিকাশ ঘটেছে। উপনিষদে ধর্মের রহস্যমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলেও এর মধ্যে বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী চিন্তার যে বিরূপ সমালোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে এই পর্যায়ে জনসমাজে বস্তুবাদী চিন্তাও যে কিছুটা প্রভাবশালী ছিল তা বুঝতে পারা যায়।

২. মীমাংসা বেদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও সমস্যার আলোচনা নিয়ে মীমাংসা সৃষ্টি। মীমাংসার তত্ত্বগত তাৎপর্য তেমন কিছু আছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন না। তবে তাঁরা এ পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন। মীমাংসায় বেদকেই অবিনশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে। বেদই ভগবান। বেদের বাইরে কোনো ভগবানকে মীমাংসায় উল্লিখিত হতে দেখা যায় না।

৩. বৈশেষিক বিশেষ থেকে বৈশেষিক। বৈশেষিকের দর্শন অণুবাদী। ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম, মন সবই হচ্ছে বস্তু। এই সমস্ত বিশেষ বস্তু সম্মেলনেই সর্বপ্রকার বস্তুর সৃষ্টি। এমনকি আত্মা, স্থান, সময় ইত্যাকার সত্তাও মূল বস্তুর সম্মেলনের ফল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। বৈশেষিক এবং সাংখ্য উভয় ধারাতেই মনকে বস্তু এবং আত্মা থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪. ন্যায় : যুক্তি ও তর্কের পদ্ধতি নিয়ে তৈরি হয়েছে ন্যায়। ভারতীয় দর্শনের বিপুল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা-উপধারার মধ্যে তীব্র বিরোধ ও কূটতর্কের মাধ্যমে পরস্পরকে খণ্ডন করার চেষ্টা চলত। তার ফলে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র বিশ্বের প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত, সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত বলে বিবেচনা করা হয়। ন্যায়শাস্ত্রে পঞ্চস্তর বিশিষ্ট অনুমানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আরোহী অনুমানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা উপনয় এবং উপসংহার—এই পাঁচটি স্তরকে অনুমানের অঙ্গ বলে অভিহিত করা হতো। যুক্তির পদ্ধতি ব্যতীত ন্যায়ের অপর একটি তাত্ত্বিক মত হচ্ছে : ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদির সম্মেলনে বিশ্বলোক সৃষ্টির জন্য একটি আদি কারণের প্রয়োজন আছে। আর সেই আদি কারণই হচ্ছে ভগবান।

৫. সাংখ্য সংখ্যা থেকে থেকে সাংখ্য। তত্ত্বগতভাবে সাংখ্য অণুবাদী নয়। সাংখ্যর মতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি এবং পুরুষ-এর সহযোগে। প্রকৃতি হচ্ছে বস্তু আর পুরুষ হচ্ছে অচেতন আত্মা। আত্মার চেতনা ও মুক্তিলাভ প্রকৃতির বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে সম্ভব।

৬. যোগ সাধনার জন্য দেহ এবং মনের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে যোগ। সনাতনী এই ছটি ধারার প্রত্যেকেই যেমন বেদকে একমাত্র মান্য বলে স্বীকার করে তেমনি পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে আত্মার প্রশ্নেও তারা ঐকমত্য পোষণ করে।

৭. জৈনতত্ত্ব : অ-সনাতনী ধারার মধ্যে জৈনশাখা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বলে পরিচিত।

৮. বৌদ্ধবাদ বৌদ্ধবাদ সনাতনী সমস্ত ধারা থেকে আত্মার প্রশ্নে ভিন্ন তত্ত্ব পোষণ করে। বৌদ্ধবাদের মতে, ভগবান বা পরমাত্মা বলে কিছু নেই। আত্মা হচ্ছে বস্তুপুঞ্জের প্রবাহ। এই প্রবাহের অন্তরালে স্থির সত্তা বলে কিছু নেই। আত্মা হচ্ছে বস্তুপুঞ্জের প্রবাহ।

এই প্রবাহের অন্তরালে স্থির সত্তা বলে কিছু নেই। বস্তুত বৌদ্ধবাদের মতে, বিশ্বে স্থির বা নিত্য সত্তা বলে কিছু নেই। সবই অনিত্য। মানুষের অভিজ্ঞতা মুহূর্তের ঘটনার সমাহার ব্যতীত আর কিছু নয়।

৯. **বস্তুবাদ** পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকল ধারার শেষে বস্তুবাদ উদ্ভূত হয়েছে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। সমস্ত সনাতনী ও ভাববাদী ধারার প্রভাবকালেই তার প্রতিধারা হিসাবে বস্তুবাদী বা লোকায়ত চিন্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চারুবাক বা জনপ্রিয় তত্ত্ব হিসাবে চার্বাক মতের সমালোচনা সনাতনী শাখাগুলির প্রায়টির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন বস্তুবাদের প্রকাশ দেখা যায় প্রধানত অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং আত্মার প্রশ্নে। অস্তিত্ব বস্তুবাদের মতে মনসহ সব অস্তিত্বই বস্তু। বস্তুর সম্মেলনেই বস্তু গঠিত। জ্ঞান : অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরোক্ষ অনুমান একাবারে অসম্ভব না হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়। আত্মা : আত্মার পুনর্জন্মের কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই আত্মার পুনর্জন্ম ঘটে, এ তত্ত্ব গ্রহণ করা চলে না।

দশম শতাব্দীতে ইসলামের ভারতে আগমন ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজনের সূচনা করে। ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদী। ইসলামের প্রভাবে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনেও একেশ্বরবাদের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে কবীর পন্থা এবং শিখ ধর্মের উল্লেখ করা যায়।

ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে নতুনতর পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে আধুনিককালে ইংরেজ সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের ভারত আগমনের সঙ্গে। আধুনিক ইংরেজ ও ইউরোপীয় সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দক্ষতার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীগণ নিজেদের স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে শুরু করে। সনাতন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে আধুনিক পুঁজিবাদের বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এই পর্যায়ে জাতীয় মর্যাদা, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে নব্য শিক্ষিতদের পুরোধাদের মধ্যে যে চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাকে ভারতীয় দর্শনের আধুনিক পর্যায় বলা যায়। এই পুরোধাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, তিলক, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, মোহাম্মদ ইকবাল, সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কারুর মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের কিংবা নবতর উদার ধর্মের সৃষ্টি (ব্রাহ্ম সমাজ) এবং কারুর মধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় ভাববাদের সম্মেলন ঘটাবার প্রয়াসমূলক চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

Individual : ব্যক্তি

Individual and Society : ব্যক্তি ও সমাজ

১. ব্যক্তি বলতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক একক বা মানুষকে বুঝান হয়।
২. মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি হচ্ছে বুদ্ধি এবং আবেগের বিশিষ্ট প্রকাশ সমন্বিত চরিত্র।

ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। আবার সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব। সমাজের বাইরে ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয় বলেই একদিন সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সম্পর্কের বিষয়টি দর্শন ও সমাজতত্ত্বের একটি বিশেষ আলোচিত প্রশ্ন। কারণ, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতা অনস্বীকার্য হলেও ব্যক্তি বা সমাজ যুগ-নিরপেক্ষ কোনো সত্তা নয়। সমাজ বলতে মানুষের তৈরি একটা সংগঠনকে বুঝায়। এ সংগঠন যুগ থেকে যুগে পরিবর্তিত হয়। সমাজের একক ব্যক্তি বটে, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে না। বহু ব্যক্তির সম্মেলনে সৃষ্টি সমাজ ক্রমান্বয়ে একটা জটিল স্বাধীন অস্তিত্বময় সত্তা হিসাবে ইতিহাসে বিকাশ লাভ করেছে। সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় প্রধানত তার উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে। সম্পদের উৎপাদন জীবমাত্রেরই জীয়নকাঠি। সমাজের আদি অবস্থায় ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্কে কোনো বিরোধ থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে উৎপাদনের উপায় কিছু সংখ্যক লোকের কবলিত হওয়ায় কিছু সংখ্যকের উপর অধিক সংখ্যকের নির্ভরতার মধ্য দিয়ে আদিসমাজ বিরোধসম্পন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে যখন আইন ও রাষ্ট্র-কাঠামো তৈরি হয় তখন উৎপাদনের উপায়ের মালিক ব্যক্তি বা শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের নিজেদের স্বার্থকেই সমাজের অভিন্ন স্বার্থ বলে পরিচিত করে তোলে এবং তখন থেকে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক একটি বিরোধাত্মক সম্পর্ক বলে বোধ হতে থাকে। জীবিকার ক্ষেত্র যতদিন ব্যক্তির জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে এবং উৎপাদনের উপায় কবলিত করে রাখার মাধ্যমে কোনো শ্রেণী অপর শ্রেণীর ব্যক্তির উপর শোষণ ও প্রভুত্ব কায়েম রাখতে পারবে ততদিন ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিরোধাত্মক থাকা স্বাভাবিক। কেননা, এমন পর্যায়ে সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাঠামো কার্যত প্রভু-শ্রেণীসমূহের সমাজ বা মুখপাত্ররূপে শোষিত শ্রেণীসমূহের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই বলে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক চিরকাল এরূপ বিরোধাত্মক থাকবে তেমন ভাবাও সঙ্গত নয়। আসলে সমাজের উদ্ভব ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধের মাধ্যমে নয়। পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সমাজের সৃষ্টি। সমাজের বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দার্শনিকগণ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভবিষ্যতে একদিন যখন জীবিকার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সমাজে বিরোধাত্মক শ্রেণীসমূহের যেমন অস্তিত্ব থাকবে না, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক পরিপূর্ণরূপে পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ক বলে আবার প্রতিভাত হবে।

Individual, Particular & Universal : বিশিষ্ট, বিশেষ ও সার্বিক

জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু-জগৎকে জানার জন্য মানুষের তৈরি কয়েকটি দার্শনিক সূত্র। বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কের বিভিন্নতাকে এই সূত্রগুলির সাহায্যে মানুষ প্রকাশ করে। বস্তুজগতে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক সাদৃশ্য ও পার্থক্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়। একটি বস্তু বা ব্যক্তি অপর ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনায় যে কারণে পৃথক বলে চিহ্নিত হয় সে কারণ বা গুণকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে আমরা বিশিষ্ট বা বিশেষ বলি।

যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ বলতে এক কিংবা একাধিক সংখ্যাবাচক পদ বা বাক্যকে বুঝায় যেমন 'এই ঝুড়ির একটি আম কাঁচা' কিংবা 'এই ঝুড়ির অনেকগুলি আম কাঁচা' বাক্য দুটিকে বিশেষ বাক্য বলে।

বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য যেমন বস্তুকে বিশিষ্ট করে, তেমনি বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য বস্তুর কোনো গুণকে সার্বিক বলে চিহ্নিত করে। 'রাম, রহিম, বা লাল রং-এর কুকুরটি' পদগুলি বিশিষ্ট পদ। আবার রাম, রহিম, করিম প্রভৃতি ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে এই যে, তারা সকলেই মানুষ। সুতরাং তাদের মানুষ হওয়ার গুণটি বা মনুষ্যত্ব সার্বিক বা সাধারণ। যুক্তিবিদ্যায় সার্বিক বা সাধারণ পদ দ্বারা সেই সমস্ত গুণকে বুঝায় যে গুণ কোনো একটি জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিরাজিত। মানুষ বা মনুষ্যত্ব সার্বিক বা সাধারণ। কারণ মানুষ জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তির এই গুণ রয়েছে। 'একটি লাল কুকুর' বিশেষ বা বিশিষ্ট পদ। কিন্তু 'কুকুর' পদটি সার্বিক বা সাধারণ। কারণ কুকুর বলতে কুকুর জাতির অন্তর্গত সকল জীবকে বুঝায়।

বিশিষ্ট, বিশেষ এবং সার্বিক পদগুলি পরস্পর সম্পর্কিত। তথাপি সার্বিক বা সার্বিকতা বলতে কি বুঝায়, এটি দর্শনের একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। ইতিহাসগতভাবে বলা যায় যে, মানুষের মধ্যে সার্বিকতার বোধ প্রথমে উদ্ভব হয় বস্তুর সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য এবং কোনো গুণের পৌনঃপুনিক অস্তিত্বের প্রকাশ থেকে। কালক্রমে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য যে গুণের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে গুণের মূল কি? গুণটির কি নিজস্ব কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে না এটি মানুষের মনের কল্পনা বা বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ গুণের মানসিক বিশ্লেষণ? দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মানুষ' একটি সার্বিক পদ অর্থাৎ যাদের মানুষ হওয়ার গুণ আছে তারা সকলেই মানুষ। তা হলে মানুষ হওয়ার গুণ বা 'মনুষ্যত্ব' কি বিশেষ মানুষের বাইরের কোনো অস্তিত্ব? না 'মনুষ্যত্ব'টা মানুষের মনের একটি কল্পনা যার সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কোনো জীবকে মানুষ বলা হয়।

আদি গ্রিক দার্শনিকগণ 'সার্বিক' গুণকে এক প্রকার বিশেষ অস্তিত্বময় বস্তু বলে বিবেচনা করতেন। থেলিস-এর কাছে 'পানি' ছিল সার্বিক। কারণ তিনি মনে করতেন আর সব বস্তুর মধ্যে পানি আছে : পানির দ্বারাই সব বস্তু তৈরি। হেরাক্লিটাস মনে করতেন 'আগুন' হচ্ছে সার্বিক বস্তু। ডিমোক্রিটাস মনে করতেন 'অণু' হচ্ছে সার্বিক বস্তু বা সকল সৃষ্টির মূল।

কিন্তু প্লেটো তাঁর কূট যুক্তি দিয়ে বললেন, সার্বিক কোনো বিশেষ বস্তু হতে পারে না। সবার মধ্যে আছে বলে সার্বিক। কিন্তু সে নিজে বস্তু হিসাবে থাকলে বিশেষ হয়ে যায়। তাই সার্বিকের স্বাধীন অস্তিত্ব যেমন আছে তেমনি আবার সে বস্তু নয়। সার্বিক হচ্ছে স্বাধীন অস্তিত্বময় ভাব। এ্যারিস্টটল প্লেটোর মতকে পুরো স্বীকার করেন নি। তিনি সার্বিক গুণকে একদিকে বিভিন্ন বস্তুর বিশ্লেষণে মনের আহৃত গুণ বলে উল্লেখ করেছেন, আবার অপর দিকে এ গুণকে কেবল মনের নির্ভরশীল বা মনের কল্পনাতে পর্যবসিত করেন নি। সপ্তদশ শতকে ইংরেজ দার্শনিক লক সার্বিকতাকে মানুষের মনের বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রকাশ বলে আখ্যায়িত করে সার্বিক গুণের স্বাধীন অস্তিত্বকে একেবারেই অস্বীকার করেন।

বিশেষ ও সার্বিকের সম্পর্কটি দ্বন্দ্বমূলকভাবে বুঝা সঙ্গত। বস্তু-জগতের সামগ্রিকতা হচ্ছে 'সার্বিক'। এই সমগ্র বা সার্বিকের মধ্যে বিশেষ বস্তু একটির সঙ্গে আর একটি

সম্পর্কিত। সম্পর্কের অনিবার্য দুটি দিক হচ্ছে তার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, বিশিষ্টতা এবং সর্বজনীনতা। মানুষ বস্তুজগতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বস্তুর এই পারস্পরিকতা ও সামগ্রিকতাকে যত বুঝতে সক্ষম হয়েছে তত সে তার মধ্যে বিশেষ ও সার্বিককে মানসিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

Individualism : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ইউরোপে মধ্যযুগের পরবর্তীকালে নিরঙ্কুশ শক্তিসম্পন্ন রাজা বা সরকারকে রাষ্ট্রের প্রতিভূ বিবেচনা করে রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা, অধিকার প্রভৃতির পক্ষে যুক্তিমূলক তত্ত্বকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বলে অভিহিত করা হয়। এই পটভূমিতে এমন কথাও বলা হয় যে, কোনো একটি সমাজে ব্যক্তি হচ্ছে সার্বভৌম, সরকার তথা রাষ্ট্র নয়। ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতকে এবং ফরাসি দেশে অষ্টাদশ শতকে এই তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা দেখা যায়। রাষ্ট্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে? রাষ্ট্রচিন্তার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে বলা হতে থাকে, ঈশ্বর কিংবা রাজা নয়। রাষ্ট্র উদ্ভূত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের আদি বা প্রাকৃতিক অবস্থাতে সার্বভৌম ব্যক্তির সঙ্গে সার্বভৌম ব্যক্তির চুক্তির ভিত্তিতে। এই তত্ত্ব 'সোস্যাল কনট্রাস্ট থিওরি' বা 'সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব' নামে পরিচিত। ইংল্যাণ্ডের টমাস হবস এবং জন লক সপ্তদশ শতকে এবং ফ্রান্সের রুশো অষ্টাদশ শতকে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ যথা 'লেভিয়াথান', 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেণ্ট' এবং 'সোস্যাল কণ্ট্রাক্ট'-এ রাষ্ট্রের উদ্ভব, সরকারের ভূমিকা এবং ব্যক্তির অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নের উপর 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত চিন্তাবিদের চিন্তায় এবং একালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ছিল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বোধের প্রকাশ। আসলে এই কাল ছিল সামন্ততান্ত্রিক পর্যায় থেকে ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে সমাজের বিকাশ কাল। নতুন উদীয়মান ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকারের ঘোষণাই ছিল ইংল্যাণ্ডের ১৬৪৯ এবং ১৬৮৮ সালের বিপ্লবাত্মক ঘটনাসমূহ, আমেরিকার ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য। সেই সময় থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তত্ত্বেরও বিকাশ ঘটেছে। গোড়াকার সেই আমলের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্র এবং সরকারকে ব্যক্তির বিরোধী অস্তিত্ব বলে বিবেচনা করত। এবং সে কারণে ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্র এবং সরকারের যত কম হস্তক্ষেপ ঘটে, তত মঙ্গল বলে মনে করা হতো। রাষ্ট্র বা সরকার ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা এবং বাইরের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করবে। এর অধিক কোনো দায়িত্ব ব্যক্তি রাষ্ট্র বা সরকারকে প্রদান করে নি। এ চিন্তার মধ্যে জোর ছিল ব্যক্তির সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে তার অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তার উপর। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে অবাধ প্রতিযোগিতার একটি তাত্ত্বিক ভূমিকা একালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পালন করে। হবস, লক এবং রুশোর পরে হার্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তার অন্তর্নিহিত সামাজিক সমস্যার ক্রমবৃদ্ধি চিন্তাবিদদের মধ্যে আবার এই

বোধেরও সৃষ্টি করতে থাকে যে, রাষ্ট্র বা সরকার বনাম ব্যক্তি বোধটি বিদ্যমান সামাজিক সমস্যার চরিত্র অনুধাবনে এবং তার সমাধানে যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র এবং সরকার যেমন ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি, তেমনি ব্যক্তির জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকে বাঞ্ছিত বলে গণ্য করা যায় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এরূপ ব্যাখ্যার সাক্ষাৎ বেনথাম, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং টি.এইচ. গ্রীন প্রমুখের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। এরূপ ব্যাখ্যাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা উদারতাবাদের সংশোধন বলেও অনেক সময়ে আখ্যায়িত করা হয়। (দ্র. Social Contract : সামাজিক চুক্তি ; Green : গ্রীন, Utilitarianism : উপযোগবাদ প্রভৃতি)

Induction : আরোহ

Inductive Method : আরোহী পদ্ধতি

জ্ঞান আহরণের দুটি পদ্ধতি প্রধান। একটি অবরোহী। অপরটি আরোহী। অবরোহীতে কোনো সাধারণ সত্যের সাহায্যে কোনো বিশেষের জ্ঞান আমরা লাভ করি। আরোহীর ক্ষেত্রে বিশেষের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা একটি সাধারণ বা সার্বিক সত্যে উপনীত হই।

ইউরোপীয় দর্শনে জ্ঞান ও যুক্তির পদ্ধতি প্রথমে বিশ্লেষণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এ্যারিস্টটল। এ্যারিস্টটলের পরে আরোহী পদ্ধতির বিকাশ ঘটে আধুনিককালে প্রধানত ফ্রান্সিস বেকন, গেলিলিও, নিউটন, মিল প্রমুখ বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের হাতে। জ্ঞানের আরোহী পদ্ধতির বিকাশ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ যেমন সহজতর করেছে তেমনি বিজ্ঞানের বিকাশ আরোহী পদ্ধতিকে সুবিস্তারিত এবং সঠিক করে তুলেছে।

সাধারণত আরোহী যুক্তি বা অনুমানকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয় (১) পূর্ণাঙ্গ আরোহ, (২) আংশিক আরোহ ও সাধারণ আরোহ, (৩) বৈজ্ঞানিক আরোহ।

পূর্ণাঙ্গ আরোহ বলতে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যেকটির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বুঝানো হয়। পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণতার ভিত্তিতে এই অনুমানকে পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। একটি বিদ্যায়তনের প্রত্যেকটি ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ করে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, উক্ত বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র বাংলা ভাষাভাষী তা হলে এই অনুমানটি পূর্ণাঙ্গ আরোহী অনুমান হবে। কারণ বিদ্যায়তনের সকল ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে। এমন অনুমানের সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিশ্চিত। কিন্তু এরূপ অনুমান কেবলমাত্র তেমন ক্ষেত্রেই সম্ভব যেখানে পরীক্ষণীয় বা বিবেচ্য বস্তু বা বিষয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। পূর্ণাঙ্গ অনুমানের বিপরীত হচ্ছে অপূর্ণাঙ্গ অনুমান। একটি স্কুলের কয়েকটি মাত্র ছাত্রকে পরীক্ষা করে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এই স্কুলের সকল ছাত্র বুদ্ধিমান কিংবা ইংরেজ জাতির কিছু সংখ্যক লোকের পরিচয় পেয়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ইংরেজ জাতি পরিশ্রমী অর্থাৎ সকল ইংরেজ পরিশ্রমী, তা হলে সিদ্ধান্তটি অ-পূর্ণাঙ্গ অনুমানের দৃষ্টান্ত হবে। এখানে বিবেচ্য বিষয়ের সকলকে পর্যবেক্ষণ করা হয় নি। এরূপ অনুমানের সংখ্যাই

অধিক। মানুষ এই পদ্ধতিতে সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে অপূর্ণাঙ্গ অনুমানকে সাধারণ বা জনপ্রিয় আরোহী অনুমান বলে অভিহিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক আরোহেও আংশিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন রাম মরেছে, রহিম মরেছে, জালাল মরেছে, সুতরাং সকল মানুষ মরবে বা সকল মানুষ মরণশীল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং শর্ত হচ্ছে এই যে, অ-পূর্ণাঙ্গ অনুমান যেখানে পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলির মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে করা হয়, সেখানে বৈজ্ঞানিক আরোহে পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কারণে বৈজ্ঞানিক অনুমানে পর্যবেক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা কম বা আংশিক হলেও সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত।

জ্ঞানের জন্য বৈজ্ঞানিক আরোহই প্রধান উপায়। বৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে পর্যবেক্ষণের বিষয় বা বস্তুর মধ্যে অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা। প্রচলিত যুক্তিবিদ্যায় এই সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য আরোহী অনুমানের কয়েকটি পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিগুলিকে আরোহী পদ্ধতি বা আরোহী অনুমানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণভাবে এরূপ পদ্ধতির সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটি। ১. অন্বয়ী বা সাদৃশ্যপদ্ধতি বিবেচিত বিষয়ের মধ্যে একাধিক গুণের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সকলের সম্পর্কে অনুমান। ২. ব্যতিরেকে পদ্ধতি বিবেচিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট গুণের ক্ষেত্রে পার্থক্যের ভিত্তিতে বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৩. সাদৃশ্য ও ব্যতিরেকের সংযোগে গঠিত যুক্তপদ্ধতি। ৪. সহপরিবর্তন পদ্ধতি বিবেচিত বিষয়ের একটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর কারুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হতে দেখলে উভয় কার্যকারণ রূপে সম্পর্কিত বলে অনুমান গ্রহণ। ৫. অবশেষ পদ্ধতি কোনো বিষয়ের এক অংশ যদি অপর কোনো অংশের কারণ বলে আমাদের জানা থাকে তা হলে তার ভিত্তিতে এই বিষয়ের অবশিষ্ট অংশকে অপর বিষয়ের অবশিষ্ট অংশের কারণ বলে অনুমান করা।

অবরোহ অনুমানে আমরা সাধারণ বা সার্বিক সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হই এবং আরোহ অনুমানে বিশেষ থেকে সার্বিকের দিকে অগ্রসর হই বলে এরূপ মনে হতে পারে যে, অবরোহ এবং আরোহ পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু তা ঠিক নয়। বস্তুত, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবরোহ এবং আরোহ হচ্ছে পরস্পর-সম্পর্কিত এবং পরিপূরক পদ্ধতি।

Inference : অনুমান

যুক্তির ক্ষেত্রে এক কিংবা একাধিক যৌক্তিক বাক্যের মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে অনুমান বলা হয়। অনুমান প্রধানত অবরোহ এবং আরোহ অনুমান হিসাবে বিভক্ত।

অবরোহ অনুমানের মধ্যে এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার সিলোজিজম বা দুটি যৌক্তিক বাক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রধান বলে মনে করা হয়। সকল মানুষ মরণশীল, সক্রেটিস একজন মানুষ ; সুতরাং মরণশীল—এটি সিলোজিজমের একটি প্রচলিত দৃষ্টান্ত।

এরূপ অনুমানের মূল ভিত্তিকে এ্যারিস্টটলের 'ডিকটাম ডি অমনি এট নালো' বলে উল্লেখ করা হয়। এ্যারিস্টটলের এই বিধান অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে একটি শ্রেণী বা জাতি সম্পর্কে যে কথা সত্য, উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কেও সে কথা অনুরূপভাবে সত্য। অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে যুক্তির কাঠামোর মধ্যে গৃহীত বাক্য বা বিবৃতির সত্যতার উপর। গৃহীত হেতু বা যৌক্তিক বাক্য যদি সত্য হয় তা হলে সিদ্ধান্ত সত্য হবে। অবরোহ অনুমান তাই যুক্তির কাঠামোগত সঙ্গতি বা আঙ্গিক সত্যতার উপর অধিক জোর দেয়। এই সঙ্গতি বিধানের জন্য যুক্তিবিদগণ অনুমানের কতকগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য : ১. একটি যুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত পদ বা শব্দকে একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করতে হবে, একাধিক অর্থে নয়। ২. একটি যুক্তির মধ্যে যদি না বাচক বাক্য থাকে তবে তার সংখ্যা একের অধিক হতে পারবে না। ৩. মধ্য পদের মাধ্যমে যুক্তির প্রধান ও অপ্রধান পদকে সম্পর্কিত হতে হবে। এই নিয়মগুলি পালন করে যুক্তি গঠন করলে সে যুক্তি সঙ্গতিসম্পন্ন হবে। কিন্তু কার্যত মানুষ নিয়মগুলি পালনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে না বলে অনেক সময় যুক্তিতে পরস্পরবিরোধী এবং অসঙ্গতিপূর্ণ বাক্য এবং সিদ্ধান্তের ব্যবহার দেখা যায়।

Infinite and Finite : অসীম এবং সসীম

বস্তুজগৎকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি সূত্র। দর্শনের ইতিহাসে অসীম ও সসীম ভাব দুটি বিশেষ বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। অনেক দার্শনিকের মতে অসীম ও সসীমের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার সমস্যা একটি চিরন্তন সমস্যা এবং এর কোনো সমাধান সম্ভব নয়। অনেকে আবার অসীমকে একেবারে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে মানুষ অভিজ্ঞতায় কেবল সসীমকেই পায়, অসীমকে নয়। এ কারণে অসীম বলে কিছু আছে বলে মানুষ দাবি করতে পারে না।

অসীমের ধারণা মানুষ তার জীবনের শুরুতে করতে পারে নি। অসীমের ধারণা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করে নি। সসীম বা খণ্ডবস্তুর সঙ্গেই তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু খণ্ডবস্তুর অভিজ্ঞতা যত বিস্তারলাভ করতে থাকে তত মানুষের মনে বস্তু ও বিশ্বজগতের ব্যাপকতার বোধ জাগ্রত হতে থাকে। এই ব্যাপকতা বোধ থেকেই মানুষের মনে অসীম ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। 'অসীম' মানুষের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নয়। 'অসীম' একটি যৌক্তিক ভাব। বস্তুকে সসীম ভাবা যায় না বলেই মানুষকে অসীমের কল্পনা করতে হবে। খণ্ডবস্তুর সঙ্গে মানুষের পরিচয়। সমস্ত খণ্ডবস্তু নিয়ে অখণ্ড বিশ্ববস্তু। কিন্তু এমন চিন্তা করা যায় না যে, কাল বা স্থানের মধ্যে এই অখণ্ড বিশ্ববস্তুর কোনো সীমানা আছে। যদি তেমন কোনো সীমানা থাকে তা হলে সেই সীমানার বাইরে বিস্তারিত যা তার চরিত্র নির্ধারণ করতে হয়। সীমানার বাইরে যা তা নিশ্চয়ই কোনো অস্তিত্ব। কেননা, অস্তিত্বহীনতার মধ্যে কোনো অস্তিত্ব বিরাজ করতে পারে না। নিরেট শূন্য বা নাস্তিত্ব বলে কিছু থাকতে পারে না। নাস্তিত্বের মধ্য থেকে কোনো অস্তিত্ব আবির্ভূত হতে পারে না। কাজেই বস্তুর কোনো সীমানা নির্দিষ্ট করলে তার বাইরে সীমানাহীনতাও একটা অস্তিত্ব। আর তা বস্তু ছাড়া কিছু হতে

পারে না। বস্তু ছাড়া কোনো অস্তিত্বের কল্পনা বিজ্ঞান করে না। এ কারণে বস্তুর সীমানার বাইরেও বস্তু। অর্থাৎ বস্তু সীমাহীন ও সময়হীন। বস্তুর মধ্যে সীমা আছে অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বস্তুপুঞ্জ দিয়েই বস্তু গঠিত ; কিন্তু সমগ্র বস্তুর কোনো সীমা নেই। বস্তুর সময় নেই অর্থাৎ বস্তু কোনো এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শূন্যতা ছিল এমন কল্পনাও বৈজ্ঞানিকভাবে করা সম্ভব নয়। কিন্তু খণ্ডবস্তুর সময় আছে, পরিবর্তন আছে। খণ্ডবস্তুর জন্ম ও পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা চলে। কিন্তু সমগ্র বস্তুর নয়। এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সসীম হচ্ছে একটি আপেক্ষিক ধারণা এবং অসীম ও সসীমের সম্পর্ক হচ্ছে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। সসীম নিয়েই অসীম তৈরি। কিন্তু সে কারণে অসীমকে সসীম বলা যায় না। আবার কোনো সসীমই অপর সসীম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। খণ্ডবস্তুর সঙ্গে খণ্ডবস্তুর সম্পর্ক একটি খণ্ডবস্তুর সসীমতা যেমন নির্দিষ্ট করে তেমনি আবার এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাকে অসীমের অংশ করে অসীমের কল্পনাকে সম্ভব করে তোলে। অসীম ও সসীমের এই পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে আধুনিককালে হেগেলের দর্শনে এবং তাঁর পরবর্তীকালে মার্কসবাদী দর্শনে পাওয়া যায়।

ধর্ম অবশ্য অসীমকে বস্তু বলে কল্পনা করে না। ধর্মীয় বিশ্বাসে বস্তুজগৎ হচ্ছে সসীম, কিন্তু বস্তুজগতের স্রষ্টা যিনি তিনি যেমন অ-বস্তু তেমনি অসীম। ধর্মের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই যে, সেই অসীম অ-বস্তুকে বস্তুগত গুণ বা ধারণা ছাড়া অপর কিছুর দ্বারা ধর্ম প্রকাশ করতে পারে না। ধর্মীয় অসীম অ-বস্তু হলেও তাঁর দয়ামায়া, দণ্ডদানের এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষমতা আছে। ধর্মীয় অসীমের মধ্যে মানুষ মাত্রেরই অসীমবোধের একটা প্রয়োজনীয়তার যেমন স্বীকৃতি আছে তেমনি সে ব্যাখ্যা রহস্যময় হয়ে সসীম ও অসীম উভয়ের বৈজ্ঞানিক ধারণার বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

Innate Ideas : সহজাত ভাব

ভাববাদী দর্শনের মতে মানুষের মনের ভাব বা ধারণা দুরকমের। ১. অভিজ্ঞতাগত ভাব ; ২. জন্মগত বা সহজাত ভাব।

সহজাত বা জন্মগত ভাব বলতে ভাববাদী দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, মানুষের মনের সব ভাব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত নয়। তার মনে এমন কতকগুলি ভাব থাকে যেগুলি তার জন্মগত। এগুলিকে মানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করে না। এঁদের মতে ধর্ম, নীতি, ন্যায়শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি এরূপ জন্মগত ভাবের ভিত্তিতে গঠিত। সংখ্যা কিংবা ২+২ = ৪, ঈশ্বর, ধর্ম কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের বিধান বা সময়, স্থান ইত্যাদির ধারণা মানুষের সহজাত ধারণা। সহজাত ধারণার অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করে তাদের মতে সহজাত ধারণা যেমন সার্বিক অর্থাৎ স্বভাবস্বীকৃত, তেমনি সেগুলি সত্য এবং অনিবার্য। সত্য, কেননা মানুষের মন এগুলি অসত্য বলে কল্পনা করতে পারে না। এগুলি অসত্য হলে বিশ্ব-জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত বলতেন 'আমি চিন্তা করি'—এটি এমন একটি ধারণা যাকে মানুষ আদৌ সন্দেহ বা অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, মানুষের সন্দেহ করাটাও একটা চিন্তার প্রকাশ। সন্দেহের অতীত এই ধারণা

মানুষের জন্মগত। এই ধারণার মূল ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞানরাজ্য গঠিত। সহজাত ধারণা অনিবার্য। কারণ, সহজাত ধারণা ব্যতীত মানুষের জ্ঞানজগৎ অকল্পনীয় হয়ে পড়ে।

ভাবের উদ্ভব এবং প্রকারভেদ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ 'সহজাত ধারণাগুলিকে' মানুষের মনের বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতার এবং যুগ যুগব্যাপী অভিজ্ঞতার পরিফল বলে মনে করেন। এগুলিকে আদিকাল থেকে সহজাত বলে স্বীকার করেন না। ভাবের উৎস সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের কারণেই বহু পরীক্ষিত এবং বহু অভিজ্ঞতায় লব্ধ আপাতসহজ এবং সন্দেহের অতীত ভাবকে মানুষ স্বতঃসিদ্ধ এবং সহজাত বলে মনে করে। মানুষ ভাবের আকর। মানুষের সঙ্গে বস্তুজগতের নিয়ত প্রবহমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষের মনে বস্তু সম্পর্কে ভাবের সৃষ্টি হয়। বস্তুবাদীদের মতে সকল প্রকার ভাব সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য।

Inhibition : বাধা

'ইনহিবিশন' বা বাধা মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। ব্যক্তির চরিত্র বিভিন্ন প্রকার কামনা বাসনা দিয়ে গঠিত। কিন্তু ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ তার সকল কামনা পূরণ করার সুযোগ দেয় না। সমাজের নিকট ব্যক্তির যে ইচ্ছাগুলি অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হয় সমাজ সে ইচ্ছাগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা বা বাসনা মাত্রই একটা শক্তি। তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও সে বিনা প্রতিরোধে নিরুদ্ধ হয়ে যায় না। সামাজিক আইন কানুন, বিধিনিষেধ ব্যক্তির মনে বিবেক বা সচেতন প্রহরীর রূপ গ্রহণ করে। একে আমরা চেতনাও বলতে পারি। ব্যক্তির বিবেক বা চেতনা নিষিদ্ধ বাসনার আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করে। অপরদিকে 'নিষিদ্ধ' বাসনাও আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে চরিতার্থতার পথ অন্বেষণ করে। এই নিষিদ্ধ বাসনা এবং তাদের চরিতার্থতা লাভের প্রয়াসকে মনোবিজ্ঞানের বাধা বা ইনহিবিশন বলে আখ্যাত করা হয়।

Inquisition : নির্দয় ধর্মীয় বিচার

'ইনকুইজিশন' শব্দের অর্থ 'বিচারের জন্য অনুসন্ধান' হলেও ইউরোপের ইতিহাসে ইনকুইজিশন বলতে ধর্মান্ধতার যুগে ধর্মীয় প্রতিপক্ষ কিংবা ধর্মীয় গোড়া সংস্কার ও বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও নির্দয় বিচার ব্যবস্থাকে বুঝায়। ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারের সূচনা ঘটে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। খ্রিষ্টীয় যাজকগণ যাদেরকে অবিশ্বাসী বা খ্রিষ্টীয় ধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করত তাদের বিচার করার জন্য অনুসন্ধানকারী এবং একদল বিচারক নিযুক্ত করত। খ্রিষ্টীয় যাজকদের এই বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের খ্রিষ্টীয় সম্রাটগণ অনুমোদন করেন। যারা খ্রিষ্টানধর্ম পরিত্যাগ করে অপর কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করত তাদের বিরুদ্ধেও 'ইনকুইজিশন' ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হতো। গোড়ার দিকে ধর্মত্যাগী কিংবা অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে স্বীকারোক্তি আদায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া দৈহিক নিপীড়ন প্রয়োগ করা না হলেও ক্রমান্বয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখা, নির্মম অত্যাচার এবং অভিযুক্তকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করা 'ইনকুইজিশনের' অংশ

হয়ে দাঁড়ায়। এ বিচার ব্যবস্থায় অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হতো না। দুজন লোকের গোপন অভিযোগের ভিত্তিতে যে-কোনো নাগরিককে এই ধর্মান্ধ বিচারকদের নিকট সোপর্দ করে তাকে দণ্ডিত করা যেত। ইনকুইজিশনের চরম রূপ গ্রহণ করে স্পেনে পঞ্চদশ শতকে। স্পেনীয় ইনকুইজিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত কিংবা ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করত তারা। স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড এবং রানী ইসাবেলা যাকে প্রথম ইনকুইজিটার বা প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন সে তার কার্যকালে দু'হাজার লোককে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেছিল। ইনকুইজিশনের আতঙ্কে মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষকগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে কিংবা মতামত প্রকাশ করতে সাহস পেত না। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। অনেক চিন্তাবিদ এবং মুক্তবুদ্ধির মানুষকে এই ধর্মীয় বিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এঁদের মধ্যে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা গিওর্দানো ব্রুনোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর যুক্তিবাদী ও স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁকে ইনকুইজিশনের হুকুমে ১৬০০ সনে রোম শহরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

Insanity : বাতুলতা, পাগলামি, মানসিক অসুস্থতা

মানসিক অসুস্থতা কিংবা পাগলামির সূচনা বা উহার সীমা নির্দিষ্ট করে সংজ্ঞাদান কঠিন। কারণ মানসিক অসুস্থতা কেবল মন কিংবা কেবল দেহের ব্যাপার নয়। মানসিক রোগ বা অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ ব্যক্তির জাগতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণক্ষমতার হ্রাস কিংবা অভাব। জাগতিক উদ্দীপকের জবাবে মানুষ যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সে সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা পারম্পর্য এবং সম্পর্ক বিদ্যমান। এই পারম্পর্য এবং সম্পর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি বা বিবেচনার ফল। ব্যক্তির মন বা মস্তিষ্ক কেন্দ্রীয়ভাবে সমস্ত উদ্দীপকের বিবেচনা করে এবং তার জবাবে নিজের জীবন ও স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাব ঘটলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ামূলক জবাবের মধ্যে আর শৃঙ্খলা, ভারসাম্য এবং আত্মস্বার্থমূলক চিন্তার লক্ষণ থাকে না। অবশ্য শৃঙ্খলা, ভারসাম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি আপেক্ষিক। ব্যক্তির সামাজিক আচরণের যদি কোনো আদর্শ মান স্থির করে তাকে 'স্বাভাবিক' বলা যায় তা হলে তার বিচারে যে-কোনো ব্যক্তির কোনো-না-কোনো আচরণকে 'অস্বাভাবিক' বলা যাবে। এজন্য পাগলামি কিংবা মানসিক রোগের লক্ষণ যদি 'অস্বাভাবিক' আচরণ হয় তা হলে মানুষমাত্রই আপেক্ষিকভাবে কম কিংবা অধিক পরিমাণে অস্বাভাবিক অর্থাৎ পাগল। সাধারণত যে ব্যক্তির আচরণ সমাজের অপর দশজনের চোখে অত্যধিক অস্বাভাবিক বলে বোধ হয় তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

পাগলামির কারণের গবেষণা চিকিৎসা শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানে দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির পূর্বে সাধারণ ধারণা ছিল যে পাগলামির কারণ অতি-প্রাকৃতিক এবং দেহের বাইরের কোনো অশরিরী অশুভ শক্তি ব্যক্তির উপর ভর করে তার সমস্ত আচরণ অস্বাভাবিক করে তোলে। এ কারণে অতীতে পাগলামি থেকে রোগীকে নিরাময় করার প্রধান পদ্ধতি হিসাবে মানুষ জাদু, মন্ত্র ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। পরবর্তীকালে

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষয় কিংবা ক্ষতির মধ্যে নির্ধারিত করার চেষ্টা করা হয়। চিকিৎসকগণ বলেন যে, মস্তিষ্কের করটেক্স বা বহিঃস্তরে আঘাতের ফলে কিংবা বিষাক্ত রক্তের কারণে কোনো ক্ষতি সাধিত হলে ব্যক্তির চেতনায়ও নানা প্রকার বিভ্রান্তি বা বিকারের সৃষ্টি হয়। এরূপ বিকারকেই মানসিক রোগ বলা হয়। আসলে মানসিক বা মনের রোগ বলে কিছু নেই। সবই ঘটে দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতির ফলে। কিন্তু এই অভিমত মনোবিজ্ঞানীগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন না। মনোবিজ্ঞানে মনের অস্তিত্বের উপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তিনি মানসিক রোগের উপর গবেষণা করেন এবং তাঁর গবেষণার তত্ত্ব মনোসমীক্ষণ বলে পরিচিত। ফ্রয়েড এই অভিমত পোষণ করেন যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি মস্তিষ্কের কোষসমূহ স্বাভাবিক থাকলেও মানসিক বিকারের উদ্ভব ঘটতে পারে। এর কারণ মানুষের মন আছে এবং মন হচ্ছে মানুষের জীবনযাপনের এবং সুখলাভের জন্য কামনা বাসনার সমষ্টি। মানুষের মন চেতন এবং অচেতনে বিভক্ত। (দ্র.unconscious অচেতন) সামাজিকভাবে অবাঞ্ছিত কামনা নিয়ে 'অচেতন' তৈরি। 'অচেতন' ভাগের আত্মতৃপ্তি লাভের প্রচেষ্টা এবং সচেতন মনের তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়াসে মানুষের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা ব্যক্তির চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে ব্যক্তিকে মানসিক রোগীতে পরিণত করে ফেলে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ফ্রয়েড তাই মানসিক রোগের নিরাময়ের জন্য দেহের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ঔষধযোগে নিরাময়ের পরিবর্তে মনের দ্বন্দ্ব নিরসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। এই উপায়ের মধ্যে ক্যাথারসিস বা বিমোক্ষণ অন্যতম।

পাগলামির প্রধান লক্ষণ হিসাবে ব্যক্তির মধ্যে ডেল্যুশন বা বিশ্বাসভ্রম, হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টিভ্রম, অপরকে অকারণে দৈহিকভাবে আঘাত কিংবা নিজের আত্মহত্যার চেষ্টা প্রভৃতি আবেগমূলক আচরণ উল্লেখ করা যায়। রোগের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে, রোগী কোনো বিষয়ের ওপর সামান্যমাত্র মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে না। সে প্রতিমুহূর্তে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাবার প্রবণতা দেখায়। আবার এমনও হতে পারে যে, রোগী আপাতঃদৃষ্টিতে এত গভীরভাবে আত্মবিলীন হয়ে থাকে যে তার মনোযোগ কোনো উদ্দীপক দ্বারাই আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় না। স্মৃতি-ভ্রংশ কিংবা স্মৃতির পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাওয়া মানসিক রোগের অপর একটি সাধারণ রক্ষণ। মানসিক রোগের মূলে দৈহিক কোনো ক্ষতি থাকে কিনা সে সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই বলা চলে মানসিক অসুস্থতা নানাপ্রকার দৈহিক অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে। মানসিক বিকার রোগীর নিদ্রাল্পতা বা নিদ্রাহীনতা, ধমনীর দ্রুতগতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রোগীর নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

Instinct : সহজাত প্রবৃত্তি, সহজ প্রতিক্রিয়া, অচেতন প্রতিক্রিয়া

উত্তেজনা অর্থাৎ পরিবেশের সংস্পর্শে প্রাণীমাত্রেরই একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে। উত্তেজকের জবাবে প্রাণী তার দেহের সাড়া দেয়। উন্নত বা জটিল প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া প্রধানত দুরকমের অচেতন এবং সচেতন। নিম্নতর প্রাণীর মধ্যে অচেতন

প্রতিক্রিয়ার পরিমাণই অধিক। কীট-পতঙ্গ অতি নিম্নমানের প্রাণী। জীবন রক্ষার জন্য পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলতে হয়। এ জন্য তাদের বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয় ; কিন্তু এ সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিবেচনাসম্পন্ন চিন্তা আছে বলে আমরা মনে করি নে। এ জন্যই এরূপ প্রতিক্রিয়াকে প্রাণীর অচেতন, প্রাথমিক কিংবা সহজাত প্রতিক্রিয়া বলা হয়। মানুষের ব্যবহারের প্রধান ভাগ সচেতন। কিন্তু ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়ার একটা ভাগ অচেতন বা সহজাত সাড়া দিয়ে গঠিত। আঙুলের ডগায় সুচ ফুটলে বা প্রজ্জ্বলিত দীপকাঠি স্পর্শ করলে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই অবিলম্বে নিজের হাত সরিয়ে নেয়। চোখে তীব্র আলোর প্রক্ষেপ ঘটলে আমাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। কোনো উত্তেজকের জবাবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এরূপ প্রতিক্রিয়াকে সহজাত প্রতিক্রিয়া বলা হয়। রুশ মনোবিজ্ঞানী পাভলভের মতে মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত অণুক্রিয়া বা আনকনডিশন্ড্ রিফ্লেক্স এ্যাকশন। তাঁর মতে অণুক্রিয়া বলতে উত্তেজকের জবাবে দেহের অঙ্গাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে পাল্টা ক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেই আচরণকে বুঝায়। অণুক্রিয়াকে যে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করে 'নিয়ন্ত্রিত অণুক্রিয়া' বা কনডিশণ্ড রিফ্লেক্সের সৃষ্টি করা যায় তা তাঁর কুকুরের বিখ্যাত পরীক্ষায় প্রমাণ করেন।

সহজাত প্রতিক্রিয়া অভিজ্ঞতাপূর্ব। কোনো প্রাণীর পক্ষে একে শিক্ষা করার আবশ্যক হয় না। বাবুই পাখির বাচ্চা ভিন্নতর পরিবেশে পালিত হলেও সে তার জাতির অন্যান্য পাখির ন্যায়ই বাসা বানাতে পারবে। এই মত অনুযায়ী সহজাত এবং সচেতন ব্যবহার পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু অনেকে সহজাত এবং সচেতন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগহীন বিরোধিতার কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যা আজ সহজাত বলে মনে হচ্ছে সে আচরণ যুগ যুগব্যাপী সচেতন পূর্বশিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হতে পারে। মানুষের হাঁটার ছন্দটি পরিণত বয়সে সহজাত বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু শিশুকালে তাকে হাঁটতে শিখতে হয়েছে। সেই দীর্ঘ পরিচর্যার ফলে তার হাঁটার ছন্দ পরবর্তীকালে সহজাত বলে বোধ হয়।

Intellectualism : বুদ্ধিবাদ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তার দেহ এবং বাস্তব পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কোনো স্বাধীন শক্তি নয়। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক বা বুদ্ধিগত ক্ষমতার জন্ম হয়েছে এবং তার বিকাশ ঘটেছে। বুদ্ধির এই আপেক্ষিক বিচার বা তার দ্বন্দ্বমূলক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি সর্বযুগে সমান নয়। প্রাচীনকালে মানুষের অসহায় অবস্থায় বুদ্ধি এবং বাস্তব অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক সহজবোধ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের বুদ্ধির যত বিকাশ ঘটেছে, তত অনেকের কাছে বুদ্ধি বাস্তব অবস্থা এমনকি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিদেহী এবং বিমূর্ত শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই ধারণার ভিত্তিতে ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্ব মানুষের জ্ঞানকে কেবলমাত্র বুদ্ধিসঞ্জাত বলে বিবেচনা করেছে। এবং বুদ্ধি যেহেতু একটা স্বাধীন শক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, এই অনুমানে ভাববাদ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে অসত্য বলে সিদ্ধান্ত করেছে। এইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিগত জ্ঞান সত্য এবং ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান

অসত্য, ভাববাদীগণ এরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। ইন্দ্রিয়-বিচ্ছিন্ন এই বুদ্ধিবাদী তত্ত্বের সাক্ষাৎ আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে দেকার্ত, তার অনুসারী এবং স্পিনোজার মধ্যে পাওয়া যায়। জ্ঞানের এই তত্ত্ব র‍্যাশনালিজম বলে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে পরিচিত। একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, অপরদিকে মানুষের সমাজে ধনী এবং নির্ধনের আধুনিক শ্রেণীসংগ্রাম বুদ্ধি এবং বাস্তবের পারস্পরিক অন্তঃসম্পর্ককে সাধারণভাবে অনস্বীকার্য করে তুললেও, বর্তমানকালেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বুদ্ধিকে একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে অত্যধিক গুরুত্বদানের একটি প্রবণতা দেখা যায়। বুদ্ধিকে মানুষের সমাজ ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করার এই প্রবণতাকে বুদ্ধিবাদ বলা চলে।

Intelligence Quotient (I.Q.) : বুদ্ধ্যঙ্ক

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য উনবিংশ শতক থেকেই ফেকনার, গালটন, হেলমজ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা বা অভিক্রিয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেন। গোড়ার দিকে মনোবিজ্ঞানীগণ কোনো উদ্দীপকের জবাবে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ব্যবধান-সময় পরিমাপের চেষ্টা করেন। এবং এই ব্যবধান-সময়ের তারতম্য দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য নিরূপণ করেন। চোখ, কান, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন যান্ত্রিক ক্রিয়া এঁরা ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে উচ্চতর বুদ্ধি বা মানসিক ক্ষমতাকেও পরিমাপ করার পদ্ধতি বের করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মনোবিজ্ঞানী এবিনহস (জ. ১৮৯৭) এবং বাইনেট ও সাইমন-এর নাম (জ. ১৯০৫)। বাইনেট এবং সাইমন বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য বিভিন্ন রকম সহজ ধরনের বুদ্ধির পরীক্ষা বা অভিক্রিয়া প্রস্তুত করেন। এর মারফত এঁরা বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধির সূচক তৈরি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি আট বছরের শিশুর পক্ষে যে সমস্ত প্রশ্নের জবাবদান সম্ভব কিংবা অধিক সংখ্যক আট বছরের শিশু যে প্রশ্নগুলির জবাব দিতে পারে তাকে উক্ত বয়সের বুদ্ধির নির্দেশক বলে বাইনেট ও সাইমন স্থির করেন। এই ভিত্তিতে একটি ছ বছরের শিশু যদি আট বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন বা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তা হলে উক্ত ছ বছরের শিশুর বুদ্ধি তার নিজের দৈহিক বয়সের চেয়ে অধিক এবং আট বছর বয়সের সমান। বাইনেট ও সাইমন মনে করতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বুদ্ধির একটি কুশেন্ট অর্থাৎ সূচক বা বুদ্ধ্যঙ্ক আছে। যে-কোনো শিশু বা ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক স্থির করার জন্য তাঁরা নিম্নোক্ত পদ্ধতির উল্লেখ করেন

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক (আই.কিউ.)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{দৈহিক বয়স}} \times ১০০$$

যেমন রহিমের বয়স যদি ১০ বছর হয় এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে রহিম ৮ বছর বয়সের শিশুর উপযুক্ত সমাপনে সক্ষম তা হলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে ৮০। এই মনোবিজ্ঞানীদের মতে বুদ্ধির গড় বুদ্ধ্যঙ্ক বা সূচক ১০০ ধরে উপরোক্ত পদ্ধতিতে কোনো শিশু বা ব্যক্তির বুদ্ধি ১০০-এর কম কিংবা বেশি বলে নির্দিষ্ট হতে পারে।

Intelligentsia : বুদ্ধিজীবী

আমাদের দেশের সামাজিক রাজনীতিক ইতিহাসের পটভূমিতে শিক্ষিত মহলে 'বুদ্ধিজীবী' কথাটি যেমন বেশ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তেমনি তার একটি আবেগগত অর্থও বিদ্যমান। আবেগের দিক থেকে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দ দ্বারা চিন্তাশীল, এমনকি বিবেকবান, প্রগতিশীল একটি মহলকে বুঝান হয়। কথাটির এরূপ প্রচলন বিশেষভাবে ঘটেছে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা মর্মান্তিক ঘটনা থেকে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে গণহত্যা শুরু করে তাতে এবং পরবর্তীতে যুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তান সামরিক জান্তা এবং তাদের এদেশীয় অনুচর রাজাকার, আলবদরদের হাতে ঢাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ও শহরের অগণিত শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক নির্মমভাবে নিহত হন। এঁরা শহীদ বুদ্ধিজীবী বলে শ্রদ্ধার সাথে স্মৃত হন এবং আমাদের অনুপ্রেরণা দান করেন।

কিন্তু ব্যুৎপত্তিগতভাবে ইংরেজি 'ইনটেলিজেন্টশিয়া'র বাংলা অনুবাদ হিসাবে 'বুদ্ধিজীবী'র এমন অর্থ প্রধান অর্থ নয়। অন্যান্য দেশেও 'বুদ্ধিজীবী' বলতে তেমন কোনো আবেগের সঞ্চার ঘটে না। 'বুদ্ধি' থেকে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি তৈরি হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য দেশেও এ শব্দের কিছু বিশেষ অনুষঙ্গ দেখা যায়। বুদ্ধিবিহীন মানুষ নেই। আবার 'জীবী' দ্বারা যদি জীবিকা বুঝায়, তা হলে আমাদের দেশেও কেবল বুদ্ধি দ্বারা কেউ জীবিকা নির্বাহ করে না। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশা এবং এই পেশাগত সম্প্রদায় বা শ্রেণী আছে। তথাপি শব্দটির একটি সাধারণ প্রচলন আছে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী বলতে কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতিকে বুঝানো হয়। আমাদের দেশের ইতিহাসের পটভূমিতে শব্দটির আবেগের দিক বাদ দিলে 'বুদ্ধিজীবী' কথাটি অনির্দিষ্ট কথা। ইনটেলিজেন্টশিয়া বা বুদ্ধিজীবীর আর একটি সহগামী শব্দ হচ্ছে 'ইনটেলেকচুয়াল' বা 'বুদ্ধিবাদী' শব্দ। (দ্র. Intellectualism : বুদ্ধিবাদ)।

International, 1st, 2nd & 3rd : আন্তর্জাতিক, ১ম, ২য়, এবং ৩য়

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আন্তর্জাতিকতা। কার্লমার্কস (১৮১৮-৮৩) এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫) সমাজবিকাশের দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ দিয়ে দেখান যে, সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী যে ধনতান্ত্রিক যুগ বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার পরিণামে সমাজতান্ত্রিক যুগ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে। এটি সমাজ বিকাশের নিয়মের অনিবার্য পরিণাম হিসাবেই ঘটবে। তাঁরা বলেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব এর উৎপাদন-উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, তথা উৎপাদনের উপায়ের মুষ্টিমেয় মালিকের সঙ্গে উৎপাদনের প্রধানশক্তি অধিক সংখ্যক বঞ্চিত শ্রমিকের। কার্লমার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সমাজবিকাশকে কেবল তত্ত্বমূলকভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের অনিবার্য আইন আছে, সত্য। কিন্তু সে আইন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যকর হবে, এমন নয়। সে আইনের অপর সত্য হচ্ছে, মানুষ এই পরিবর্তনের সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে বাধ্য

থাকে এবং সে এই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আর তাই কেবল বিশ্লেষণ নয়। বাস্তব কাজও প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে মার্কস এবং এঙ্গেলস ব্যক্তিগতভাবে কেবল যে অত্যন্ত আগ্রহ এবং ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁদের জীবনকালে বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ধনবাদী ব্যবস্থার অগ্রগামী দেশসমূহের সামাজিক বিপ্লব এবং বিপ্লবী আন্দোলনসমূহকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাই নয়। প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা এই সমস্ত বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন।

নতুন যুগের প্রধান শক্তি শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক শক্তিই প্রধান বল। কেবল তাই নয়। এই নতুন যুগে কোনো দেশের সামাজিক বিপ্লব আর পূর্বের ন্যায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এক দেশের মানুষ অপর দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আজ সংযুক্ত। তাই প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও আজ আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত। এ কারণে কোনো দেশের শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের দেশে সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে চাইলে তার নিজের শক্তিই যথেষ্ট নয়। তাকে সকল দেশের বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে আত্মিক এবং সাংগঠনিকভাবে যুক্ত হতে হবে। এরূপ যুক্ত হওয়ার উপায় তৈরি করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকে মার্কস এবং এঙ্গেলস ১৮৪৭ সনে 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে একটি সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্ট লীগকে এই চিন্তার কারণে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। তখনকার ইউরোপের সকল দেশের শাসকশ্রেণীর নির্যাতন ও প্রতিরোধের আবহাওয়ায় কমিউনিস্ট লীগকে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে তার সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করতে হয়। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডনে কমিউনিস্ট লীগের যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তার সিদ্ধান্তরূপে মার্কস এবং এঙ্গেলস যৌথভাবে এই সংঘের ইশতেহার হিসাবে ঐতিহাসিক 'ম্যানিফেসটো অব দি কমিউনিস্ট পার্টি' রচনা করেন। এই ইশতেহারে মার্কস এবং এঙ্গেলস সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু গভীর চিন্তামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ভাষায় দ্বন্দ্বমূলক সমাজবিজ্ঞান ও সাম্যবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব এবং কৌশলকে তুলে ধরেন। ইশতেহারের সর্বশেষ ছত্রে : 'দুনিয়ার মজদুর এক হও : শৃঙ্খল ব্যতীত তোমাদের হারাবার কিছু নেই'—আধুনিক বিশ্বের এই অন্যতম বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারিত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অধিকতর সংগঠিত রূপ প্রকাশিত হয় 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠায় ১৮৬৪ সনে। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস এই সংগঠনেরও নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলেন। প্রথম সম্মেলনে মার্কস সংগঠনের উদ্বোধনী ভাষণ তৈরি করেন এবং তাঁর সেই ভাষণে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান, দেশে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর সামনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী সাংগঠনিক দৃঢ়তা, ঐক্য এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত ক্ষমতা দখলের এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না। প্রথম আন্তর্জাতিকে শ্রমিক আন্দোলনের যে সমস্ত প্রতিনিধি জমায়েত হয়েছিলেন তাদের সকলের সমাজের বিশ্লেষণ ও চিন্তা সর্বক্ষেত্রে এক ছিল না। এমন অনেক পণ্ডিত এবং আন্দোলনকারী ছিলেন (প্রুধো, বাকুনিন) যাঁরা পাতিবুর্জোয়াকে শ্রমিকশ্রেণীর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এর ফলে মার্কসের সঙ্গে এই সমস্ত চিন্তাবিদের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। ১৮৭৬ সনে

প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রধান দপ্তর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করা হয়। সংগঠনের মধ্যে বাকুনিনের নৈরাষ্ট্রিক চিন্তার বিরুদ্ধে মার্কস তাঁর সমালোচনা ও বিশ্লেষণ চালিয়ে যান। ১৮৮৩ সনে মার্কসের মৃত্যু হয়।

ইউরোপে ১৮৪০-এর দশকে বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা ঘটে। পরবর্তীকালে আন্দোলনে ভাটা আসে। ১৮৭৬ সনে প্রথম আন্তর্জাতিকের অবসান ঘটে।

১৮৭০-এর দশকে ইউরোপে আবার আন্দোলনের ঢেউ জাগে। পুঁজিবাদ ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শক্তি অর্জন করেছে। প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য নতুন বাজারের খোঁজে উপনিবেশ অধিকার এবং দখলের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরূপ গ্রহণ করেছে। এই দশকের গোড়াতেই ফরাসি দেশে প্যারিস শহরের শ্রমিকদের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৮৭১ সালে 'প্যারিকম্যুন' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিকম্যুন ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা। এ অভ্যুত্থান তখনকার অধিকতর শক্তিশালী বুর্জোয়া সরকার অপর সকল প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই দশকের আন্দোলনের জোয়ারে সোস্যাল ডিমোক্রাটিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি নামে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, সুইজারল্যণ্ড, অস্ট্রিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশে সংগঠিত হয়। এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দলকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত করার জন্য ১৮৮৯ সনে ১৪ জুলাই ফরাসি বিপ্লব বার্ষিকী দিবসে প্যারিসে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠা হয়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যেই বিপ্লবের পর্যায় ও পন্থা নিয়ে মতাদর্শগত লড়াই চলে। মার্কসের অনুসারী চিন্তাবিদ এবং সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টিসমূহ বিপ্লবকে মূল লক্ষ্য রেখে শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে পার্লামেন্ট ও অন্যান্য সমস্ত প্রকার সংগঠন ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। তা ছাড়া এই যুগে শ্রমিক শ্রেণী নিজ নিজ দেশের সরকারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে নিজেদের স্বার্থবহ মনে করবে কি করবে না, এ নিয়েও মতামতের তফাৎ ঘটতে থাকে। মার্কসবাদীগণ ঘোষণা করেন, এই পর্যায়ে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একটি প্রধান কাজ হবে নিজের দেশের সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং যুদ্ধের সমালোচনা ও প্রতিরোধ করা। কিন্তু কোনো কোনো দেশের সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি এবং নেতা এই মত দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করতে অপারগ হয়। মতাদর্শের এই বিরোধ ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের কালে প্রকট হয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকাকে বিনষ্ট করে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে ১৯৯১-এ লেনিন (১৮১৭-১৯২৪)-এর নেতৃত্বে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিক ১৯৪৩ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কার্যকর থাকে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ও সামব্যবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে মুক্তি আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের ঢেউ এশিয়া এবং আফ্রিকাতেও

ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়ার চীনদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয় এবং ১৯২১-এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত উপমহাদেশেও স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করে। ভারতবর্ষে কলকারখানার যে প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তাতে শ্রমিকশ্রেণীও একটি শক্তিশালী শ্রেণী হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। ভারতে ১৯৩০-এর দশকে সাম্যবাদী দলের জন্ম হয়। ইউরোপে ইতালি এবং জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ শক্তি অর্জন করে। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধিতে এবং তাদের সংগঠনের আদর্শগত ও সাংগঠনিক জঙ্গীত্বে শাসক শ্রেণী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনকে নির্যাতনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। এর প্রকাশ হিসাবে ইতালি এবং জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী শক্তির উদ্ভব এবং ফ্যাসি ও নাজিবাদী দল দ্বারা ইতালি ও জার্মানিতে যথাক্রমে ১৯২৯ এবং ১৯৩৩-এ এবং পরবর্তীকালে স্পেনে ক্ষমতা দখল হয়। পরিণামে ১৯৩৯-এ ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের ক্রমগতিতে ফ্যাসিবাদী জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহের একটি বৃহৎ জোট তৈরি হয়। এই জোটের ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থা কমিনটার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অস্তিত্বকে মিত্রজোটের জন্যে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষার এই সংকটকালের কথা বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলন এবং তার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান আদর্শ ও অভিজ্ঞতায় অতীতের চেয়ে অধিক পরিমাণে শক্তিশালী হওয়াতে কোনো আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের নেতৃত্বদান আর তত প্রয়োজনীয় নয় বিবেচনা করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৪৩-এ তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর সকল দেশে আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়েছে। এখন বিভিন্ন দেশের আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্মেলন, আলোচনা ও মতামতের আদান-প্রদান অতীতের চেয়ে অধিক। কিন্তু এখন আর আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত কোনো 'আন্তর্জাতিকে'র অস্তিত্ব নেই।

Internationalism : আন্তর্জাতিকতাবাদ

ইন্টারন্যাশনালিজম বা 'আন্তর্জাতিকতাবাদ'-এর একটি সাধরণ অর্থ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি। কিন্তু শব্দটির বিকাশ ঘটেছে আধুনিককালে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধী চিন্তা হিসাবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রবণতা হচ্ছে নিজের জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রধান বলে গণ্য করা এবং অপর জাতি এবং রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থকে উপেক্ষা করা। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মারাত্মক প্রকাশ দেখা যায় এই শতকের বিশ এবং ত্রিশের দশকে ইতালি ও জার্মানিতে। ইতালির ফ্যাসিস্ট দল এবং জার্মানির নাৎসি দল তাদের দলীয় এবং রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে নিজেদের জাতি এবং রাষ্ট্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে এবং অপর জাতি এবং রাষ্ট্রকে অধম এবং পদানত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করে। এই নীতিতে তারা জঙ্গীভাবে সংগঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্রসমূকে নানা অজুহাতে গ্রাস করতে শুরু করে। এই নীতির পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং জার্মানি

এবং ইতালি এবং তাদের মিত্র জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদের এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় জাতিতে জাতিতে সমতাবোধ এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। অনেক চিন্তাবিদ জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় রাষ্ট্রের অবাঞ্ছনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একটি বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতা ওয়েনডেল উইলকী (১৮৯২-১৯৪৪) এর 'ওয়ান ওয়ারল্ড' বা এক পৃথিবী' গ্রন্থখানির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'আন্তর্জাতিকতাবাদ' অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ অর্থে আধুনিক কালের সকল দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়। সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দলসমূহ আন্তর্জাতিকতাবাদকে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন তথা শ্রেণীহীন সমাজ তৈরির সংগ্রামে আদর্শগত হাতিয়ার বলে গণ্য করে। সাম্যবাদী আন্দোলনের মূলশক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে যেমন সব চেয়ে শোষিত শ্রেণী, তেমনি ধনিক শ্রেণীর পাল্টা শক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। কোনো দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশের শ্রমিকদের উপর শোষণ বিলোপের আন্দোলন নয়। এককভাবে কোনো দেশের শ্রমিক চূড়ান্তভাবে শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণী কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশের শোষণকারী শ্রেণী নয়। সকল দেশের ধনিকগণই তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষায় পরস্পরযুক্ত। ধনিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক শ্রেণী। তারা আন্তর্জাতিকভাবে সংঘবদ্ধ। শোষিত শ্রমিক শ্রেণীও আন্তর্জাতিক শ্রেণী। দেশনির্বিশেষে তাদের মৌলিক স্বার্থ অভিন্ন। এ কারণে আন্তর্জাতিক ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীকেও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এক দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে অপর দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতার এই হচ্ছে মৌলভাব। এই আদর্শের ক্ষেত্রে তাই কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা আসতে পারে না। ছোট বড় সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের শোষিত মানুষই হচ্ছে সমান এবং তাদের মূল লক্ষ্য এবং স্বার্থ এক। এই নীতির প্রকাশ করে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের রচিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেসটো'তে বিশ্বের সকল দেশের সর্বহারাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন : ওয়ারকারস্ অব অল কানট্রিস, ইউনাইট : সকল দেশের সর্বহারাগণ : এক হও।' এই আন্তর্জাতিকতা বোধকে প্রকাশ করে সাম্যবাদী দলসমূহ একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীতও রচনা করেছে। ইউরোপে সংগঠিত শ্রমিক ও সাম্যবাদী দলসমূহ নিজেদের সমন্বয়ে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা'ও স্থাপন করেছিলেন। এই সংগঠন 'ওয়ারকারস ইন্টারন্যাশনাল' বা শ্রমিক আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত ছিল (দ্র. আন্তর্জাতিক, ১ম, ২য় ও ৩য়)।

Introspection : আত্মনিরীক্ষণ

ব্যক্তি তার মনের কোনো অবস্থা যখন নিজে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে তখন এই পর্যবেক্ষণকে আত্মনিরীক্ষণ বলা হয়। নিজের মনের অবস্থা ব্যক্তির নিজের পক্ষে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা মানুষের মনের উন্নততর বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। আত্মনিরীক্ষণের ফল ব্যক্তির নিজের বর্ণনার মাধ্যমেই মাত্র অপরে জানতে পারে। তার সে বিবরণ যথার্থ

কিনা তা প্রমাণ বা পরীক্ষার উপায় থাকে না। তথাপি মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগগত দিক বিকশিত হওয়ার পূর্বে বিংশ শতকের প্রায় তিন দশক পর্যন্ত আত্মনিরীক্ষণকেই মনোবিজ্ঞানীগণ মনের সব রকম প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল, মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিজ্ঞান। মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যার মন সে ব্যতীত অপরে কেমন করে জানবে? যার দাঁতে ব্যথা হচ্ছে সে-ই মাত্র বলতে পারবে তার ব্যথা কিরূপ। মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে পুত্রের মনে কী ভাবের উদ্রেক হয়েছে পুত্রই মাত্র সে কথা বলতে পারে। আর এর উপায় হচ্ছে ব্যক্তির নিজের মনের চোখকে মনের ঘটনার উপর নিক্ষেপ করে তা নিরীক্ষণ করে তার বিবরণ অপরকে জানানো। একথা সহজেই বুঝা যায় যে, আত্মনিরীক্ষণের এই উপায় একান্তই ব্যক্তিগত। তা ছাড়া ব্যক্তির মনে যখন কোনো আবেগ বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সেই মুহূর্তে উত্তেজিত ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ এবং অনুত্তেজিত ভাব নিয়ে নিজের উত্তেজিত মনকে নিরক্ষণ করা কতখানি সম্ভব, এটা একটা বড় প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। মনের কোনো ক্রিয়ার উপর মন দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সেই ক্রিয়ার তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার ঘটনার পরে ব্যক্তি তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করলে সে স্মৃতিও যথাযথ না হতে পারে। আত্মনিরীক্ষণের এ সমস্ত অসুবিধার কারণে মনোবিজ্ঞান পরবর্তীকালে নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে আত্মনিরীক্ষণবাদী মনোবিজ্ঞানের স্থলে আচরণবাদী ও প্রয়োগবাদী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে আত্মনিরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয় না। দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্কের ভিত্তিতে দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং পৌনঃপুনিক পরীক্ষাযোগ্য বিভিন্ন পরীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

Intuition : সজ্ঞা, বোধি

আকস্মিকভাবে, কোনো প্রকার চিন্তা ও ভাবনা ব্যতিরেকে, কোনো সমস্যার সমাধান লাভের উপায়কে সজ্ঞা বা বোধি বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞানলাভের উপায় সম্পর্কে দর্শনে বিভিন্ন মত আছে। বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক উপায় হিসাবে বুদ্ধির সহযোগে কোনো সমস্যার পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা, অনুমান ও প্রয়োগ-সমন্বিত পদ্ধতিকে জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় বলে মনে করা হয়। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে সজ্ঞাবাদী মতও অনেক দার্শনিকের মধ্যে পাওয়া যায়। হেনরী বার্গসঁর দর্শনকে সজ্ঞাবাদী দর্শন বলা হয়। সজ্ঞাবাদী হিসাবে এডমণ্ড হাসারেল ও জর্জ সান্তায়ানার নামও উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তির মন অনেক সময়ে অচিন্তনীয়ভাবে কোনো সমস্যার সমাধানে আলোকিত হয়ে ওঠে বলে সজ্ঞাবাদীগণ মনে করেন। এ জন্য ব্যক্তির কোনো শিক্ষা, চিন্তা বা অভিজ্ঞতার আবশ্যক হয় না। এঁদের মতে সজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যক্তি থাকবে নিষ্ক্রিয় একটি গ্রাহকযন্ত্রবিশেষ। সত্য এসে সে যন্ত্রে আপনি ধরা দেবে। সজ্ঞাবাদী দর্শনের মতে চরম সত্যকে মানুষ এই উপায়েই মাত্র লাভ করতে পারে—বুদ্ধি দ্বারা নয়। বুদ্ধি ও চিন্তা কেবল খণ্ড সত্য উদ্ধার করতে পারে, চরম সত্য নয়। সজ্ঞাবাদী দর্শন ভাববাদী দর্শনের প্রকারবিশেষ। ভাববাদী দার্শনিক দেকার্ত এবং স্পিনোজা স্থান, কাল, পাত্র, ঈশ্বর, কার্যকারণ এবং অন্যান্য সার্বিক ভাবকে যেমন সহজাত তেমনি সজ্ঞাজাত

বলে মনে করতেন। সজ্ঞার সমর্থক চরম ভাববাদ এবং ধর্ম ও রহস্যবাদের মধ্যেই প্রধানত পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'সজ্ঞা'র ন্যায় অতি-প্রাকৃতিক, বুদ্ধির অতীত রহস্যজনক জ্ঞানোপায়ের কোনো ক্ষমতা বা পদ্ধতি স্বীকার করা চলে না। ব্যক্তির মনে আকস্মিকভাবে কোনো সমস্যার সমাধান যে উদিত হতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু এই আকস্মিক বোধেরও মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্ভার। অন্যথায় শিশুর মনেও জটিল সমস্যার সমাধান উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারত।

Inverse Relation, Law of : বিপরীত ক্রমের বিধান

যুক্তির একাধিক শব্দ বা পদের অর্থের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে যুক্তিশাস্ত্রের একটি বিধানবিশেষ। যুক্তিশাস্ত্রে শব্দ বা পদের অর্থের দুটি দিক একটি হচ্ছে শব্দের গুণ বা তাৎপর্যের দিক ; অপরটি হচ্ছে তার পরিমাণ বা সংখ্যার দিক। একে জাত্যর্থ এবং ব্যক্ত্যর্থ বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণত জাতিবাচক পদেরই এই দুটো দিক আছে বলে মনে করা হয়। জাতিবাচক পদকে জাতি এবং উপজাতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যেমন জীব, মানুষ, সভ্য মানুষ, এশিয়ার মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ প্রভৃতি জাতিবাচক পদগুলির একটিকে অপরটির জাতি কিংবা উপজাতি বলে অভিহিত করা যায়। জীব হচ্ছে মানুষ-এর উপরস্থ জাতি এবং মানুষ হচ্ছে জীবের অন্তর্গত উপজাতি ; আবার 'সভ্য মানুষ' 'মানুষ' পদের উপজাতি এবং 'মানুষ' পদ হচ্ছে তার উপরস্থ জাতি। জাতি এবং উপজাতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ একাধিক পদের জাত্যর্থ এবং ব্যক্ত্যর্থ পরস্পর তুলনা করলে তাদের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধির যে ক্রম লক্ষ করা যায় তাকে বিপরীত ক্রমের বিধান বলা হয়। 'জীব' পদের সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থের চেয়ে অধিক। আবার 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ সভ্য মানুষ পদের চেয়ে অধিক। 'সভ্য মানুষ'-এর ব্যক্ত্যর্থ 'এশিয়ার মানুষ' পদের চেয়ে অধিক। অর্থাৎ জাতি থেকে উপজাতির দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় তত বিবেচিত পদগুলির ব্যক্ত্যর্থ বা সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অপর দিকে গুণ বা জাত্যর্থের ক্ষেত্রে উপজাতি থেকে জাতির দিকে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, একটি উপজাতির চেয়ে তার জাতির জাত্যর্থ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। যেমন 'বাংলাদেশের' মানুষ পদের যে গুণাবলী বা জাত্যর্থ তার চেয়ে তার উপরস্থ জাতি অর্থাৎ এশিয়ার মানুষ পদের জাত্যর্থ কম। এই বিধানটিকে এভাবেও বলা যায় যে, জাতির জাত্যর্থ যেখানে উপজাতির জাত্যর্থের অন্তর্ভুক্ত সেখানে উপজাতির ব্যক্ত্যর্থ তার উপরস্থ জাতির ব্যক্ত্যর্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিপরীত ক্রমের এ বিধান সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। একটি মাত্র পদের উপর যেমন এটি প্রয়োগ করা যায় না, তেমনি 'মানুষ, 'রঙ', বিশ্ববিদ্যালয়' এরূপ বিজাতীয় একাধিক পদের ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করা চলে না। কারণ বিজাতীয় পদের মধ্যে অর্থ এবং সংখ্যাগত পারস্পরিক কোনো তুলনা চলে না।

Ionian School of Philosophy : আয়োনীয় দর্শন

প্রাচীন গ্রিসের পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপগুলি আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ হিসাবে পরিচিত ছিল। এর মধ্যে সিফালোনিয়া, করফু, ইথাকা প্রভৃতি দ্বীপের নাম প্রসিদ্ধ। এই দ্বীপাঞ্চলেই প্রথম গ্রিক

দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে এই অঞ্চলে যে সকল দার্শনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁদের সর্বাগ্রে ছিলেন থেলিস। থেলিসের পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধিলাভ করেন এনাক্সিমেণ্ডার এবং এনাক্সিমেনিস। বস্তুত গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে আয়োনীয় কিংবা মাইলেশীয় দর্শন বলতে থেলিস, এনাক্সিমেণ্ডার এবং এনাক্সিমেনিস-এর দর্শনকে বুঝায়। এঁদের দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এঁরা জগতের বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি রহস্যকে বস্তু দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। জগতের সর্বত্রই বস্তু বিরাজমান। এর মধ্যে আবার পানির গুরুত্ব তাঁদের কাছে সর্বাধিক বলে বোধ হয়েছে। কেননা তাঁদের চারদিকে তারা অগাধ জলরাশিকে বিস্তারিত দেখেছেন। তাই থেলিস মনে করতেন যে সর্বপ্রকার বস্তুর মূলে আছে পানি। পরবর্তীকালে হিরাক্লিটাস, এনাক্সাগোরাস, ডায়োজেনিস প্রমুখ দার্শনিক বস্তুর মূল হিসাবে আগুন, বাতাস, অণু, কিংবা পরিবর্তমানতা ইত্যাদি সূক্ষ্মতর কারণের উল্লেখ করেন।

Iqbal, Muhammad : মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)

ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম কবি এবং দার্শনিক। মুহম্মদ ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন শিয়ালকোট শহরে, ৯ নভেম্বর, ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। পাঞ্জাব, ক্যাম্ব্রিজ এবং মিউনিকে তিনি আইনবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯০৮ সালে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকবাল তাঁর 'পারস্যে তত্ত্ববিদ্যার বিকাশ' বা 'ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়া' শীর্ষক গবেষণার জন্য ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি লাভ করেন। লাহোর সরকারি কলেজে মুহম্মদ ইকবাল কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ থেকে বুঝা যায় যে তিনি কেবল জ্ঞান এবং গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশনে মুহম্মদ ইকবাল সভাপতিত্ব করেন। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'নাইট' খেতাবে ভূষিত করেন। এর পর থেকে তিনি স্যার মুহম্মদ ইকবাল নামেই সর্বত্র পরিচিত হন।

ইকবাল তাঁর কাব্য সাধনা এবং জ্ঞানচর্চা করেন প্রধানত উর্দু এবং ফার্সি ভাষায়। তাঁর কাব্যের প্রধান সুর এবং বিষয় হচ্ছে মুসলমানের হারানো অতীত ঐশ্বর্য এবং ঐতিহ্যের স্মৃতি এবং বর্তমানের হতোদ্যম মুসলমানের প্রতি নব জাগরণের উদাত্ত আহ্বান। ইকবালকে তাই মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য, শক্তি ও স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইকবালের ঐকান্তিক প্রয়াসের জন্য তাঁকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তানের' ভাব-জনক বলে আখ্যায়িত করা হতো।

মুহম্মদ ইকবালের দার্শনিক চিন্তাধারাও মুসলমানের উন্নতির উপায়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তাঁর মতে মুসলমানের মুক্তির পথ হচ্ছে (১) ইসলামের বিধানের প্রতি আনুগত্য পোষণ, (২) আত্মসংযম এবং (৩) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ অর্থাৎ নবীর

উপর বিশ্বাস স্থাপন। মানুষের মুক্তির উপায় আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন হলেও ইকবাল কিসমত বা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের তত্ত্ব গ্রহণ করতে চান নি। মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে ব্যক্তির নিজের স্বাধীনতাও কম নয়। ইকবালের চিন্তাধারায় পারস্যের বিখ্যাত সুফি কবি জালালউদ্দীন রুমী, জার্মান দার্শনিক নিৎসে এবং ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইকবালের 'আসরার-ই খুদী'র মধ্যে তাঁর দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্‌। কিন্তু আল্লাহ্‌ কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে যে বিশ্বের সমস্ত ভবিষ্যৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৃষ্টি করে দিয়েছেন, একথা ভাবা যায় না। আল্লাহ্‌ বিশ্বের ভূত-ভবিষ্যতের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা তার মূলগত সম্ভাবনার ভিত্তিতে ; তার প্রতিটি বাস্তব সৃষ্টির ভিত্তিতে নয়। অন্য কথায় বলা চলে আল্লাহ্‌ বিশ্ব সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, একথা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌ বিশ্বকে সৃষ্টি করে চলেছেন। আল্লাহ্‌র বান্দা মানুষও কেবলমাত্র ক্রীড়নক নয়। মানুষও আল্লাহ্‌র প্রবহমান সৃষ্টিকার্যের সক্রিয় অংশীদার। এ তত্ত্বের মধ্যে বার্গসঁর ক্রিয়েটিভ ইভোল্যুশন-এর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

ইকবালের প্রধান দার্শনিক রচনা হিসাবে তাঁর 'দি রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম' গ্রন্থ পরিচিত। এই গ্রন্থে কবি বলেছেন, সামাজিক ক্ষেত্রে মুক্তি এবং অগ্রগতির জন্য ইসলামকে অবশ্যই গোঁড়ামি এবং অতীতের অবাস্তব শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। এক কালের বিধান অপর কালের মানুষের বিচারের উর্ধ্বে হতে পারে না। বর্তমানের মুসলমানকে অতীতের বিধানকে বিচার করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার পথ নির্ণয় করতে হবে। এরূপ তত্ত্বে ইকবালের অগ্রসর বা প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ইকবালের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'রামুজে বেখুদী' এবং 'জাবিদনামা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জাবিদানামা'কে তাঁর প্রধান কাব্যিক সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। স্যার মুহম্মদ ইকবাল ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮ সালে লাহোরে পরলোকগমন করেন।

Islam : ইসলাম

বিশ্বধর্মসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইসলাম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের মধ্যে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের নাম উল্লেখযোগ্য। ইসলামের অনুসরণ দেখা যায় প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া ভূ-খণ্ডসমূহে। ইসলামের উদ্ভবকাল ৭ম শতাব্দী। আরব দেশের কোরেশ বংশের আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ-কে (সা.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) ইসলামের অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁকে সম্মানের সঙ্গে হযরত মুহম্মদ বলে উল্লেখ করে। হযরত মুহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

ধর্মের দুটো দিক আছে। একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক। অপরটি তার সামাজিক ভূমিকার দিক। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষের এরূপ বিশ্বাস যে, দৃশ্য জগতের পেছনে অদৃশ্য একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি মানুষকে সত্য পথে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে নির্বাচিত করেন। এক ধর্মের অনুসারীগণ অপর ধর্মের নির্বাচিত মানুষকে সাধারণত স্বীকার করতে চায় না। ধর্মের উদ্ভব মানুষের রাষ্ট্রীয়

সংগঠন সৃষ্টির পূর্বে ঘটেছে। ধর্ম শুধুমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্বে ব্যক্তির বিশ্বাস নয়। সামাজিক জীপনযাপনের জন্য ধর্মের অনুশাসনসমূহও গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনো ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রয়োজন জড়িত থাকে। আরবের গোত্রতান্ত্রিক সমাজের নতুনতর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত হওয়ার ক্রান্তিকালে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্বে যেখানে আরবের অধিবাসীগণ বিভিন্ন সরদার বা গোষ্ঠী নেতার অধীনে বিভিন্ন বংশ এবং গোত্রে বিভক্ত ছিল সেখানে তারা এই প্রথম বিস্তৃততর অঞ্চলের একমাত্র নেতা 'খলিফা'র অধীনে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হলো। গোত্রতান্ত্রিক বিভাগে অর্থনৈতিক লেনদেন এবং যোগাযোগ যেখানে সংকীর্ণ এবং তার বিকাশ অবরুদ্ধ হয়েছিল সেখানে খলিফার নেতৃত্বে সংগঠিত আরব ভূখণ্ডে তা এবার অবাধ হয়ে উঠল। গোত্রের সংকীর্ণ পরিধিতে বিবদমান গোষ্ঠীসমূহকে এরূপ বৃহত্তর একটি জনসংস্থায় সংগঠিত করার চিন্তানায়ক এবং সংগঠক হিসাবে কাজ করেছেন হযরত মুহম্মদ (সা.) এই ভূমিকার মধ্যে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং অগ্রসর চিন্তার যে পরিচয় বিদ্যমান তা তাঁকে ইতিহাসে অন্যতম ধর্মীয় নেতা এবং সামাজিক সংগঠক হিসাবে স্মরণীয় করে রেখেছে।

ধর্মের তত্ত্ব এবং সামাজিক বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে একই অঞ্চলে উদ্ভূত পূর্বকার ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং জরাথুস্ত্র ধর্মের প্রভাব ইসলামের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যে-কোনো ধর্মতত্ত্বের মধ্যে একটি বিশ্বতত্ত্ব বা দর্শনের আভাস থাকে। ইসলামের দর্শন কোরান এবং হযরত মুহম্মদের উপদেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রধান জোর আল্লার বিধান এবং সেই বিধান অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য যে পূর্বনির্ধারিত এই তত্ত্বের উপর। 'তাওয়াক্কালাল্লাহ্' 'আল্লার উপর নির্ভর কর', ইসলামের অনুসারীদের জীবনের যে-কোনো সংকটকালে এটি একটি সর্বদা উচ্চারিত বাণী। 'আল্লার উপর নির্ভর কর এবং ধৈর্য ধারণ কর' পরকালে পুরস্কার ও সুখলাভ করবে—এরূপ উপদেশের উপর অত্যধিক জোরের মধ্যে মানুষকে প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও সংকটে নিষ্ক্রিয় এবং অসহায় করে রাখার একটা প্রবণতা থাকে। আধুনিককালে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামের বিধানসমূহ যেরূপ নির্দিষ্ট, তেমনি অধিকতর অনড়। ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহের ব্যাখ্যা ভিত্তিতে তার বিভিন্ন ভাবধারা বিকাশলাভ করেছে। এই ব্যাখ্যা যে দার্শনিকগণ অধিকতর উদারভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা মুতাজেলাবাদী বা মুক্তচিন্তাবাদী বলে পরিচিত। মুক্তচিন্তাবাদীরা প্রাচীন গ্রিক দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের দর্শন আরবি ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে এই অনুবাদের মাধ্যমেই ইউরোপ গ্রিক দর্শনের পরিচয় লাভ করে। আল্লাহ্‌র উপর দয়া, মায়া ইত্যাকার মানবিক গুণ আরোপ করার যুক্তিগত তাৎপর্য এবং মানুষের কাজের স্বাধীনতার প্রশ্নে মুতাজেলা এবং গোড়াপন্থী আশারিয়াদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক এবং মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ইতিহাসে গোঁড়া মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

Isocrates : আইসোক্রাটিস (খ্রি. পূ. ৪৩৬-৩৩৮)

আইসোক্রাটিস ছিলেন প্লেটোর সমকালীন বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও শিক্ষক। বাগ্মী হিসাবে আইসোক্রাটিসকে এথেন্সের দশজন বাগ্মীর একজন বলে গণ্য করা হতো। অর্থবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পিলোপনেশীয় যুদ্ধে আইসোক্রাটিসের পরিবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। যুদ্ধের পরে আইসোক্রাটিস শিক্ষকতাকে প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যে তাঁর নিজের ছাত্রসংখ্যা এক সময় ১০০-তে উন্নীত হয়েছিল। এই ছাত্রগণ চার বছর তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করত এবং তাদের শিক্ষার দেয় ছিল ছাত্রপ্রতি দশমিনা। এই শিক্ষকতার পেশাতেই আইসোক্রাটিস এত অধিক অর্থ উপার্জন করেন যে তাঁকে এথেন্সের সবচেয়ে অর্থবান নাগরিকদের মধ্যে একজন বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে শিক্ষকদের সম্পর্কে সফিস্ট বলে যে আখ্যা প্রচলিত আছে আইসোক্রাটিস নিজেকে তাদের মধ্যে গণ্য করতে চাইতেন না। এজন্যে 'সফিস্টদের বিরুদ্ধে'. এই নামে তিনি একটি প্রচার পুস্তিকাও রচনা করেন। এই পুস্তিকায় আইসোক্রাটিস খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের সফিস্টদের শিক্ষানীতি ও দর্শন থেকে তার নিজের শিক্ষানীতি ও দর্শন যে পৃথক তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর এই পুস্তিকায় তিনি সফিস্টদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কূটতর্কের কৌশল শিক্ষাদানকে উল্লেখ করেন। সফিস্টদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিকূল মনোভাব তৈরি এবং সফিস্টগণ প্রশংসা বা শ্রদ্ধার পাত্র নয় এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টিতে আইসোক্রাটিস-এর পুস্তিকার বিশেষ প্রভাব ছিল। আইসোক্রাটিসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ পঞ্চাশ বছরের অধিককালে স্থায়ী ছিল। আইসোক্রাটিস জীবন ও জগতের বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর নিজস্ব একটা দর্শন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এদিক দিয়ে সক্রেটিস এবং প্লেটোর সঙ্গে আইসোক্রাটিসের একটি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সক্রেটিসের দর্শন এবং আইসোক্রাটিসের দর্শনের মধ্যকার পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিস যেখানে সাধারণ অভিমতকে সত্যলাভের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন সেখানে আইসোক্রাটিস বিজ্ঞানের চেয়ে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ অভিমতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতেন। আইসোক্রাটিস বলতেন অকেজো ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক নিশ্চিত সত্যের চেয়ে কাজের ব্যাপারে সম্ভাব্য সত্যের মূল্য অধিক। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি প্লেটো থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্লেটো অঙ্কশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর জোর দিতেন। কিন্তু আইসোক্রাটিস মনে করতেন, রাষ্ট্রনীতিক বিষয়ে সঠিক অভিমত পোষণ করা এবং তাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা শিক্ষাদানই হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল করণীয়। আর তাই আইসোক্রাটিসের দর্শন রাষ্ট্রীয় জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য রাজনীতিক প্রশ্নে উপযুক্ত অভিমত পোষণ এবং বাগ্মীতার সঙ্গে তার সুকৌশল প্রকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

J

Jainism : জৈন মতবাদ

জৈন মতবাদের দুটি দিক। একটি ধর্মীয়। অপরটি তত্ত্বগত। ধর্ম হিসাবে জৈন ধর্মের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের সমসাময়িক কালে। বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মেও প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে। মহাবীরকে জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। মহাবীর বা জীন অর্থাৎ বিজয়ী,—জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার উপর এরূপ আখ্যা তাঁর অনুসারীগণের প্রদত্ত। মহাবীরের জীবনোপখ্যান এরূপ যে তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতা মাতার আকস্মিক বিয়োগে দুঃখাভিভূত হয়ে দিগম্বর বেশে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। এরপর বার বৎসর যাবৎ অকল্পনীয় শারীরিক কৃচ্ছ্রতা এবং মানসিক সংযমের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাধনায় সিদ্ধলাভ করেন।

দর্শন হিসাবে ভারতীয় দর্শনের বহুত্ববাদী তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায় জৈন মতবাদে। জৈন দর্শনে সৃষ্টির মূল হচ্ছে তত্ত্ব বা সার। তত্ত্ব প্রধানত দুই প্রকার : জীব (আত্মা) এবং অ-জীব (আত্মার বহির্ভূত জগৎ)। আত্মা বা জীবের মূল হচ্ছে চেতনা। অ-জীবের প্রকারভেদই বস্তু। বস্তুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সম্পর্ক, গন্ধ, শব্দ, রঙ এবং স্বাদ। বস্তু অণুতে বিভাজ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরিবর্তনশীল এবং আদি ও অন্তশূন্য। কিন্তু তা হলেও বস্তু বিধাতার সৃষ্টি। কর্ম হচ্ছে দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের মাধ্যম। পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা বলে কিছু নেই। পৃথিবীতে যত প্রাণী তত আত্মা। প্রত্যেক আত্মারই সর্বত্রগামী হওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু দেহের বন্ধনে আবদ্ধ বলে আত্মা দেহের বাইরে যেতে পারে না। মানুষকে সাধনা করতে হবে, দেহের বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করার জন্য। জৈনমতে আত্মার মুক্তির পথ হচ্ছে 'ত্রিরত্ন'কে অনুসরণ করা। ত্রিরত্ন হচ্ছে জ্ঞান, ধর্ম এবং বিশ্বাস। কিন্তু দেহের বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি মানে পরম আত্মার মধ্যে জীবাত্মার লয় বা মিলন নয়। কারণ পরম আত্মা বলে কিছু নেই। আত্মার মুক্তির অর্থ বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণও নয়। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত জীবাত্মা মানুষের অকল্পনীয় কোনো লোকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

নীতিধর্ম বা সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে জৈন ধর্ম হচ্ছে চরম অহিংসা এবং কৃচ্ছ্রতাবাদী। ত্রিরত্নের অন্যতম রত্ন 'ধর্মের' অনুশাসন হচ্ছে : কোনো প্রাণীকে হত্যা করবে না ; মিথ্যে কথা বলবে না ; চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করবে না ; ইন্দ্রিয়গত কোনো ভোগে লিপ্ত হবে না ; এবং জ্ঞানের প্রশ্নে ইন্দ্রিয়কে অভ্রান্ত বলে মানবে না।

James, William : উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০ খ্রি.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এবং ভাববাদী উইলিয়াম জেমস প্রাগমেটিজম বা প্রয়োগবাদেরও অন্যতম প্রবক্তা। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন।

দর্শনে উইলিয়াম জেমস ভাববাদী হলেও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে 'সাইকোলজি' বা 'মনোবিজ্ঞানী' শীর্ষক গ্রন্থ আধুনিক মনোসমীক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এক অবিসংবাদী ভূমিকা পালন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুদিন যাবৎ জেমস-এর 'মনোবিজ্ঞান' জ্ঞানের এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত ছিল। উইলিয়াম জেমস মানুষের মনকে 'চেতনার স্রোত' হিসাবে বিশ্লেষণ করেন। সত্যাসত্য বিচারের প্রশ্নে জেমস উপযোগ বা প্রয়োগবাদের আশ্রয় নেন। তাঁর মতে কোনো বিশেষ ভাব বা বিবৃতির সত্যাসত্যতার প্রধান নিরিখ হবে বাস্তবক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা কিংবা উপযুক্ততা। বাস্তব ক্ষেত্রে যে ভাব যতখানি কার্যকর বা প্রয়োজনীয় ফলদায়ক সে ভাব ততখানি সত্য। ব্যক্তির প্রয়োজন এবং স্বার্থনিরপেক্ষ সত্যের অস্তিত্ব জেমস অস্বীকার করেন। ধর্মীয় এবং অলৌকিক অভিজ্ঞতার চর্চার জন্য উইলিয়াম জেমস একটি বিশেষ ধরনের ধর্মীয় সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠা করেন। অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে জেমস অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে যুক্তি এবং প্রমাণের উর্ধ্বেও অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

Japanese Philosophy : জাপানি দর্শন

জাপানে দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে সামন্ততান্ত্রিক যুগে। জাপানি দর্শনের প্রথম উৎস ছিল প্রাচীন চীনের প্রধান দার্শনিক ধারাসমূহ, বিশেষ করে কনফুসিয়, বৌদ্ধ এবং পরবর্তীকালের নব কনফুসিয়বাদের চিন্তাধারা।

জাপানে কনফুসিয় ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দার্শনিক ফুজিউয়ারা (১৫৬১-১৬১৯ খ্রি.) এবং হায়াশি রাজান (১৫৮৩-১৬৫৭ খ্রি.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মতবাদ 'সুসিগাকুহা' নামে প্রচারিত ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী অস্তিত্বের চরম হচ্ছে 'তাইকেকু' অথবা 'মুকেকু'। এই চরম অস্তিত্বই বিশ্বের নিয়ন্তা। অস্তিত্বের চরম যেমন 'তাইকেকু' তেমনি ভাবের মূল হচ্ছে 'রী' অথবা 'লী'। বস্তুর মূল 'কী' অথবা 'চী'র সঙ্গে 'তাই কেকু' এবং 'লী'র সংযোগে সৃষ্ট হয়েছে বিচিত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্য জগৎ।

ইউরোপীয় দর্শনের বেকন, হবস, কপারনিকাস, গেলিলিও, নিউটন প্রমুখ চিন্তাবিদের অভিমতের সঙ্গে পরিচয়ের ভিত্তিতে জাপানে সামন্তবাদী চিন্তাধারার প্রতিবাদী হিসাবে বস্তুবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে। এই নবতর বিকাশে যে সমস্ত জাপানি দার্শনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে কাইবারা একিকেন (১৬৩০-১৭১৪ খ্রি.) মুরো কুয়োসা (১৬৫৮-১৭৩৪ খ্রি.) ইতো জিনসাই (১৬২৭-১৭০৫ খ্রি.) ইয়ামা গাতা শুমান (১৬৮৭-১৭৫২ খ্রি.)-এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাপানি সামন্তবাদের পরিণাম কাল হিসাবে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ এবং অষ্টাদশ শতকের সূচনাকে চিহ্নিত করা চলে। এই পর্বের প্রধান বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন আন্দোশোকি। তিনি নব কনফুসিয়বাদের 'সীমাহীন ভাব'-এর তত্ত্বকে পরিত্যাগ করে 'বিরামহীন সৃজন ক্রিয়ার' নীতি সমর্থন করেন। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আন্দোশোকির ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে বিশ্বের মূল হচ্ছে পাঁচটি মৌলিক এবং সীমাহীন

বস্তুগত শক্তি। এই মূল শক্তিগুলি স্বয়ংক্রিয়। আন্দোশোকি ছিলেন সামন্ততন্ত্রের আপসহীন প্রতিবাদী এবং জ্ঞানবিকাশের উদ্গাতা। মানুষে মানুষে অসাম্যকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক বৈষম্য এবং বিরোধের মূল বলে ঘোষণা করেছিলেন। জমির যৌথ চাষকে তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বলে প্রচার করতেন।

জাপানে আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে : ১৮৬৭-৬৮ সালে। এ বিপ্লব অসম্পূর্ণ থাকলেও উনবিংশ শতকের জাপানি দর্শনের বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভূত প্রভাব ছিল। এই সময়ে জাপানি দর্শনে দুটি প্রতিধারার উদ্ভব ঘটে। এর একটিকে কারনো গাকুশা বা আমলাতন্ত্রের দর্শন ও বিজ্ঞান এবং অপরটিকে মিনকান গাকুশা বা জনসাধারণের দর্শন ও বিজ্ঞান বলা হত। আমলাতন্ত্রীর দর্শন যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্বার্থবহ করে রাখার চেষ্টা করেছে, জনসাধারণের দর্শন সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বৃহত্তর জনসমাজের স্বার্থ সাধন করার প্রয়াস পেয়েছে। এই দ্বিতীয় ধারার একজন প্রখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম হচ্ছে নাকায়ে (১৮৪৭-১৯০১ খ্রি.)। প্রগতিশলি জাপানি বিজ্ঞান ও সামাজিক চিন্তাধারার বিকাশে এঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকের অন্যান্য বস্তুবাদী এবং দ্বান্দ্বিক দার্শনিকের মধ্যে রয়েছেন তোসাকাজেন (১৯০০-১৯৪৫), কোয়াকামী হাজিমে (১৮৭৯-১৯৪৬) এবং নাগাতা হিরোশি (১৯০৪-১৯৪৭)।

Jaspers, Karl : কার্ল জাসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯ খ্রি.)

জার্মান অস্তিত্ববাদী দর্শনের একজন প্রবক্তা। কার্ল জাসপার্স তাঁর দার্শনিক চিন্তা প্রধানত মনোবিকলনবিদ হিসাবে শুরু করেন। দার্শনিক সমস্যাসমূহের সমাধানে তিনি তাঁর মনোবিকলনবাদী চিন্তা দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হন। জাসপার্সের মতে ব্যক্তির মনোবিকলন কেবলমাত্র মানসিক বিপর্যস্ততার প্রকাশ নয় ; মানসিক বিপর্যস্ততা ব্যক্তিত্বের উৎস সন্ধানের প্রকাশ। ব্যক্তির এই আত্মানুসন্ধানই হচ্ছে দর্শনের মূল। জাসপার্স মনে করেন ব্যক্তির আসল সত্তা হচ্ছে 'সাইফার' বা প্রকাশমান সংকেত। দর্শনের মূল কাজ হচ্ছে এই সংকেতের তাৎপর্য উদ্ধার করে চলা। জ্ঞান বলতে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো তথ্য বা তত্ত্ব নয়। সংকেতের তাৎপর্য উদ্ধার করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে জ্ঞান। তা ছাড়া যুক্তির মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বে অযৌক্তিক সত্তা অনেক আছে। অযৌক্তিক মানেই অসত্য নয়। দর্শনের অপর কাজ হচ্ছে এই অযৌক্তিক শক্তিকে উপলব্ধি করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করা। জাসপার্সের অস্তিত্ববাদের প্রধান প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'বর্ডারলাইন সিচুয়েশন' বা প্রান্তিক পরিস্থিতি কিংবা বলা চলে 'প্রান্তিক সংকট'-এর তত্ত্বে। ব্যক্তি তার অস্তিত্বের সঠিক তাৎপর্য কেবল মাত্র কোনো গভীর সংকট মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারে। অসুস্থতা, মৃত্যু, অনুশোচনার অতীত কোনো অপরাধবোধ— এ রকম সংকটকালেই ব্যক্তির রহস্যময় অস্তিত্বের সংকেত সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। এমন মুহূর্তে ব্যক্তি তার প্রাত্যহিক লেনদেন, টানাপড়েন কিংবা সত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বেড়াজাল থেকে পরিপূর্ণ এক মুক্ত অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। আর এমন মুহূর্তেই সে তার মূল অস্তিত্বের মুখোমুখি হয় ; সমস্ত সৃষ্টি ও শক্তির মূল যে বিধাতা তার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি এমনি মুহূর্তে গভীরভাবে অভিষিক্ত হয়।

Jeans, James : জেমস জিনস (১৮৭৭-১৯৪৬ খ্রি.)

জেমস জিনস ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত পদার্থবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সৌর জগৎ সম্পর্কে জেমস জিনস-এর তত্ত্বটি বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। গ্রহ জগতের উদ্ভব ব্যাখ্যার জন্য জেমস জিনস তাঁর এই তত্ত্বে বলেছিলেন যে, সূর্য এবং অপর একটি তারকার মধ্যে আকস্মিক সংঘর্ষের পরিণতিতে গ্রহমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানকালে এই তত্ত্ব আর সঠিক বলে গৃহীত হয় না। বিজ্ঞানের উপর, বিশেষ করে কারিগরি ক্ষেত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ আছে। কিন্তু জেমস জিনস বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সঙ্গীতের দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতারাজি এবং রচনাবলীর জন্য।

Jataka : জাতক

গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মসমূহের কাহিনী ভাণ্ডার। 'জাতক' এর অর্থ জন্মগ্রহণকারী। এ সমস্ত কাহিনী পালি সাহিত্যের সূত্ত পিটকের অঙ্গিভূত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ৫৫০টি পূর্বজন্মের পরিণামে তাঁর সর্বশেষ জীবন লাভ করেন। এই সমস্ত পূর্বজন্মে তিনি কীভাবে জীবনযাপন করেছেন তার কাহিনী নিয়েই জাতক গ্রন্থ। জীবনে ব্যক্তির পক্ষে করণীয় অকরণীয়ের উপদেশমূলক জাতক কাহিনী শুধু এশিয়ায় নয়, য়ুরোপেও বিভিন্ন নামে প্রচলিত হয়েছিল। য়ুরোপে প্রচলিত ইশপের গল্প জাতক কাহিনীর রূপান্তর।

'বিশ্বকোষ' নামক প্রখ্যাত বাংলা জ্ঞানকোষে 'জাতক' এর বিবরণ এরূপ : 'জাতক, বৌদ্ধ গ্রন্থবিশেষ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক এক জন্মের বিবরণ। বৌদ্ধগণ বলেন, "সমস্ত জাতকের সংখ্যা ৫৫০। বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তী অবস্থানকালে তাঁহার শিষ্যগণকে মোক্ষ ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ৫৫০ পূর্বজন্মের যে যে অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন তাহাই ঐ সমস্ত জাতকে গল্পচ্ছলে বলিয়া যান। বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বলিয়া বৌদ্ধগণ এই সকল গ্রন্থকে পরম পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া মান্য করেন। এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রচলিতদের মধ্যে অগস্ত্য, অপুত্রক, অধিসহ্য, শ্রেষ্ঠী, আয়ো, ভদ্রবর্গীয়, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধবোধি, চন্দ্রসূর্য, দশরথ, গঙ্গাপাল, হংস, হস্তী, কাক, কপি, ক্ষান্তি, কাল্মষ পিণ্ডি, কুম্ভ, কুশ, কিন্নর, মহাবোধি, মহাকপি, মহিষ, মৈত্রীবল, মৎস্যমৃগ, মধাদেবীয়, পদ্মাবতী, রুরু, শক্র, শারভ, শশ, শতপত্র, শিবি, সুভাস, সুপারগ, সুতসোম, শ্যাম, উন্মাদয়ন্তী, বানর, বর্তকপোত, বিশ, বিশ্বম্ভর, বৃষভ, ব্যঘ্র, যজ্ঞ, বৃষহরণীয়, লতুব, বিতুর, পুষ্কর জাতকের নাম উল্লেখ করা যায়।... এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত। —অনেকে অনুমান করেন এই সকল জাতক দুই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতন্ত্রের বা ঈশপের গল্পের ন্যায়। অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্পের পরিবর্তিত বৌদ্ধরূপ।"

John of Salisbury : স্যালিসবারির জন (১১১৯-১১৮০ খ্রি.)

দ্বাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ছিলেন স্যালিসবারির জন। ফরাসি দেশে প্যারিসে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং রোম ভ্রমণ করেন। ১১৫৯ সনে তিনি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার

উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম দিয়েছিলেন 'পলিক্রাটিকাস'। এই গ্রন্থে মধ্যযুগের আবহাওয়াতেও জন শাসকের গুণাবলীর উপর যেসব মন্তব্য করেন তার মধ্যে যুগের প্রেক্ষিতে যুক্তি এবং সাহসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। জন শাসক বা রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করলেও শাসককে যে বিধানকে মান্য করে প্রজাসাধারণের জন্য ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে যে রাজা ঈশ্বরের ন্যায়ের বিধান ভঙ্গ করে শাসন করবে, তাকে প্রজাসাধারণ স্বৈরশাসক বলে বিবেচনা করবে। এবং এমন স্বৈরশাসকের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রজাদের অধিকার আছে স্বেচ্ছাচারী রাজাকে হত্যা করার। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন রোমের স্বৈরাচারী শাসকদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ দেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় হেনরি। সম্রাটের সঙ্গে তাঁর অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার টমাস বেকেটের (১১১৮-১১৭০) বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে এবং টমাস বেকেটের উপর যখন রাজরোষ নেমে আসে তখন জন টমাস বেকেটকে সমর্থন করেছিলেন। টমাস বেকেট রাজার অনুচরদের দ্বারা ১১৭০ সনে নিহত হন।

Judaism : ইহুদিবাদ

প্রাচীন ইহুদিগোত্রসমূহের বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে একেশ্বরবাদী ইহুদি ধর্মের উদ্ভব ঘটে।

ইহুদিবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, জেহোভাকে ঈশ্বর বলে মনে করা, পরিণামে ত্রাণকর্তার আবির্ভাবে আস্থা স্থাপন এবং ইহুদিয়া যে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা। ওলড টেস্টামেন্ট বা বাইবেলের প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে ইহুদি ধর্মের মূল গ্রন্থ। ইহুদি ধর্মের মধ্যে একটা ঐতিহাসিকতার লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণভাবে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় এরূপ মনে করা হয় যে, ঈশ্বর কোনো একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে বিশ্বচরাচরের জীবসমূহকে সৃষ্টি করে চরম বিচারক হিসাবে তিনি তাদের অবলোকন করতে থাকেন। কিন্তু ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে ঈশ্বর প্রথমে জগৎ অর্থাৎ জড়বিশ্বকে সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তী এক সময়ে সে জগতের মধ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেন। এরও পরবর্তীকালে তিনি ইহুদি জাতিকে তাঁর মনোনীত জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেন।

Judgement : রায়, মানসিক বাক্য

আইন-শাস্ত্রে কোনো বিবাদ বা সমস্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্থিরকৃত এবং ঘোষিত সিদ্ধান্তকে রায় বলে।

যুক্তিশাস্ত্রে মানসিক বাক্য এবং ভাষায় প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে একটা পার্থক্য করার চেষ্টা করা হয়। আমরা ভাষার মাধ্যমেই যুক্তি প্রদর্শন করি। এই যুক্তি গঠনগতভাবে কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যুক্তির এরূপ বাক্যকে যৌক্তিক বাক্য বলা হয়। কিন্তু একটি বাক্যের বিষয়কে ভাষায় প্রকাশ করার পূর্বে আমরা তাকে প্রথমে মন বা চিন্তার মধ্যে গঠন করি। সকল মানুষ মরণশীল ; রহিম একজন মানুষ ; সুতরাং রহিম

মরণশীল। এখানে তিনটি বাক্য সমন্বয়ে একটি যুক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটিকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ব্যক্তিমাত্রকেই চিন্তার মধ্যে তাকে প্রাথমিকভাবে গঠন করতে হয়। একটি যৌক্তিক বাক্যের এই ভাষায় প্রকাশপূর্ব পর্যায়কে মানসিক বাক্য বলা হয়।

Juliot-Curie : জুলিও কুরী (১৯০০-১৯৫৮ খ্রি.)

বিখ্যাত ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী এবং বামপন্থী প্রগতিশীল চিন্তাবিদ। জুলিও কুরী ও তাঁর স্ত্রী আইরেনী কুরী যুগ্মভাবে 'কৃত্রিম বিকিরণ তত্ত্ব বা আরটিফিসিয়াল রেডিও এ্যাকটিভিটি' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। নিউট্রন আবিষ্কৃত হলে জুলিও কুরী পারমাণবিক মৌলকে ভেঙে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা ও প্রয়োগের কথা বলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই মাত্র কুরী দম্পতি নিবদ্ধ ছিলেন না। জুলিও কুরী বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সক্রিয় উদ্যোগী কর্মী ছিলেন। বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের অনুসারী জুলিও কুরী সমাজ প্রগতির জন্য একজন বৈজ্ঞানিকের সচেতন ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সেই আদর্শকে অনুপ্রেরণাদায়কভাবে প্রয়োগ করেন।

Justice & Injustice : ন্যায়, ন্যায়বিচার, অন্যায়, অবিচার

মানুষের সামাজিক জীবনের কার্যক্রম, আচার-আচরণের মূল্যবোধক শব্দ। কিন্তু মানুষের কোনো কাজ ন্যায় এবং কোনো কাজ অন্যায় এ নিয়ে দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তির কোনো বিশেষ কাজ বা আচরণকে ন্যায় বলে এবং অপর কোনো কাজকে অন্যায় বলে নির্দিষ্ট করে। কিন্তু এই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি কি? পূর্বে এরূপ ধারণা করা হতো যে ন্যায়-অন্যায়ের একটা চরম এবং স্থায়ী অতিলৌকিক মাপকাঠি আছে। সেই মাপকাঠির আদর্শে কেবল ব্যক্তির নয়, সামাজিক সমস্ত সংস্থার আচরণও মূল্যায়িত হয়। ন্যায়-অন্যায়ের এই চরম মাপকাঠি মানুষের জন্য কেবল তার সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী নয়, সে আদর্শ তার জীবনে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণাদায়ক, আকর্ষণ এবং কাম্য শক্তি হিসাবেও কাজ করে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস ও পর্যালোচনা প্রমাণ করেছে যে মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধ কোনো অপরিবর্তনীয় স্থায়ী ধারণা নয়। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো চরম অতি-লৌকিক বা ভাবগত মানদণ্ডের অস্তিত্ব নেই। মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধ যে কেবল সমাজ থেকে সমাজে এবং যুগ থেকে যুগে পৃথক ও পরস্পরবিরোধী হয়েছে তাই নয়। দ্বন্দ্বমান শ্রেণীতে বিভক্ত কোনো সমাজের মধ্যে একইকালে একই বিষয়ে ন্যায়-অন্যায়ের পরস্পরবিরোধী পরিমাপক অনুসৃত হতে পারে। শ্রমিকের শ্রম ক্রয় করা এবং সেই শ্রমের ভিত্তিতে মুনাফা অর্জন করা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যেখানে পুঁজির মালিক শ্রেণী ন্যায্য, আইনসঙ্গত এমনকি সর্বজন মান্য বলে বিবেচনা করে, সেখানে শ্রমের মালিক অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী তাকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে বিবেচনা করে। ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র বৃহৎ এবং স্থায়ী মাপকাঠি হতে পারে মানুষের কল্যাণ

ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের। কিন্তু পরস্পর সংঘাতমূলক শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত কোনো রাষ্ট্রে ন্যায়-অন্যায়ের এরূপ একক মাপকাঠির চিন্তা করা যায় না। দ্বন্দ্বমান শ্রেণীর যেখানে বিলোপ ঘটেছে সেরূপ সমন্বিত সমাজেই মাত্র ন্যায়-অন্যায়ের একক মাপকাঠির উদ্ভব ঘটতে পারে।

প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রনীতির দর্শনে 'ন্যায়বিচার'-এর বিশেষ আলোচনা দেখা যায়। গ্রিকগণ ন্যায়কে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অলঙ্ঘণীয় আদর্শ বলে বিবেচনা করতেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে দর্শনগুরু সক্রেটিস এবং সঙ্গীদের বিতর্কে ন্যায়কে অন্যতম আলোচনার বিষয় হিসাবে উপস্থিত করেন। ন্যায় সম্পর্কে প্লেটোর অভিমতের তাৎপর্য হচ্ছে : সমাজে যার যেমন অবস্থান সেই অবস্থান অনুযায়ী ব্যক্তির করণীয় করাই হচ্ছে ন্যায়। আবার সেই অবস্থান অনুসারে সমাজের কাছ থেকে যার যা প্রাপ্য তা পরিশোধ করাই হচ্ছে সমাজের পক্ষে ন্যায়। মোট কথা যে দাস সে দাসের মতো থাকবে এবং যে প্রভু সে প্রভুর ন্যায় দাসকে শাসন করবে। এরূপ তত্ত্বের মূল অর্থ হচ্ছে প্রচলিত ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন কাম্য নয়।

Kant Immanuel : ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.)

ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন অষ্টাদশ শতকের জার্মানির দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। জার্মানিতে সনাতন ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি। জার্মানির কনাইবার্গ শহরে তাঁর জন্ম। জীবনের পরবর্তী সময়ে এই কানাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্ট জ্যোতির্মণ্ডলের নীহারিকা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করতেন, যে-জ্যোতির্মণ্ডলে আমাদের বাস তার বাইরেও সংখ্যাহীন জ্যোতির্মণ্ডলের মহাবিশ্ব বিরাজ করছে। পৃথিবী গ্রহের আবর্তনে জোয়ার ভাটার বিপরীত প্রভাব এবং গতি স্থিতির আপেক্ষিকতার তত্ত্বকেও কান্ট প্রতিষ্ঠিত করেন। হেগেল ও মার্কস-এর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বিকাশে কান্টের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু কান্ট ভাববাদী দার্শনিক হিসাবেই অধিক পরিচিত। তাঁর ভাববাদকে অপরাপর ভাববাদ থেকে পৃথক করে ক্রিটিকাল অর্থাৎ বিচারবাদী বা বৈচারিক এবং ট্রান্সেণ্ডেন্টাল বা অতিক্রমী ভাববাদ বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কান্টের দার্শনিক জীবনকে আমরা বৈচারিক-পূর্ব এবং বৈচারিক-উত্তর যুগ হিসাবে বিভক্ত করতে পারি।

বৈচারিক-পূর্ব যুগে সত্তার প্রশ্নে কান্ট বাস্তব সত্তা এবং যুক্তিগত সত্তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার প্রয়াস পান। এ যুগে কান্টের কাছে বিমূর্তসূত্রের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অধিকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হত। এ ক্ষেত্রে কান্টের উপর অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাবকে আমরা লক্ষ করতে পারি। ১৭৭০ সাল থেকে কান্টের দর্শনে বিচারবাদী যুগের শুরু। তাঁর 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন' বা 'বিশুদ্ধযুক্তির সম্যক বিচার'-এর প্রকাশ ঘটে ১৭৮১ সালে এবং 'ক্রিটিক অব প্রাকটিক্যাল রিজন' 'বাস্তবযুক্তির সম্যক বিচার'-এর প্রকাশ ঘটে ১৭৮৮ সালে।

এই সমস্ত গ্রন্থে কান্ট জ্ঞান, নীতি এবং নন্দনতত্ত্বের পর্যালোচনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এ যুগে কান্টের প্রতিপাদ্য ছিল জ্ঞানের প্রকার এবং মানুষের জ্ঞান-শক্তির সীমারেখার পূর্ব-আলোচনা ব্যতীত আমাদের পক্ষে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব স্থির করা আদৌ সম্ভব নয়। জ্ঞানের সীমা এবং প্রকারের পর্যালোচনার মাধ্যমে কান্ট অজ্ঞেয়বাদের সঙ্কটে সমুপস্থিত হন। তাঁর প্রত্যয় ঘটে যে, বস্তু যেমন আছে, তাকে তেমনভাবে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানের কতকগুলি সূত্রের মাধ্যমেই মাত্র মানুষ বস্তুকে জানতে পারে। সূত্রের মাধ্যম না থাকলে মানুষ বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারত। কিন্তু বস্তুর তেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুকে মানুষ 'বস্তুত্বে'র সূত্র, সময়কে 'সময়'রূপ সূত্র দ্বারাই জানতে পারে। জ্ঞানের সূত্রগুলি মানুষ অভিজ্ঞতা-পূর্বরূপে লাভ করে। কিন্তু সূত্রই সত্তা নয়। 'সময়'রূপ সূত্রের মাধ্যমে আমরা সময়কে জানি। তার মানে এই নয় যে, 'সময়'রূপ সূত্রই সময়। বস্তু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্যাটেগরি। বা সূত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বস্তু বা সত্তাকে জানি না, সত্তার সূত্রমাধ্যম প্রকাশকেই জানি।

নীতিশাস্ত্রে কাণ্ট 'ক্যাটেগরিক্যাল ইমপারেটিভ' বা 'শর্তহীন নিয়ামক'-এর বিধান তৈরি করেন। আচরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন নিয়ামকের ব্যাখ্যা দিয়ে কাণ্ট বলেন, মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায় কিংবা ভালোমন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের ফলাফল কোনো বিবেচনার বিষয় হবে না। বিষয়-নিরপেক্ষভাবে আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্দিষ্ট হবে। পিতা সন্তানকে পালন করবে সন্তানের কাছ থেকে ভবিষ্যতে প্রতিদানের আশায় নয়, সন্তানের প্রতি স্নেহের আকর্ষণে নয়—তাকে পালন করা তার কর্তব্য বলে সে তাকে পালন করবে। নন্দনতত্ত্বেও কাণ্ট বিষয়নির্বিশেষ এক আনন্দের কল্পনা করেন। কাণ্টের দর্শনে পরস্পরবিরোধিতা এবং অবাস্তবতার সাক্ষাৎ মেলে। সামাজিক বিকাশের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে কাণ্টের দর্শনের এই দুর্বলতার মূলে ছিল অষ্টাদশ শতকের জার্মান পুঁজিবাদী শ্রেণীর অগ্রসরতা এবং দুর্বলতা।

Kautilya : কৌটিল্য (খ্রি. পূ. ৩২৭)

প্রাচীন ভারতের কূট রাজনীতিজ্ঞ এবং 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রণেতারূপে পরিচিত। কেবল কৌটিল্য নয়, ইতিহাসে তাঁকে চাণক্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত বলেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ সনে ভারত অভিযানে আসেন। কৌটিল্যকে এই সময়কার রাজনীতিক বলে অনুমান করা হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী এক রাজার কাছ থেকে রাজ্য অধিকারে কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রণাদাতা হিসাবে কাজ করেন এবং চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' চন্দ্রগুপ্তের শাসনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ৬০০ শ্লোকে গ্রন্থখানি রচিত। এর অধ্যায় সংখ্যা ১৫০। এই গ্রন্থের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এখানে যে, এর মধ্যে রাষ্ট্র শাসনের সর্ববিষয়ে সম্রাট তথা শাসকের করণীয় সম্পর্কে উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্র বা শাসকের প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রিক চিন্তাবিদ এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর ন্যায় তাত্ত্বিক আলোচনা না থাকলেও শাসকের করণীয় সম্পর্কে কৌটিল্যের উপদেশাবলী থেকে রাষ্ট্র ও শাসক সম্পর্কে তাঁর একটি ধারণারও আভাস পাওয়া যায়। শাসকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্র এবং নিজের শাসনকে রক্ষা করা। তার শাসনকে রক্ষা করার জন্য তাকে শত্রু মিত্রকে চিহ্নিত করতে হবে। সম্রাটের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো ষড়যন্ত্র সৃষ্ট হচ্ছে কিনা, তা জানার জন্য তাকে গুপ্তচর নিয়োগ করতে হবে। শাসককে রাষ্ট্রের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। তার কর্মচারীবৃন্দকে নির্দেশ দিতে হবে। 'অস্ত্রশাস্ত্রে'র মধ্যে সম্রাটের দৈনন্দিন কার্যের বিভিন্ন ভাগ ও প্রহরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ও নিজের শাসনকে রক্ষা করার জন্য শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সম্রাটকে প্রয়োজনে নির্মম হতে হবে। এ লক্ষ্যে কোনো কৌশল গ্রহণেই সম্রাটের দ্বিধা করলে চলবে না। সম্রাটের শাসনের লক্ষ্য হবে প্রজাদের সুশাসন করা। সম্রাটকে সুশাসনের জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে। এই শপথের মর্ম হবে আমি প্রজাদের নির্যাতন করলে মৃত্যুর পরে আমার যেন নরকবাস ঘটে। 'অর্থশাস্ত্রে' শাসনের যে কূটনীতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এই গ্রন্থকে সমসাময়িক গ্রিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস' গ্রন্থের কোনো কোনো আলোচনার সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তুলনা করা চলে। শাসককে নিজের শাসনকে রক্ষা করার জন্য কোনো কৌশল গ্রহণেই দ্বিধা করলে চলবে না—অর্থশাস্ত্রের এরূপ উপদেশ ইউরোপের পঞ্চদশ শতকের ম্যাকিয়াভেলীকে ইউরোপের কৌটিল্য বলে আখ্যায়িত করা চলে।

Kautsky, Karl : কার্ল কাউট্স্কী (১৮৫৪-১৯৩৮ খ্রি.)

জার্মান ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবিদ। কার্ল কাউট্স্কী বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার তাত্ত্বিক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। ১৮৮১ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর সঙ্গে কাউট্স্কীর সাক্ষাৎ ঘটে। এর পূর্ব দশকেই শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাউট্স্কীর নিবন্ধসমূহ প্রায় প্রকাশিত হত। মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর সঙ্গে সহযোগিতার যুগে ইতিহাস এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উপর কাউট্স্কীর রচনাসমূহ মার্কসবাদী ভাবধারা প্রসারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু মার্কস এবং এঙ্গেলস কাউট্স্কীর সকল তত্ত্বের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাঁরা অভিযোগ করেন যে কাউট্স্কীর রচনায় মার্কসবাদের বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের মতে সর্বহারা বিপ্লবের মূল তত্ত্ব যেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদের ভিত্তিতে সর্বহারার রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দাবি করে সেখানে কাউট্স্কী মার্কসবাদের ব্যাখ্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। ১৯১০ সালে মার্কসবাদের সঙ্গে কাউট্স্কীর বিচ্ছেদ চূড়ান্তরূপ ধারণ করে। তিনি জার্মানির শ্রমিক আন্দোনের প্রধান সংস্থা জার্মান সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে একটি বিরোধী উপদল গঠন করে মার্কসবাদের প্রকাশ্যভাবেই সমালোচনা করতে শুরু করেন। এই মতভেদের কারণে লেনিন তাঁকে শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব কার্যক্রম এবং তত্ত্বগত ব্যাখ্যায় সুবিধাবাদী বলে মনে করতেন। কাউট্স্কীর দার্শনিক রচনাসমূহে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

Khilafat Movement : খেলাফত আন্দোলন

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গণআন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় মুহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) এবং শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৮)। নামে ধর্মীয় হলেও ক্রমান্বয়ে তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং মূলত একটি অসহযোগ আন্দোলন বলে অভিহিত হয়। এই আন্দোলনের মূলে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তুরস্কের সুলতান তথা খলিফার উপর আক্রমণাত্মক আচরণ। ভারতের মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন থাকলেও ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্কের সমর্থনহীনতার কারণে এবং খেলাফতের অপসারণে ভারতে খেলাফত আন্দোলন বাতিল হয়ে যায়।

Kierke gaard, Soren : সোরেন কিয়ার্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫ খ্রি.)

ডেনমার্কের অধিবাসী কিয়ার্কেগার্ড ছিলেন অস্তিত্ববাদের পূর্বসূরি। তাঁর মৃত্যু ঘটে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থসমূহের অনুবাদ এবং তার অভিমতের প্রচার ঘটে বিশ শতকের মধ্যভাগে। জাঁপল সার্ত্রে, রেনল্ড নাইবুর এবং অপরাপর অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের উপর কিয়ার্কেগার্ডের প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ। জ্ঞানের প্রশ্নে কিয়ার্কেগার্ড হেগেলের 'চরম জ্ঞান'বাদের প্রতিবাদী ছিলেন। মানুষের পক্ষে চরমজ্ঞান লাভ সম্ভব এবং চরম জ্ঞান হচ্ছে যুক্তিগত জ্ঞান, হেগেলের এই তত্ত্বকে কিয়ার্কেগার্ড অগ্রাহ্য করেন। তিনি প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো এবং এ্যারিস্টট্ল-এর এরূপ অভিমতকেও অস্বীকার করেন যে, জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা থেকে বহির্গত হয় এবং ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান অর্জনের অর্থ হচ্ছে নিজের অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে ব্যক্তির চেতনা লাভ। এর বিরোধী তত্ত্ব হিসাবে কিয়ার্কেগার্ড অভিমত প্রকাশ করেন যে, জ্ঞান অবশ্যই ব্যক্তির জন্য একটি বহিরাগত বিষয়। ব্যক্তিকে জ্ঞান আহরণ করতে হয় তার শিক্ষক কিংবা বিধাতার নিকট থেকে। বিধাতা কেবল যে আমাদের জ্ঞানদান করেন তাই নয়। বিধাতা সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আমাদের দান করেন। কিয়ার্কেগার্ডের কাছে ব্যক্তির ইচ্ছার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে ইচ্ছার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীন। ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব নিজেই স্বাধীনভাবে স্থির করতে পারে। 'স্বাধীনতার সংজ্ঞা কি? ব্যক্তি যা চায় তা হতে পারাই হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতা'—কিয়ার্কেগার্ডর এই উক্তিটি পরবর্তীকালে অস্তিত্ববাদের অন্যতম মূলসূত্র হিসাবে প্রচারিত হয়। কিয়ার্কেগার্ড যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী স্বীকার করা কঠিন হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাকে স্বীকার করতে হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাসের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। কিয়ার্কেগার্ডের গ্রন্থসমূহের শিরোনামগুলির মধ্যেই তাঁর দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আইদার/অর বা হয়/নয়। সংলাপের আকারে লিখিত এই গ্রন্থে তিনি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যার এক জবাবের বিরুদ্ধে অপর জবাব তৈরি করে জবাবের সংলাপ রচনা করেছেন। তাঁর অপর এক গ্রন্থের নাম 'ভয়' এবং আর একখানি শিরোনাম 'আমৃত্যু মৃত্যু' বা 'সিকনেস আনটু ডেথ'। এ সব গ্রন্থের মূলসুর হচ্ছে হতাশা। ধর্মীয় বিশ্বাসে আত্মসমর্পণই হচ্ছে মানুষের পক্ষে হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়—কিয়ার্কেগার্ডের দর্শনের সিদ্ধান্ত ছিল এই। সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়ে এ দর্শনের যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা রয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

Knowledge : জ্ঞান

সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক শ্রম এবং চিন্তার মধ্যেই জ্ঞানের উদ্ভব। পরিবর্তমান বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের ভাবগত ধারণা এবং তার ভাষাগত প্রকাশ—এই দুই নিয়েই জ্ঞান। এক কথায়, জ্ঞান সামাজিক ব্যাপার। সমাজের মধ্যে ব্যক্তির ক্রিয়াকাণ্ডের বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে জ্ঞান সমস্যার সঠিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্ব পূর্বে তেমন স্বীকৃত হতো না। বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি থেকে আহৃত

সমাধান বা তত্ত্বকে জ্ঞান বলা হতো। এরূপ ধারণা করা হতো যে, বাস্তব জগৎ থেকে যে ব্যক্তি যত বিচ্ছিন্নভাবে সমস্যা নিয়ে আত্মনিবিষ্ট হতে পারে সেই তত জ্ঞানী। সমাজ ও বস্তু জগতের উর্ধ্বে কোথাও 'জ্ঞান'-রূপ একটা অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তি কেবল বিশ্লিষ্ট চিন্তা বা ধ্যানের মাধ্যমেই সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। জ্ঞানের সর্বজনীন সূত্রগুলি মানুষের জন্যে বিধাতার দান বলে মনে করা হতো। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটি অবদান এই যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জ্ঞানকে পরিবেশের সঙ্গে সমাজবদ্ধ ব্যক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে এবং তার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী চিন্তার বিকাশ ইত্যাদি মিলিয়ে একটি সামগ্রিক বিকাশমান প্রক্রিয়া হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জ্ঞানের যে সর্বজনীন সূত্রগুলিকে আমরা ঈশ্বর দত্ত বলে অনুমান করেছি যে সূত্রগুলিও মানুষের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ফল। এ কারণে মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে বিকাশলাভ করার গোড়া থেকেই মানুষ জ্ঞানী হতে পারে নি। বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিকাশের একটা পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করেছে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ের সূচক।

Kropotkin : ক্রোপোটকিন (১৮৪২-১৯২১ খ্রি.)

ক্রোপোটকিন প্রিন্স বা রাজকুমার ক্রোপোটকিন বলে পরিচিত। নৈরাষ্ট্রবাদের একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক। রুশদেশে একটি রাজবংশে তাঁর জন্ম। ভূগোলবিদ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয় অঞ্চলে অভিযান করে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক মানচিত্র তৈরি করার তথ্যসামগ্রী তিনি সংগ্রহ করেন। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ক্রোপোটকিন নারোদনিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন। কিন্তু দু বৎসর পরে কারাগার থেকে পলায়ন করে ক্রোপোটকিন দেশের বাইরে চলে যান এবং ১৯১৭ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন। এ জন্য ফরাসি সরকার ১৮৮৬ সালে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু ফরাসি পার্লামেন্টের সদস্যদের দাবিতে তাঁকে ফরাসি সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ক্রোপোটকিন সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের কথা বলেন। কিন্তু সাম্যবাদের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বের পার্থক্য এই যে, ক্রোপোটকিনের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানুষের স্বেচ্ছামূলক একটা যৌথ সংস্থায় পরিণত হয়ে যাবে। উৎপাদনকারী মানুষ স্বেচ্ছামূলকভাবে আঞ্চলিক ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে সংগঠিত হবে। তখন আর রাষ্ট্রীয় সংস্থার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সাম্যবাদও তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় মানুষের সমাজের উন্নতির কল্পনা করে। কিন্তু সে অবস্থা সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই অর্জিত হবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনমাত্রই রাষ্ট্রহীন অবস্থার উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে না। সাম্যবাদের সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে ক্রোপোটকিনকে সোভিয়েত রাষ্ট্র তার খ্যাতির জন্য তাঁকে সম্মানের সঙ্গে দেখেছে। মৃত্যুর পর ক্রোপোটকিনের জন্মস্থানকে একটি জাদুঘরে পরিণত করা হয়।

Labour : শ্রম

'শ্রম হচ্ছে প্রধানত মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ ক্রমান্বয়ে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।' মার্কস : ক্যাপিটাল : প্রথম খণ্ড।

শ্রম বলতে কায়িক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমই বুঝায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে প্রতিমুহূর্তে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। বস্তুজগৎ যেমন মানুষকে স্পর্শ করে এবং আঘাত করে, মানুষও তেমনি বস্তুজগৎকে স্পর্শ করে এবং প্রত্যাঘাত করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়েরই পরিবর্তন ঘটে। মানুষের হাতের যেমন ক্ষমতা আছে শক্ত পাথরকে হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ করার, তেমনি পাথরের ক্ষমতা আছে সেই শক্তিমান হাতের নরম তালুকে কড়াপরা কর্কশ তালুতে পরিবর্তিত করে দেওয়ার। মানুষ তাই শুধু প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে না, সে নিজেও প্রকৃতি দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

মানুষের হাতে প্রকৃতির পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের শ্রম। শ্রমের তিনটি দিক ১. মানুষ কোনো একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রম করে। ২. মানুষ বাস্তব কোনো বস্তু বা বিষয়ের উপর তার শ্রম প্রয়োগ করে। ৩. শ্রমের উপায় হিসাবে মানুষ যন্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করে। মানুষের অস্তিত্বের প্রধান শর্ত হচ্ছে শ্রম। শ্রম ব্যতীত মানুষ জীবন রক্ষা করতে পারে না। আবার এই শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে নিজকে উন্নত করতে পেরেছে। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রধান পার্থক্য এই যে পশু যেখানে প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করে নিজের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে, মানুষ সেখানে শ্রমের মাধ্যমে সে প্রকৃতিকে নিজের দাসে পরিণত করে প্রকৃতি দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করে।

কিন্তু মানুষের সামাজিক অর্থনীতি অবস্থার বিকাশে বিভিন্ন স্তরে শ্রম বিভিন্নভাবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। আদি সাম্যবাদী সমাজে শ্রম ছিল মানুষের যৌথশক্তি। মানুষ যৌথ বা সম্মিলিতভাবে শ্রম করত, শ্রমের উপায় বা হাতিয়ারকে যৌথ মালিকানায় ব্যবহার করত এবং শ্রমের মাধ্যমে লব্ধ ফল-ফসল-সম্পদকে যৌথভাবে ভোগ করত। এরূপ স্তরে এক মানুষের হাতে অন্য মানুষের শ্রমশক্তির শোষণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সমাজ দ্বন্দ্বমান শ্রেণীতে বিভক্তি হয়ে যায়। দ্বন্দ্বমান সমাজে শ্রম আর প্রকৃতির পরিবর্তনে যৌথ শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। শ্রমই জীবনরক্ষা ও তার দৈহিক ও মানসিক আরাম আয়াসের মূল হওয়াতে একের শ্রম ব্যবহার করে অপরের সুখসম্ভোগ নিশ্চিত করার প্রয়াস চলতে থাকে। দুর্বল শ্রেণীর শ্রম সবলতর শ্রেণী নিজের স্বার্থে শোষণ করতে শুরু করে। দাস সমাজে দাসের শ্রমে প্রভুর সম্পদ, সামন্তবাদী সমাজে চাষীর শ্রমে ভূস্বামীর

সম্পদ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে কলকারখানার শ্রমিকের শ্রমের শোষণে পুঁজিপতির ধনের বৃদ্ধি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমকে আর মুক্তশ্রম বলা চলে না। শ্রম এখানে শৃঙ্খলিত। কিন্তু কালক্রমে আবার শৃঙ্খলিত শ্রমিক বিপ্লব করে শ্রমের মুক্তি সাধন করে। শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার সঠিক প্রচেষ্টায় শ্রমিক শ্রেণী মুক্ত শ্রমের যৌথ প্রয়োগের সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তোলে।

La Fargue, Paul : পল লাফার্গ (১৮৪২-১৯১১ খ্রি.)

লাফার্গের জন্ম ফরাসি দেশে। কার্ল মার্কসের জামাতা ছিলেন। লাফার্গ মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করে বহু পুস্তক রচনা করেন। 'রিলিজিয়ন অব ক্যাপিটাল' বা পুঁজিবাদের ধর্ম 'বর্বরযুগ থেকে সভ্যতা পর্যন্ত সম্পত্তির বিকাশ' 'আদম হাওয়ার উপাখ্যান', 'নবম পায়াসের স্বর্গবাস' প্রভৃতি শিরোনামের পুস্তকে লাফার্গ সমাজ ও ধর্মের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। জ্ঞান-সমস্যা নিয়েও তিনি পুস্তক রচনা করেন। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি অজ্ঞেয়বাদকে খণ্ডন করেন। লাফার্গ তাঁর জীবদ্দশায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্যারি শহরের শ্রমিক শ্রেণী অভ্যুত্থান করে প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠা করে। প্যারি শহরের শ্রমিকদের এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে লাফার্গের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মার্কসবাদের ব্যাখ্যায় লাফার্গ আপসহীন মানোভাব পোষণ করতেন। পুঁজিবাদ বিপ্লব ব্যতীত ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে—শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধাবাদী তাত্ত্বিকদের এরূপ অভিমতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। লাফার্গ তাঁর দার্শনিক রচনাসমূহে ইতিহাসের বিকাশের দ্বন্দ্বমূলক বিধান যে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্বিশেষে বাস্তব, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং সমাজের অর্থনীতিক বুনিয়াদ এবং তার রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের সম্পর্ক যে বিদ্যমান তা প্রকাশ করেন। পরবর্তী মার্কসবাদীগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাফার্গের তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা, বিশেষ করে সমাজের অর্থনীতিক বুনিয়াদের উপর তার ভাবগত কাঠামোর সক্রিয় প্রভাবের পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগের পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে অক্ষমতার জন্য তাঁর সমালোচনা করলেও একজন মার্কসবাদী দার্শনিক হিসাবে লাফার্গের অবদান তাঁরা সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করেন।

Language : ভাষা

মানুষের মনের ভাব আদান প্রদান এবং জ্ঞান অর্জনের প্রতীকময় মাধ্যমকে ভাষা বলে।

ভাষাকে ব্যবহার ও সৃষ্টির দিক থেকে স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে চিন্তার প্রকাশ এবং পারস্পরিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য যে ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি তাকে স্বাভাবিক ভাষা বলা যায়। কিন্তু বিশিষ্ট চিন্তার প্রকাশের জন্য সচেতনভাবে আমাদের ভাষা সৃষ্টিও করতে হয়। অঙ্কের চিহ্ন, পদার্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী তত্ত্বের ভাষা, দূর বার্তার কিংবা গোপন তথ্যের সংকেত ইত্যাদি ভাষাকে কৃত্রিম বলা চলে।

ভাষা মানুষের সমাজ জীবনের প্রকাশ। সঙ্গীহীন কোনো ব্যক্তির কথা চিন্তা করলে তার মুখে ভাষার বিকাশ চিন্তা করা যায় না। মানুষ জীবন রক্ষার জন্যই আদিতে সমাজবদ্ধ হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনই হচ্ছে জীবন রক্ষার মূলশর্ত। ব্যক্তিগতভাবে নয় সামাজিকভাবেই ব্যক্তিকে আদিতে খাদ্য উৎপাদন করতে হয়েছে। জীবন রক্ষার এই উপায়ের উৎপাদনে অপরাপর হাতিয়ারের মধ্যে ভাষা ছিল মানুষের অন্যতম প্রাথমিক হাতিয়ার। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ পরস্পরের শ্রমকে সংযুক্ত করে সমষ্টিগতভাবে বনের পশুকে শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, হিংস্র ব্যাঘ্র এবং বৈরী গোত্রের আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছে এবং কালক্রমে অবকাশের ব্যবহারে সুকুমার বৃত্তির চর্চা করে সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পেরেছে।

ভাষা চিন্তার আধারও বটে। চিন্তার মধ্য দিয়ে ভাষার সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটে। কিন্তু ভাষার মধ্যেই আবার চিন্তার অবস্থান ঘটে। চেতানার বিকাশেও ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিত্র থেকে সংকেতে উত্তরণই হচ্ছে ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা।

ভাষা ভাবের প্রকাশ। ভাবকে দেখা যায় না। কিন্তু ভাষার সংকেতকে দেখা যায়। তার উচ্চারণকে শ্রবণ করা যায়। ভাব বিদেহী হলেও ভাবই ভাষার নিয়ন্তা। কিন্তু আমরা জানি মানুষের ভাব সমাজোর্ধ্ব কোনো সত্তা নয়। সমাজবদ্ধ মানুষের ভাবের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সমাজ। ভাষা ইতিহাসের বাহকও বটে। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার এক যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারকে পরবর্তী যুগের মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে পারে। এ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিশ্লিষ্ট চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা পাইনে বলে আমরা অনেক সময়ে অভিযোগ করি। কিন্তু ভাষা ব্যতীত 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' চিন্তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশিষ্ট বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে জ্ঞানের প্রক্রিয়া। এ দিক থেকে যে-কোনো অর্থবোধক শব্দ মাত্রই চিন্তার সাধারণীকরণ। আবার একথাও ঠিক যে চিন্তা এবং ভাষা অভিন্ন নয়। সমাজে ভাষার উদ্ভবের পরে ভাষা চিন্তা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবেই নির্দিষ্ট হয়। প্রত্যেকটি ভাষার একটি নিজস্ব কাঠামো থাকে। শব্দের উচ্চারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক বোধ—প্রভৃতি নিয়েই ভাষার এই আন্তরিক কাঠামো গঠিত। এই কাঠামোর বাইরে একটি ভাষার কোনো প্রতীকের অর্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সহজ নয়।

Language Movement : ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববাংলায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন বাংলা ভাষা আন্দোলন বলে পরিচিত। ঐ বৎসর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রাদেশিক সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করে। গুলীবর্ষণে রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ কয়েকজন তরুণ ছাত্র ও শ্রমিক নিহত হন। বহু বিক্ষোভকারী আহত হন এবং ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকসহ বহুসংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানি সরকারের নির্যাতনে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত

হয়ে পড়লেও বিক্ষোভের মূল পূর্ববাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। পরিশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলন প্রধানত পূর্ববাংলার আন্দোলন। পাকিস্তানের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ববাংলার অবস্থান ও তার জনসংখ্যা ভাষা আন্দোলনের শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করেছে। ভাষা জীবনের অপরাপর সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা নয়। ভাষা জীবনযাপনের উপায় বা মাধ্যম। এজন্য ইতিহাসে সাধারণত ভাষা আন্দোলন বলে জনতার কোনো আন্দোলন বা সংগ্রামকে চিহ্নিত করা হয় না। পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত পূর্ববাংলার কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের আন্দোলন।

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষের শাসক ইংরেজ শক্তির মধ্যস্থতায় অখণ্ড ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের ভীতিমুক্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ববাংলার জনসাধারণ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আশা ব্যাপকভাবে পোষণ করতে শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক বিকাশের চেষ্টাকে তারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের বিরোধী বলে চিন্তা করতে থাকে। পূর্ববাংলাকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রব্যাদির বাজার এবং কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি কার্যকর করতে তারা পূর্ববাংলার জনসাধারণের ভাষা বাংলাকে হীন এবং হিন্দু প্রভাবাধীন বলে পাকিস্তানে পরিত্যাজ্য বলে প্রচার করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় ঘোষণা করেন : 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। তাঁর এই উক্তি এবং পাকিস্তান সরকারের উল্লিখিত উপনিবেশবাদী আচরণ ও নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার চেতনশীল ছাত্র ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে ১৯৪৮ সাল থেকেই অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। পূর্ববাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষক সমাজের মধ্যে তাদের জমি, খাজনা, ফসল ইত্যাদি সমস্যার ক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন চলে আসছিল। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের তেভাগা, ময়মনসিংহের পাহাড়ী অধিবাসী হাজংদের টঙ্ক এবং রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলের সাঁওতাল কৃষকদের আন্দোলন সরকারি নির্যাতনে পর্যুদস্ত হলেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এবং পূর্ববাংলার কৃষক সমাজে বিশেষ রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করে।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ববাংলায় বাস করত। সমগ্র দেশের ১২ কোটি অধিবাসীর মধ্যে সাতকোটির মুখের ভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলা ভাষারই রাষ্ট্রভাষা হওয়া সঙ্গত ছিল।

ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলাদেশের জীবনে ধারাবাহিক আন্দোলন। একদিকে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ক্রমাধিক শোষণ এবং গভীরতর ষড়যন্ত্র, অপরদিকে ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৭০ সালের রাজনীতিক সামাজিক অর্থনীতিক

আন্দোলনের বিশিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে ভাষা আন্দোলন পরিপক্বতা পেয়ে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বিশেষ করে ২১ ফেব্রুয়ারির স্মৃতি দিবস থেকে বাংলাদেশের সর্বাত্মক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ৭ মার্চের তারিখে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রমনা ময়দানের বিশাল জনসভায় এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ঘোষণা করে বলেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৩ মার্চের 'পাকিস্তান দিবস'কে ছাত্রসমাজ প্রতিরোধ দিবসে পরিণত করে। সবুজ পটভূমিতে রক্তসূর্য এবং বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে তারা এক নতুন জাতীয় পাতাকার সৃষ্টি করে। ঘরে ঘরে পাকিস্তানি পতাকার বদলে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান নিয়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিরামহীনভাবে নিধনযজ্ঞ চলতে থাকে। গ্রাম বাড়ি-ঘর হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিশ লক্ষাধিক লোক নিহত হয়। সংখ্যাহীন নারীর সম্ভ্রম বর্বর বাহিনীর হাতে বিনষ্ট হয়। হাজার হাজার মানুষকে বন্দিশিবিরে নিক্ষেপ করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় দুই কোটি মানুষ হৃতসর্বস্ব এবং আশ্রয়হীন হয়। এক কোটি লোক প্রাণ বাঁচাতে সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সারা বাংলাদেশে নেমে আসে নির্যাতন এবং হত্যার তাণ্ডবলীলা। এই রক্তাক্ত অবস্থায় ২৬ মার্চ গোপন স্বাধীন বাংলা বেতারে ঘোষিত হয় স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে অপসারণ করেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করতে পারে না। জন্মলাভ করে ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী : শ্রমিক কৃষকের সন্তানদের মুক্তিবাহিনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং চীন সরকার প্রকাশ্যে এবং গোপনে পাকিস্তান সরকারের এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে তাকে আরো নির্মম করে তোলার জন্য পাকিস্তান সরকারকে মারণাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্বব্যাপী সংগ্রামী জনসাধারণ বর্বর পাকিস্তান সরকারের এই গণহত্যার নিন্দা করতে থাকে। বাংলাদেশের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্রিয় সাহায্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক জটিলতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়ে ভারতের উপর সর্বাত্মক হামলা শুরু করলে ভারতীয় বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে। ঢাকা ও বিভিন্ন শহরের পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী ত্বরিৎ আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেয়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর তারিখে প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে শত্রু কবলমুক্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ করে।

১৯৫২ সালের ভাষার দাবিতে যে রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সে সংগ্রাম পরিণতি লাভ করে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন তাই ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এবং জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে একটি অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন।

Lamarck : লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯ খ্রি.)

জ্যাঁ ব্যাপতিস্ত লামার্ক বিখ্যাত ফরাসি জীববিজ্ঞানী। ১৮০৯ সনে লামার্ক তাঁর 'ফিলোসফি জুয়োলজিকা' গ্রন্থে সর্বপ্রথম জীবজগতের ক্রম বিবর্তনের একটি সামগ্রিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অর্জিত সাফল্যসমূহের ভিত্তিতে লামার্ক এই অভিমত পোষণ করেন যে, পরিবেশের পরিবর্তন প্রাণীর জীবন ধারণের ক্ষেত্রে নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে। এই চাহিদা পূরণের প্রয়াসে প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 'ব্যবহার, অব্যবহারজনিত' পরিবর্তন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সৃষ্টি হতে থাকে। কোনো অঙ্গের অতিব্যবহার সে অঙ্গের আদিরূপের পরিবর্তন ঘটায় ; কোনো অঙ্গের অব্যবহারে সে অঙ্গের কালক্রমে বিলোপ ঘটে। জিরাফের গলা আদিতে হয়ত এরূপ লম্বা ছিল না। অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ অবস্থায় খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় এই প্রাণীর গলা লম্বা হয়েছে। কালক্রমে এই পরিবর্তন তথা বৈশিষ্ট্য জীবের বংশধারার অঙ্গীভূত হয়ে জন্মগত হতে পারে। লামার্কের এ তত্ত্ব ছিল এতদিনকার প্রজাতির আদিকাল থেকে অপরিবর্তনের কাল্পনিক তত্ত্বের উপর আঘাতবিশেষ। লামার্ক তাঁর বিবর্তনের তত্ত্ব কেবল জীবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর মতে অজৈবের বিবর্তনের মাধ্যমে জৈবের উদ্ভব। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত জীবন গোড়াতে ছিল অ-জটিল, সরল। জটিল জীবন ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য লামার্ক বস্তুর স্ব-গতির কথা চিন্তা করেন নি। বস্তুর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় গতি আদিতে ঈশ্বরই প্রদান করেছেন। এবং জৈব এবং অজৈবের বিবর্তন প্রবাহ ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বিবর্তনে এবং বংশানুক্রমিক গুণের সৃষ্টিতে পরিবেশের ভূমিকার লাকার্মীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ডারউইন তাঁর বিবর্তনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

Law : আইন, নিয়ম, বিধান

১। প্রাকৃতিক জগতে বস্তুপুঞ্জের নিত্যগতির নিয়ামক আত্মন্তিক সম্পর্ককে বিধান বলা হয়। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বস্তুতে বস্তুতে কার্যকারণের সুনির্দিষ্ট সূত্রকে আমরা বিধান বলি। মানুষের জ্ঞানের বিকাশে বিধানের বোধ তার চেতনার অগ্রগতির একটি বিশেষ পর্যায় সূচিত করে। বস্তুপুঞ্জের পর্যবেক্ষণে মানুষ যখন তার বহিঃপ্রকাশ এবং অন্তঃসত্ত্বার মধ্যে, অস্থায়ী এবং স্থায়ী চরিত্রের মধ্যে, পরিহার্য এবং অপরিহার্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে তখনিমাত্র মানুষের পক্ষে বস্তুপুঞ্জের বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, অসঙ্গতির মধ্যে ঐক্য, সঙ্গতি এবং অনিবার্য বিধানকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই বিধানের জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে মানুষের বিশ্লিষ্ট চিন্তার ক্ষমতার বিকাশ, প্রকাশের অন্তরে সারকে অনুধাবন করার শক্তির স্ফূরণ। প্রাকৃতিক জগতের বিধানসমূকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. বিশেষ বিধান অর্থাৎ বস্তুপুঞ্জের কোনো বিশেষ অবস্থার ব্যাখ্যাকারী বিধান। ২. সাধারণ বিধান বস্তুপুঞ্জের ব্যাপকতর পরিধির ব্যাখ্যাকারী বিধান এবং ৩. বিশ্বজগতের সার্বিক বিধান।

২। রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতি অনুশাসনকেও বিধান বলা হয়। একটি রাষ্ট্রের মানুষের সামাজিক আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রের শাসকশক্তি বিভিন্ন নিয়ম-

নিষেধের প্রবর্তন করে। এরূপ নিয়ম নিষেধের অলঙ্ঘনীয়তার মূলে থাকে রাষ্ট্রশক্তির দণ্ডদানের ক্ষমতা। এ কারণে কোনো রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের যারা নিয়ামক তাদের ইচ্ছার অনিচ্ছা স্বার্থ-অস্বার্থের প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রীয় বিধানে। রাষ্ট্রীয় বিধানকে আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ বলে বোধ হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তির মালিক শ্রেণী বিধানকে নিরপেক্ষ হিসাবে দেখাতে চায়। আসলে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত কোনো শ্রেণী-রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় বিধান নিরপেক্ষ হতে পারে না। যে-কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক বহিঃকাঠামোর নিয়ন্তা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক অন্তঃকাঠামো। আবার অর্থনীতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয সমাজের উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের সম্পর্ক দ্বারা। উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ তার যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার এবং উৎপাদনের সম্পর্ক অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক দ্বারা। একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিক বুনিয়াদের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে উৎপাদনের যন্ত্র ও শ্রমিকের উপর মালিক শ্রেণী। যে অর্থনীতিতে শ্রমিক শ্রেণী যন্ত্র এবং শ্রম উভয়ের মালিক সেখানে শ্রমিক শ্রেণী তার অর্থনীতিক অন্তঃকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় বহিঃকাঠামোর নিয়ন্তা।

Leap : উৎক্রমণ, উল্লম্ফন

কোনো বিষয় বা বস্তুর চরিত্রে পরিমাণগত পরিবর্তনের বৃদ্ধিতে গুণগত পরিবর্তনের ক্রান্তি বা সংকট মুহূর্ত হচ্ছে উৎক্রমণের মুহূর্ত। পানিতে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে তার উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময়ে পানি তরল থেকে বাষ্পীয় দ্রব্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনকে উৎক্রমণ বলা যায়। দ্বন্দ্বমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিরোধ ও সংঘাত বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় তখনো বিকাশের ক্ষেত্রে উৎক্রমণ ঘটে। ফরাসি বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত হওয়া উৎক্রমণের একটি দৃষ্টান্ত। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপলাভ করা উৎক্রমণের আর একটি দৃষ্টান্ত। উৎক্রমণের মাধ্যমে একটি বস্তু বা বিষয়ের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। উৎক্রমণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার আকস্মিকতা। কিন্তু সমাজদেহে মৌলিক পরিবর্তন যেসব সময় আকস্মিকভাবে ঘটবে তা সত্য নয়। যে সমাজে মারাত্মক শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হয়েছে তেমন সমাজে মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিপ্লব ব্যতীত ক্রমবিকাশের মাধ্যমেও নতুন মৌলিক চরিত্রের উদ্ভব ঘটতে পারে। উৎক্রমণের ক্ষেত্রে যেখানে নতুন চরিত্রের হঠাৎ উদ্ভব ঘটে এবং পুরাতনের বিলোপটাও আকস্মিক এবং সামগ্রিক বলে বোধ হয় সেখানে ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পুরাতনের পাশাপাশি নতুন চরিত্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার পরিণামে পুরাতন বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাকৃতিক জগতেও ক্রমবিকাশের দৃষ্টান্ত আছে। মানুষ মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীব থেকে ভাষা ব্যবহার এবং মানসিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে পৃথক প্রাণী। জীববিজ্ঞান বলে, মানুষ মনুষ্যেতর জীব থেকেই পরিবর্তিত হতে হতে মানুষের চরিত্র লাভ করেছে। তার এ পরিবর্তন ঘটেছে একটু একটু করে—প্রকৃতির সঙ্গে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ভিত্তিতে লক্ষ লক্ষ বছরের পরিধিতে।

Leibniz : লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রি.)

সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান বাস্তব-ভাববাদী দার্শনিক। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র দার্শনিক ছিলেন না। তাঁর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা ছিল বহুমুখী। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁকে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস তত্ত্বের একজন আবিষ্কর্তা বলে স্বীকার করা হয়। পদার্থ বিদ্যায় তিনি 'শক্তি সঞ্চয়' বিধান আবিষ্কার না করলেও তার পূর্বাভাস দান করেন। তা ছাড়া তিনি ভূতত্ত্ববিদ, প্রাণিবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকও ছিলেন। কেবল তাত্ত্বিক নয়। সমাজজীবনেও লাইবনিজ একজন নিরলস সংগঠক ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী বার্লিন বিজ্ঞান একাডেমীর তিনি মূল পরিকল্পনাকারী এবং তার প্রথম সভাপতি। সপ্তদশ শতকের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে লাইবনিজের দার্শনিক তত্ত্ব ছিল সর্বাধিক যুক্তিনির্ভর সূক্ষ্মতত্ত্ব। বিশ্বসংসারের রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি তাঁর 'মোনাডোলিজ' গ্রন্থে 'মোনাড' তত্ত্ব উপস্থিত করেন। তাঁর মতে বিশ্বের গঠনগত মৌলিক সত্তা হচ্ছে অসংখ্য মোনাড। মোনাড দিয়েই বিশ্ব। কিন্তু মোনাড বস্তু নয়। মোনাড অবিভাজ্য অ-বস্তু সত্তা। মোনাড প্রত্যক্ষদর্শী এবং আত্মক্রিয়। মোনাডে মোনাডে বিশ্ব গঠিত। কিন্তু লাইবনিজের মতে এক মোনাডের সঙ্গে অপর মোনাডের কোনো কার্যকারণগত সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই। তথাপি এক মোনাডের সঙ্গে অপর মোনাড সম্পর্কিত সব মোনাড নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি একটি সুসংহত বিশ্ব। বিশ্বের এ সুসঙ্গতি পুর্বনির্দিষ্ট। এ যেন সর্বশ্রেষ্ঠ মোনাড বা বিধাতার মধ্যে যে সঙ্গতি বিদ্যমান তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে প্রতিটি মোনাডে। সত্তার এই তত্ত্বের পরিপূরক হিসাবে লাইবনিজ তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব রচনা করেন। বস্তুর অস্তিত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার জন্য তিনি যথোপুযক্ত যুক্তির বিধান, 'ল অব সাফিশিয়েন্ট রিজন' তৈরি করেন। তাঁর মতে বিশ্বজগতের ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক হচ্ছে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আবিষ্কার করা। যে বস্তু যেখানে যেমন আছে তার সে অবস্থান অবশ্যই আকস্মিক বা কারণহীন নয়। সে যেখানে যেমন আছে সেখানে তেমনভাবে থাকার কারণ আছে। পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে সেই কারণ। কাজেই বিশ্বজগতে কোনো বস্তু বা ঘটনাকে অনুপযুক্ত বা অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করার উপায় নেই। বস্তু বা ঘটনামাত্রই যুক্তিগত। যুক্তিতেই তার অবস্থান। কাজেই বলা যায় যে, প্রত্যেকটি বিষয়ই যুক্তিগ্রাহ্য এবং প্রত্যেকটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় বা বস্তুই যথার্থ। অভিজ্ঞতাবাদী লক বলেছিলেন, মন শুরুতে দাগশূন্য একখানি শ্লেট বৈ আর কিছু নয়। এবং যার অস্তিত্ব বাস্তব অভিজ্ঞতায় নেই, তার ভাব মনের মধ্যেও জন্মাতে পারে না। জ্ঞানের এ তত্ত্বকে লাইবনিজ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধি অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছুই গ্রহণ করুক না কেন, মানুষ বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি তার অভিজ্ঞতাপূর্ব শক্তি। অভিজ্ঞতা মানুষের মনে জ্ঞানের সার্বিক সূত্রের জন্ম দিতে পারে না। জ্ঞানের সার্বিক সূত্রগুলির সাহায্যেই মন অভিজ্ঞতাকে অনুধাবন করে। লাইবনিজের এই জ্ঞানতত্ত্ব ভাববাদী বুদ্ধিবাদ বলে পরিচিত। বার্ট্রাণ্ড রাসেল লাইবনিজকে আঙ্কিক যুক্তিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচনা করেছেন। সপ্তদশ শতকের জার্মানির সমাজ জীবনের পটভূমিতে বিচার করলে লাইবনিজের দর্শনে সমাজের সুসঙ্গত বিকাশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক শক্তি জার্মান ধনতন্ত্র এবং সামন্তবাদের পারস্পরিক আপসের প্রতিফলন দেখা যায়।

Lenin, V.I. : ভি. আই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রি.)

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর উত্তরসূরি। মার্কসবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনি ছিলেন ব্যাখ্যাতা এবং বিপ্লবী দার্শনিক। লেনিন রুশদেশে সংঘটিত ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তান লেনিন কিশোর বয়স থেকেই সক্রিয়ভাবে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। জারকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে তার অগ্রজের ফাঁসি লেনিনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। লেনিন দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অধিকতর অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভাই-এর সন্ত্রাসবাদী পন্থা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী গণসংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব সাধনের নীতি গ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে লেনিন ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রথম গ্রেপ্তার হন। তাঁকে একটা গ্রামে অন্তরীনাবদ্ধ করে রাখা হয়। ১৮৯১ সালে ২১ বৎসর বয়সে লেনিন সেন্ট পিটাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহির্ছাত্র হিসাবে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। লেনিন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং সক্রিয়ভাবে ১৮৮৯-৯৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি মার্কসবাদী চক্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৪ সালে ২৪ বৎসর বয়সে লেনিন 'জনতার মিত্র কারা এবং সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের পদ্ধতি কি'—এই শিরোনামে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি নিজ দেশ পরিত্যাগ করে য়ুরোপের অন্যদেশে গমন করেন এবং দেশের বাইরে থেকে বিপ্লবী 'ইসক্রা' পত্রিকা প্রকাশ করে রাশিয়ায় প্রেরণ করে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৯০৩ সালের রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অভ্যন্তরে তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবী বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থান জারের নির্মম অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়। ১৯০৫ এবং ১৯১৭ সালের উভয় বিপ্লবে লেনিন প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দান করেন।

বিশ শতকে ইতিহাসের নতুন পর্যায়ের সমস্যার বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধানে মার্কসবাদের সৃজনশীল ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের মধ্যেই লেনিনের কৃতিত্ব নিহিত। লেনিন ১৯১৬ সালে তার 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' শীর্ষক সুবিখ্যাত গ্রন্থে বিশ শতকের প্রথম পাদে পুঁজিবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদের বিকাশের বিধান উদঘাটিত করেন। এই বিশ্লেষণ অত্যাসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক শক্তিশালী আদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। লেনিনের এই গ্রন্থ তাঁর অন্যান্য সামাজিক দার্শনিক সমস্যার উপর লিখিত বহুসংখ্যক গ্রন্থের ন্যায় সমাজ বিকাশের মৌলিক সূত্রের প্রাঞ্জল উপস্থাপনার জন্য বিপ্লবী কর্মী এবং সমাজবিজ্ঞানীর নিকট চিরায়ত সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের অসম বিকাশের বাস্তব অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে লেনিন প্রমাণ করেন যে, এমন অবস্থায় একটি বিশেষ দেশেও সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে। ইতোপূর্বে ধারণা করা হতো যে, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের যে শক্তি ও বিকাশ তাতে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বব্যাপী একই সময়ে তা

প্রতিষ্ঠিত হবে। বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিয়ত বিকাশের উপর লেনিন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০৮ সালে রচিত তাঁর 'ম্যাটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থ তার মৌলিক দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ হিসাবে সুপরিচিত। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিকৃতির অপচেষ্টাকে লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে আপসহীনভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেন। এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার ও তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে এবং জ্ঞানের সমস্যায় তাঁর মতামত উপস্থিত করেন। শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্র এবং বিপ্লব প্রভৃতি সমস্যা বিশ্লেষণ করে লেনিন একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি সংস্কৃতি, সমাজতান্ত্রিক শিল্প, সাহিত্য এবং চারিত্রনীতি প্রভৃতি সমস্যার উপরও আলোকপাত করেন। লেনিন ভাবধারাকে লেনিনবাদ বলে অভিহিত করা হয়। লেনিনবাদ মার্কসবাদের নতুনতর বিকাশের স্মারক।

Leucippus : লিউসিপাস (৫০০-৪৪০ খ্রি. পূ.)

গ্রিক দার্শনিক ডিমোক্রিটাসের সমসাময়িক হলেও লিউসিপাস ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। বস্তুর অণুতত্ত্বের মূল ধারণা লিউসিপাসই প্রতিষ্ঠা করেন। ডিমোক্রিটাস তাঁর সেই ধারণাকে পূর্ণতর তত্ত্বের রূপ দেন। তা ছাড়া লিউসিপাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো তিনটি মৌলিক ধারণার সৃষ্টি করেন, যথা : (১) চরম শূন্যতা (২) চরম শূন্যতার মধ্যে সঞ্চরমান অণু (৩) যান্ত্রিক অনিবার্যতা। তাঁর রচনাসমূহের যে সমস্ত অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে এরূপ অনুমান করা হয় যে, লিউসিপাস কার্যকারণের বিধান এবং প্রয়োজনীয় যুক্তির বিধানও আবিষ্কার করেন। লিউসিপাস মনে করতেন, কারণ ব্যতীত কোনো কিছুরই উদ্ভব ঘটতে পারে না। এবং যা কিছু ঘটে তার পেছনে প্রয়োজনের অনিবার্যতা সর্বদাই বিদ্যামান থাকে।

Levellers : সমানকারী

সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে যখন স্বৈরাচারী রাজার শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং আইনের শাসন বা পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের লড়াই শুরু হয় এবং রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে তখন সমাজের কেবল উচ্চতর স্তর নয়, নিম্নতর স্তরও আন্দোলিত হয়ে ওঠে। নানা দাবি ও মতামতের প্রচার হতে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এরূপ দাবি প্রচার হতে থাকে যে, কেবল পার্লামেন্টের ক্ষমতা নয়, মানুষে মানুষে অসাম্যকেও বিলুপ্ত করতে হবে। সামরিক বাহিনীর মধ্যেও সমতার দাবি উঠতে থাকে। সাম্যবাদী এরূপ মতের প্রচারকারীদের 'লেভেলারস' বা 'সমানকারী' বলা হতো। এদের চাপে পার্লামেন্ট-পক্ষের সামরিক নেতা ক্রমওয়েলকে 'এ্যাগ্রিমেন্ট অব দি পিপল' বা 'জনতার চুক্তি' নামে বিপ্লবী এক গণতান্ত্রিক সংবিধানকে স্বীকার করতে হয়। অবশ্য লেভেলারদের এ দাবি অচিরকালে উচ্চতর শ্রেণীর প্রতিভূদের দ্বারা নাকচ হয়ে যায়। এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে এরূপ মতাবলম্বী কেন্দ্রগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়।

Li : লী

'লী' কথাটি চীনের দর্শনের একটি মৌলিক ভাববোধক শব্দ। 'লী' দ্বারা চীনের দর্শনে বিধান, বস্তু, জগতের শৃঙ্খলা, আকার ইত্যাদি বুঝান হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ 'লী'কে বস্তুবোধক 'চী'র বিপরিতার্থক ভাববাচক ধারণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কনফুসীয় মতবাদে 'লী'কে আবার সামাজিক বিধানের সমাহার হিসাবেও ব্যাখ্যাত হতে দেখা যায়।

Liberalism : উদারতাবাদ

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার যে তত্ত্ব বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ প্রচার করেন তা উদারতাবাদ বলে পরিচিত। এই কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তত্ত্বও উদারতাবাদের আর এক নাম। 'উদারতাবাদ' 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' পদগুলি আধুনিক জীবনেও ব্যবহৃত হয় বটে। কিন্তু এককালে উদারতাবাদ বলতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে অবাধ প্রতিযোগিতাকে বুঝান হতো বর্তমানে তার বদলে উদারতাবাদ বলতে সাধারণভাবে অরক্ষণশীল এবং পরমত সহিষ্ণু উদার চিন্তাকে প্রধানত বুঝানো হয়। (দ্র: Individualism : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ)

Liberty, theory of : স্বাধীনতার তত্ত্ব

ইউরোপে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রাজার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে যে আন্দোলন এবং বিপ্লব সংঘটিত হয় তার মূলদাবি ছিল রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। রাষ্ট্রে সকল ব্যক্তি সমান, রাজায়-প্রজায় কোনো ভেদ নেই এবং ব্যক্তির দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি ; ব্যক্তির কতকগুলি মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা আছে, যেমন জীবন রক্ষার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ তথা শাসনের স্বাধীনতা। হবস, লক, রুশো : সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের এই সকল প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদের রচনাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার এরূপ তত্ত্ব প্রচারিত হতে দেখা যায়। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ব্যক্তির স্বাধীনতার সমস্যার বিশ্লেষণ করে যে প্রবন্ধ রচনা করেন 'অন লিবার্টি' বা 'স্বাধীনতার উপর' শিরোনামের সে আলোচনা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর লিখিত আলোচনাসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচনা বলে খ্যাতি লাভ করেছে। (দ্র. Mill John, Stuart : জন স্টুয়ার্ট মিল)

Life : জীবন

বিজ্ঞান জীবনকে বস্তুর গতির একটা বিশেষ প্রকাশ বলে মনে করে। জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জীবন বিভিন্ন প্রকার জীবদেহের মধ্যে বিধৃত। জীবন বিকাশের একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মলাভ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নিজের ধারাকে রক্ষাকারী অনুরূপ

জীবনের সৃষ্টি করে আবার অ-জীবে রূপান্তরিত হয়। জীবনের বিকাশের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জীব একদিকে জীবের সঙ্গে এবং অপরদিকে অজীব পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে, সহজ থেকে জটিলতর এক জীবজগতের সৃষ্টি করেছে। সহজ থেকে জটিলতার বিবর্তনের এই ধারার সর্বাধিক জটিল বিকাশ ঘটেছে মনুষ্যজীবদেহে। জীবদেহের একটি মৌলিক চারিত্র্য হচ্ছে তার অভ্যন্তরস্থ সার্বক্ষণিক সৃষ্টি এবং ধ্বংসের প্রক্রিয়া। জীবদেহমাত্রই বীজকোষের সমাহার। জীবদেহে সর্বক্ষণই একদিকে এক জীবকোষের বিভাজনে অপর জীবকোষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং অপর দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত জীবকোষের মৃত্যু ঘটছে। জীবকোষের এই সার্বক্ষণিক ক্ষয়বৃদ্ধিকেই অনেকে জীবনের সহজ সংজ্ঞা বলে নির্দিষ্ট করেছেন। জীবের সঙ্গে অ-জীবের পার্থক্য কি বস্তুর অণুর একটি বিশেষ সংবদ্ধতা কিংবা বস্তুর অতিরিক্ত 'জীবন' নামক কোনো অতুলনীয় শক্তির মধ্যে নিহিত? এ তর্কের কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নি। বস্তুবাদীগণ, বিশেষ করে যান্ত্রিক বস্তুবাদ জীবনকে গতিময় অণুর বিশেষ সংবদ্ধতা বলে চিহ্নিত করতে চান। জীবনবাদীগণ 'জীবন'কে একটা তুলনাহীন শক্তি বলে মনে করেন। বস্তুর মধ্যে এই শক্তির অনুপ্রবেশে জীবদেহের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জীবনের ব্যাখ্যায় বস্তু এবং বস্তুর রাসায়নিক বিধানের সঙ্গে জীবনের যে অপর একটি জৈবিক বিধান রয়েছে, একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। জীবনের বিবর্তন উদ্দেশ্যময় কিংবা উদ্দেশ্যহীন—এটিও জীবনের ক্ষেত্রে আর একটি মূল প্রশ্ন। এ প্রশ্নে উদ্দেশ্যবাদীগণ যেমন জীবনের বিকাশ ও বিবর্তনকে কোনো সম্মুখ আকর্ষণ বা পশ্চাৎ প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনে করেন, তেমনি তার বিপরীতপন্থীগণ জীবনের বিকাশকে যান্ত্রিক এবং উদ্দেশ্যহীন বিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান।

Locke, John : জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রি.)

জন লক ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের বস্তুবাদী দার্শনিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক লেখক। তখনকার ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিক এবং সমাজ জীবনে যে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রভাবে সংঘটিত হচ্ছিল, লক তাতে প্রত্যক্ষভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর প্রধান দার্শনিক রচনা হচ্ছে 'এসে কনসারনিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' বা মানুষের জ্ঞান সম্পর্কিত নিবন্ধ। এর প্রকাশকাল ১৬৯০। এই নিবন্ধে লক তাঁর বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ-এর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লক দেকার্তের জন্মগত ভাব-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। লকের মতে, অভিজ্ঞতাপূর্ব বা জন্মগত কোনো ভাবের অস্তিত্ব নেই। মানুষের মনের সব ভাবেরই মূল হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। ভাব দুপ্রকার হতে পারে। মৌল এবং অ-মৌল বস্তুজগৎ সর্বক্ষণ মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর আঘাত হানছে। এই আঘাতের মাধ্যমে মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত ভাবের উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তি অবশ্য তার নিজের মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু মনোগতভাবেরও সৃষ্টি করতে পারে। 'মনোগত ভাবের' স্বীকৃতি দ্বারা লক জ্ঞানের প্রশ্নে ভাববাদী তত্ত্বের সঙ্গে খানিকটা আপস করতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে জ্ঞানের তত্ত্বে লককে অবিমিশ্র বাস্তব-অভিজ্ঞতাবাদী বা ইন্দ্রিয়গত ভাববাদী বলে বিবেচনা করা চলে না। লকের মতে ইন্দ্রিয়গত ভাব দ্বারা আমরা

বস্তুর মৌলিক এবং অ-মৌলিক গুণের জ্ঞান লাভ করি। 'শক্তত্ব' বস্তুর একটি মৌলিক গুণ। কিন্তু তার রং একটি অ-মৌলিক গুণ। ভাবমাত্রই জ্ঞান নয়। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রিয় যে-ভাব সংগ্রহ করে তা জ্ঞানের কাঁচামালবিশেষ। এই কাঁচামালের উপর মনের তুলনা, বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের সৃষ্টি। এই প্রক্রিয়াতেই মন সহজ থেকে জটিল ভাবের সৃষ্টি করে। মানুষের মনে জন্মগত কোনো ভাব থাকে না। কারণ শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তার মন একখানি নিদাগ শ্লেট বা 'টেবুলা রাসা' ব্যতীত আর কিছু নয়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুজগৎ শিশুর ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে এই নিদাগ শ্লেটে অসংখ্য দাগ কেটে দিতে থাকে। নিদাগ শ্লেটে বস্তুজগতের এই দাগই হচ্ছে ভাব বা জ্ঞানের কাঁচামাল।

মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতা কতখানি, এটি দর্শনের একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। লক জ্ঞানের সীমানাকে অসীম বলেন নি। বস্তুজগৎ এবং বিশেষ করে অ-বস্তুজগতের অনেক কিছুই মানুষ হয়ত জানতে পারে না। কিন্তু তাই বলে মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসহায় নয়। লক জ্ঞানের সীমাকে স্বীকার করলেও তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না। তাঁর কাছে জ্ঞানের মূল প্রশ্ন হচ্ছে, জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন। এরূপ জ্ঞানলাভের ক্ষমতা মানুষের অবশ্যই আছে।

রাষ্ট্রীয় তত্ত্বে লক মানুষের আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতার উত্তরণের স্তরসমূহের উপর আলোকপাত করেন এবং সরকারের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ব্যক্তি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের ধনিক শ্রেণীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ধনিকশ্রেণী আপন বিকাশের জন্য একটি সামাজিক বিপ্লব সাধন করে। তাদের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে নিহিত থাকবে। সরকারের কর্তব্য হবে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা। অধিকার হরণ করা নয়। এই ভূমিকাকে লঙ্ঘন করে রাষ্ট্র বা সরকার স্বৈরাচারী রূপধারণ করলে নাগরিকেরও অধিকার থাকবে সে সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবার। সামাজিক, রাজনীতিক এবং দার্শনিক প্রশ্নসমূহের প্রগতিশীল এবং বাস্তববাদী সমাধানে লকের চিন্তাধারার প্রভাব তৎকালে সুদূরপ্রসারী ছিল। পরবর্তীকালে ফরাসিদেশে যে বস্তুবাদী দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল, তার প্রেরণার উৎস ছিল লকের ভাবধারা। লক বস্তুর মৌলিক এবং অ-মৌলিক গুণের মধ্যে যে পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন তাঁর সে পার্থক্যের ভিত্তিতেই আবার ভাববাদী দার্শনিক ধর্মযাজক বার্কলে জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির মানসিক বোধে পর্যবসিত করার প্রয়াস পান।

Logic, Deductive. Inductive, Mathematical অবরোহী, আরোহী এবং আঙ্কিক যুক্তিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যার প্রধান ভূমিকা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রমাণের মূল্যায়ন। জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর চিন্তা করে। এই চিন্তাকে

পুনরায় ভাষায় প্রকাশ করে তাকে সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে। ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু জ্ঞান ব্যক্তিক ব্যাপার নয়—জ্ঞান সামাজিক ব্যাপার। এ কারণে চিন্তার ভাষায় প্রকাশিত রূপ হচ্ছে যুক্তিবিদ্যার বিচার্য বিষয়। কেবল চিন্তার ব্যাপারটা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। তথ্যের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতি ও সম্পর্ক, সেই তথ্য সম্পর্কে রচিত বাক্যের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই যুক্তিবিদ্যার সূত্রপাত ঘটে একটি যৌক্তিক বাক্যের সঙ্গে অপর একটি যৌক্তিক বাক্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণে বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক কত প্রকারের হতে পারে, বাক্যের অংশসমূহের বৈশিষ্ট্য কি, বাক্যের পারম্পর্য কীভাবে রক্ষিত হতে পারে, ইত্যাকার প্রশ্নের আলোচনায়। খুব ব্যাপক অর্থে যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে জ্ঞানানুসন্ধানের তত্ত্ব। নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা দিয়েই যুক্তিবিদ্যার পরিমণ্ডল গঠিত। পর্যবেক্ষণ, তুলনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সংজ্ঞা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হেত্বাভাষ বা ত্রুটির প্রকার, যুক্তির নীতির বিকৃতি এবং অপপ্রয়োগ ইত্যাকার প্রক্রিয়াগুলির অনসুধাবন সঠিক জ্ঞানের জন্য আবশ্যক বলে এগুলিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য যুক্তিবিদ্যা এ সমস্ত প্রক্রিয়াও আলোচনা করে।

যুক্তির দুটি প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে : অবরোহ এবং আরোহ। অবরোহ যুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট যুক্তির শুরুতে প্রদত্ত এক কিংবা একাধিক বাক্যের ভিত্তিতে একটি অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরোহ যুক্তিতে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তের সত্যতা যুক্তির শুরুতে গৃহীত যৌক্তিক বাক্যের সত্যতা, অসত্যতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঠিকতার উপর। অবরোহ এবং আরোহ পরস্পর পরিপূরক পদ্ধতি। যে-কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা অবরোহ এবং আরোহ উভয় পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করি।

পূর্বে ধারণা ছিল যে, অবরোহ এবং আরোহ ব্যতীত যুক্তির আর কোনো পদ্ধতি নেই। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দার্শনিক জর্জ বুল যুক্তির ক্ষেত্রে আঙ্গিক ও পতীকপদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং হোয়াইটহেড এই পদ্ধতিকে অধিকতর ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তির এই আধুনিক বিকাশকে আঙ্কিক যুক্তি, প্রতীক যুক্তি কিংবা যুক্তির বীজগণিত বলেও আখ্যাযিত করা হয়। আঙ্কিকযুক্তি জটিল বলে বোধ হলেও সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে যে এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে, তা নিচের উদাহরণ থেকে বুঝা যায়।

সকল মানুষ মরণশীল
সক্রেটিস একজন মানুষ
∴ সক্রেটিসও মরণশীল।

অবরোহ যুক্তির এই দৃষ্টান্তটি খুবই পরিচিত। এই দৃষ্টান্তের মধ্যে অনিবার্যতার যে সত্য রয়েছে, তাকে অধিকতর সাধারণ করে আমরা বলতে পারি

সকল ক হচ্ছে খ
সকল গ হচ্ছে ক
সকল গ হচ্ছে খ

আবার এ সত্য আরো আঙ্কিক করে বলা যায় :

ক = খ, গ = ক, সুতরাং গ = খ।

Logos : লগোস

'লগোস' একটি গ্রিক শব্দ। গ্রিক দর্শনে লগোস বলতে জগতের ভিত্তি হিসাবে একটা প্রজ্ঞা বা সঠিক বিধানকে বুঝাত। হিরাক্লিটাসের রচনাতেও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। তার মতে, বিশ্বচরাচরের সবকিছুই নিয়ামক হচ্ছে সার্বিক, সার এবং নিত্যকালের লগোস। হিরাক্লিটাসের লগোসকে হেগেল সার্বিক প্রজ্ঞা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রিক স্টোয়িক বা অবিচলবাদীগণ লগোসকে বস্তু এবং ভাবজগতের মৌলিক বিধান বলে মনে করতেন। প্রাচ্যদর্শনে ব্যবহৃত 'তাপ' এবং 'ধর্ম' অর্থগতভাবে গ্রিক 'লগোস'-এর অনুরূপ।

Lokayata : লোকায়ত

প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদী দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। লোকায়ত মতের আদি উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মযাজকীয় গ্রন্থে, বেদ এবং সংস্কৃত মহাকাব্যে। প্রাচীন উপাখ্যানে মুনি বৃহস্পতিকে লোকায়ত মতের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়। বেদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতাবাদী যে-সমস্ত উক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সে সকল উক্তি চার্বাকের বলে মনে করা হয়। এজন্য ভারতীয় বস্তুবাদ চার্বাকবাদ বলেও চিহ্নিত হয়ে আসছে। লোকায়ত দর্শনের মূল হচ্ছে সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অভিমত। লোকায়ত মতে বিশ্বের মূলে আছে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং ব্যোম অর্থাৎ মাটি, পানি, আগুন এবং আকাশ এই চারটি অস্তিত্ব। প্রত্যেক অস্তিত্ব একপ্রকার অণুর সম্মেলনে গঠিত। অণুর চরিত্র এই যে, অণু নিজে অপরিবর্তনীয় এবং অক্ষয়। সময়ের আদি থেকেই অণু অস্তিত্বমান। বস্তুর প্রকার বা চরিত্র নির্দিষ্ট হয় তার গঠনের মৌলিক অণুর প্রকার এবং তাদের সম্মেলনের অনুপাত দ্বারা। একটি সপ্রাণ অস্তিত্বের মৃত্যুর পরে তার সাংগঠনিক অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে অপ্রাণ বস্তুজগতে তার সদৃশ্য অণুর সঙ্গে গিয়ে সম্মিলিত হয়। লোকায়তের কোনো কোনো পাঠে ক্রমবিকাশতত্ত্বেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেননা লোকায়তবাদীগণ বস্তুকে মূল ধরে তা থেকে অপর বিশেষ বস্তু বা প্রাণের বিকাশের কথা অনুমান করেছেন। জ্ঞানের প্রশ্নে লোকায়তবাদীগণকে ইন্দ্রিয়বাদী বলা যায়। তাদের কাছে যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়সদৃশ বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারে। লোকায়ত মতে অনুমানসিদ্ধ জ্ঞানের কোনো স্বীকৃতি নেই। অনুমান জ্ঞানের অনির্ভরযোগ্য এবং ভ্রান্তিকর উপায়। বেদের বিধানও যথার্থ নয়। কেননা, বেদের বিধান কারোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয়। বেদের বিধান পরোক্ষ এবং অনুমানমূলকমাত্র। লোকায়ত দর্শন ঈশ্বর কিংবা আত্মার অস্তিত্ব এবং পুনর্জন্ম— কাউকে স্বীকার করে না। জীবনযাপনের নীতিতে লোকায়তবাদীগণ 'সুখবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন। লোকায়তবাদীগণের নিজস্ব রচনার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। বস্তুত ভারতীয় দর্শনের প্রধান এবং পরাক্রমশালী ভাববাদী ধারা লোকায়ত দর্শনকে তীব্র সমালোচনা মাধ্যমে জনমন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা কেবল প্রতিযুক্তিতে সীমাবদ্ধ

থাকে নি। কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে ভাববাদী দার্শনিকগণ লোকায়তবাদীদের দৈহিকভাবেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে। ফলে তাদের সমালোচনার মধ্যে মাত্র লোকায়ত দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। এতে লোকায়তবাদীদের নিজস্ব ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও প্রতিযুগে প্রতিষ্ঠিত ধারার বিরুদ্ধে লোকপ্রিয় এবং বস্তুবাদী একটা চিন্তাধারা যে ভারতের বুকে সংগ্রামরত ছিল, আমরা তা অনুমান করতে পারি।

Lucretius : লুক্রেশিয়াস (৯৯-৫৫ খ্রি. পূ.)

লুক্রেশিয়াস প্রাচীন রোমের কবি এবং বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন। 'ডা রিরাম ন্যাচার' বা 'প্রকৃতি জগৎ' তাঁর সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। লুক্রেশিয়াস গ্রিক দার্শনিক এপিক্যুরাসের উত্তরসূরি। এপিক্যুরাসের দর্শনকেই তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ব্যক্তির জীবনে সুখের সমস্যা মূল সমস্যা। সামাজিক সংঘাত এবং ধ্বংসের মধ্যে ব্যক্তি নিয়ত আবর্তিত। ধৈর্যের মধ্যে বিধি-নিষেধের বন্ধনে সে আবদ্ধ। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে দেবতাদের অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হচ্ছে। মৃত্যুর আতঙ্ক আর মৃত্যুর পরে নরকের আজাবের আশঙ্কা জীবনের প্রতি মুহূর্তকে আবিল করে দেয়। এই ব্যক্তির সুখের পথ কি? লুক্রেশিয়াস ব্যক্তির জন্য সুখের পথের সন্ধান দানকে নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে মনে করেছেন। তাঁর মতে জগৎ, মানুষ এবং সমাজ সম্পর্কে এপিক্যুরাসের অভিমত হচ্ছে সঠিক অভিমত। এপিক্যুরাসের দর্শন অনুসরণ করলে মাত্র ব্যক্তি জীবনের এই দুঃখের জাল থেকে মুক্তির সন্ধান লাভ করতে পারবে। লুক্রেশিয়াসের মতে মৃত্যুর পরে দুঃখ বা দণ্ডের আশঙ্কা ব্যক্তির পক্ষে অমূলক। কারণ আত্মা দেহের মতোই মরণশীল। আত্মাও অণুর সম্মেলনে গঠিত। দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মারও মৃত্যু ঘটায়। কাজেই মৃত্যুর পরে নরকের দুশ্চিন্তায় জীবনকে দুর্বিষহ করার কোনো কারণ নেই। লুক্রেশিয়াস মানুষকে লক্ষ্য করে সুন্দর করে বলেছেন : জীবন এবং মৃত্যু পরস্পরবিরোধী। যেখানে জীবন আছে সেখানে মৃত্যু নেই। মানুষ যখন জীবিত তখন সে মৃত নয়। আবার যখন সে মৃত তখনও তার জীবন নেই। কাজেই মৃত্যুর পরে জীবনের আশঙ্কার কোনো ভিত্তি থাকতে পারে না। আর দেবতাদের বাস মানুষের মধ্যে নয়। তারা শূন্যরাজ্যের প্রাণী। তাদের পক্ষে মানুষের রাজ্যে এসে মানুষকে দণ্ডদান অসম্ভব। জগৎ সম্পর্কে লুক্রেশিয়াসের দর্শন তাই পুরোপুরি বস্তুবাদী। তৎকালীন রোমের সমাজ জীবনকে কুসংস্কার মুক্ত করে বুদ্ধি ও যুক্তির প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লুক্রেশিয়াসের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষের সুখের অন্বেষণে নিবেদিত কবি লুক্রেশিয়াস আত্মহত্যা করেছিলেন।

Luddites : লুডবাদী, লুডবাদ

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে পুরোনো হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শহরে শহরে যন্ত্রভিত্তিক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অপরদিকে নতুনতর যন্ত্রপাতির নিয়োগ, অবাধ প্রতিযোগিতা, অতি উৎপাদন, মন্দা, ছাঁটাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গী এ সকল কারণে কর্মহীন বেকার মানুষও সৃষ্ট হতে থাকে। সচেতন, রাজনৈতিক তত্ত্বসমৃদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পূর্বে এইসব বেকার এবং কর্মচ্যুত মানুষের মধ্যে এরূপ মনোভাবের উদয়

হতো যে তাদের এই দুরবস্থার জন্য যন্ত্র এবং কারখানাই দোষী। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে ক্যাপ্টেন লুডের নেতৃত্বে একদল শ্রমিক এরূপ চিন্তা থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করে। ভুল চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হলেও এ আন্দোলন নির্যাতিত শ্রমিকদের অসহায় ক্ষোভের প্রকাশস্বরূপ ছিল ; ধনবাদী সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থা অসহায় শ্রমিকদের এরূপ আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। লুডের নেতৃত্ব থেকে 'লুডাইট' কথাটি প্রচলিত হয়।

Luther, Martin : মারটিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রি.)

মারটিন লুথার ছিলেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইউরোপের সমাজ ও খ্রিষ্টধর্মের সংস্কারবাদী আন্দোলনের নেতা এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। লুথার ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। জার্মান ভাষার গঠনে লুথারের এই অনুবাদ কর্মের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে যাজক সম্প্রদায়ের যে বিরোধ চলছিল লুথার তাতে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মযাজকদের হস্তক্ষেপের অধিকারকে হ্রাস করতে সাহায্য করেন। মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে গির্জা এবং খ্রিষ্টধর্মই একমাত্র সংযোগসূত্র এবং যাজকরাই মাত্র মানুষের স্বর্গে গমনের ছাড়পত্র মঞ্জুর করতে পারে, একথা লুথার বিশ্বাস করতেন না। লুথার বলতেন মানুষের মুক্তি ধর্মীয় আচরণের মধ্যে নিহিত নয়। মানুষের মুক্তি বিশ্বাসের ঐকান্তিকতায়। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে পুঁজিবাদের যে বিরোধ চলছিল, তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় লুথারের ধর্মীয় ধারণা এবং আন্দোলনে। এ বিরোধে লুথার অগ্রসর চিন্তার পরিচয় দেন এবং গোঁড়ামির বিরোধিতা করেন। তবে লুথারের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং চিন্তাধারা দুর্বলতামুক্ত ছিল না। সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি আপসের মনোভাব দেখিয়েছেন। উঠতি শহরগুলির সংস্কার আন্দোলনে তিনি শহরবাসীর স্বার্থের বিরোধিতা করেন। রাষ্ট্রীয় বিধানের মূল কি? রাষ্ট্র না মানুষের প্রকৃতি? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথেচ্ছাচার রোধ করার জন্য আইনকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উর্ধ্বে স্থাপনের যে প্রয়োজনীয় আন্দোলন তখন জার্মানিতে চলছিল তাতে লুথার রক্ষণশীল মত অনুসরণ করেন। ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে যে বিরাট কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাতেও মারটিন লুথার শাসক শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেন।

Lyceum : লাইস্যুম

লাইস্যুম প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স নগররাষ্ট্রের একটি বাগানের নাম। এখানে ৩৩৫ খ্রি. পূর্বাব্দে এ্যারিস্টটল তাঁর দর্শন প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে দর্শনের ইতিহাসে লাইস্যুমকে এ্যারিস্টটলের দর্শনাগার বা একাডেমী বলেও উল্লেখ করা হয়। লাইস্যুমের স্থায়ীত্বকাল প্রায় আটশত বছর। এ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যবর্গ লাইস্যুম পরিচালনা করেন। এঁদের মধ্যে থিওফ্রাস্টাস, ইউডেমাস, ডাইকারকাস এবং স্ট্রাটোর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এ্যারিস্টটলের পরে লাইস্যুম তার সৃজনশীল ও বিশ্লেষণী চরিত্র হারিয়ে কেবলমাত্র এ্যারিস্টটলের তত্ত্বের ব্যাখ্যাগারে পরিণত হয়। দাসের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রিকসমাজের পতনের সঙ্গে লাইস্যুমের বিলোপ ঘটে।

M

Machiavelli : ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.)

ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকের ইতালির জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক এবং চিন্তাবিদ। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের ভিত্তিতে ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানিতে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলেও ইতালি তখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য এবং স্বাধীন নগরে বিভক্ত। ইতালির জাতীয় এবং সামাজিক স্বার্থ ইতালিতে ঐক্যবদ্ধ সুশাসিত রাষ্ট্রের গঠন অত্যাবশ্যক করে তুললেও একদিকে রোমের পোপের আপন ক্ষমতা বজায় রাখার ইচ্ছা, অপরদিকে ইতালির রাজ্যসমূহের পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব এবং ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের হস্তক্ষেপে ইতালির ঐক্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ইতালির এরূপ পটভূমিতে ম্যাকিয়াভেলীর রাজনীতিক জীবন এবং তার রাষ্ট্রীয় দর্শন রূপলাভ করে। ম্যাকিয়াভেলী ১৪৮৮ থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত ইতালির রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা বাধাহীন ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক শক্তি, যাজকতন্ত্র এবং বৃহৎ রাষ্টসমূহ ম্যাকিয়াভেলীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত শক্তির স্বার্থে ১৫১২ সালে ফ্লোরেন্স সরকার ম্যাকিয়াভেলীকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করে। এই ঘটনার পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলী সক্রিয় রাজনীতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে রাজনীতিক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'ডিসকোর্স' বা আলোচনা এবং 'প্রিন্স' বা রাষ্ট্রনায়ক বিখ্যাত। 'প্রিন্স' ম্যাকিয়াভেলী মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়।

ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন উদীয়মান ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। ইতালির সামাজিক ও জাতীয় বিকাশের জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর এই ঐক্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার যে বাস্তবনীতি তিনি ব্যাখ্যা করেন 'ম্যাকিয়াভেলীর নীতি' বলে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'ম্যাকিয়াভেলীর নীতি' বলতে রাষ্ট্রের স্বার্থ সাধনের জন্য বিশেষ কোনো নৈতিকতায় আবদ্ধ না থেকে যা কিছু প্রয়োজন তাই সম্পন্ন করা বুঝায়। ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনা উভয়কে ধর্ম এবং নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র মানুষেরই সৃষ্টি, কোনো ঐশ্বরিক সত্তা নয়। এবং এর পরিচালনা মানুষের কল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা নীতির বন্ধন রাষ্ট্রের জন্য অলঙ্ঘণীয় নয়। রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার শাসন ব্যবস্থার চরিত্র যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এ সত্য ম্যাকিয়াভেলী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি রাজতন্ত্রকে সর্বাধিক কাম্য শাসন ব্যবস্থা বলেছেন। এর প্রধান কারণ, ইতালির অনৈক্য এবং অরাজকতার অবস্থায় একচ্ছত্র রাজশক্তিকে তিনি প্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন। ইতালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধ নয়, তাকে সম্প্রসারিত হতে হবে, বৃহৎ হতে হবে। কারণ ম্যাকিয়াভেলী মনে করতেন,

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিকাশ এবং বৃদ্ধিতেই অস্তিত্ব। রাষ্ট্রকে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে হবে। অপর রাজ্য গ্রাস করে হলেও তার সীমানাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই বৃদ্ধিই রাষ্ট্রের জীবন। এই বৃদ্ধি যেখানে স্তব্ধ রাষ্ট্র সেখানে জড় এবং মৃতবৎ। রাষ্ট্রের বিরাট এলাকার উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং বজায় রাখার জন্য ম্যাকিয়াভেলী কূটকৌশল এবং শক্তিপ্রয়োগের উপর জোর দেন। ম্যাকিয়াভেলীর মতে রাষ্ট্রে উত্তম শাসক সে যে শাসিত অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও সমীহের ভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। শাসক দয়ালু এবং দুর্বল হলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং বিদ্রোহের উদ্ভব ঘটে। কাজেই শাসকের পক্ষে প্রশংসিত বা প্রিয় হওয়ার চেয়ে শ্রেয় হচ্ছে ভয়ের পাত্র হওয়া। ম্যাকিয়াভেলীর এরূপ বক্তব্যে তাঁর সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ব্যাখ্যার স্থানে ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্রীয় সমস্যার বিচারে বাস্তব এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজনীতিক সিদ্ধান্তসমূহ একদিকে যেমন তৎকালীন ইতালির ঐক্যসাধন এবং সামাজিক বিকাশে অগ্রসর শক্তির কাজ করেছে তেমনি তাঁর 'নীতিহীনতা' পরবর্তীকালে ইউরোপের ধনবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদী আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টিরও সহায়ক হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলীর বিশেষ অবদান এই যে, এ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে যেখানে অতিজাগতিক এবং ঐশ্বরিক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে সেখানে ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্র যে মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়োজনে তার ব্যবহার এবং বিকাশ, এ সত্যকে তিনি মধ্যযুগের পটভূমিতে অগ্রগামীর সাহস নিয়ে প্রকাশ করেছেন।

ম্যাকিয়াভেলীর জীবনকালে ইতালি, রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস এবং নেপলস এরূপ পাঁচটি 'নগর রাষ্ট্রে' বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ম্যাকিয়াভেলীর নিজ রাষ্ট্র ফ্লোরেন্স অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী, ইউরোপীয় নগজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র।

Magic : জাদু, ইন্দ্রজাল

জাদু বা ইন্দ্রজাল বলতে প্রাচীনকালের কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানকে বুঝায়। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, এই সমস্ত আচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ, পশু, প্রেত ইত্যাকার শক্তিকে ইচ্ছানুযায়ী বশীভূত করা যায়। জাদুর মূলে মানুষের মনের এই ধারণা কাজ করত যে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানুষ একটা অলৌকিক বন্ধনে আবদ্ধ। আদিম মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন, যেমন কোনো শ্রমের নির্দিষ্ট ফল লাভ, অপরের ক্ষতি সাধন, রোগ থেকে আরোগ্যলাভ প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাদুমন্ত্র ছিল। জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস য়ুরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রবল ছিল। খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং অন্যধর্মসমূহের প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদির মধ্যে জাদুর রেশ এখনো বিদ্যমান।

Mahabharat, Ramayan : মহাভারত এবং রামায়ণ

প্রাচীন ভারতের সুবিখ্যাত দুটি মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারত। শ্লোক হিসাবে এ

কাহিনী লিখিত হয়েছিল। এ দুটি মহাকাব্যের শ্লোক সংখ্যা দুই লক্ষের উপর ছিল। যেমন গ্রীসের হোমারের ইলিয়াড, তেমনি রামায়ণ, মহাভারত উভয় কাহিনী প্রেম বিষয়ক। রামায়ণের প্রধান চরিত্র ছিল রাজা রাম এবং তার স্ত্রী সীতা। ভারতের দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা নামে যে দ্বীপ ছিল সে দ্বীপের রাজা রাবণ নাকি সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে সীতার বনবাসকালে তাকে অপহরণ করে নিয়েছিল।

এই নিয়ে রামের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধে কেবল মানুষ যে অংশগ্রহণ করেছিল তাই নয়। বানরও এ কাহিনীর অন্যতম চরিত্র রাম ও সীতার পক্ষে দীর্ঘ সময় লড়াই করে সীতাকে লঙ্কা থেকে উদ্ধার করেছিল। বাংলা সাহিত্যের অমর কবি মেঘনাদ রাম রাবণের যুদ্ধের উপর দীর্ঘ এবং তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনার ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলা হয়।

Malthusianism : মালথুসবাদ

ইংল্যাণ্ডের ধর্মযাজক মালথুস (১৭৬৬-১৮৩৪ খ্রি.) জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন সমস্যার উপর একটি তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্ব মালথুসবাদ নামে পরিচিত। মালথুসের মতে, কোনো দেশের খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির হারের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গতি যদি আঙ্কিক হয়, তা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হচ্ছে জ্যামিতিক। অর্থাৎ মানুষের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১, ২, ৩, ৪ এরূপ ক্রমিক ভিত্তিতে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১, ৩, ৯, ২৭ এরূপ গুণনের হারে। ফলে কালক্রমে জনসংখ্যা এবং খাদ্যের মধ্যে ব্যবধান বিরাট হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের জীবন ধারণের জন্য জনসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা আবশ্যক। মালথুসের মতে এই ভারসাম্য মানুষ সাধারণত বজায় রাখে না। জনসংখ্যা খাদ্যের পরিমাণকে সংকটজনকভাবে অতিক্রম করে যায়। এমন অবস্থায় প্রকৃতি নিজে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়, যুদ্ধ ইত্যাকার দুর্বিপাক সৃষ্টি করে জনসংখ্যা হ্রাস করে খাদ্যের পোষণ ক্ষমতার কাছাকাছি নিয়ে আসে। মালথুসের পরবর্তী অনুসারীগণ মনে করেন, আধুনিককালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে আছে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মৃত্যুর হারের হ্রাসপ্রাপ্তি। জনসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যকার ব্যবধান দূর করার জন্য মালথুস যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিকে প্রকৃতিদত্ত সমাধান এবং অনিবার্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ এবং তার ফলে সৃষ্ট যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। মার্কসবাদ এ কারণে তীব্রভাবে মালথুসবাদের বিরোধিতা করে। মার্কসবাদের মতে বিজ্ঞানের যে বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে তাতে খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অধিক করা সম্ভব। কাজেই জনসম্পদ জনসংখ্যাকে বহন করতে পারে না, একথা সত্য নয়। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোনো অলঙ্ঘ্য সমস্যা বলে প্রতিপন্ন হয় নি। জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। আসলে পুঁজিবাদী সমাজে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে কৃত্রিমভাবে অর্থনীতিক সঙ্কটের মূল হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়। সমস্যার মূল জনসংখ্যার বৃদ্ধি নয়, উৎপাদন ও বন্টনে পুঁজিবাদী শোষণ এবং অরাজকতার অস্তিত্ব।

Mao-Tse-Tung : মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬ খ্রি.)

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং চীন ভূ-খণ্ডের প্রায় শতাব্দীকালের সামাজিক-রাজনীতিক মুক্তি ও বিপ্লবের নায়ক। জাপানি দখলদার শক্তি এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার কুওমিনটাং নেতা চিয়াংকাইশেকের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক বিপ্লবের জন্য চীনের অগণিত এবং অনুন্নত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কৌশলী হিসাবে মাও সেতুং এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে সংগ্রামী মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক উপকথায় পরিণত হয়েছিলেন। চীনের একাংশে শিল্পের বেশ কিছুটা বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই ঘটেছিল। কিন্তু চীনের সামাজিক বিপ্লব শিল্পের কেন্দ্র শহরসমূহ এবং তার শিল্পশ্রমিকদের শক্তির ভিত্তিতে ঘটে নি। শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে সংঘটিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মাও সেতুং বিপ্লবের প্রতিষ্ঠিত পরিক্রমার পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলে গরিব কৃষকদের সংগঠিত করে জাপানি ও কুওমিনটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কৌশলে লড়াই-এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন। প্রধানত এই সশস্ত্র কৃষক বাহিনীকে নেতৃত্বদান করে মাও সেতুং এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনটাং-এর সামাজিক ও সামরিক শক্তিকে সুদীর্ঘ সংগ্রামে পরাজিত করে ১৯৪৯ সনে সমগ্র চীন দখল করেন। কুওমিনটাং দলের নেতা এবং চীন সরকারের প্রধান চিয়াংকাইশেক তাঁর পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নিতে সক্ষম হন। ১৯২৭ সালের হুনান বিদ্রোহ থেকে চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের শুরু। সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৩৪ সালে কুওমিনটাং বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাও সেতুং তাঁর কৃষক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে দুর্গম পথে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে চীনের পশ্চিমাঞ্চল ইয়েনানে গিয়ে উপস্থিত হন। চীনের ইতিহাসে এই যাত্রা 'লং মার্চ' বা 'দীর্ঘযাত্রা' নামে খ্যাতিলাভ করে। মাও সেতুং এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় ত্রিশ বছরের সংগ্রাম শেষে চীনে কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি এবং পরিধি বিরাটভাবে বৃদ্ধি করে। সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় সাহায্যে চীনের শিল্প ও কৃষিতে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক মিত্রসুলভ ছিল। কিন্তু ষাটের দশক থেকে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। এই মতবিরোধের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিযোগ তোলে যে মাও সেতুং চীনকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। অপর দিকে চীনের নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে সংশোধনবাদী নীতি অনুসরণ করছে। চীন ও সোভিয়েতের মতবিরোধের প্রভাব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেও বিস্তারিত হয়েছে। ফলে অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বকার ঐক্য ভেঙে গেছে। একাধিক কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব ঘটেছে।

Marcus Aurelius : মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রি.)

মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন স্টয়েক বা নিস্পৃহবাদী দার্শনিক এবং রোমের সম্রাট। তাঁর একমাত্র রচনা 'মেডিটেশনস' বা অনুধ্যান উপদেশবাক্যাকারে লিখিত। মার্কাস অরেলিয়াসের দর্শনে রোম সাম্রাজ্যের সংকটের আভাস পাওয়া যায়। স্টয়েক দর্শনের যে নতুন ব্যাখ্যা মার্কাস অরেলিয়াস পেশ করেন তাতে স্টয়েক দর্শনের বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে উক্ত দর্শন ধর্মীয় রহস্যবাদের রূপ ধারণ করে। মার্কাস অরেলিয়াসের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরই সার্বিক বিবেক হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র সর্বপ্রাণে বিস্তারিত হয়ে আছে। ব্যক্তির দেহের মৃত্যুর পরে ব্যক্তির চেতনা বিশ্ববিবেকের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ব্যক্তির জীবন ধারণের নীতির ক্ষেত্রে মার্কাস অরেলিয়াসের অভিমত অদৃষ্টবাদের রূপ গ্রহণ করে। তিনি ব্যক্তিকে বাস্তব জীবনের ঘটনার অপরিহার্য নিয়তিকে মেনে নিয়ে নিজের আত্মশুদ্ধি এবং আত্মোন্নতির মাধ্যমে সান্ত্বনা প্রাপ্তির উপদেশ দেন। মার্কাস অরেলিয়াস সম্রাট হিসাবে সদ্য প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের প্রতি নির্দয় নীতি অনুসরণ করলেও পরবর্তীকালের খ্রিষ্টীয় ধর্মের উপর তাঁর দর্শনের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

Marx, Karl : কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.)

কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং উনবিংশ শতকের শ্রমিক শ্রেণীর সাম্যবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে ইতিহাসে বিখ্যাত। ছাত্রাবস্থাতে কার্ল মার্কস হেগেলের দর্শনের প্রভাবে এলেও হেগেলের দর্শনের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল ভাবসমূহই মার্কসকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। হেগেলের অনুসারীদের মধ্যে তিনি বামপন্থী হেগেলবাদী বলে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে মার্কস ক্রমান্বয়ে যত প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে লিপ্ত করে তোলেন ততবেশি তিনি হেগেলের দর্শনের ভাববাদী প্রভাব কাটিয়ে উঠতে থাকেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের জার্মানির আর্থনীতিক অবস্থা সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ফয়েরবাকের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে তার পরিচয় মার্কসকে পরিপূর্ণভাবে হেগেলীয় দর্শনের আওতার বাইরে টেনে আনে। তিনি এই সময় থেকে তীব্রভাবে হেগেলের দর্শনের বৈপরীত্য, তার অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার ভাব-ব্যাখ্যার বিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে মার্কস তাঁর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন। ১৮৪৮ সালের জার্মানিতে কৃষক এবং শ্রমিকের যে বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান ঘটে তাতে এবং পরবর্তীকালে প্যারিস শহরের শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মার্কস পরিপূর্ণরূপে সাম্যবাদী নেতায় পরিণত হন। এই সময়ে মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কসের কর্মজীবনের একনিষ্ঠ সাথী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মার্কস-এর সঙ্গে এসে মিলিত হন। মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই মানুষের সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ইতিহাসের উপর গভীর গবেষণার মাধ্যমে এক নতুন বিশ্বদর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৭ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস ব্রুসেলস শহরে সাম্যবাদী দল নামে একটি গোপন শ্রমিক সংস্থা সংগঠিত করেন। এই সংগঠনের দ্বিতীয় কংগ্রেসে দুই বন্ধু 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বা 'সাম্যবাদের ইশতেহার' (১৮৪৮ সালে)

রচনা করেন। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক দলিলবিশেষ। এই ইশতেহারের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তীক্ষ্ণভাবে ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের তত্ত্ব বিবৃত করে উনবিংশ শতকের য়ুরোপে শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদের গর্ভে নূতন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য শক্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। মার্কসের দর্শনের ঐতিহাসিক প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতকের য়ুরোপীয় সমাজের আর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর রচিত তাঁর গভীর গবেষণামূলক 'দি ক্যাপিটাল' বা পুঁজি-নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন এঙ্গেলস মার্কসের মৃত্যুর পরে যথাক্রমে ১৮৮৫ এবং ১৮৯৪ সালে। ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত শোষণের স্বরূপ এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহিযুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মার্কস আমেরিকার একটি সাময়িক পত্রে যে প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেন মার্কসের গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির স্মারক হিসাবে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যও অপরিসীম। বিপ্লবী কার্যক্রমের অভিযোগে জার্মানি এবং পরবর্তীকালে বেলজিয়াম সরকার কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে ১৮৪৮ সালের পর থেকে মার্কস সপরিবারে লণ্ডন শহরে বাস করতে থাকেন। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ মার্কস লণ্ডন শহরে মারা যান।

Materialism : বস্তুবাদ

বিশ্ব-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি অভিমত মৌলিক এবং প্রধান। একটি বস্তুবাদ অপরটি ভাববাদ। মানুষের চেতনার বিকাশের আদিকাল থেকে এই দুই মতবাদের দ্বন্দ্ব চলে আসছে।

বস্তুবাদকে দুইভাগে ভাগ করে বিবেচনা করা যায়। সাধারণ বস্তুবাদ ; দার্শনিক বস্তুবাদ। সাধারণ বস্তুবাদ বলতে জগৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতবাদ বুঝায়। চারিপাশের জগৎ সত্য না মিথ্যা, মায়া না যথার্থ, এ সম্পর্কে মানুষের মনে আদিকাল থেকেই প্রশ্ন জেগেছে। সাধারণ মানুষ গভীর যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকেই জীবন-যাপনের বাস্তব প্রয়োজনে জগৎ এবং বাস্তবকে সত্য বলে মনে করেছে। কিন্তু জগতের বৈচিত্র্য এবং প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ বস্তুবাদ যথেষ্ট নয়। এই সাধারণ বা স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক এবং পূর্ণতার বিশ্লেষণ ঘটেছে দার্শনিক বস্তুবাদে। জগৎ সম্পর্কে দার্শনিক বস্তুবাদের অভিমত হচ্ছে : বস্তু এবং মন বা ভাবের মধ্যে বস্তু হচ্ছে প্রধান। মন, চেতনা এবং ভাব অপ্রধান। এরই অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে : বিশ্বজগৎ অবিনশ্বর এবং শাশ্বত। ঈশ্বর বা অপর কোনো বহিঃশক্তি বিশ্বের স্রষ্টা নয়। স্থান এবং কাল উভয়তই বিশ্ব অসীম। কোনো বিশেষ সময় কিংবা কালে যেমন বিশ্বকে অপর কেউ সৃষ্টি করে নি, তেমনি স্থানিক সীমা বলেও বিশ্বের কোনো সীমা নেই। বিশ্ব হচ্ছে বস্তু। চেতনা বিশ্বের বিবর্তনের সৃষ্টি। চেতনা বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া। চেতনা যখন বিশ্বের সৃষ্টি তখন বিশ্ব চেতনার অজ্ঞেয় নয়।

দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বস্তুবাদ প্রত্যেক যুগের প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং শ্রেণীর দর্শন হিসাবে অনুসৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি বা শ্রেণী জগৎকে সঠিকভাবে জানতে চেয়েছে এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছে তারাই বস্তুবাদকে তাদের দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছে। বস্তুবাদ কোনো কাল্পনিক অভিমত নয়। যে-

কোনো যুগের বৈজ্ঞানিক বিকাশের সূত্রকার বিবরণই বস্তুবাদ। বিজ্ঞানের বিবরণ যেমন বস্তুবাদ, তেমনি বস্তুবাদ আবার বিজ্ঞানের অগ্রগতিরও হাতিয়ার। বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ তাই পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ উভয়ই নিরন্তর বিকাশলাভ করছে। বস্তুবাদের জন্ম এবং বিকাশ কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রাচীন ভারত, চীন এবং গ্রিসের দাসভিত্তিকি সমাজে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক অন্যান্য জ্ঞানসূত্র বিকাশলাভ করার ফলে বস্তুবাদ প্রথম জন্ম লাভ করে। প্রাচীনকালের এই বস্তুবাদ জগৎ সংসারের সমস্যাদির ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই অতিসহজ বা প্রাথমিক চরিত্রের ছিল। বস্তুজগৎ মন নিরপেক্ষভাবেই অস্তিত্বসম্পন্ন, এই ছিল প্রাচীন বস্তুবাদের ধারণা। জগতের বৈচিত্র্যের মূলে কোনো একক নিশ্চয়ই আছে। এবং সে একক অবশ্যই বস্তু। প্রাচীন বস্তুবাদীদের মধ্যে চীনের লাওজু, ওয়াং চুং, ভারতের চার্বাকমত, গ্রিসের হিরাক্লিটাস, এ্যানাক্সাগোরাস, এমপিডোকলিস, এপিক্যুরাস প্রমুখ দার্শনিকের নাম সুপরিচিত। লিউসিপাস, ডিমোক্রিটাস প্রমুখ প্রাচীন বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বিচিত্র বস্তুর মূল হিসাবে এক কিংবা একাধিক অণুর অস্তিত্বের কথাও কল্পনা করেছিলেন। প্রাচীন বস্তুবাদের একটা অসম্পূর্ণতা এই ছিল যে, প্রাচীন বস্তুবাদের পক্ষে বস্তু এবং মনের পার্থক্য এবং সম্পর্কের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। মন বা চেতনার সকল বৈশিষ্ট্যকেই প্রাচীন বস্তুবাদ বস্তুর প্রকারভেদ বলে ব্যাখ্যা করতে চাইত। কিন্তু মন এবং চেতনা একটা জটিল সত্তা। তাকে কেবল বস্তুর প্রকারভেদ বললে তার সম্যক জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং 'মনসহ সব কিছুই বস্তু'—কেবলমাত্র এই তত্ত্ব দ্বারা জগতের জটিল বিকাশকে ব্যাখ্যা করা এবং মানুষের অগ্রগতির উপায় হিসাবে জ্ঞানকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রাচীন বস্তুবাদের মধ্যে প্রাচীন ধর্মীয় অলীক বিশ্বাসেরও আভাস পাওয়া যায়। য়ুরোপের মধ্যযুগে বস্তুবাদ ধর্মীয় প্রকৃতিবাদের রূপ গ্রহণ করে। সর্ববস্তুতে ঈশ্বর প্রকাশিত এবং প্রকৃতি এবং ঈশ্বর উভয়ই নিত্যসত্য, এই অভিমতের মাধ্যমে বস্তুবাদ এই যুগে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে বস্তুবাদের পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ ঘটে। আর্থনীতিক উৎপাদন, বিজ্ঞান এবং কারিগরি কৌশলের নতুনতর উন্নতির পরিবেশে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বস্তুবাদ মধ্যযুগের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পর্যায়ের বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বেকন, গেলিলিও, হবস, গাসেন্দী, স্পিনোজা এবং লকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্যায়ে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস এবং প্রকৃতিকে মূল সত্তা ধরে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা এবং যাজক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সময়ের প্রধান বিকাশ ঘটে গণিত এবং বলবিদ্যায়। বিজ্ঞানের এই দুই শাখার উপর নির্ভর করাতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয় যান্ত্রিকতা। চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগ সূত্র প্রকাশে এই বস্তুবাদ ব্যর্থ হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক ডিডেরট, হেলভেটিয়াস, হলবাক এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়াস পান। এর পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাকের মধ্যে আমরা নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের বিকাশ দেখি। বস্তুবাদের পূর্ণতর বৈজ্ঞানিক বিকাশ ঘটেছে ঊনবিংশ শতকের কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং লেনিনের দার্শনিক চিন্তাধারায়।

প্রাচীন বস্তুবাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিকতা, হেগেলের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব এবং মনুষ্য সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসীয় বস্তুবাদ কেবল বিশ্বসংসারের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। মার্কসীয় বস্তুবাদ বর্তমান বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের হাতে নতুনতর সঙ্গতিপূর্ণ মনুষ্যসমাজ তৈরির প্রধান হাতিয়ার। বস্তুত, দর্শনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যেখানে ভাববাদের প্রাধান্য ছিল, সেখানে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে।

Materialism and Empirio-Criticism : লেনিনের দার্শনিক গ্রন্থ : 'বস্তুবাদ এবং নব-অভিজ্ঞতাবাদ'

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে নানা দার্শনিক বিভ্রান্তির প্রকাশ দেখা যায়। ম্যাক, আভানারিয়াস প্রমুখ চিন্তাবিদগণ উনবিংশ শতকের শেষদিকে 'এ্যমিপিরিও ক্রিটিসিজম' নামক এক তত্ত্ব দাঁড় করান। রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে এই তত্ত্বের অনুসারীদের লেনিন 'ম্যাকিসট্স' বলে আখ্যায়িত করেন। এই তত্ত্বের মূল বিভ্রান্তির দিক উন্মোচন করে তার যে বিশ্লেষণ লেনিন রচনা করেন তাঁর সেই রচনা 'ম্যাটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম' নামে ১৯০৯ সনে প্রকাশিত হয়। লেনিন এই তাত্ত্বিকদের আলোচনা করে বলেন, আন্দোলনের বিপর্যয়েরকালে যেখানে প্রয়োজন দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সত্যকে সংশোধনবাদের আঘাত থেকে রক্ষা করা, রুশ 'ম্যাকিসট'গণ সেখানে 'সংশোধনবাদী নব অভিজ্ঞতাবাদের' 'অন্তর্বাদী' বা 'সাবজেকটিভ' ভাববাদ এবং জ্ঞানের প্রশ্নে 'অজ্ঞানবাদ'কে প্রচার করার চেষ্টা করছেন। বাজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কি প্রমুখ সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীগণ সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করছেন রহস্যবাদ এবং হতাশাবাদকে। অভিজ্ঞতাবাদ, উপলব্ধিবাদ, প্রতীকবাদ প্রভৃতি নতুন নতুন শব্দের আড়াল দিয়ে তাঁরা বিকৃত করার চেষ্টা করছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথা মার্কসবাদকে। লেনিনের এ গ্রন্থ ভাবধারার ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রশ্নে তাঁর আপসহীনতারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কি এঁরাও সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, কাজেই তাঁদের আক্রমণ করে রুষ্ট না করে তাঁদের সঙ্গে আপসের প্রস্তাব করলে লেনিন লেখক গোর্কীকে বলেছিলেন : 'আপনি নিশ্চয়ই একদিন স্বীকার করবেন যে, আদর্শের ক্ষেত্রে কোনো মতকে যদি দলের কর্মী স্বপ্রত্যয়ে ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর বলে জানে, তবে সে ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর মতের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করাই তার অনিবার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ; তার সঙ্গে আপস করা নয়।' লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে বার্কলে, কাণ্ট, হিউম প্রভৃতি আধুনিক মুখ্য ভাববাদীদের দর্শনসহ সমগ্র ভাববাদের, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে, তাঁর বিশিষ্ট রচনাশৈলীতে তীক্ষ্ণ সমালোচনা উপস্থিত করেন। লেনিনের 'ম্যাটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম' সংগ্রামী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংযোজন। (দ্র. Empirio Criticism নব অভিজ্ঞাতাবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ)

Meterialism, Historical : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মার্কসবাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়। মানব সমাজের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায়, মানুষের সামাজিক জীবনের ইতিহাসের মূল শক্তি হচ্ছে মানুষের জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম। মানুষ তার জীবন ধারণ করে জীবন রক্ষার উপাদানসমূহ সংগ্রহ এবং সৃষ্টির দ্বারা। এজন্য তার হাতিয়ার আবশ্যক। এই হাতিয়ার বা উপায়কে মার্কসবাদে উৎপাদনের শক্তি বা 'ফোর্সেস অব প্রোডাকশন' বলা হয়। উৎপাদনের উপায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরি হয়। এটা হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক বা 'প্রোডাকশন রিলেশনস'। আদিতে মানুষের অস্তিত্ব একেবারে প্রকৃতি ও পরিবেশ নির্ভর হওয়ার কারণে জীবিকার উপায়সমূহ যৌথভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ এবং তার ফলকে যৌথভাবে ভোগ করা ব্যতীত উপায়ন্তর ছিল না। মানুষের আদিকালের এই যৌথ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী অবস্থা বা পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এমন অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে না। অধিকতর স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য মানুষ জীবন ধারণের উপায়সমূহকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে তোলে। উন্নততর উপায়সমূহ সকলের হাতে সমানভাবে না থাকার কারণে এরূপ উপায় বা শক্তির মালিকগণ এরূপ উপায় বা শক্তির অমালিকগণের চাইতে অধিকতর শক্তিমান হয়ে পড়ে। শক্তিমানরা শক্তিহীনদের দ্বারা উন্নততর উৎপাদনী উপায় প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহে সমর্থ হন। সংগৃহীত সম্পদকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য করতে থাকে। এভাবে আদিম যৌথ বা সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার মালিক এবং অ-মালিক তথা পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। মার্কসবাদী তত্ত্বে সমাজ বিকাশের এই পর্যায়কে দ্বিতীয় বা দাস পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। এই দাসপর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পর্যায়ে শক্তিমান শ্রেণী শক্তিহীন দাসদের মাধ্যমে জীবন ধারণের দ্রব্যসামগ্রী, সম্পদ, ইত্যাদি সংগ্রহ করত। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল দাসভিত্তিক বা দাসদের শ্রমের শোষণভিত্তিক। এই দাস পর্যায় পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে একই সময়ে ছিল কিনা এবং তার আয়ুষ্কালের পরিধি কোথায় কি পরিমাণ ছিল তা এখনো গবেষণা এবং তর্কসাপেক্ষ। তথাপি মার্কসবাদ দাসপর্যায়কে মানব সমাজের অতিক্রান্ত ইতিহাসের একটি সাধারণ পর্যায় বলে গণ্য করে। শস্য উৎপাদনের নতুনতর হাতিয়ারাদির উদ্ভাবন, দাসদের বিদ্রোহ এবং নতুন উৎপাদনে দাসব্যবস্থা ক্রমান্বয় প্রতিবন্ধক বলে বোধ হতে থাকা প্রভৃতির মাধ্যমে দাসব্যবস্থার স্থানে নতুন অপর একটি অর্থনৈতিক পর্যায়ের উদ্ভব ঘটে। এটি সমাজ বিকাশের ইতিহাসে তৃতীয় বা সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে জমির শস্য এবং জমির উপর দখল সামাজিক জীবনের শক্তির আধার হয়ে দাঁড়ায়। জমির জবরদস্তি বা শক্তিমান মালিকরা সামন্তপ্রভু এবং গোড়াতে কৃষিতে বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত কৃষকদের ভূমিদাস এবং পরবর্তীতে কৃষক বলে অভিহিত করা হয়। এই পর্যায়ও কোন্ দেশে কিরূপ ছিল এবং এর কালপরিধি কি ছিল সে সম্পর্কে এখনও গবেষণা চলছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সংঘটিত হয়। মাটির অভ্যন্তরে শক্তির আধার কয়লা

উদ্‌ঘাটিত হয়। দ্রব্যের উৎপাদন অধিকতরভাবে পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য বিনিময় তথা পণ্য বিক্রয়ের রূপ লাভ করতে থাকে। শহরকেন্দ্রিক এবং উন্নততর যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রথমে ইউরোপে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে পুঁজিভিত্তিক যন্ত্রশিল্প তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে উনবিংশ শতকে প্রধান এবং প্রবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপ গ্রহণ করে। মানব সমাজের বিকাশের এই স্তরকে চতুর্থ তথা পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। মার্কসবাদের মতে এর পরবর্তী বা পঞ্চম পর্যায় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। (দ্র. Socialism সমাজতন্ত্র)

Matriarchy : মাতৃতন্ত্র

আদিম সমাজের বিকাশে একটি বিশেষ পর্যায় ছিল মাতৃতন্ত্র। এই পর্যায়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। সমাজের বিকাশের একেবারে গোড়ার দিকে মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ব্যক্তির ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। যৌথ-বিবাহ তখন প্রচলিত ছিল। যৌথ-বিবাহের ফলে সন্তান এবং বংশধারার জন্য বর্তমানের ন্যায় পিতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হতো না। মাতাই ছিল সন্তানের পরিচয়সূত্র। মাতৃপক্ষ থেকেই সন্তানের বংশধারা নির্দিষ্ট হতো। অমুক মায়ের সন্তান—এই ছিল সন্তানের পরিচয়। গোত্র-জীবনের অর্থনীতিরও পরিচালিকা ছিল নারী। পুরুষ পশুশিকার করত ; কিন্তু পশুশিকার জীবিকা নির্বাহের কোনো নিশ্চিত বা নির্ভরশীল উপায় ছিল না। শস্যক্ষেত্রে বীজবপন, সন্তানপালন, গৃহরক্ষা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ছিল নারীর। পশুপালন জীবিকার অন্যতম উপায় হওয়ার পরে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এই সময় থেকে জীবিকা নির্বাহে পুরুষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। উৎপাদনশক্তি হিসাবে পশুর বহর পালন এবং দাসদের খাটানোর দায়িত্ব পুরুষ গ্রহণ করতে থাকে। পিতা এখন থেকে পরিবারের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের গোড়াপত্তন এই সময়েই ঘটে।

Matter : বস্তু

চেতনায় প্রতিফলিত বটে, কিন্তু চেতনা নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্বকে বস্তু বলা হয়। বস্তুর অসংখ্য প্রকাশ। সর্বপ্রকার প্রকাশ, বিভিন্ন প্রকাশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, গতি সব কিছুর ধারক হচ্ছে বস্তু। গতি আর বস্তু ভিন্ন সত্তা নয়। গতিময়তা হচ্ছে বস্তুর অচ্ছেদ্য চরিত্র। কাজেই বিশেষ প্রকাশের বাইরে গতিহীন অনড় কোনো নির্বিশেষে বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। বিচিত্র প্রকাশকে তাদের গতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জানাই বস্তুকে জানা। বস্তু নিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে। বস্তুর বিবর্তনে যেমন চেতনার উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি চেতনার শক্তি বস্তুর বিবর্তনে এবং বস্তুর বৈচিত্র্যের বৃদ্ধিতে এক মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। বস্তুর বিকাশের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুলনামূলকভাবে সহজ থেকে জটিলতা প্রাপ্তি। বস্তুর বিকাশ যত জটিল, তত বিচিত্র তার প্রকাশ এবং তাদের

মধ্যকার আভ্যন্তরীক সম্পর্ক। বস্তুর বিকাশের চরম পর্যায়ে চেতনাসম্পন্ন মানুষের উদ্ভব ঘটেছে। চেতনা বস্তুর বিকাশের ফল হলেও চেতনা ও বস্তুর চরিত্র এত পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় যে, এই বিরোধিতার ভিত্তিতে ভাববাদী দার্শনিকগণ চেতনাকে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বস্তুর চেয়েও আদি এবং মূলসত্তা বলে দাবি করেন। ভাববাদী দার্শনিকদের অনেকের মতে চেতনা যে কেবল অ-বস্তু তাই নয়। চেতনাই বস্তুর মূল। বস্তু চেতনারই প্রকাশ কিংবা বস্তু চেতনার কল্পনা মাত্র। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে বস্তু এবং চেতনার মধ্যকার বিরোধিতা আপেক্ষিক। বস্তু এবং চেতনার মধ্যে চরম কোনো বিরোধিতা থাকতে পারে না। বস্তুর সঙ্গে চেতনাসম্পন্ন মানুষের যে সম্পর্ক তাতে মানুষ তার পরিবেশকে নিয়ত পরিবর্তিত করে বস্তুর নতুনতর প্রকাশের এবং তাদের নতুনতর সাংগঠনিক সম্বন্ধের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম এবং তা ঘটাচ্ছে। উৎপাদনের নতুনতর উপায়, দালানকোঠা, ঘর-বাড়ি তৈরি, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বিধানসমূহের প্রয়োগে নতুনতর দ্রব্যসামগ্রির সৃষ্টি—এসবই প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর মানুষের চেতনার হস্তক্ষেপের পরিফল। বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশলকে মানুষ যত আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে, বস্তুর প্রকাশের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মানুষ কেবল বস্তুর বিবর্তনের ফল নয় ; মানুষ বস্তুর বিবর্তনের অন্যতম মাধ্যমও বটে। অর্থাৎ বস্তুর ক্ষেত্রে মানুষ কেবল সৃষ্টি নয় ; মানুষ স্রষ্টাও। এই অভিমত ব্যক্ত করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্যতম ব্যাখ্যাতা লেনিন বলেছিলেন, 'মানুষের চেতনায় কেবল বাস্তব জগতের প্রতিফলন ঘটে না। মানুষের চেতনা বাস্তব জগৎকে সৃষ্টিও করে।'

Matubbar, Araz Ali : আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৬)

বাংলাদেশের বরিশাল শহরের ৭-৮ কিলোমিটার দূরের একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম। তাঁর নিজের কথায় 'লামচারী গ্রামের বাড়িতে বাংলা ১৩০৭ সালের ৩ পৌষ আমার জন্ম হয়।'

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন বাংলাদেশের এক অসামান্য লোক দার্শনিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। শ্রমজীবী কৃষকের জমিতে জাত, আত্মপ্রচার বিমুখ, ঋষিপ্রতিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। "কৃষকের সারল্য এবং স্মিতমুখে অনুচ্চ শব্দে এবং মিতবাক্যে তিনি কথা বলতেন। চলাচলে, বসনে ভূষণে এবং আলাপচারিতায় আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন অতুলনীয় এবং অনুপ্রেরণাদায়ক এক ব্যক্তিত্ব।" সাধারণ অর্থে কোনো বিদ্যাপীঠে তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ হয় নি। কিন্তু জ্ঞান আহরণ, গ্রন্থপাঠ এবং শিক্ষায় তিনি ছিলেন একটি আদর্শ চরিত্র। 'স্বশিক্ষিত' কথাটির একটি অসাধারণ বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর। যৌবনে মায়ের মৃত্যুর পরে আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের অনুশাসনের কারণে মায়ের কোনো আলোকচিত্র গ্রহণ এবং তাঁকে রক্ষা করতে না পারার কারণে তিনি মর্মাহত হন এবং সমাজের এমন অনুশাসনকে অবৈজ্ঞানিক এবং অমানবিক বলে অভিহিত করেন। তাঁর মন সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আচার আচরণ ও বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। আরজ আলী মাতুব্বর নিজের হাতে জমির কর্ষণ এবং অন্যান্য কাজ সম্পাদন করতেন। জীবিকার জন্য তিনি পরবর্তীতে জমি-জমার মাপ-জোঁকের কঠিন বিষয়ও নিজের চেষ্টায়

আয়ত্ত করে একজন 'আমিনের' বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবেশীদের নিকট একজন প্রাজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য জমিজমা জরিপকারী হিসাবে পরিচিত হন এবং এই বৃত্তি থেকে অল্পপরিমাণ যে অর্থ তিনি উপার্জন করেন তার ভিত্তিতেই তাঁর নিজ বাড়িতে স্কুল ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

জীবন, জগৎ, সৃষ্টিকর্তা, ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, বস্তু ও জীবনের সংজ্ঞা, জীব-অজীবে পার্থক্য প্রভৃতি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর কৈশোরকাল থেকেই নিজের মনে জিজ্ঞাসা তুলেছেন এবং চিন্তা করেছেন। অপরের সঙ্গে কোনো উচ্চকণ্ঠ তর্ক-বিতর্ক কিংবা কলহে প্রবৃত্ত না হয়ে তিনি নিজের চিন্তা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে তাকে পুস্তকাকারে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সে প্রকাশ বই-এর জগতে বাহ্যিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণকারী না হলেও, তাঁর সকল প্রকাশিত গ্রন্থই তাঁর মৌলিক চিন্তা ও জ্ঞানের পরিচয়বাহী। প্রতিকূল পরিবেশ এবং বৈরী রাজপুরুষরা নানাভাবে তাঁর চিন্তার প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। তাঁকে বিধর্মী, ধর্মহীন ইত্যাদি নিন্দনীয় অপবাদে আখ্যায়িত করে তাঁর সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট কেন তাঁকে তাঁর চিন্তার জন্য দণ্ড দিয়ে কারাগারে আটক করা হবে না, তার কারণ দর্শাবার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করে তাঁর উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এতদ্‌সত্ত্বেও চিন্তার ক্ষেত্রে আরজ আলী মাতুব্বর কখনো দমিত হন নি। তাঁর চিন্তার কোনো আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশে তাঁর আগ্রহ ছিল না। কিন্তু অনিসন্ধিৎসু মানুষ যেন তাঁর চিন্তার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে সেজন্য তিনি নিজ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে মুদ্রিত করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'সত্যের সন্ধান', 'অনুমান', 'সৃষ্টি রহস্য' ও 'স্মরণিকা'।

তাঁর 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে আরজ আলী মাতুব্বর যে মৌলিক প্রশ্নগুলির উল্লেখ করে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে রয়েছে : '১. আমি কে? ২. প্রাণ কি অরূপ, না স্বরূপ? ৩. মন ও প্রাণ কি এক? ৪. প্রাণের সহিত দেহের সম্পর্ক কি? ৫. প্রাণ চেনা যায় কি? ৬. আমি কি স্বাধীন? ৭. অশরীরিরী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে? ৮. প্রাণ কিভাবে দেহে আসা যাওয়া করে?'... ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রশ্নে আরজ আলী মাতুব্বর জিজ্ঞেস করেছেন, 'স্রষ্টা কি সৃষ্টি হইতে ভিন্ন?' ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী, না নিয়মতান্ত্রিক?'

কেবল দার্শনিক চিন্তার নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বোধের আর এক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এরূপ কর্মে যে, তিনি জীবিত অবস্থাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানুষের হিতার্থে তাঁর দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে উইলের মাধ্যমে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজকে দান করে গেছেন।

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের স্মারক আরজ আলী মাতুব্বর ১৯৮৬ সনে তাঁর পূর্ণজীবন সায়াহ্নে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Means of Production : উৎপাদনের উপায়

মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরির জন্য মানুষের শ্রম এবং মাল-মসলা ও যন্ত্রপাতির সমাহারকে উৎপাদনের উপায় বলা যায়। 'উৎপাদনের উপায়' বলতে তাই মানুষের শ্রমশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উভয়কে বুঝায়। মানুষের শ্রম যার উপর প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা

যায় শ্রমের মাধ্যম বা শ্রমের উপায়। এই অর্থে শ্রমের উপায় বলতে যে সমস্ত বস্তু এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা মানুষ তার প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর উৎপাদন করে সেই সমস্ত বস্তু এবং যন্ত্রপাতিকে বুঝায়। প্রাচীনকালে মানুষ প্রধানত লাঠি এবং ঘর্ষিত পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে তার জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং তৈরি করত। তাই প্রাচীনকালের মানুষের কাছে তার শ্রমের উপায় বা মাধ্যম ছিল লাঠি এবং পাথরের অস্ত্র। আধুনিক মানুষের কাছে তার শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার হচ্ছে বিবিধ রকম যন্ত্রপাতি। শ্রমের মাধ্যমের মধ্যে জমি, শ্রমের স্থান বা ঘর, রাস্তা ঘাট, খাল, নদী, পরিবহণের গাড়ি, জাহাজ প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য শ্রমের কার্যকর প্রয়োগের যাবতীয় উপকরণই শ্রমের উপায় বা মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মানুষের শ্রমের প্রয়োগে উৎপাদনের উপকরণ ক্রমান্বয়ে উন্নত এবং পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের শ্রমই যে কেবল উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তিত করেছে তাই নয়। উৎপাদনের উপকরণও আবার শ্রমের ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেছে। এক জোড়া গরু এবং একখানি লাঙ্গল যখন উৎপাদন বা শ্রমের উপকরণ ছিল তখন শ্রমের ক্ষেত্রে মানুষের সম্পর্ক ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আধুনিক কালে জটিল এবং বৃহৎ যন্ত্রপাতি যেখানে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে শ্রমের ক্ষেত্রে মানুষের সম্পর্ক অপরিহার্যরূপে যৌথ এবং সম্মিলিত সম্পর্কের রূপ গ্রহণ করেছে।

Medieval Philosophy : মধ্যযুগীয় দর্শন

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের দিকে য়ুরোপে পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এই দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী এক হাজার বছর য়ুরোপের দেশসমূহে দর্শনের যে বিকাশ ঘটে, তাকে য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে সাধারণত মধ্যযুগীয় দর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের দাসভিত্তিক সমাজে প্রাচীন য়ুরোপীয় দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন এই দাস সমাজের ধ্বংসের ফলে প্রাচীন দর্শনেরও অবক্ষয় ঘটে। রোম সভ্যতার পতনের পরে ইউরোপে জমিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পরিপোষক ভাবধারারূপে খ্রিষ্টীয় ধর্ম সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সহযোগী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিকে খ্রিষ্টীয় ধর্মের যাজকতন্ত্র সুসংগঠিত রূপ নিতে থাকে, অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যাধিকারীদের বশীভূত করে রাষ্ট্রপতি বা রাজতন্ত্র সুদৃঢ় হতে থাকে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পরিণামে খ্রিষ্টধর্মের যাজকতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে যাজকতন্ত্র যেমন নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তির একমাত্র প্রতিভূ বলে দাবি করে এবং রাজাকে যাজকতন্ত্রের অধীনস্থ বলে মনে করে, তেমনি অপরদিকে রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে দাবি করে রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে তার শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দর্শনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার দ্বারা দর্শন হয় ধর্মীয় পোপ নয়তো রাষ্ট্রীয় রাজার দাবিকে সমর্থন করে। প্রাচীন দর্শনের মধ্যে বাস্তবমুখীনতা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার যে পরিচয় ছিল, মধ্যযুগে তা হারিয়ে যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের উপলক্ষে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যোগাযোগ ঘটে এবং গ্রিক-দর্শনের আরবীয় অনুবাদের সঙ্গে য়ুরোপীয় দার্শনিকদের পরিচয় ঘটে। এর পূর্ব পর্যন্ত য়ুরোপের কাছে প্রাচীন গ্রিক-দর্শন একরূপ অজ্ঞাত ছিল।

মধ্যযুগের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চতুর্থ-পঞ্চম শতকের আফ্রিকার অধিবাসী ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন, দ্বাদশ শতকের আবেলার্ড, ত্রয়োদশ শতকের সেন্ট আলবার্ট, টমাস একুয়নাস, ডানস স্কোটাস, রোজার বেকন এবং দ্বাদশ শতকের স্পেনের মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ (যিনি য়ুরোপে আভারস নামে পরিচিত)।

Memory : স্মৃতি, স্মরণ

ব্যক্তির পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে ধারণ করে রাখা এবং তাকে চেতনার মধ্যে পুনরায় উপস্থিত করার ক্ষমতাকে স্মৃতি কিংবা স্মরণ করার ক্ষমতা বলা হয়। প্রতিমুহূর্তে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুজগতের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে। এই সম্পর্কের ফলে ব্যক্তির মনে ঘটনার ছাপ পড়ে। পরবর্তীকালে ব্যক্তি তার প্রয়োজন সাধনের জন্য অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনরায় চেতনার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। স্মরণ করার ক্ষমতা মানুষের জন্মগত হলেও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটি জটিল বিষয় এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গবেষণার ব্যাপার। কোনো ঘটনা স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে—কতখানি তার অনিবার্য, এ নিয়েও গবেষণা চলছে। স্মরণ রাখার ক্ষমতার মধ্যে তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগ হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে স্মরণীয় বিষয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে তার মনের অচেতন ভাণ্ডারে স্মরণীয় বিষয়ের অবস্থান। কারণ, যে ঘটনাকে ব্যক্তি কোনো বিশেষ মুহূর্তে স্মরণ করে, তা সর্বক্ষণ তার চেতনায় থাকে না। যে বন্ধুর নামটি আমি এই মুহূর্তে স্মরণ করলাম সে নামটি এর পূর্বমুহূর্তে আমার চেতনায় ছিল না। কিন্তু যখন আমার প্রয়োজন হলো তখন আমি তাকে আমার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে চেতনার আলোকে উদ্ধার করে আনলাম। চেতনার আলোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে স্মরণের তৃতীয় ভাগ। অতীতের সব ঘটনাকে আমরা প্রয়োজনমতো চেতনার মধ্যে আনতে পারি নে। কোনো কোনো ঘটনাকে আমরা চেতনার আলোকে আনতে পারি নে এবং কেন অপর কোনো ঘটনাকে পারি কিংবা কোন্ বয়সে আমরা অধিক সংখ্যক ঘটনাকে স্মরণ করতে পারি, কোন্ বয়সে খুব অল্প সংখ্যক ঘটনাকে স্মরণ করতে পারি—আমাদের স্মরণ ক্ষমতার এই তারতম্যের রহস্যোদ্ধার এবং স্মরণ করার ক্ষমতা কোন্ কৌশলে বৃদ্ধি করা যায় কিনা ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্মরণের তিন ভাগকে ইংরেজিতে 'লারনিং', 'রিটেনশন' এবং 'রিকল' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমরা এই তিনভাগকে যথাক্রমে 'শিক্ষা', 'ধারণ' এবং 'স্মরণ' বলে অভিহিত করতে পারি।

Meng Tzu : মেং জু (৩৭২-২৮৯ খ্রি. পূ.)

মেংজু ছিলেন কনফ্যুসিয়াসের অন্যতম অনুসারী। মেংজু ভাববাদী ছিলেন। তাঁর অভিমতে জ্ঞানের শুরু যুক্তি বা প্রজ্ঞায়, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতায় নয়। মানুষের চরিত্র মূলত উত্তম। মানুষ

জন্মগতভাবে মহৎ। কারণ মানুষের মহত্ত্বের মূল হচ্ছে ঈশ্বরের মহত্ত্ব। ভাববাদী হলেও তৎকালীন সামাজিক রাজনীতিক সমস্যায় মেংজুর একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক উল্লেখ করে মেংজু বলেছিলেন, শাসক হবে শাসিত অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থসাধনকারী। জনতার স্বার্থবিরোধী হলে শাসককে অপসারিত করার নীতিগত অধিকার জনতার আছে। সামন্ততান্ত্রিক চীন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য সাধনে মেংজুর অভিমতসমূহের একটা বিশেষ অবদান ছিল।

Metaphysics : অধিবিদ্যা, পরাদর্শন

উচ্চতর দর্শন বা সত্তার যথার্থ প্রকৃতির আলোচনামূলক জ্ঞান-শাখা। (দ্র. দর্শন)

Mill, John Stuart : জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রি.)

জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন উনবিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত দার্শনিক, যুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং নীতিশাস্ত্রবেত্তা। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সিসটেম অব লজিক', 'প্রিন্সিপল্স অব পলিটিক্যাল ইকনমি' 'অন লিবার্টি' 'রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট' এবং ইউটিলিটারিয়ানিজম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দর্শনের ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট মিলের মধ্যে হিউম, বার্কলে এবং কোঁতের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাববাদ এবং বস্তুবাদকে দর্শনের ক্ষেত্রে দুই বিপরীত প্রান্ত হিসাবে মনে করে মিল উভয়কে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন যে, বস্তু হচ্ছে অভিজ্ঞতাগত অনুভূতির সম্ভাবনা আর ভাব হচ্ছে মানসিক বোধের প্রকাশ। মানুষের অনুভব বা উপলব্ধির বাইরে বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর মানুষের অনুভব তার সেন্সেশন বা সংবেদনে সীমাবদ্ধ। যুক্তির ক্ষেত্রে মিল অবরোহী বা ডিডাকটিভ যুক্তির চেয়ে আরোহী বা ইনডাকটিভ যুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আরোহী যুক্তির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তিনি সাদৃশ্য, বৈশাদৃশ্য, সহ-পরিবর্তন এবং অবশিষ্টাংশসূচক কয়েকটি পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন। এগুলি মিলের পদ্ধতি নামে বিশেষভাবে পরিচিত। ইংরেজিতে এই পদ্ধতিগুলিকে যথাক্রমে মেথড অব এ্যাগ্রিমেন্ট, মেথড অব ডিফারেন্স, মেথড অব কনকোমিট্যান্ট ভেরিয়েশন এবং মেথড অব রেসিডুস বলা হয়। নীতিশাস্ত্রে মিলকে উপযোগবাদী বলা হয়। তিনি তাঁর পূর্বগামী বেনথামের উপযোগবাদ বা ইউটিলিটারিয়ানিজম তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি যে কারোর যে-কোনো আচরণের ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি হবে অধিকতম সংখ্যক মানুষের অধিকতম পরিমাণ সুখ উৎপাদনের উপযোগিতা। যে আচরণ মানুষের এরূপ সুখ উৎপাদনে উপযোগী, সে আচরণ ন্যায্য ; যে আচরণ এর অনুপযোগী সে আচরণ অন্যায্য। মিলের মতে অবশ্য সুখের নিরিখ কেবল তার পরিমাণ দিয়েই হবে না। পরিমাণের সঙ্গে গুণের প্রশ্নও বিবেচনা করতে হবে। সুখ কেবল পরিমাণগতভাবে পৃথক নয়। সুখ গুণগতভাবেও পৃথক হতে পারে। অর্থাৎ আমরা কেবল অধিক সুখই যে কামনা করব, তা নয়। আমরা উত্তম সুখেরও বাসনা করব। এবং 'অধিকের' চেয়ে 'উত্তমই' আমাদের কাম্য হবে। তা ছাড়া দৈহিক সুখের চেয়ে মানসিক সুখকে উত্তম বলে মনে করব।

মিল ছিলেন গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আপসহীন সমর্থক। ব্যক্তি স্বাধীনতার অলঙ্ঘণীয়তার উপর জোর দিতে গিয়ে মিল বলেছিলেন

"এমন যদি হয় যে, সমগ্র মানবজাতি একদিকে এবং একটিমাত্র ব্যক্তি বিপরীত দিকে, সমগ্র মানবজাতি একটি মতের পোষক এবং একটিমাত্র ব্যক্তি বিপরীত মতের পোষক, তা হলেও আমি বলব, ঐ একটিমাত্র ব্যক্তির বিরোধী মতকে দমন করার অধিকার সমগ্র মানবজাতির নেই, যেমন নেই একটিমাত্র ব্যক্তির (যদি তার সেরূপ ক্ষমতা থাকে) মানব জাতির মতকে দমন করার।" অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রের চিন্তার স্বাধীনতা এবং তা প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। সংখ্যা কিংবা শক্তির আধিক্য ব্যক্তির এই মৌলিক স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করতে পারে না। সেরূপ করার কোনো অধিকার কারোর নেই।

Monad : মোনাড

Monadology : মোনাডতত্ত্ব

গ্রিক শব্দ 'মোনাস' থেকে 'মোনাড'। 'মোনাস'-এর অর্থ একক। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের পাইথাগোরীয় ধারার চিন্তাবিদগণ মোনাস বা মোনাড তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। তাঁদের কাছে 'মোনাড' হচ্ছে গাণিতিক একক এবং এই গাণিতিক একক হচ্ছে বিশ্বের মূল একক। সংখ্যা দ্বারাই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হয়েছে। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে 'মোনাড' পদের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় জার্মান দার্শনিক লাইবনিজের দর্শনে। তাঁর 'মোনাডলজি' বা মোনাড তত্ত্বে লাইবনিজ মোনাডকে জগতের মূল, সরল এবং পরিবর্তনশীল একক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের মন বা আত্মাও হচ্ছে মোনাড। লাইবনিজের মতে প্রত্যেকটি মোনাডের মধ্যেই বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়। (দ্র. Leibniz : লাইবনিজ)

Montesquieu, Charles de : মন্টেস্‌ক্যু (১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রি.)

মন্টেস্‌ক্যু অষ্টাদশ শতকের ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্টেস্‌ক্যুর রচনাবলী ১৭৮৯ সালের ফরাসি ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম করার কাজে সাহায্য করে। কারণ মন্টেস্‌ক্যু স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় বিধানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করেন। রাষ্ট্র প্রকৃতিজাত সংগঠন এবং তার বিধানের মূলও প্রকৃতি, রাজা কিংবা ঈশ্বর নয়। মন্টেস্‌ক্যুর এই তত্ত্ব মধ্যযুগে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে গণ্য করার যে তত্ত্ব চলে আসছিল সেই কায়েমী তত্ত্বের বিরোধী ছিল। অবশ্য মন্টেস্‌ক্যু রাজতন্ত্রকে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। তাঁর মতে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই হচ্ছে সর্বোত্তম শাসনতন্ত্র। মন্টেস্‌ক্যুর অপর তত্ত্ব ভৌগোলিকবাদ বলে পরিচিত। এই তত্ত্বে তিনি বলেন, যে-কোনো একটা জনগোষ্ঠী বা জাতির দৈহিক, চারিত্রিক এবং রাষ্ট্রীয় চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রাকৃতিক অবস্থান অর্থাৎ তার ভূখণ্ডের আকার, জলবায়ু, মাটি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা। মন্টেস্‌ক্যু নিজে নাস্তিক না হলেও তিনি গির্জা এবং যাজকতন্ত্রের তীব্র সমালোচক ছিলেন। 'দি স্পিরিট অব দি লজ' মন্টেস্‌ক্যুর সুবিখ্যাত গ্রন্থ।

More, Thomas : টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রি.)

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে টমাস মুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়ার প্রাচীর ভেঙে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদার ভাবের নবজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে টমাস মুর ছিলেন অন্যতম মানবতাবাদী প্রাজ্ঞ পুরুষ। ১৫২৯-১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টমাস মুর ইংল্যাণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার হিসাবে রাষ্ট্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রে রাজা সার্বভৌম শক্তি, একথা টমাস মুর অস্বীকার করাতে তিনি রাজার কোপে পতিত হন। গির্জার উপর রাজার অধিকার অস্বীকার করার অপরাধে রাজার হুকুমে টমাস মুরের মাথা কেটে ফেলা হয়। টমাস মুরের রচনা 'ইউটোপিয়া' সুপরিচিত গ্রন্থ। 'ইউটোপিয়া' শব্দের অর্থ কাল্পনিক বা অস্তিত্বহীন। টমাস মুর তাঁর 'ইউটোপিয়া'তে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ছবি এঁকেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুরের 'ইউটোপিয়া' সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলে বিবেচিত হয়েছে। মুর তার সমকালীন ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার ভিত্তিতে তিনি এমন একটি বিকল্প সমাজের ছবি অঙ্কন করেন, যেখানে জনসাধারণ যৌথভাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। এই যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সমষ্টিগত শ্রমের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী নীতির সুবিস্তারিত কল্পনায় টমাস মুরের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর কাল্পনিক রাষ্ট্রে পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌল একক। উৎপাদনের প্রধান প্রক্রিয়া হচ্ছে হস্তশিল্প। এ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। নাগরিকমাত্রই শ্রমের ক্ষেত্রে এবং উৎপন্ন দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে একে অপরের সমান। এ-রাষ্ট্রে গ্রাম ও শহর জীবনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, দৈহিক শ্রম এবং মানসিক শ্রমের মধ্যেও অধম-উত্তমের বৈরিতা নেই। এ-রাষ্ট্রে মানুষ অনুক্ষণ শ্রমের শেকলে বাধা নয়। মানুষ ছ ঘণ্টা কাজ করে এবং বাকি সময় সে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা এবং চিত্তবৃত্তির চর্চায় অতিবাহিত করে। এ রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতি বিধান। শিক্ষার ক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং বাস্তবের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা থাকবে না। তত্ত্ব এবং তথ্যের সমাহারের ভিত্তিতে শিক্ষিত হবে ব্যক্তি। টমাস মুরের ইউটোপিয়ার এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকেও তাঁর চিন্তাধারার প্রাগ্রসরতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য একথা সত্য টমাস মুর সেদিন অনুধাবন করতে পারেন নি, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের এই যৌথ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজের বাস্তব জীবনে উৎপাদন কৌশলের অর্থাৎ তার যান্ত্রিক কলা-কৌশলের বিশেষ বিকাশ। টমাস মুর তাঁর পরিকল্পিত সমাজের বাস্তবায়নে সংগ্রামের আবশ্যকতাও উল্লেখ করেন নি। তিনি কল্পনা করতেন যে, সমাজের এই রূপান্তর শান্তিপূর্ণভাবে ঘটে যাবে।

Morgan, Lewis Henry : লিউস হেনরী মর্গান (১৮১৮-১৮৮১ খ্রি.)

লিউস হেনরী মর্গান আমেরিকার একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর 'এ্যনসিয়েণ্ট সোসাইটি' বা 'প্রাচীন সমাজ' সমাজ বিকাশের গবেষণায় এক মৌলিক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে মর্গান আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের জীবন যাত্রার উপর বিপুল পরিমাণ তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন। এই তথ্যের গবেষণায় তিনি আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন সাম্যবাদী জীবনের রেশ আবিষ্কার করেন। মর্গান শ্রেণীসমাজের পূর্বকার অবস্থার বিকাশকে যুগপর্যায়ে বিভক্ত করে দেখাবার চেষ্টা করেন। সে যুগ-বিভাগ আজ তত স্বীকৃত না হলেও তাঁর এ তত্ত্ব স্বীকৃত যে, মানুষের জীবনের ইতিহাসে পরিবারের যে একক, তা চিরদিন ছিল না। বিকাশের একটা ঐতিহাসিক পর্যায়েই পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে। এবং পরে আবার ইতিহাসের গতিপথে তার বিবর্তন ঘটেছে। বস্তুত মর্গান মানুষের সমাজের বিকাশের একটি বস্তুবাদী এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁর অবদান স্বীকার করে বলেছেন যে, মর্গানের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, মর্গান নিজের গবেষণার মাধ্যমে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে যেন পুনরায় আবিষ্কার করেছেন। এঙ্গেলস তার 'পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' শীর্ষক সুবিখ্যাত গ্রন্থে হেনরী মর্গানের 'এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি'র তথ্যসমূহকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন এবং তার মার্কসীয় ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

Mutakallimins : মুতাকাল্লিমিন

'কালাম বা খোদার বাণী থেকে মোতাকাল্লিমিন অর্থাৎ যারা খোদার কালাম বা বাণীকে ভিত্তি করে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম দর্শনে 'কালাম'বাদীগণ গোঁড়া এবং রক্ষণশীল বলে পরিচিত। এঁরা কোরানের বাণী এবং কোরানে আল্লাহর উপর আরোপিত মানবিক গুণাবলীকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। কালামবাদীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে ওয়ালিস বিন আতা, জাহিজ, মুআম্মার ইবনে আব্বাস প্রমুখ প্রাক্তন কালামাবাদীদের নেতৃত্বে মুক্তবুদ্ধির একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এঁরা কালামবাদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিলেন বলে এঁদের মুতাজিলা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হতো। কালামবাদকে কেবল অন্ধবিশ্বাস বলা চলে না। মুতাজিলাগণ নিজেদের যুক্তিবাদী বলত। কালামবাদীগণও নিজেদের যুক্তিবাদী বলত। কালামবাদীদের বক্তব্য ছিল যে, অন্ধবিশ্বাস যেমন ইসলামকে রক্ষা করতে পারে না, তেমনি মুতাজিলাদের গ্রিকদর্শনের বিধর্মী যুক্তিও ইসলামের জন্য মারাত্মক। ইসলামকে কোরানের বাণীর যুক্তিগত ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই রক্ষা করতে হবে।

Nation : জাতি

সাধারণত কোনো জনসমাজ যদি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী হয়, একই ভাষায় তারা ভাবের আদানপ্রদান করে, একই ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহক হয় এবং রাষ্ট্রীয় সীমানায় আবদ্ধ থাকে কিংবা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয় তা হলে এরূপ জনসমাজকে জাতি বলে অভিহিত করা হয়। বাংলায় জাতি শব্দের অবশ্য একাধিক অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ধর্মের ভিত্তিতেও এক জনসমাজ নিজেকে বা অপর সমাজকে জাতি বলে চিহ্নিত করে থাকে। অনেক সময় হিন্দু কিংবা মুসলমান কিংবা খ্রিষ্টান জনসমাজের লোক নিজেদের হিন্দু জাতি কিংবা মুসলমান জাতি বা খ্রিষ্টান জাতির লোক বলে অভিহিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'জাতি' সত্তার অস্তিত্ব ইতিহাসে সর্বদা ছিল না। আধুনিককালে জাতিকে সাধারণত রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমাজ বলে মনে করা যায়। কিন্তু একইরূপ জনসমাজের রাষ্ট্ররূপে সংগঠিত অবস্থা ইতিহাসের আদি স্তরে দেখা যায় না। প্রাচীনকালে মানুষ বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে বাস করত। কিন্তু একটি গোত্রের মধ্যে ঐক্যসূত্রের অস্তিত্ব থাকলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিধিবিধান দ্বারা সংগঠিত ছিল না। জনসমাজে জীবিকার ক্ষেত্রে শক্তির তারতম্যের উদ্ভবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টি থেকে জনসমাজে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উদ্ভব ঘটে। এই পর্যায় দাস পর্যায় বলে পরিচিত। কিন্তু দাস পর্যায়ের জনসমাজকেও জাতি বলা হতো না। সামন্তযুগে য়ুরোপীয় ভূখণ্ড বিভিন্ন ভূস্বামী এবং সম্রাটের মধ্যে বিভক্ত ছিল। য়ুরোপে জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সংকীর্ণ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করার মাধ্যমে নতুনতর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ সুগম করার প্রয়োজন বোধ ও প্রয়াস থেকে। এই প্রক্রিয়ায় ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং য়ুরোপে জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি এবং জাতিয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হতে থাকে। পরবর্তীকালে এই জাতীয়তাবোধ আবার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা এবং আগ্রাসী মনোভাবের সৃষ্টি করে। একটা ধনিক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে নিজের শত্রু বলে বিবেচনা করে। এর মূলে অবশ্য থাকে একের আর্থনীতিক আধিপত্য অপরের উপর প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অসঙ্গতি এবং সংকট অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং এর পরিণামে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে জনসমাজধ্বংসী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। জাতীয়তাবাদের দুটি রূপ ইতিহাসে স্পষ্ট। একটা তার সংগ্রামী এবং প্রগতিশীল ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধ একটা জনসমাজকে মুক্তির সংগ্রামে সংগঠিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আবার উগ্রজাতীয়তাবোধ একটা জনসমাজের মধ্যে গর্ব, অহংকার এবং আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টি

করে মানুষের অমঙ্গলের কারণ হতে পারে। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান জঙ্গী জাতীয়তাবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় এবং পৃথিবীর মহা অকল্যাণ সাধন করে। মানুষের সমাজ থেকে শ্রেণীভিত্তিক শোষণ বিদূরিত হলে মানুষের জাতিভিত্তিক বিভাগের গুরুত্ব হ্রাস পাবে, বিশেষ করে জাতিতে জাতিতে বৈরীমূলক সম্পর্কের আশঙ্কা দূরীভূত হবে বলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণ কল্পনা করেন।

'এক ভাষা, এক জাতি, এক রাষ্ট্র' এরূপ অবিমিশ্র রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ খুব বিরল। প্রধানত এক ভাষা, এক জাতি, এক রাষ্ট্রের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু এই বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাভাষী জনসমাজ আবদ্ধ নয়। ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিম বাংলাও বাংলাভাষী জনসমাজ অধ্যুষিত। আবার বাংলাদেশের মধ্যে কিছু সংখ্যক পার্বত্য উপজাতির অস্তিত্ব রয়েছে যাদের ভাষা বাংলা থেকে ভিন্ন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্তিত বা বিভক্ত হতে পারে। মহাযুদ্ধের পরে জার্মান জাতি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি হিসাবে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল। কোরিয়াও বর্তমানে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া হিসাবে বিভক্ত হয়ে আছে। ভিয়েতনামও অনুরূপভাবে বিভক্ত ছিল। ভারতীয় ইউনিয়ন এবং রাশিয়া বহু ভাষা ও বহু জাতির রাষ্ট্র।

National Democracy : জাতীয় গণতন্ত্র

বিপ্লবী শক্তির সমাবেশনের ভিত্তিতে গঠিত একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাঠামো। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা, জনসাধারণের জন্য ব্যাপক রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অধিকার স্বীকার, ব্যাপকতম জনসমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নীতি বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কৃষি সংস্কার সাধনের মধ্যে জাতীয় গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত। সাম্রাজ্যবাদী বন্দিত্ব থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত একটা জাতি ব্যাপকতম জনতার ঐক্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এবং সমাজ জীবনে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অর্জিত মুক্তিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সক্রিয় সমর্থনের ভিত্তিতে এরূপ জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ব্যতিরেকেই সরাসরি শিল্প সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া বর্তমান বিশ্বে অসম্ভব নয়।

Nationalism : জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ বলতে প্রধানত পুঁজিবাদী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক আদর্শকে বুঝায়। ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করেছে। পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী যুগে পদার্পণ করে তখন জাতীয়তাবাদেরও দুটি রূপ প্রকাশ পায়। এর একটা রূপ হচ্ছে অপর জাতি ও রাষ্ট্রের আক্রমণকারী ও নিপীড়নকারী আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের অপর প্রকাশ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিকামী

জনতার ঐক্য সৃষ্টিকারী সংগ্রামী মনোভাব। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদকে তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মনে করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি এবং তার সহযোগী শ্রেণী জাতীয়তাবাদের আওয়াজ তুলে একদিকে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং অপরদিকে জাতীয় ঐক্য তৈরি করে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি সংহত করার এবং তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণীর জন্য জাতীয়তাবাদ কোনো সহায়ক আদর্শ নয়। কারণ জাতীয়বাদের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এবং বৈরী বোধের সৃষ্টি করা। অপর দিকে সর্বহারা এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির আন্তর্জাতিক ঐক্য। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি, মুক্তিলাভের পরে রাষ্ট্রীয় শক্তি দখলকারী পুঁজিবাদী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বহারার নতুনতর সংগ্রামের সাফল্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সেই জাতীয়তাবোধকে একটা ভাবগত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের মোহ সৃষ্টি করে তাকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে পৃথক করে রাখারও সে প্রয়াস পায়।

New Left : নব বাম

বিশ শতকের ষাটের দশকে পাশ্চাত্যের বিদ্যমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, প্রচলিত জীবনধারা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আদর্শের বিরুদ্ধে পাঁতি বুর্জোয়া ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রতিবাদী যে আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে তা নব বাম আন্দালন বলে পরিচিত হয়। সামাজিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহাত্মক ভাব থাকলেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট এবং বিকল্প সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল না। এ আন্দোলনের কাছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যেমন অগ্রাহ্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও তেমনি অগ্রাহ্য। এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এই আন্দোলনের মধ্যে বিকল্পহীন নৈরাজ্যিক এবং নেতিবাচক প্রবণতাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। নব বাম আন্দোলন বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার সংকট সম্পর্কে ব্যাপক জনসাধারণের চেতনাকে আলোড়িত করার একটা ভূমিকা পালন করলেও, এর আদর্শহীনতা এবং পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য একে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনের সহজ শিকারে পর্যবসিত করে আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়। বৃহত্তর শোষিত মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীশক্তিকে নব বাম অস্বীকার করে। সংগ্রামী শোষিত মানুষের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মোকাবেলা করতে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

Neoplatonism : নব প্লেটোবাদ

৩য় থেকে ৬ষ্ঠ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে প্লেটোর ভাববাদের একটি রূপান্তরকে নব প্লেটোবাদ বলে অভিহিত করা হয়। এর উদ্ভব প্রথমে ঘটে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মিশরে। রোমের প্লটিনাসের উদ্যোগে একটি নব প্লেটোবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠিত হয়। নব প্লেটোবাদী দর্শনে বস্তুজগৎকে মূল ভাবের একটা রহস্যময় প্রকাশ বলে মনে করা হয়। আসল ভাব বা সত্তার প্রকাশ ঘটে স্তরক্রমে। এই স্তরের একেবারে নিম্নতম পর্যায়ের প্রকাশ হচ্ছে বস্তুজগৎ। বস্তুজগতের উর্ধ্বে হচ্ছে বিশ্ব-আত্মা। বিশ্ব-আত্মাকে অতিক্রম করে আত্মা। আত্মার উপরে হচ্ছে পরম আত্মা বা চরম সত্তা। প্লেটোর মূল দর্শনে ভাবকে ঈশ্বর হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি। কিন্তু নব প্লেটোবাদে প্লেটোর 'ভাব' ঈশ্বরে পর্যবসিত হয়ে নব প্লেটোবাদকে এক প্রকার ধার্মিক রহস্যবাদে পরিণত করে। মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় দর্শনের বিকাশে নব প্লেটোবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এথেন্স নগরীতে প্রোক্লাস সর্বশেষ যে নব প্লেটোবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন তা ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। (দ্র. Plotinus : প্লটিনাস)

New and Old : নতুন এবং পুরাতন

প্রাকৃতিক জগতের, বিশেষ করে মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশের মূলে রয়েছে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। সমাজের প্রতি পর্যায়ে যে শক্তি সমাজকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে দিতে সাহায্য করে সেই শক্তিই হচ্ছে 'নতুন' এবং যা সমাজকে যেমন আছে তেমন অবস্থায় রাখতে চায় কিংবা তার গতি বিপরীতমুখী করার প্রয়াস পায় তা হচ্ছে 'পুরাতন'। পুরাতনকে ভেঙে এবং অতিক্রম করে নতুনকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। তাই নতুনের আত্মপ্রকাশে একটা উৎক্রমণ বা আকস্মিকতার বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু তথাপি নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। 'নতুন' এবং 'পুরাতন' কথাও আপেক্ষিক।

যা আজ নতুন তা কালক্রমে পুরাতন হয়ে যায়। নতুনের মধ্যে বিরোধী শক্তির উদ্ভব ঘটতে থাকে। এই বিরোধী শক্তি নতুনতর অগ্রসরমান শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে এবং পূর্বকার 'নতুন' প্রতিদ্বন্দ্বে পুরাতনে পর্যবসিত হয়। পর্যায়ক্রমে এই প্রক্রিয়া সর্বদা সর্বঅস্তিত্বেই প্রবহমান। বস্তুত নতুন পুরাতনে দ্বন্দ্বই বস্তুজগতের গতি এবং জীবনের লক্ষণ। এই দ্বন্দ্ব কোনো ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

Newton, Issac : আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রি.)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বিশ্ববরেণ্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটনকে বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। নিউটন বস্তুজগতের সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। দার্শনিক চিন্তার বিকাশকেও তিনি বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর মূল গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'ফিলসফি ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা।' 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা' হিসাবে এ গ্রন্থ সর্বজনীনভাবে পরিচিত। তাঁর সর্ব-ব্যাপক মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সূর্য কেন্দ্রীক সৌরমণ্ডলের চিন্তাকে যেমন পরিপূর্ণতা দান করে তেমনি এ তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বের সকল বস্তু জগৎ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহকেও ব্যাখ্যার উপায় প্রদান করে। দর্শনের ক্ষেত্রে নিউটন সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব এবং মানুষের পক্ষে বিশ্বজগতের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। অবশ্য কালের প্রেক্ষিতে তিনি বস্তুর মূল গতি ঈশ্বর থেকে এসেছে বলে মনে করেন। কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে

তাঁর ঘোষণা, অনুমানের উপরে আমি কোনো কথা বলি নে, 'হাইপথেসিস ননফিঙ্গো' অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশে নিউটনের অবদান অবিস্মরণীয়। জ্ঞানের অসীমতার ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি 'আমি জ্ঞান সমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করে চলেছি' গভীর দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ অনুপ্রেরণাদায়ক উক্তি।

Nietzsche, Friedrich : ফ্রেড্রিক নিৎসে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রি.)

ঊনবিংশ শতকের জার্মানির ভাববাদী দার্শনিক ফ্রেড্রিক নিৎসে ফ্যাসীবাদী মতাদর্শের অন্যতম পূর্বসূরি ছিলেন। য়ুরোপে পুঁজিবাদ তখন সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অসঙ্গতি ও সংকট সমাজের অভ্যন্তরে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকে তীব্র করে সামাজিক বিপ্লবকে অত্যাসন্ন করে তুলছে। এই বাস্তব পরিবেশে পুঁজিবাদের আত্মরক্ষার এবং প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের আদর্শগত প্রতিভূ হিসাবে নিৎসের অভিমত প্রকাশিত হয়। নিৎসের দর্শনের মধ্যে তাই জনতা এবং বিপ্লবী মতাদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার ভাব সুস্পষ্ট। নিৎসের দর্শনের মূল কথা হচ্ছে : প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে নিরন্তর আত্মরক্ষা এবং বাঁচার সংগ্রাম চলছে। এই বাঁচার সংগ্রামের পরিণাম হচ্ছে ক্ষমতা বিস্তারের অদম্য ইচ্ছা। তাই শোষক, শোষিত বা দাস, প্রভু এগুলি প্রকৃতিগত ব্যাপার। শোষণ করা জীবনমাত্রেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আর দাস হওয়াটাও বাঁচার সংগ্রামে পরাজিত পক্ষের অনিবার্য ভাগ্য। পরাজিতের পক্ষে দাসত্ব স্বীকার করা হচ্ছে বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি। কিন্তু বাঁচার সংগ্রাম স্বাভাবিক এবং পরাজয়ের পরে দাসত্ব অনিবার্য বলে নিৎসে ঊনবিংশ শতকের ধনবাদী শোষককে ভবিষ্যতের অনিবার্য দাসত্বকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করেন নি। তাকে সংগ্রামের পরিণামে অনিবার্য পরাজয় থেকে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তার প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের মারফত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ধনবাদী সভ্যতার প্রথম যুগের প্রগতিশীল বুদ্ধিবাদ, উদারতাবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতি ভাবধারাকে দুর্বলচিত্ততা বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। নিৎসের মতে এই সমস্ত ভাবধারা আসন্ন বিপ্লবকে রোধ করতে অক্ষম। আসন্ন বিপ্লবকে রোধ করতে হলে সমাজের শক্তিধরদের নিজেদের চরিত্রে কাঠিন্য, সাহস, দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে হবে। তাদের নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হতে হবে। গণতন্ত্র এবং মানবতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। বস্তুত এই সংকট থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারবে একমাত্র অতিমানুষ যে তার উদ্দেশ্য সাধনে কোনো গণতন্ত্র এবং মানবতাবাদী নীতিরই পরোয়া করবে না। নিৎসের অতিমানুষের আদর্শই বাস্তবায়িত হয়েছিল বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানে এবং তার মনুষ্যেতর বর্বর নায়ক এ্যাডলফ হিটলারের চরিত্রে। নিৎসে দ্বিধাহীনভাবেই বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীকে বশে রাখতে হলে তার মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এবং পুঁজিবাদী প্রভুদের মধ্যে প্রভুত্বের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। নিৎসের মতে বিশ্বে অগ্রগমন বা বিবর্তন বলে কোনো সত্য নেই। বিশ্বে চলছে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পৌনঃপুনিক পুনরাবর্তন। 'জারাথুস্ত্র বললেন', 'হিত অহিতকে অতিক্রম করে' এবং 'উইল টু পাওয়ার' বা শক্তির সংগ্রাম নিৎসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Nihilism : নাস্তিত্ববাদ

হ্যাঁ বাচক বা অস্তিবাচক সবকিছুকে অস্বীকার করা হচ্ছে নাস্তিত্ববাদের বৈশিষ্ট্য। নিহিলিজম বা নাস্তিত্ববাদ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় রুশ সাহিত্যিক তুর্গেনিভের উপন্যাসে। উনবিংশ শতকে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গণতান্ত্রিক কর্মীদের নাস্তিত্ববাদী বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মিগণ নৈরাজ্যবাদী বা নাস্তিত্ববাদী ছিল না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আদর্শ রুশ ভূমিদাস প্রথা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেমন উচ্ছেদ কামনা করেছে, তেমনি তার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। লেনিন নাস্তিত্ববাদের মধ্যে দুটি সম্ভাবনার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের দাবি যদি নাস্তিত্ববাদে দেখা যায় তা হলে তার প্রগতিশীল চরিত্র স্বীকার্য। কিন্তু যে নাস্তিত্ববাদ মানুষের বুদ্ধি, ক্ষমতা সব কিছুকে অস্বীকার করে তার বৈশিষ্ট্য অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল।

Nominalism : নামবাদ, নামসর্বস্বতা

য়ুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শনে সাধারণ ভাবকে বিশেষ বস্তুর নাম বলে আখ্যায়িত করার অভিমত নামবাদ বলে পরিচিত। রাম, রহিম, সক্রেটিস বিশেষ বিশেষ মানুষের নাম। কিন্তু মানুষ বলতে কি বুঝাবে, এটি দর্শনের একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নে দুটি অভিমতের প্রকাশ দেখা যায়। একটি হচ্ছে বাস্তববাদ। অর্থাৎ বিশেষ বস্তুর যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি সাধারণ ভাবেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এর বিপরীত মত হচ্ছে নামবাদ। নামবাদের মতে সাধারণ ভাবের কোনো নির্বিশেষ অস্তিত্ব নাই। সাধারণ ভাবও একটি বিশেষ অস্তিত্ব। রহিম যেমন একটি বিশেষ অস্তিত্বের নাম তেমনি 'মানুষ'ও অপর একটি বিশেষ অস্তিত্বের নাম। নামবাদকে প্রাথমিক বস্তুবাদ বলে বিবেচনা করা যায়। কেননা নামবাদের প্রতিপক্ষে ছিল ভাববাদ। অর্থাৎ সবকিছুই ভাব। ভাবের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো বস্তু আছে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অভিমতের চরম প্রতিক্রিয়া হিসাবে নামবাদ বিশেষ অবিশেষ সব ভাবকে বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বসূচক নাম বলে আখ্যায়িত করে। পরবর্তীকালের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নামবাদের এই রকম নাম-সর্বস্বতাকে অস্বীকার করে। দ্বন্দ্বমূলক বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মতে মানুষ বিশেষের সঙ্গে বিশেষের তুলনার ভিত্তিতে সাধারণ চরিত্র বা ভাব আবিষ্কারের ক্ষমতা রাখে। সাধারণভাবে অস্তিত্বহীন নয়। কিন্তু তার অস্তিত্ব বিশেষ অস্তিত্ব নয়। বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষ ভাবের অস্তিত্ব। 'মানুষ' বলতে আমরা যে সকল গুণ বিভিন্ন বিশেষ মানুষ পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করেছি সে সকল গুণের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব যেমন বুঝায় না, তেমনি মানুষ বলতে রাম, রহিম, সক্রেটিস প্রভৃতি বিশেষ মানুষের মধ্যে সে সকল গুণের যে বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে তাও বুঝায়। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর নামবাদীদের মধ্যে জন ডানস স্কোটাস এবং অকামের উইলিয়ামের নাম উল্লেখযোগ্য। নামবাদের ভাববাদী ব্যাখ্যা দেখা যায় পরবর্তীকালে বার্কলে এবং হিউমের দর্শনে এবং সাম্প্রতিককালের শব্দতত্ত্বের মধ্যে।

Non-Aryans : অনার্য

উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ শতকের আর্যভাষীদের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতে যে সমস্ত জাতির লোক বাস করত তাদের সাধারণভাবে 'অনার্য' বলে আখ্যায়িত করা হয়। পূর্বে ভারতের ইতিহাসের পরিচয় আর্যদের আগমন থেকে দেওয়া হতো। তার পূর্বযুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হতো। কিন্তু বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে সিন্ধু নদীর উপকূলে হরপ্পা এবং মহেনজোদাড়ো নগরীর ধ্বংসাবশেষ খননের পরে ভারতের ইতিহাস আর্যপর্ব অতিক্রম করে খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বৎসর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে গেছে। হরপ্পা এবং মহেনজোদাড়োতে প্রাচীন ভারতের একটি সুবিকশিত সভ্যতার আভাস পাওয়া গেছে। এই সমস্ত প্রাচীন নগরীতে পোড়া ইটের দ্বারা বাড়ি তৈরি হতো। নগরীর রাস্তাঘাট পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্মিত হতো। প্রত্যেক বাড়িতে পানির কূপ এবং গোছলখানার ব্যবস্থা ছিল। অনেকে মনে করেন দক্ষিণ ভারতের আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতা এবং সিন্ধু উপকূলের এই সভ্যতার মধ্যে যোগসূত্র ছিল। সিন্ধু নদীর সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতার বিস্তার। আর্যপূর্ব 'অনার্য' ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে একেবারে প্রাচীনকালের পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আধুনিক কালে ভারতের সাঁওতাল পরগণাসমূহে ছোটনাগপুর এবং মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলে কোল বা মুণ্ডা নামক যে উপজাতিদের রেশ দেখা যায়, ঐতিহাসিকদের মতে তারা নব্যপ্রস্তর যুগের ভারতীয়দের উত্তর পুরুষ। আর্যপূর্ব হিসাবে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতিকেও অনার্য বলা যায়। বর্তমানের তামিলের প্রাচীন নাম দ্রাবিড়। দ্রাবিড় বলতে তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষাভাষীদের পূর্বপুরুষদের বুঝায়। বালুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষী অধিবাসীদেরও দ্রাবিড় জাতিভুক্ত মনে করা হয়। বালুচিস্তান ভারতের উত্তর পশ্চিমে। বালুচিস্তানে দ্রাবিড়ভাষার গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার সাক্ষাৎ থেকে এরূপ অনুমান করা হয় যে, দ্রাবিড়গণও ভারতের আদি মানুষ নয়। তারাও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই দ্রাবিড়দের সঙ্গে পরবর্তীকালে আগত আর্যদের লড়াই হয়। এই লড়াই-এ দ্রাবিড়গণ পরাজিত হয়ে আর্যদের দাসে পরিণত হয়।

অনার্যদের মধ্যে প্রাচীনকালে উত্তরপূর্ব দিক থেকে ভারতে আগত জনগোষ্ঠীকেও ধরা হয়। ভোটিয়া, নাগা, লেপচা, কিরান্তি, প্রভৃতি উপজাতি প্রাচীনকালে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগতদের উত্তর পুরুষ। (দ্র. ক্যামব্রিজ শর্ট হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া)

Non-Co-operation Movement : অসহযোগ আন্দোলন

ভারতবর্ষের ইংরেজ অধীনতার সময়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন বলে পরিচিত। গান্ধীজি (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯-১৯৪৮ লোকমুখে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত হতেন) তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে 'অহিংসা'র ভাবও যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অহিংসাভাব প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের একটি প্রধান ভাব। জীবমাত্রই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের কোনো সৃষ্টি বিনষ্ট করা উচিত নয়। এই বোধ থেকে জৈনধর্ম কোনো প্রকার জীবহত্যাকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটি বণিক এবং জৈনধর্ম-বিশ্বাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন। যৌবনে ইংল্যাণ্ড থেকে আইনবিদ্যা অর্জন করে তিনি প্রথমে দেশে, পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনের ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীগণ সরকারের বৈষম্যমূলক এবং বর্ণবিদ্বেষী বিধানের ফলে যে নির্যাতন ভোগ করছিল তার প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর এ প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৈহিক শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ নয়, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসভাবে প্রচারের সাহায্যে এবং নির্যাতন সহ্য করার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণ করার তিনি চেষ্টা করতেন। গান্ধীজির ভাষায় 'অহিংসা'র অর্থ অন্যায়কারীর নিকট নতি স্বীকার করা নয়। অহিংসার অর্থ স্বৈরাচারী ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সমগ্র আত্মার বোধকে উত্থিত করা।' দক্ষিণ আফ্রিকাতে যানবাহন, বিশেষ করে রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে অশ্বেতাঙ্গদের আরোহণ নিষিদ্ধ ছিল। এই আইনকে ভঙ্গ করে গান্ধীজি প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করতেন। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গগণ জোর করে, এমনকি শারীরিক নির্যাতন করে তাঁকে প্রথম শ্রেণী থেকে নামিয়ে দিত। গান্ধীজি সে নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করতেন। এই নির্বিকার নির্যাতন ভোগের দৃষ্টান্ত ক্রমান্বয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের এই অহিংস রীতি এবং অনমনীয় দৃঢ়তা ক্রমান্বয়ে শক্তি গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে ১৯১৪ সনে এশিয়বাসীর বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্জিত জনপ্রিয়তা নিয়ে ১৯১৪ সালে গান্ধীজি ভারতে প্রত্যাবর্তন করে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে' যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ইংরেজদের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে দেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এরূপ সহযোগিতায় ইংরেজ সরকার ভারতের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন করে ভারতকে 'স্বরাজ' দান করবে।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ সরকার ভারতে তার দমননীতি তীব্র করে তোলে। ভারতেও বিভিন্নভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত এবং বিস্ফোরিত হতে থাকে। ইংরেজ সরকার 'রাওলাট বিল' পাশ করে বিনাবিচারে গ্রেপ্তার, আটক এবং নির্যাতনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯১৯ সনের এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি প্রতিবাদ সভায় ইংরেজ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ডায়ার নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে শত শত লোককে হত্যা করে। (দ্র. অমৃতসর হত্যাকাণ্ড) সমগ্র পাঞ্জাবব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হয়।

এরূপ আবহাওয়ায় ভারতের প্রধান রাজনীতিক দল জাতীয় কংগ্রেসও ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের পূর্বেকার সহযোগিতার নীতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইংরেজ সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং স্বরাজলাভের জন্য প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব গান্ধীজির উপর দেওয়া হয়। তিনি অহিংসা এবং অসহযোগের ভিত্তিতে এই আন্দোলন পরিচালনা করা স্থির করেন। ১৯২০ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে এই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলন একটি ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ লাভ করে। হিন্দু এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে অনৈক্য ছিল তা ১৯১৬ সনের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে অনেকটা দূরীভূত হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মুসলিম

স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে একটা সমঝোতা স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের ফলে জার্মানির সহযোগী হিসাবে তুরস্কের পরাজয়ে তুরস্কের সুলতানের প্রতি ইংরেজদের আচরণে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তুরস্কের সুলতান তখনো মুসলিম জগতের 'খলিফা' বলে বিবেচিত হতো। সেভারস-এর চুক্তি (১৯২০) অনুযায়ী হেজাজ রাজ্যকে তুরস্কের অধীনতা মুক্ত করা হয় এবং আরমেনিয়া, থ্রেস, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ার এবং প্যালেস্টাইনের উপর থেকে তুরস্কের কর্তৃত্ব বিলোপ করা হয়। তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তির এরূপ আচরণ 'খিলাফত'কে ধ্বংস করার নামান্তর বলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় মনে করে। তারা 'খিলাফত' পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'খিলাফত কমিটি' গঠন করে। মৌলানা মোহাম্মদ আলী এবং মৌলানা শওকত আলী এই খিলাফত কমিটির নেতৃত্ব দেন। কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় খিলাফত কমিটিও এই আন্দোলনকে সমর্থন দান করে।

অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা ঘটে ইংরেজদের প্রস্তুত করা এবং ভারতে আমদানি করা পণ্যের বর্জন এবং তাকে ভস্মীভূত করা, মাদকদ্রব্যের দোকান বয়কট করা নিয়ে। ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন খাজনা এবং ট্যাক্স প্রদান না করা, ইংরেজ শাসনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র ও শিক্ষকদের দ্বারা বর্জন, এমনকি আইন-ব্যবসায়ীদের দ্বারা আইন-আদালত বর্জন পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনকারীরা স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণের নীতি গ্রহণ করে। ইংরেজ সরকার ভারতবাসীদের শান্ত করার জন্য রাজকুমার অর্থাৎ প্রিন্স অব ওয়েলসকে ভারত ভ্রমণে পাঠায়। কিন্তু তাঁর ভারত উপস্থিতির দিন (১৯২১-এর ১৭ নভেম্বর) দেশব্যাপী এক বিরাট প্রতিবাদ হরতাল পালন করা হয়। আন্দোলনের চরমে ৩০,০০০ আন্দোলনকারীকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। গান্ধীজি এই আন্দোলনকে পুরোপুরি অহিংস রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলন যত ব্যাপকতা এবং তীব্রতা লাভ করতে থাকে তত তা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকে। ফলে গান্ধীজি আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তিত হতে থাকেন। তিনি আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করেন। আন্দোলন ১৯২১ সনে যখন খুব তীব্র আকার ধারণ করে তখন আহমেদাবাদে কংগ্রেসের সম্মেলন আহ্বান করা হয়। যদিও দেশব্যাপী দাবি উঠেছিল যে আন্দোলনকে অধিকতর সংগ্রামী করে তুলতে হবে এবং 'স্বরাজ'-এর অনির্দিষ্ট কথাকে পরিবর্তন করে পূর্ণ স্বাধীনতাকে আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করতে হবে তথাপি আহমেদাবাদের কংগ্রেস সম্মেলনে স্বাধীনতা অবলম্বন করে সংগ্রামের জঙ্গী আওয়াজ পরিত্যাগ করা হয় এবং জনসাধারণের সম্মুখ থেকে খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধের লক্ষ্যও তুলে নেওয়া হয়। এই সম্মেলনেই হসরত মোহানী পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলে গান্ধীজি ক্ষোভের সঙ্গে একে দায়িত্ববোধের পরিচয়শূন্য বলে অভিহিত করেন। গান্ধীজি আন্দোলনকে এবার প্রতীকী রূপ দেবার চেষ্টা করেন। অহিংসা রক্ষার সকল সতর্কতা গ্রহণ করে তিনি একটি ছোট গ্রাম বরদলীকে গণঅসহযোগের জন্য নির্বাচিত করে সরকারের নিকট অবিলম্বে সকল বন্দির মুক্তি দাবি করেন। (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২) ইতোমধ্যে যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) চৌরিচৌরা গ্রামে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এই গ্রামের বিক্ষুব্ধ কৃষকগণ পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে একটি থানা ঘেরাও করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ২২ জন পুলিশের প্রাণহানি ঘটে। এই ঘটনার সংবাদ গান্ধীজির নিকট পৌঁছলে গান্ধীজি অবিলম্বে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করেন।

এই পর্যায়কে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় বলা চলে। ১৯৩০ পুনরায় সমুদ্রতীরের ডাণ্ডিতে লবণ আইন অমান্য করে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।
গান্ধীজি ছিলেন প্রধানত ভারতের রক্ষণশীল সমাজ এবং প্রতিষ্ঠাকামী ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ। এ শ্রেণী নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষকের জঙ্গী চেতনা এবং সংগঠনকে ভয়ের চোখে দেখত। এই ভীতি থেকে জনতা অধিকতর সংগ্রামী হতে চাইলে নেতৃত্ব তার রাশ টেনে ধরতে চেয়েছে। আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ব্যাপক জনতাকে অনুপ্রাণিত করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল গান্ধীজির। হিন্দু সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁকে সাধুপুরুষের মতো ভক্তি করত। ফলে তাঁর পরিচালনায় এই আন্দোলন পূর্বেকার সকল আন্দোলনকে অতিক্রম করে এক ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

Nous : নউস

প্রাচীন গ্রিক দর্শনে সকল চিন্তা ও চেতনার কেন্দ্রিভূত সত্তাকে 'নউস' বলা হতো। এ্যানাক্সগোরাসের দর্শনে নউসের প্রথম এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ্যানাক্সগোরাসের মতে আকারহীন আদি বস্তুর আকার ও বৈচিত্র্য প্রাপ্তির মূল শক্তি হচ্ছে 'নউস'। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের দর্শনে 'নউস'কে সব আকারের শেষ আকার বা সব ভাবের সর্বোচ্চ ভাব বলে ব্যাখ্যাত হতে দেখা যায়। প্রাচীন বস্তুবাদী দার্শনিকগণও 'নউস' শব্দকে ব্যবহার করেছেন। ডিমোক্রিটাস 'নউস'কে বলেছেন গোলাকার অগ্নি। থেলিসও নউসকে সৃষ্টির উৎস বলে মনে করেছেন। প্রাচীন দার্শনিকগণের কাছে নউস তাই বস্তু ও সৃষ্টি কর্মের মূল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের নউসের মধ্যে যে নির্বিশেষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মধ্যযুগের ব্যাখ্যায় সেই চরিত্র আর দেখা যায় না। মধ্যযুগে নউসকে দার্শনিকগণ ব্যক্তিক চরিত্র বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

Naya : ন্যায়

প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের একটি শাখার নাম ন্যায়। ন্যায় দর্শনের প্রধান জোর ছিল যুক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বের উপর। প্রাচীন উপাখ্যানের ঋষি গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। ন্যায়বাদ ভারতীয় দর্শনের অনুবাদ। কারণ ন্যায় দর্শনে বিশ্বজগৎ অসংখ্য অণুর সম্মেলনে সৃষ্ট হয়েছে। অসংখ্য অণুর সঙ্গে অসংখ্য আত্মার অস্তিত্বকেও ন্যায় দর্শন স্বীকার করে। আত্মা অণু থেকে আলাদা যেমন থাকতে পারে তেমনি তারা বস্তুর অণুতে মিশেও থাকতে পারে। ঈশ্বর অণু বা আত্মার স্রষ্টা নয়। ঈশ্বর হচ্ছে অণুর সঙ্গে আত্মার সম্মেলনকারী বা বিমুক্তকারী শক্তি। এ্যারিস্টটল যেমন গ্রিসের দর্শনে যুক্তিকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন, ভারতীয় দর্শনের ন্যায়ও তেমনি যুক্তিশাস্ত্রকে সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ করে। ন্যায়যুক্তির পাঁচটি স্তর, যথা প্রতিপাদ্য, প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্ত। ন্যায় দর্শন অনুবেদন (পারসেপশন), অনুমান তুলনা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির এবং গ্রন্থের সাক্ষ্যকে জ্ঞানের প্রক্রিয়াস্বরূপ বলে স্বীকার করে। জ্ঞান ও বস্তুর প্রধান সূত্রগুলিকেও ন্যায় দর্শন শ্রেণীবদ্ধ করেছে।

Ontology : তত্ত্ববিদ্যা, সত্তাতত্ত্ব, নির্বিশেষ তত্ত্ব

নির্দিষ্ট কোনো অস্তিত্বকে আমরা বিশেষ বলি। বলটি, বৃক্ষটি, লোকটি বিশেষ বস্তু। কিন্তু বিশেষই মূল, না বিশেষের পেছনে নির্বিশেষ কোনো সত্তা আছে, এ চিন্তা দার্শনিকদের আদিকালের চিন্তা। এ্যারিস্টটল এই প্রশ্নের জবাবে নির্বিশেষ অস্তিত্ব বা সত্তার তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁর মতে বিশেষ হচ্ছে খণ্ডিত সত্তা। সমস্ত বিশেষ নিয়ে অখণ্ড নির্বিশেষ সত্তা। কিন্তু তাই বলে বিশেষের সমাহার মাত্র নির্বিশেষ নয়। পরন্তু নির্বিশেষের প্রকাশেই বিশেষ এবং বৈচিত্র্য। বিশেষ নির্বিশেষের প্রশ্নে প্লেটো, এ্যারিস্টটলের পূর্বে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তু পুরিপূর্ণ সত্তা নয়। পরিপূর্ণ সত্তা বিশেষকে অতিক্রম করে বিরাজমান। নির্বিশেষের সাথে বিশেষের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অস্তিত্বের যথার্থতার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ নির্বিশেষ হচ্ছে বিশেষের নিয়ামক। প্লেটো-এ্যারিস্টটলের নির্বিশেষের এই তত্ত্ব পরাদর্শন বা পরাবিদ্যা বলে অভিহিত হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগের ধর্মীয় দর্শন প্লেটো এ্যারিস্টটলের এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। সেন্ট টমাস এ্যকুইনাসের মধ্যে এই ব্যাখ্যার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের পর থেকে নির্বিশেষ অস্তিত্বের তত্ত্ব দ্বারা ভাববাদী দার্শনিকগণ বস্তুমাত্রকেই অস্তিত্বহীন এবং ভাব বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এই প্রয়াসের চরম দেখা যায় জার্মান দার্শনিক উলফের রচনায়। উলফের ব্যাখ্যায় 'অস্তিত্ব' 'বাস্তবতা' 'সংখ্যা', 'কারণ'—এই সমস্ত ভাবের সঙ্গে বস্তুর কোনো সম্পর্ক নাই। হবস, স্পিনোজা, লক এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অস্তিত্বের এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে খণ্ডন করেন।

Opium War : আফিম যুদ্ধ

চীনের আধুনিক ইতিহাসে 'আফিং যুদ্ধ' কথাটিও ঘটনা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্যের নানা শক্তি ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য তাদের নৌবহর ইত্যাদি নিয়ে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চীনের আফিং এর চাষ খুব লাভজনক বলে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ বিবেচনা করে। চীনা সরকার চীনের সঙ্গে অবাধে চীন থেকে আফিং সংগ্রহ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ নিয়ে চীনের সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তির সংঘর্ষ এক পর্যায়ে যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। এই সংঘর্ষই আফিং যুদ্ধ বলে অভিহিত হয়। আফিং কেনা বেচার এই যুদ্ধ ১৮৪২ পর্যন্ত চলে।

Optimism and Pessimism : আশাবাদ এবং নিরাশাবাদ

ঘটনার মূল্যায়নে মানুষ যে দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে তাদের আশাবাদ এবং নিরাশাবাদ বলা হয়। ব্যক্তি এবং সমাজের জীবনে যে-কোনো ঘটনার তাৎপর্য আছে। সমাজের ঘটনাপুঞ্জ দিয়ে ইতিহাস তৈরি হয়। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ সাধারণভাবে দুটি মনোভঙ্গি নিয়ে

মানুষ করে এসেছে। ইতিহাসের বিবর্তনকে কোনো মানুষ সমাজের জন্য মঙ্গলকর বলে মনে করতে পারে। অপর একজন তাকে অমঙ্গলকর বলে ধারণা করতে পারে। অবশ্য ইতিহাসের এই মঙ্গলকর কিংবা আশাবাদী এবং অমঙ্গলকর অর্থাৎ নিরাশাবাদী ব্যাখ্যা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। প্রকৃতি জগতের ন্যায়, সমাজেও নিরন্তর শক্তির দ্বন্দ্ব,—নতুন ও পুরাতনের বিরোধ চলছে। এই দ্বন্দ্বে যে ব্যক্তি বা যে শ্রেণী নতুনের পক্ষভুক্ত, ঘটনার ব্যাখ্যা তার হাতে অবশ্যই আশাবাদী হতে বাধ্য। অপর দিকে যে ব্যক্তি সচেতন কিংবা অচেতনভাবে পুরাতনের পক্ষভুক্ত, তার ব্যাখ্যা নিরাশাবাদী হতে বাধ্য। ইতিহাসের যে-কোনো পর্যায়কেই যে কেবল আশাবাদী কিংবা নিরাশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তাই নয়। ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবেও আশাবাদী কিংবা নিরাশাবাদী হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কসবাদ ইতিহাসের বিবর্তনকে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করে।

'The Origin of the Family, Private Property and the State' : 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি'

এই শিরোনামটি ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের একখানি গ্রন্থের শিরোনাম, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। 'পরিবার' 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' এবং রাষ্ট্র'কে ধনতান্ত্রিক সমাজের সমাজবিজ্ঞানীগণ মানুষের জীবনের অপরিহার্য এবং চিরন্তন সংস্থা বলে প্রচার করে আসছিল। মার্কসবাদ সর্বপ্রথম সমাজের এরূপ ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে। সমাজের বিকাশের মার্কসবাদী ব্যাখ্যার প্রকাশ ঘটেছে এঙ্গেলসের বর্তমান পুস্তকে। আমেরিকার বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানী লিউস হেনরী মর্গানও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রাচীন সমাজ'-এ মানুষের আদি অবস্থা থেকে তার সংগঠনগত বিকাশের পর্যায়সমূহকে প্রচুর তথ্য সহকারে তুলে ধরেছিলেন। উক্ত তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অপরাপর গবেষণার সাহায্যে এঙ্গেলস তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে প্রথমে মানুষের আদি সাম্যবাদী অবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। মানুষের আর্থনীতিক জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবাহ এবং পারিবারিক বন্ধনের রীতি-প্রকৃতিও যে বিবর্তিত হয়েছে, সে তথ্য এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং টিউটন সমাজের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এঙ্গেলস প্রাচীন গোত্রতান্ত্রিক সমাজের ক্ষয়ের ধারাকে বিশ্লেষণ করে। মানুষের শ্রমের উৎপাদনী ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং শ্রম বিভাগের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্রব্যের বিনিময় প্রথা এবং তার পরিণামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। এই বিবর্তনে কৌম সমাজের ক্ষয় ঘটে এবং আর্থনীতিক শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়। সমাজের আর্থনীতিক উৎপাদনের বিকাশে যখন পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন আর্থনীতিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, তখনি শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে আবশ্যক হয়েছে বিধিবিধান প্রণয়নকারী ও রক্ষাকারী এক সংস্থার। এই সংস্থার নাম রাষ্ট্র। কাজেই এঙ্গেলসের মতে : ১. পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র—এগুলি মানুষের সমাজে কোনো চিরন্তন সংস্থা নয়। অর্থনীতির বিকাশের একটা পর্যায়ে এই সমস্ত সংস্থার উদ্ভব ঘটেছে। ২. রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রভু শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া। দ্বন্দ্বমান সমাজে প্রভু শ্রেণীর প্রয়োজন জোর জবরদস্তির মারফত শোষিত শ্রেণীকে দমিত করে রাখা। রাষ্ট্রের আইন এবং পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা—অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামো হচ্ছে সেই জবরদস্তি কার্যকরি করার মাধ্যম

বা যন্ত্র। ৩. সমাজ অনড় এবং অপরিবর্তনীয় নয়। সমাজের অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে। শোষক ও শোষিত হিসাবে মানুষের শ্রেণী বিভাগ ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও তা অবিনশ্বর নয়। সমাজের বিকাশের পরিণামে একদিন শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একদিন যেমন তার উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি আর একদিন তার বিলোপ ঘটবে। সমাজ আবার শোষক-শোষিত শ্রেণীমুক্ত সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হবে। সেদিন শোষকশ্রেণী থাকবে না এবং তার স্বার্থরক্ষার জন্য কোনো অত্যাচারমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকবে না। আর তাই সেদিন রাষ্ট্রও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। আস্তে আস্তে অত্যাচারমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Owen, Robert : রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮ খ্রি.)

রবার্ট ওয়েন ছিলেন একজন ইংরেজ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী। তার জন্ম একটি সাধারণ কারিগর পরিবারে। কিশোর বয়স থেকেই ওয়েন নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করতে শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বৃহৎ আকারে পুঁজিবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ এবং অসঙ্গতির বিষয়ে রবার্ট ওয়েনের গভীর এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তানায়কদের থেকে পৃথক ছিলেন। শিল্পবিপ্লবে জাত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অমানুষিক শোষণকে ওয়েন তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। শ্রমিকদের জন্য তাঁর সহানুভূতি এবং দরদ ছিল আন্তরিক। এই মনোভাব থেকে শোষিত শ্রমিকের মঙ্গলের জন্য তিনি নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করার চেষ্টা করেন এবং মানবতাসূচক কারখানা আইনেরও তিনি উৎস ছিলেন। রবার্ট ওয়েন বুঝতে পেরেছিলেন এই শোষণের মূলে আছে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা। ধর্ম এ শোষণকে সমর্থন করে। একারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ধর্ম উভয়েরই তিনি সমালোচনা করেন। বুর্জোয়া বিবাহ প্রথারও তিনি বিরোধী ছিলেন। রবার্ট ওয়েন ছিলেন যুক্তিবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী। মানুষের চরিত্র নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত শোষকের চরিত্র পরিবর্তন করা কিংবা শোষিতকে শোষণমুক্ত স্বাধীন সৃজনশীল মানুষে পরিণত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে : সমাজের পরিবর্তন কীভাবে সংঘটিত হবে? বিপ্লবের মাধ্যমে না মহৎ শিক্ষার ফলে? ওয়েন শ্রমিক দরদি হয়েও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিপ্লবের ভূমিকা অনুধাবন করতে পারেন নি। তাঁর মতে শিক্ষাই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন সাধনের মূল উপায়। ধনিক যে শ্রমিককে অন্যায়ভাবে শোষণ করে তার প্রধান কারণ সে তার এই অন্যায় সম্পর্কে অজ্ঞ। মহৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়-অন্যায়ের নতুন নীতিবোধ তৈরি করতে হবে। শিক্ষাকে পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে ওয়েন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক নতুন ভাব প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। শোষণমুক্ত ভবিষ্যৎ জগৎ কল্পনা করে ওয়েন বলেন যে, ভবিষ্যতে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকবে না। মানুষের সমাজ হবে তিন শত থেকে দু হাজার সংখ্যার এক একটি স্বায়ত্তশাসিত জনসমাজের স্বেচ্ছা সম্মেলন। কাল্পনিক সমাজবাদী চিন্তানায়কদের মধ্যে ওয়েনের ন্যায় শ্রমিক ও সমবায়ী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী চিন্তাবিদের সাক্ষাৎ খুব কমই মিলে। শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা যথাযথভাবে অনুধাবনে অক্ষম হলেও রবার্ট ওয়েন সব সময়ই শ্রমিক আন্দোলনের অবিচল সমর্থক ছিলেন।

P

Panchatantra : পৌরাণিক উপাখ্যান

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্প এবং রূপকথার একটা বড় উৎস ছিল 'পঞ্চতন্ত্র নামের উপাখ্যানাবলি।

Pantheism : সর্বেশ্বরবাদ

সর্বেশ্বরবাদ হচ্ছে একটি দার্শনিক অভিমত। এই মত অনুযায়ী ঈশ্বর বলতে বিশ্বজগতের বাইরের কোনো শক্তি বুঝায় না। ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক বটে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বের বাইরের নয়। বিশ্ব বা প্রকৃতিজগৎই ঈশ্বর। সবকিছুতে ঈশ্বর। সবকিছুই ঈশ্বর। কাজেই সর্বেশ্বরবাদের ঈশ্বর অতিপ্রাকৃতিক কোনো সত্তা নয়। প্রকৃতিই ঈশ্বর। অবশ্য সর্বেশ্বরবাদেরও বিকাশ ঘটেছে। সর্বেশ্বরবাদের এই ব্যাখ্যা যেমন বস্তুবাদী তেমনি পরবর্তীকালে সর্বেশ্বরবাদের ভাববাদী ব্যাখ্যাও ঘটেছে। এই ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে ঈশ্বর না বলে ঈশ্বরকে প্রকৃতি বলা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির অস্তিত্বের একটা যুক্তি থাকা আবশ্যক মনে করে ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেছেন প্রকৃতির কারণ হচ্ছে ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর যে প্রকৃতির বাইরে থেকে তাকে সৃষ্টি করেছে, এমন নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই প্রকৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

Papacy : পোপতন্ত্র

পোপের দরবার। পোপকে রোমের বিশপ বলা হয়। এ পদবির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রীক পাপাস এবং ল্যাটিন পাপা থেকে। এই পাপার উৎপত্তি ফাদার বা পিতা থেকে। গোড়াতে অনেক বিশপ বা পাদ্রীকে পোপ বলা হত। ক্রমশ পাশ্চাত্যে এই পদবী রোমের বিশপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হাতে থাকে। কিন্তু সপ্তম পোপ গ্রেগরি কেবলমাত্র রোমের বিশপের ক্ষেত্রে পোপ শব্দ আরোপ-যোগ্য বলার হুকুম দেন।

Pareto : পারেতো (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রি.)

এলিট বা শ্রেষ্ঠবাদের প্রবক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইতালির লেখক ভিলফ্রেডো পারেতো। তাঁর পরিচিত একখানি গ্রন্থের নাম 'দি মাইণ্ড এ্যাণ্ড সোসাইটি'। এলিটবাদের অপর এক প্রবক্তা ছিলেন ইতালিরই মসকা (গায়তানো মসকা : ১৮৫৮-১৯৪১)। তাঁর পরিচিত গ্রন্থের নাম 'দি রুলিং ক্লাস'। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদের পূর্ণতর বিকাশ একদিকে যেমন নানা আর্থিক ও সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করছিল তেমনি অপর দিকে শোষিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে চেতনার বিস্তার

ঘটছিল। এই সময়ে কলকারখানাতে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমের সময়, কাজের নিরাপত্তা, মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এসব আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও সংগঠনের নেতৃত্বে সাধারণ অর্থনৈতিক চরিত্র অতিক্রম করে রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। এরই একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে ১৮৭১ সনে প্যারিসের শ্রমিক অভ্যুত্থানে এবং শ্রমিকদের কম্যুন-শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়। তাদের এমন অভ্যুত্থান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে নির্মমভাবে দমিত হয়। কিন্তু এসব ঘটনাতে পুঁজিবাদী চিন্তাবিদদের একাংশের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী দর্শনের পাল্টা হতাশাবাদী দর্শন তৈরির প্রয়োজন বোধ দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান সংকট থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষার অন্যতম আদর্শগত উপায় হিসাবে সমাজ বিকাশের এবং সমাজ-প্রগতির প্রশ্নে সচেতনভাবে হতাশাবাদ সৃষ্টির এরা চেষ্টা করে। সংখ্যার চেতনা বা শক্তির কোনো মূল্য নেই। সাধারণ তথা নিষ্পেষিত মানুষ সংখ্যায় যত অধিকই হোক না কেন এবং গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের তারা যত আন্দোলনই করুক না কেন, তাদের নিয়তি হচ্ছে সংখ্যালঘু দ্বারা শাসিত হওয়া। মানব সমাজ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত। একটা হচ্ছে সংখ্যালঘু আর একটি হচ্ছে সংখ্যাগুরু। সংখ্যাগুরুরা সাধারণ। তারা সংখ্যালঘুর কূটবুদ্ধিতে, দক্ষতায়, বাগ্মীতায়, প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত এবং মোহিত হয় এবং সংখ্যালঘু দ্বারাই শাসিত হয়। রবার্ট মিশেল (১৮৭৬-১৯৩৫) তাঁর 'পলিটিক্যাল পারটিস' গ্রন্থে 'আয়রন ল অব অলিগারটি' বা 'সংখ্যালঘুর শাসনের অনিবার্য বিধান', বলে তত্ত্ব প্রচার করেন। উল্লিখিত লেখকদের রচনায় সমাজের আর্থিক অবস্থা এবং বিকাশের বিশ্লেষণ শূন্য কিছু নতুন রাজনৈতিক পদ তৈরি করে রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে রহস্যজনক এবং বাঞ্ছনীয় কোনো পরিবর্তনের উর্ধ্বে, এরূপ দেখাবার প্রবণতাই অধিক। (দ্র. Elite এলিট) প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপে ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভবে এই সমস্ত চিন্তাবিদদের চিন্তা উর্বর উৎসভূমি হিসাবে কাজ করেছে।

Parmenides : পারমিনাইডিস (৬০১-৫ম খ্রি. পূর্ব শতাব্দী)

পারমিনাইডিস ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ ইতালির এলিয়া শহরে। এজন্য পারমিনাইডিসকে 'এলিয়াটিক' দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পারমিনাইডিস মনে করতেন বিশ্ব হচ্ছে অনড় এবং নিশ্ছিদ্র অবিভাজ্য এক সত্তা। পারমিনাইডিস সত্যমিথ্যার যে তত্ত্ব দাঁড় করান তাতে সত্য হচ্ছে অবিনশ্বর, অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনীয়। আর মিথ্যা হচ্ছে বহু, নশ্বর, বিভাজ্য এবং সতত পরিবর্তনশীল। পারমিনাইডিসের এই তত্ত্ব স্পষ্টতঃই হিরাক্লিটাসের দ্বান্দ্বিক এবং গতি তত্ত্বের বিরোধী। তার তত্ত্বে ভাববাদ এবং যুক্তিবাদের আভাস পাওয়া যায়। সত্তার গতিহীনতার কথা পারমিনাইডিসই প্রথম জোরের সঙ্গে উত্থাপন করেন। ইতঃপূর্বের গ্রিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে তার নৈকট্য এবং বস্তুর দৃষ্ট গতি এবং পরিবর্তনকে যথার্থ মনে করা। পারমিনাইডিস গতি ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করে প্রাচীন দর্শনে অধিবিদ্যার অতিন্দ্রিয়তার সূত্রপাত করেন।

Patriarchy : পিতৃতন্ত্র

মানুষের সামাজিক বিকাশের একটি ঐতিহাসিক পর্যায় হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। মানুষের আদিম সামাজিক সংগঠন ছিল সাম্যবাদী এবং মাতৃতান্ত্রিক। পশু শিকারের পরবর্তী পর্যায়ে পশু পালন ও কৃষিকাজ যখন জীবিকার প্রধান উপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তখন মানুষের সামাজিক সংগঠনেও একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। ইতঃপূর্বে জীবিকার অধিকতর দুর্বল অবস্থার জন্য এবং পারিবারিক জীবনের অস্থিরতা এবং অসংবদ্ধতার কারণে সন্তানের জননী ছিল বংশের পরিচয় সূচক। এই পর্যায়কে বলা হয় মাতৃতন্ত্র। অর্থনীতির পরিবর্তিত পর্যায়ে মাতৃতন্ত্রের স্থানে পিতার অধিকার জীবিকার্জনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। এই পর্যায়ে শ্রমের বিভাগ শুরু হয়। পশুপালন ও কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেত্রের কৃষিকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে শুরু করে। দ্রব্যবিনিময়ের ব্যবস্থাও ইতোমধ্যে বেশ বিকাশলাভ করেছে। পশুর বিনিময়ে অন্য মানুষকে দাস হিসাবে লাভ করাও শুরু হয়েছে। পিতৃতন্ত্রের এই পর্যায়ে নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধের ধারাও পরিবর্তিত হয়। মাতৃতান্ত্রিক যুগে যৌথ বিবাহ কিংবা এক নারীর বহু স্বামী প্রথাই প্রধান ছিল। বর্তমান পর্যায়ে যৌথ বিবাহের স্থলে যুগ্ম বিবাহ চালু হতে শুরু করে। এখন থেকে পরিবারের এবং সন্তানের মালিক হয়ে দাঁড়ায় পিতা। বংশের সূচকও হয় পিতা। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের লোক সংখ্যা কম হতো না। যুগ্ম বিবাহ মানে এক পত্নীক বিবাহ নয়। পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারত। এবং যে কাউকে বর্জনও করতে পারত। এ পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে পুরুষই পরিবারের নিয়ন্ত্রক। পুরুষের সন্তানসন্ততি নিয়ে গোত্র তৈরি হতো ; উৎপাদনের উপায়, বিনিময় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকতর বিকাশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ক্রমে এক পত্নীক পরিবারের রূপ গ্রহণ করে।

Pavlov : পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬ খ্রি.)

আইভান পেট্রভিচ পাভলভ ছিলেন রুশদেশের একজন বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পাভলভের প্রধান খ্যাতি কুকুরের রিফ্লেক্স এ্যাকশন বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার গবেষণাকে কেন্দ্র করে। এই গবেষণার মাধ্যমে পাভলভ মানুষ এবং পশুর মস্তিষ্কের সঙ্গে বাইরের উত্তেজকের সম্পর্কের বিধান আবিষ্কার করেন। পাভলভের প্রতিবর্তক্রিয়ার তত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বস্তুবাদী এবং আচরণবাদী গবেষণা ও ব্যাখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (দ্র. Reflex প্রতিবর্ত)

Pentagon : পেন্টাগন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ দপ্তর (ভার্জিনিয়ার আরলিংটন শহরে অবস্থিত)। এরূপ মনে করা হয় যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের যত না অধীন আমেরিকার পেন্টাগন, তার অধিক পেন্টাগনের অধীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। সংখ্যাগতভাবে পেন্টাগন দ্বারা পঞ্চ বা পঞ্চ বাহুও বুঝান হয়।

Pentagon Papers : পেন্টাগন পত্রাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র পলিসির গোপন দলিল পত্র। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মার্কিন নীতির সূত্রসমূহ। গোপন এই দলিলপত্র সরকারকেই একজন কর্মচারী নিজের বিবেক বোধ থেকে ফাঁস করে দেওয়াতে জনসাধারণ এই সব দলিলের বেশ পরিমাণ সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হয় এবং মার্কিন যুদ্ধনীতির প্রকাশ এবং সামরিক আক্রমণের নীতি অধিকার প্রকাশ্যভাবে পরিচালনার দাবী বৃদ্ধি পেতে থাকে।

People : জনতা

সাধারণভাবে কোনো রাষ্ট্র বা দেশের সমস্ত জনসংখ্যাকে জনতা বলা যায়। কিন্তু বর্তমানকালে 'জনতা' শব্দের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। মার্কসবাদী রাজনীতিক তত্ত্বে জনতা দ্বারা সমগ্র জনসংখ্যাকে বুঝানো হয় না। মার্কস জনতা বলতে কোনো দেশ বা সমাজের সেই জনাংশকে বুঝাতে চেয়েছেন যে জনাংশ তার আর্থনীতিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে সমাজকে বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নততর ভবিষ্যৎ অবস্থায় নিয়ে যেতে সক্ষম। মার্কসবাদের মতে সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেওয়ার পূর্বকালেই মাত্র জনসংখ্যা এবং জনতা সমার্থক ছিল। কিন্তু সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর উদ্ভব হওয়া থেকে যে-কোনো যুগে কিংবা দেশে জনতা বলতে জনসংখ্যার শোষিত অংশ বুঝায়। সমাজের বিকাশের কোনো একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থার মধ্যে যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তখন জনসংখ্যার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। এক যুগে কিংবা এক পর্যায়ে যে জনতা শোষিত বলে পরিগণিত হয়েছে, পরবর্তীযুগে সে জনতা আর শোষিত না থাকতে পারে। এমন পরিবর্তিত অবস্থায় জনতা বলতে পূর্বের চেয়ে ভিন্নতর জনাংশকে বুঝাবে। এই বিচারের ভিত্তিতে সামন্তবাদী যুগে অগ্রসর শক্তি হিসাবে জনতার মধ্যে বিকাশমান পুঁজিবাদী শ্রেণীও ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী পরিবর্তন সম্পন্ন হওয়ার পরে পুঁজিবাদী শ্রেণী পরিপূর্ণরূপে শোষক এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হওয়াতে জনাংশের এই অংশকে আর জনতার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এই যুগে জনতা হচ্ছে বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন সর্বাধিক পরিমাণে শোষিত, কারখানার শ্রমিক এবং তার সহযোগী শোষিত গরিব কৃষক এবং মধ্যবিত্ত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টির সূচনায় সমাজতন্ত্রিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা আর জনতা পুনরায় সমার্থক হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা প্রাপ্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আর্থনীতিকভাবে কোনো শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। তাই সেখানে জনতা বলতে সমাজের সমস্ত অধিবাসীকেই বুঝায়।

Peoples Democracy : জনগণতন্ত্র

ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী পর্যায়কে আজকাল জনগণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে, এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সাধারণভাবে গৃহীত মত এই ছিল যে, বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে এবং পার্লামেন্টারি বা পরিষদীয় গণতন্ত্রের মারফত সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা গৃহীত হতো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে পূর্বজার্মানিসহ পূর্বয়ুরোপের কয়েকটি দেশ সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে এই সমস্ত দেশে এমন একটা জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে যার নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর হলেও তার মধ্যে কেবল শ্রমিক ও কৃষক নয়, জাতীয় ধনিক শ্রেণীরও একটি বৃহৎ অংশ যোগদান করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এরূপ সার্বিক ঐক্য গঠিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখন তার আন্দোলনেও সর্বশ্রেণীক চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মুক্তি আন্দোলনের জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পূর্বয়ুরোপীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বেশ কয়েকটি পার্থক্য ছিল। পার্থক্যগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা চলে : ১. রাষ্ট্রীয়ভাবে যে আন্তর্জাতিক শক্তি এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সহায়ক ছিল সে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশ, কোনো ধনবাদী দেশ নয়। ২. জাতীয় মুক্তি-মোর্চায় শ্রমিক শ্রেণী কেবল অংশীদার ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীই এই জাতীয় মুক্তি-মোর্চায় সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক সশস্ত্র সংগ্রামী নেতা ছিল। ৩. শ্রমিক শ্রেণী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি এই মুক্তি-মোর্চার নেতৃত্ব দিয়েছে। ৪. জাতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শক্তি হিসাবে জনসাধারণের কাছে চিহ্নিত এবং মুক্তিযুদ্ধের সফল অগ্রগতিতে দৈহিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াতে পুঁজিবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতীয় ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কারণে পূর্বয়ুরোপের কয়েকটি দেশে যুদ্ধ শেষে সরাসরি সমাজতন্ত্র কায়েম না হলেও, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অপরাপর জাতীয় শ্রেণীর সহযোগিতায় গঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে অবারিত করে দেয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামো কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক না হওয়াতে, অপরাপর শ্রেণীর উহাতে অংশ থাকাতে এবং অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ আকারে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকাতে এই পর্যায়কে সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিকগণ নয়াগণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র বলে অভিহিত করতে শুরু করেন। চীন এবং এশিয়ার অপর কয়েকটি দেশে মুক্তিযুদ্ধের উল্লিখিত চরিত্রের কারণে সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী স্তর হিসাবে জনগণতন্ত্র বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সফল মুক্তি আন্দোলনেও জনগণতন্ত্রের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

Peripatetics : পেরিপ্যাটেটিক, এ্যারিস্টটলীয়

গ্রিক শব্দ 'পেরিপ্যাটেটিকস' থেকে পেরিপ্যাটেটিক শব্দের উৎপত্তি। শব্দটির অর্থ ছিল চলমান অবস্থাতে কিছু করা। গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর লাইস্যুম দর্শনাগারে পদচারণা করতে করতে দর্শনের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন কিংবা বক্তৃতা দিতেন। এ কারণে তাঁর অনুসারীগণকে চলমান বা পেরিপ্যাটেটিক বলে অভিহিত করা হতো। এ্যারিস্টটলের প্রতিষ্ঠিত দর্শনাগার প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-কেন্দ্ররূপে কার্যকর ছিল। এর কার্যকালকে সাধারণত ৩৩৫ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করা হয়। এ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পরে এই দর্শনাগারের সঙ্গে

তাঁর যে সমস্ত অনুসারী যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে থিওফ্রাস্টাস, স্ট্রাটো, এ্যান্ড্রোনিকাস-এর নাম বিশেষভবে উল্লেখযোগ্য।

Personality Cult : ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তিত্বের বিকার, ব্যক্তিপূজা

রাজনীতিক দল কিংবা আন্দোলনের মধ্যে জনপ্রিয় নেতা নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সচেতনভাবে অপর সকলকে মোহগ্রস্ত এবং বাধ্য করার চেষ্টা করলে ব্যক্তিত্বের বিকার জন্মলাভ করে। আধুনিক কালের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংগঠিত দলের যে অসীম ক্ষমতা, তাতে দলের জনপ্রিয় নেতার মধ্যে এই ত্রুটি প্রকাশের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। লেনিনের মৃত্যুর পরে স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত সংগ্রামী সংগঠন। কেন্দ্রিয় কমিটি এবং যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে এই দল পরিচালিত হলেও দলের সাধারণ সম্পাদকের পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্টালিন তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে নিজেকে অস্বাভাবিকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। ক্রমান্বয়ে দলে যৌথ নেতৃত্বের বদলে দলের অনুসারীগণ সকল সাফল্যের মূল হিসাবে স্ট্যালিনের স্তুতিবাদ গাইতে শুরু করেন। স্ট্যালিনের জীবিতাবস্থায় সমালোচনা করার সাহস না পেলেও ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্ট্যালিন তাঁর নিজের একক নেতৃত্ব কায়েম রাখার জন্য সংগঠনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছেন এবং অমানুষিক দমননীতি প্রয়োগ করে বহু দলীয় কর্মী এবং নেতার অভিমত স্তব্ধ করেছেন—এমনকি তাঁর নির্দেশে অন্যায়ভাবে অনেকের জীবন নাশ করা হয়েছে। ক্রুশ্চভের এই সমালোচনায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যাঁকে এতদিন প্রায় অভ্রান্ত এবং মনীষী বলে বিশ্বের কমিউনিস্ট অনুসারীগণ সম্মান ও ভক্তি করে এসেছিল ক্রুশ্চভের বর্ণনায় তিনি অমানুষিক নির্যাতনকারী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকারগ্রস্ত ডিক্টেটর বলে প্রতিভাত হন। বস্তুত স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে তাঁর এরূপ সমালোচনা একদেশদর্শী এবং প্রতিপক্ষের জবাবহীন সমালোচনা ছিল। এই সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক ভারসাম্যের অভাব ছিল। কিছুকাল পরে ক্রুশ্চভও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব হতে অপসারিত হন। কারণ কমিউনিস্ট অনুসারীগণ ব্যক্তিত্ববাদের সমালোচনাকারী ক্রুশ্চভের চরিত্রের মধ্যে অতি আত্মবিশ্বাসী এবং মোহবিস্তারকারী প্রগলভতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্যান্য লক্ষণের প্রকাশ দেখতে শুরু করেছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিকালে স্ট্যালিনের যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টা করছেন বলে মনে হয়। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক গ্রন্থে স্ট্যালিনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঠিক নেতৃত্বদান ও বিজয় পর্যন্ত স্ট্যালিনের চরিত্রে মারাত্মক কোনো ত্রুটি দেখা দেয় নি। কিন্তু যুদ্ধপরবর্তীকালে স্ট্যালিন চরিত্রে অভ্রান্তি এবং বিরাটত্বের ত্রুটি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

স্ট্যালিনের একদেশদর্শী সমালোচনার মূলে ছিল সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আঘাত করার একটি গূঢ় ইচ্ছা। এই ইচ্ছার পরবর্তী প্রকাশ ঘটে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে

সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তির সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণে। এর পরিণতিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন সংঘটিত হয় নব্বই-এর দশকে।

Philosophy : দর্শন

জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধানের আলোচনাকে দর্শন বলা হয়। মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশের একটা পর্যায়েই মাত্র মানুষের পক্ষে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ তার নিজের উদ্ভব মুহূর্ত থেকেই চিন্তার এরূপ ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম ছিল না। মানুষের চেতনার বিকাশের একটা স্তরে মানুষ তার পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। নিজের জীবনকে অধিকতর নিশ্চিত করে রক্ষা করার প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি-জগতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। প্রকৃতি, জগৎ এবং পরবর্তীকালে মানুষের নিজের দেহ এবং চেতনা সম্পর্কেও সে চিন্তা করতে শুরু করে। আদিকালে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ খুব অধিক ছিল না। দর্শনই আদি জ্ঞানের মূল ভাণ্ডার। জগৎ ও জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা মানুষের কাছে প্রশ্ন আকারে উপস্থিত হয়। যে প্রশ্নই উপস্থিত হোক না কেন মানুষ তার একটা জবাব দিয়ে প্রকৃতিকে বশ করার চেষ্টা করেছে। তাই আদি দর্শন একদিকে যেমন সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার তেমনি আবার তার মধ্যে সমস্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সমাধানের বদলে কাল্পনিক সমাধানের সাক্ষাৎ অধিক মেলে। কালক্রমে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দার্শনিক কল্পনা বাস্তব জীবনে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে তার স্থানে অধিকতর সঠিক সমাধান আবিষ্কৃত হতে থাকে। এইভাবে অধিকতর বাস্তব এবং সুনির্দিষ্ট আলোচনার ভিত্তিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিকশিত হতে থাকে। পূর্বে প্রকৃতি, পদার্থ, সমাজ, চেতনা, যুক্তি, অর্থনীতি, ধর্ম, সবই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে তাদের প্রত্যেকে এক একটি ভিন্ন বিজ্ঞান বা আলোচনার শাখায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এই বিকাশের পরিমাণে বর্তমানে দর্শন বলতে কেমলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভরশীল কোনো বিষয় আর অবশিষ্ট নেই। তাই দর্শনের প্রাচীন সংজ্ঞা এবং তার বর্তমান পরিস্থিতি এক নয়। সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের জ্ঞান বিকশিত হওয়ার পরেও দর্শনকে অনেকে কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াসে দর্শন জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ে। যেখানে প্রাচীনকালে জীবনের সমস্যাই দর্শনের বিকাশ ঘটিয়েছে সেখানে আধুনিক কালের এরূপ প্রয়াস দর্শনকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অবাস্তব কল্পনায় পর্যবসিত করেছে। দর্শনের এই সংকটের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন ঊনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দর্শনকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে বলেন যে, দর্শন হবে জীবন ও জগৎকে বৈজ্ঞানিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। দর্শন হবে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের স্বার্থে জগৎ এবং সমাজকে পরিবর্তিত করার ভাবগত হাতিয়ার। দর্শন অবাস্তব কল্পনা নয়। দর্শন জগৎ ও জীবনের মৌলিক বিধানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আর এই ব্যাখ্যারই অপর নাম হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব।

দর্শন যেমন মানুষের আদি জ্ঞানভাণ্ডার, তেমনি তার ইতিহাস জ্ঞানের যে-কোনো শাখার চেয়ে প্রাচীন। প্রাচীন গ্রিস, ভারত ও চীনে দর্শনের বিস্ময়কর বিকাশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু দর্শনের বিবর্তনকে দেশ বা জনগোষ্ঠী হিসাবে বিভক্ত করার কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। জীবন ও জগতের সমস্যা নিয়ে চিন্তাই হচ্ছে দর্শন। মানুষের চিন্তা তার সামাজিক, আর্থনীতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে মানুষের সমাজ আর্থনীতিক বিকাশের যে প্রধান পর্যায়গুলি অতিক্রম করে এসেছে দর্শনের বিবর্তনেও সেই পর্যায়গুলির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য দর্শনের ইতিহাসকে গ্রিক, ভারতীয়, চৈনিক, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয়, কিংবা হিন্দু, ইসলামি, বৌদ্ধ প্রভৃতি হিসাবে বিভক্ত না করে দাস সমাজের দর্শন, সামন্তবাদী সমাজের দর্শন, পুঁজিবাদী সমাজের এবং সমাজতন্ত্রী সমাজের দর্শন হিসাবে বিশ্লেষণ করা শ্রেয়।

জীবন ও জগতের যে-কোনো সমস্যাই গোড়াতে দর্শনের আওতাভুক্ত থাকলেও দর্শনের মূল প্রশ্ন হিসাবে বিশ্বসত্তার প্রকৃতি, মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতা অক্ষমতার প্রশ্ন, বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের চিন্তা প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায় বা যুক্তি এবং মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধের ভিত্তি ও তার বিকাশের প্রশ্নগুলি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত দর্শনের নিজস্ব আলোচনার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। দর্শনের এই মূল বিষয়কে 'মেটাফিজিক্স্, অধিবিদ্যা বা পদার্থ—অতিরিক্ত বিদ্যা বলে অনেক সময় অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালের বিশ্বকোষিক এ্যারিস্টটলের আলোচনারাজিকে ফিজিক্স, মেটাফিজিক্স, লজিক, এথিকস, পলিটিকস পোয়েটিকস, রেটোরিকস প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

Philosophy of History : ইতিহাসের দর্শন

মানুষের আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিকাশের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং বিধানের আলোচনাকে ইতিহাসের দর্শন বলা হয়। ইতিহাসের দর্শন নিয়ে প্রাচীন জ্ঞানীগণ আলোচনা করলেও একটি নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে ইতিহাসের দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা আমরা অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ভলটেয়ার, হারডার, কনডরসেট, মন্টেস্ক্যু প্রমুখের মধ্যে বিশেষভাবে দেখতে পাই। ইতঃপূর্বে চতুর্থ শতকের খ্রিষ্টীয় ধর্মযাজক সেইন্ট অগাস্টিনের দেওয়া ইতিহাসের ধর্মীয় অদৃষ্টবাদী ব্যাখ্যাই প্রচলিত ছিল। প্রচলিত এই ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে ভলটেয়ার, মন্টেস্ক্যু প্রমুখ চিন্তাবিদগণ ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সামগ্রিকতা, অগ্রগতি, কার্যকারণ সম্পর্ক এবং ইতিহাসের গতিতে মানুষের ভৌগোলিক এবং সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। দার্শনিক হেগেল ইতিহাসকে ভাবের স্ববিধানভিত্তিক বিকাশমান সত্তা বলে ব্যাখ্যা করেন। ইতিহাসের এই ভাববাদী ব্যাখ্যার প্রতি-ব্যাখ্যা হিসাবে মার্কস এবং এঙ্গেলস ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। ইতিহাসের দর্শনে আধুনিককালের ভাববাদী ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে টয়েনবি এবং স্পেংলারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের ব্যাখ্যায় ইতিহাসের বিবর্তনে অগ্রগতি এবং কার্যকারণের বিধানকে অস্বীকারের প্রবণতা দেখা যায়।

Philosophy of Antiquity : প্রাচীন দর্শন

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে প্রাচীন দর্শন বলে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রাচীন দর্শনের বিকাশ ঘটে দাসের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গ্রিক সমাজে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে। এবং খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোমের দাসভিত্তিক সাম্রাজ্য। দর্শনের এই প্রাচীন পর্যায়ের বিস্তার খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ধরা যায়। এই প্রাচীন পর্যায়ের ইতিহাসের গোড়ার দিকে গ্রিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃতিবাদী। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন থেলিস, এ্যানাক্সিমেণ্ডার, এ্যানাক্সিমেনিস এবং হিরাক্লিটাস। জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যায় এই সমস্ত দার্শনিক প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এঁদের ব্যাখ্যায় নানাপ্রকার রূপক, উপাখ্যান এবং কল্পনার সাক্ষাৎ মিললেও এই যুগের দার্শনিকগণ সমস্ত অস্তিত্বের মূল হিসাবে জল, বায়ু, অগ্নি, মাটি প্রভৃতির একটি কিংবা একাধিক বস্তুকে গ্রহণ করেছেন। হিরাক্লিটাসের দর্শন কেবল বস্তুবাদী ছিল না। তাঁর মতে সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন চলছে। পরিবর্তন সত্য ; আপাতঃদৃশ্য স্থিরতা বা পরিবর্তনহীনতা সত্য নয়। কিন্তু অপরিণত বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশে ক্রমান্বয়ে ভাববাদী বৈশিষ্ট্যেও উদ্ভব ঘটতে থাকে। সক্রেটিস এবং প্লেটোর দার্শনিক আলোচনায় এক শক্তিশালী ভাববাদী দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দাস এবং অপরাপর শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন নাগরিকদের নগররাষ্ট্রে অসংগতি ও সংকট যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের ন্যায় প্রভু শ্রেণীভুক্ত চিন্তাবিদগণ তাঁদের রাষ্ট্র এবং সমাজকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দৃশ্যের পেছনে অদৃশ্য সত্তা, চরম উত্তম, ধর্ম, অবস্থার অপরিবর্তনীয়তা প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট দার্শনিক ভাবসূত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। প্রাচীন দর্শনের বস্তুবাদী ধারার অধিকতর বিকাশ এমপিডকলিস, এ্যানাক্সগোরাস লিউসিপাস এবং ডিমোক্রিটাসের চিন্তাধারায় দেখা যায়। বস্তুত দর্শনের সমগ্র ইতিহাসে ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে মূল দুটি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার সূত্রপাত প্লেটো এবং ডিমোক্রিটাসের দর্শনেই ঘটে। লেনিন দর্শনের ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, দর্শনের ইতিহাসের মূল ধারার একটিকে প্লেটোর ধারা, অপরটিকে ডিমোক্রিটাসের ধারা বলেও আখ্যাত করা চলে।

Plato : প্লেটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.)

প্লেটো ছিলেন গ্রিসের ভাববাদী দার্শনিক। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। সক্রেটিসের নিজের কোনো রচনার কথা জানা যায় না। কিন্তু প্লেটো সক্রেটিসকে নায়ক করে বিপুল সংখ্যক সংলাপমূলক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রিপাবলিক লজ, এ্যাপোলজি, ক্রিটো, ফিডো, পারমিনাইডিস, থিটিটাস প্রভৃতি সংলাপের নাম বিশেষ বিখ্যাত। প্লেটোর পূর্ববর্তী গ্রিক দার্শনিকদের দর্শন ছিল প্রধানত প্রকৃতিবাদী। সে দর্শনে বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে ভাববাদী তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁর মতে দৃশ্য জগতের বস্তু সত্য নয়। দৃশ্য

জগতের বস্তু হচ্ছে খণ্ড সত্য। সমস্ত সৃষ্টির পেছনে এক সত্তা আছে যার চরিত্র বস্তুগত নয়। মূল সেই সত্তা হচ্ছে অ-বস্তু ও ভাব। দৃশ্য বস্তু হচ্ছে সেই ভাবের প্রকাশ। ভাব হচ্ছে অবিনশ্বর এবং অতিন্দ্রিয়। মূল সত্তা-রূপ ভাবের কোনো সৃষ্টি কিংবা ক্ষয় নেই। স্থান এবং সময়ের উপরও সে নির্ভর করে না। এই ভাবকে প্লেটো আবার বিশ্বের আত্মা বলেও অভিহিত করেছেন। এই বিশ্ব-আত্মার খণ্ড প্রকাশ ঘটে ব্যক্তির আত্মার মধ্যে। আমাদের জ্ঞানের সঠিকতা নির্ভর করে ব্যক্তির আত্মার পক্ষে বিশ্ব-আত্মাকে আপন স্মৃতিতে ভাস্বর করে তোলার মধ্যে। জ্ঞানের মধ্যে প্লেটো একটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছেন। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির দুটি দিক। একদিকে আমরা ক্রমাধিক সাধারণীকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সাধারণ সত্যে আরোহণ করি। অপর দিকে সর্বোচ্চ সাধারণ সত্য থেকে ক্রমান্বয়ে অল্প থেকে অল্পতর সাধারণ সত্যের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন বিশেষ সত্য বা ভাবে আরোহণ করি। গ্রিসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাসের এবং অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের শোষণ। প্লেটো নিজে ছিলেন অভিজাত শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'লজ' বা বিধান এবং 'রিপাবলিক' নামক সংলাপে তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তার ভিত্তিও তাই দাসের শ্রম। রাষ্ট্রের শাসক হবে দার্শনিক সম্প্রদায়। তার রক্ষক হবে সৈন্যবাহিনী। দার্শনিক আর সামরিকবাহিনী এরাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সত্তার অধিকার ভোগকারী স্বাধীন নাগরিক। এদের নিচে অবস্থান হচ্ছে দাস এবং শ্রমজীবী কারিগরের। তারা শ্রম করে শাসক দার্শনিক এবং রক্ষক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করবে। শাসক দার্শনিকদের জীবিকার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। তাদের কোনো ব্যক্তিগত পরিবার বা সম্পত্তি থাকবে না। কিন্তু তাই বলে তাদের কোনো কিছুর অভাবও থাকবে না। অভাবহীন অবকাশে তারা শাসনের কৌশল আয়ত্ত করবে এবং এইভাবে শাসন-বিশেষজ্ঞ হয়ে শাসনক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হবে। শিশুকাল থেকে শাসকসম্প্রদায়ের সন্তানদের এক সার্বিক শিক্ষার মাধ্যমে শাসক হওয়ার উপযুক্ত গুণে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। প্লেটো যেভাবে রাষ্ট্রের শাসন, রক্ষণ এবং উৎপাদনমূলক কাজকে পৃথক করে এক এক সম্প্রদায়ের উপর নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে শ্রম বিভাগের গুরুত্ব যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেটোর শ্রমবিভাগ এবং আধুনিক কালের শ্রমবিভাগ অবশ্যই পৃথক। প্লেটো তাঁর এই বিভাগকে কার্যত অনড় শ্রেণী বিভাগে যেমন পরিণত করেছিলেন, তেমনি এই বিভাগের একটিকে অপর একটি থেকে উত্তম এবং অধম বলেও নির্দিষ্ট করেছিলেন। শাসনের কাজ হচ্ছে সর্বোত্তম কাজ। আর শ্রম দিয়ে উৎপাদন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও মূল্যায়নের দিক থেকে অধম কাজ। প্লেটোর ভাবগত দর্শন আর সমাজগত তত্ত্ব উভয়ই পরবর্তীকালের ভাববাদী চিন্তার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

Plekhanov : প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮ খ্রি.)

রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী চিন্তাবিদ এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসাবে জর্জি ভালেন্তিনোভিজ প্লেখানভের প্রসিদ্ধি। প্লেখানভের রাজনীতিক ও তাত্ত্বিক জীবন অবশ্য নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। গোড়াতে তিনি একটি নারোদনিক সংগঠনের নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে রুশদেশ পরিত্যাগ করে যখন বিদেশে যান তখন তিনি মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর রচনাবলী পাঠ করেন এবং পশ্চিম ইউরোপের

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এই পর্যায়ে তিনি নারোদবাদ বা সংস্কারবাদী জনতা দল পরিত্যাগ করে বিপ্লবী মার্কসবাদের আদর্শে শ্রমিকের মুক্তি' নামক একটা দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের মাধ্যমে তিনি মার্কসবাদের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বগত রচনায় নারোদবাদ, আইনগত মার্কসবাদ, সংস্কারবাদ এবং বুর্জোয়া দর্শনকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। ১৯০৩-এর পরবর্তী পর্যায়ে মার্কসবাদের সঙ্গে প্লেখানভের মতদ্বৈধ দেখা দেয়। মার্কসবাদের অনুসারীগণ বলেন যে, ১৯০৫-এর অভ্যুত্থান এবং প্রতিক্রিয়ার হাতে তার পরাজয়ের তাৎপর্য অনুধাবনে প্লেখানভ ব্যর্থ হন। পরিণামে তিনি বলশেভিকদের বিরোধীপক্ষ মেনশেভিকদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্যও তিনি উপলব্ধি করতে অক্ষম হন। কিন্তু তা হলেও লেনিন এবং মার্কসবাদীগণ প্লেখানভের তাত্ত্বিক রচনাসমূকে মার্কসবাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যায়ন বলে মনে করেন। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে 'ইতিহাসের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার বিকাশ', 'বস্তুবাদের প্রসঙ্গ' 'ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Plotinus : প্লটিনাস (২০৫-২৭০ খ্রি.)

প্লটিনাস গ্রিসের একজন ভাববাদী দার্শনিক। কিন্তু প্লটিনাসের জন্ম হয় মিসরে এবং তিনি জীবন অতিবাহিত করেন রোম নগরে। প্লটিনাসকে নব-প্লেটোবাদের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। প্লটিনাসের ব্যাখ্যায় দর্শন অধিকতর রহস্যময় তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। প্লটিনাসের মতে সৃষ্টি পরিক্রমার উৎস হচ্ছে এক ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছে মানুষের অনুধাবন কিংবা বর্ণনার ঊর্ধ্বে। এই এক উৎস প্রথমে বিশ্বপ্রজ্ঞা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বপ্রজ্ঞা পরে জগতের আত্মা এবং ব্যক্তির আত্মা এবং ব্যক্তির দেহরূপে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তির দেহ এবং জগতের বস্তুর কোনো সত্য অস্তিত্ব নাই। মানুষের কামনা হবে দেহের ভোগ, বাসনা, আকর্ষণ অতিক্রম করে দেহ থেকে আত্মায় এবং আত্মা থেকে বিশ্বপ্রজ্ঞায় আরোহণ করে পরিশেষে এক পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়া।

Pluralism : বহুত্ববাদ

একত্ববাদের বিরোধী তত্ত্ব হচ্ছে বহুত্ববাদ। বহুত্ববাদের মতে অস্তিত্বের মূলে আছে বহু এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন সত্তা। এই বহুসত্তার মূলকে কোনো এক সত্তায় পরিণত করা সম্ভব নয়। বহুত্ববাদের একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে লাইবনিজের বহুমোনাডের তত্ত্ব।

Politics : রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি

রাষ্ট্রনীতি বলতে অবশ্য রাষ্ট্র সম্পর্কীয় নীতি বুঝায়। কিন্তু বহুলপ্রচলিত শব্দ রাজনীতি দ্বারা আমরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার আন্দোলন বুঝাই। এই অর্থে আমরা 'স্বাধীনতার আন্দোলন', 'স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করি। 'রাজনীতি' ব্যাপকতর অর্থে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার দাবি নয়, রাষ্ট্র এবং

সমাজের যে-কোনো সমস্যা সমাধানের আন্দোলন বুঝাতে পারে। এই অর্থে শ্রমিকের এবং কৃষকের বা অপরাপর শ্রেণীর আর্থিক অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের আন্দোলনও রাজনীতির অংশ। এ কারণে রাজনীতি বলতে কোনো নির্দিষ্ট নীতির বদলে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষমূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝায়। তাই রাজনীতির প্রধান বাহন হচ্ছে সংগঠিত দল। শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষামূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝায়। তাই রাজনীতির প্রধান বাহন হচ্ছে সংগঠিত দল। শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার জন্য দলগত প্রচেষ্টা আধুনিককালের সাধারণ সত্য হলেও এই প্রচেষ্টা আধুনিককালেরই বৈশিষ্ট্য নয়। উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সমাজ দ্বন্দ্বমান শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার সময় থেকেই দ্বন্দ্বমান শ্রেণীর সচেতন অংশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। অনেক সময়ে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে বহু রাজনীতিক দলের সৃষ্টি এবং কার্যক্রম দেখা যায়। কিন্তু রাজনীতিক দলের সংখ্যার আধিক্য একথা বুঝায় না যে এই রাষ্ট্র এত অধিক শ্রেণীতে বিভক্ত। দলের সংখ্যা যতই হোক না কেন মূলত তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রধান দ্বন্দ্বমান আর্থনীতিক শ্রেণীর স্বার্থই প্রতিফলিত হয়। বাইরে থেকে এই বৈশিষ্ট্য অনেক সময়ে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, জীবিকার ভিত্তিতে আর্থনীতিক বিন্যাস নিয়ে তৈরি হয় সমাজের অন্তঃকাঠামো। আর এই অন্তঃকাঠামোর উপর গঠিত হয় শাসনগত এবং রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহিঃকাঠামো। শোষিত শ্রেণীর রাজনীতিক লক্ষ্য থাকে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা দখলের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করা কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের মাধ্যমে পরিণামে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা। যে-কোনো পর্যায়ের শাসক ও শোষক শ্রেণীর রাজনীতির লক্ষ্যও থাকে নিজেদের দখলকৃত অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। শ্রেণীহীন সমাজ হলে শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রের রাজনীতির অবসান ঘটে এবং রাজনীতি সেখানে রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক শক্তি দখলের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য দিকের ক্রমিক উন্নতির জন্য মানুষের সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডকে বুঝায়। এমন অবস্থায় রাজনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রের সংগঠিত কর্মকাণ্ডের আর প্রভেদ থাকে না।

Political Thought : রাষ্ট্র-চিন্তা, রাষ্টবিজ্ঞান

Political Thought, History of : রাষ্টচিন্তার ইতিহাস

রাষ্ট্র কি, রাষ্ট্রের উদ্ভব কীভাবে ঘটেছে, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্যের ভিত্তি কি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক, রাষ্ট্র এবং সরকারের পার্থক্য, সরকারের প্রকারভেদ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সমস্যার আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে রূপলাভ করেছে।

মানবজাতির প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলেই রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্যার উপর সেই অঞ্চলের চিন্তাবিদগণ ইতিহাসের আদিকাল থেকে চিন্তা করে এসেছেন। এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে রাষ্ট্রমাত্রের সাংগঠনিক একক মানুষ হলেও এবং তার সমস্যা মূলত ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্কের সমস্যা হলেও এই সমস্যার প্রকাশ সব অঞ্চলে সর্বকালে একইভাবে

ঘটে নি। মৌলিক ঐক্যের মধ্যেও অঞ্চল থেকে অঞ্চলে সমস্যা এবং সমস্যার সমাধানমূলক চিন্তার পার্থক্য বর্তমানের ন্যায় অতীতেও ছিল।

মানব সভ্যতাকে আজকাল সাধারণত পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য বা এশিয়া এবং ইউরোপীয় সভ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ বিভাগের কৃত্রিমতা অনস্বীকার্য। কিন্তু এরূপ বিভাগের মূলে যে কিছু পার্থক্য রয়েছে তাও সত্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের প্রকৃষ্ট গবেষণা তুলনামূলকভাবে ইউরোপে এশিয়ার চেয়ে অধিক হয়েছে। ফলে এশিয়ার এবং আফ্রিকার মানুষের রাষ্ট্রীয় সত্তার বিকাশ এবং এশিয়া আফ্রিকার চিন্তাবিদদের রাষ্ট্রীয় চিন্তার পরিচয় এখনও প্রধানত অনুদ্ঘাটিত এবং অজ্ঞাত। সে কারণে রাষ্ট্রীয় চিন্তার বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস বলতে সাধারণত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং সে অঞ্চলের চিন্তাবিদদের চিন্তার বিবর্তন এবং ইতিহাস বুঝায়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম এবং উন্নতধরনের সূত্রপাত ঘটে প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রে এবং গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার মধ্যে।

প্রধানত ভৌগোলিক কারণে গ্রিসে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এই সমস্ত নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টা ছিল যথাক্রমে রাজনীতিক চিন্তা ও গণতন্ত্রের বিকাশ এবং সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের জন্য বিশিষ্ট। এথেন্সের সক্রেটিস এবং বিশেষ করে প্লেটো যখন রাষ্ট্রীয় সমস্যার উপর তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন তখন এথেন্সের গণতন্ত্রের গৌরব ও সমৃদ্ধি বিনষ্ট-প্রায়। স্পার্টার সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে এথেন্স নানা রাজনৈতিক সংকটে আবিষ্ট। দাসের শোষণের ভিত্তিতে যে সভ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল সে সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকেই ন্যায়, অন্যায়, আনুগত্য, বিদ্রোহ, ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতা, গুণ এবং দাবি প্রভৃতি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে আরম্ভ করেছে। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল উভয় দার্শনিক এথেন্সের সেরা জ্ঞানীদের প্রধান ছিলেন। তাঁরা তাঁদের রচনাসমূহের মাধ্যমে সংকটগ্রস্ত এথেন্স তথা গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের পুরাতন রাষ্ট্রীয় আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। তাঁরা উভয়ে দাসপ্রথাকে সমর্থন করেছেন এবং গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রচনা করেছেন তাতে একদল বিশেষভাবে শিক্ষিত ও দক্ষ শাসক বা দার্শনিককে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। প্লেটো রাষ্ট্রের নাগরিকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে উল্লেখ করেন যে, ন্যায় মানে হচ্ছে যার যে দায়িত্ব তার সে দায়িত্ব পালন করা। এ্যারিস্টটল প্লেটোর চেয়ে অধিক বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি কোনো আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করার বদলে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে সরকারের প্রকারভেদ করে প্রত্যেক প্রকার সরকারই কেমন করে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে তার পথ নির্দেশ করেন। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স' গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্ভব, রাষ্ট্রের অন্তর্গত শ্রেণীসমূহের বিশ্লেষণ, সরকারের প্রকারভেদ, কার্যকর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক ও রাজনীতিক শর্ত এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ এবং তার নিবারণের উপায়ের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও সংজ্ঞাদানের চেষ্টা রয়েছে। এদিক থেকে এই গ্রন্থকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার অন্যতম আদি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু প্লেটো-এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রীয় আলোচনার সুসংবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, তাঁদের পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত গ্রিক নগর-রাষ্ট্রকে নতুন জীবন দান করা সম্ভব হয় নি। কিছুকালের মধ্যে সম্রাট আলেজাণ্ডারের

আক্রমণে এবং পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। রোম নগরী প্রাচীন নগর রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সীমানায় সীমাবদ্ধ না থেকে কালক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনই রোমের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা ছিল। এর ফলে ইতিহাসে রোমের অবদান সূক্ষ্মচিন্তা ও দর্শনের চেয়ে এক-কেন্দ্রিক শাসনের প্রয়োজনীয় আইন-কানুন রচনা ও ব্যাখ্যা দান এবং সামরিক বাহিনী চলাচলের সড়ক নির্মাণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইউরোপে যে দীর্ঘ পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে তাকে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই পর্যায়ে খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তীকালে রোমের পোপের নেতৃত্বে এক বৃহৎ যাজক সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই যাজকতন্ত্র কেবল পারলৌকিক নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায়। সামন্ততন্ত্র যতদিন ইউরোপের প্রধান আর্থনীতিক ব্যবস্থা ছিল ততদিন খ্রিষ্টিয় যাজকতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র সম্মিলিতভাবে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের এবং কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার বিকাশে বাধা দান করতে থাকে। মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় চিন্তার প্রধান প্রশ্ন ছিল : পোপ বড়, না রাজা বড়? এই প্রশ্নে যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত চিন্তাবিদ সেন্ট বার্নার্ড, সেলিসবারীর জন এবং সেন্ট টমাস এ্যাক্যুইনাস রাজার বিরুদ্ধে ধর্ম তথা পোপের পক্ষ অবলম্বন করে পোপের সর্বাধিক ক্ষমতার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করেন। কিন্তু যন্ত্রশিল্প এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ, ক্রুজেড বা ধর্মযুদ্ধে ইসলামের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় এবং এর ফলে প্লেটো এ্যারিস্টটলের রচনার আরবি অনুবাদের ইউরোপ আগমন, ক্রুজেডে পোপের নেতৃত্বের দুর্বলতার প্রকাশ ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণে পোপের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মান্ধ যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাজার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা এককালে সমাজের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রগতিশীল ছিল। ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) বোদিন (১৫৩০-১৫৯৬) এবং হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাজা বা শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধিকতর বিকাশ লাভ করে। এই সময়ের প্রধান চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২), জন লক (১৬৩২-১৭০৪) এবং বার্ক (১৭২০-১৭৯৭) ও ফরাসি দেশের রুশো (১৭১২-১৭৭৮) মন্টেস্ক্যু (১৬৮৯-১৭৫৫)। লক এবং রুশো উভয়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যার জন্য সামাজিক চুক্তির উল্লেখ করেন। হবসও সামাজিক চুক্তির উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক চুক্তির যে ব্যাখ্যা হবস দেন তা যেমন লক ও রুশোর ব্যাখ্যার পৃথক, তেমনি আবার লক ও রুশোর ব্যাখ্যাও অভিন্ন নয়। হবস সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা দ্বারা রাজা বা শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। লকের মতে, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব শাসকের উপর অর্পিত হলেও শাসক সার্বভৌম কোনো ক্ষমতা নয়। রুশো লকের এই গণতান্ত্রিক ভাবকে সম্প্রসারিত করে তাঁর সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যায় বলেন যে, চুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণ যদি তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা কারোর নিকট অর্পণ করে থাকে তবে সে কোনো ব্যক্তিক শাসক নয়। সে হচ্ছে জনসাধারণেরই 'সাধারণ ইচ্ছা'। জনসাধারণ ইচ্ছা করেই সাধারণ ইচ্ছার নিকট ব্যক্তিগত অধিকারকে অর্পণ করেছে। অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন আর

স্বাধীন শাসক হিসাবে কার্যকর থাকবে না (প্রাকৃতিক অবস্থায় সে যেরূপ ছিল) তেমনি আবার কোনো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তিক শাসকেরও সে অধীন হবে না। সে তার এবং অপর সবার মিলিত 'সাধারণ ইচ্ছার' দ্বারা শাসিত হবে। কাজেই রাষ্ট্রে সরকার জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছার প্রতীক, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বাধীন সত্তা নয়। তার মানে, সরকার যখন জনসাধারণকে শাসন করে না, জনসাধারণই শাসন করে তখন কোনো ভিন্ন শাসক জনসাধারণকে শাসন করে না, জনসাধারণই জনসাধারণকে শাসন করে। যে ব্যক্তি তার শাসক অধিকার চুক্তির মাধ্যমে ত্যাগ করেছিল সেই আবার সাধারণ ইচ্ছার একক হিসাবে নিজেকে শাসন করার অধিকার লাভ করে। মন্টেস্ক্যু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রবর্তক বলে খ্যাত। ঊনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আর্থনীতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে এবং অর্থনীতিকে রাষ্ট্রনীতির মূল বলে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নতুন চিন্তার যোগান দেন। হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে বাস্তব সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পর্যায় থেকে পুঁজিবাদী চিন্তাবিদগণও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। পুঁজিবাদের বিকাশ, তার আভ্যন্তরিক বিরোধ এবং সংকট, নতুন শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ ইত্যাদি চিন্তাবিদমাত্রকেই একথা স্বীকারে বাধ্য করে যে, বর্তমান রাষ্ট্রের ভূমিকা আর সুবিধাভোগী সংকীর্ণ কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা নয়—রাষ্ট্রের ভূমিকা আজ রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বপ্রকার সুবিধাকে বৃহত্তর, এমনকি সমস্ত জনসংখ্যার উপর তার শ্রেণী বা আর্থিক উপার্জনগত যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে বিস্তারিত করে দেওয়া।

বর্তমানে রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থার দিক থেকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক। এই দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের আর্থিক বুনিয়াদ একেবারে পৃথক বলে উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সংগঠন অর্থাৎ তার সরকার, আইনসভা, রাজনীতিক দল, ব্যক্তিক অধিকার, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ইত্যাকার সমগ্র রাষ্ট্রীয় প্রশ্নই ভিন্ন প্রকারের। একই মাপকাঠি দিয়ে এদের উভয়কে পরিমাপ করা চলে না। সে বিচারে উভয়ের সমস্যার যথার্থ অনুধাবন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

Polytheism and Monotheism : বহু ঈশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদ

বহু ঈশ্বরের বিশ্বাসকে বহু ঈশ্বরবাদ এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা হয়।

আদি গোত্রতান্ত্রিক সমাজে অলৌকিক শক্তির আধার হিসাবে মানুষ প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন সজীব বা আজীব বস্তু কিংবা বস্তুর প্রতীককে পূজা করত। গোত্রতান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গনের পরে এবং সমাজ অধিকতর সংগঠিত রূপ নেওয়ার পর্যায়ে গোত্রপ্রতীক বা বস্তুর স্থানে শূন্যে বা ঊর্ধ্বস্থানে অবস্থানকারী দেবতাকুলের উদ্ভব ঘটে। মানুষের সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য এবং সামজিক সম্পর্কগত স্তরক্রম দেবতাদের জগতেও প্রতিফলিত হতো। কিন্তু তখনো সমাজ সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয় নি। তাই ছোটবড় বিভিন্ন পর্যায়ের দেবতাদের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায় বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন হিসাবে বজায় ছিল। কিন্তু কালক্রমে গোত্রসমাজ ভেঙে দাস ও প্রভু সমাজের উদ্ভব হয়। দাসের শ্রম ও শোষণের ভিত্তিতে প্রভু-শাসকগণ বৃহদাকার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থার প্রতিফলনও

মানুষের ধর্মীয় কল্পনার মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। দেবতাদের মধ্যেও এবার ছোটবড়র তারতম্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। যে দেবতা অধিক শক্তিশালী সে অধিক পূজ্য হতে থাকে। অবশ্য অন্যান্য দেবতাও সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে কম বেশি স্বীকৃতি পায়। সমাজে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক যুগে একচ্ছত্র সম্রাটের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং তাদের শাসিত অঞ্চলের স্থানে বৃহদাকারের রাষ্ট্র সংগঠিত হতে থাকে। ধর্মেও বহু দেবতাদের স্থানে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ধর্মীয় ধারণায় প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে ইসলামের মধ্যে এক স্রষ্টার কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

Postmodernism : উত্তর আধুনিকতা

সময় বিশেষ করে সমাজের গতিপ্রবাহ সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক প্রত্যয়ের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'উত্তর আধুনিকতা'। যখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কথাটি সূর্যের মত প্রধান ছিল, তখন 'রবীন্দ্রপূর্ব' কথাটির সাধারণ বোধ্য অর্থ ছিল রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। কিন্তু যেমন বস্তু, তেমনি প্রত্যয়। কোন কিছুই স্থির বা অপরিবর্তিত নয়। সে কারণে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর বা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কথাটিও চালু হয়েছিল। এ সব বিমূর্ত প্রত্যয় নিয়ে আলোচনায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। যা নিয়ে আলোচনা তা মূর্ত হলেও নানাজনের নানা মনোভাবভিত্তিক আলোচনা কেবল যে বিমূর্ত হয়ে দাঁড়ায় তাই নয়। বেশ কিছুটা নৈরাজ্যিক বা অনির্দিষ্ট হয়েও পড়ে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর কথাটি অনিবার্য না হলেও তত দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সামাজিক, বিশেষ করে সমাজের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'পোস্ট মডারনিজম' বা 'উত্তর আধুনিকতা' কথাটি দেখতে বা শুনতে যত সহজ, তাকে ধরা তত সহজ নয়। ইউরোপ আমেরিকার কথা বাদ দিয়ে আমাদের পরিচিত বাংলাভাষার পরিমণ্ডলে 'উত্তর আধুনিকতা' দ্বারা কেবল যে, 'যা আধুনিক নয়' বুঝার চেষ্টা করা যায়, তাই নয়। উত্তর আধুনিকতাবাদীদের একটি প্রবণতা হচ্ছে বস্তু জগৎকে বুঝার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম নীতি, ধারাবাহিকতা, এমনকি কার্য-কারণ বা 'কজ এ্যাণ্ড এফেকট' রূপ কোনো অনিবার্যতার সম্পর্ককে অস্বীকার করার প্রবণতা। সব কিছু সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, কোনো কিছুই কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কোনো কিছুই কোনো কিছু নয় এরূপ একটি নেতিবাচক ভাবের প্রচার করা।

'উত্তর আধুনিক' তথা 'পোস্ট মডারনিজম' কথাকে কারা কীভাবে প্রচলিত করেছেন তা এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট নয়। কেবল এটুকু বলা যায়, ইতিহাসে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ উত্তর আধুনিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন অর্থহীন, তেমনি ভবিষ্যতের চিন্তাও অর্থহীন। অর্থাৎ 'উত্তর আধুনিক' একটি নতুন শব্দ বটে, কিন্তু শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সাধারণভাবে গ্রাহ্য অর্থ এখনও নিশ্চিত হয় নি।

Pragmatism : প্রয়োগবাদ

প্রাগমেটিজম প্রয়োগবাদ আধুনিক দর্শনের একটি অন্তর্মুখী ভাববাদী তত্ত্ব। ইংরেজি প্রাগমেটিজম কথার উৎপত্তি ঘটেছে গ্রিক শব্দ 'প্রাগমা' থেকে। 'প্রাগমা'র অর্থ হচ্ছে কার্য

সম্পাদিত বা কার্যকৃত। প্রয়োগবাদ সত্য নিরূপণ করে বিচার্য বিষয়ের কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতার ভিত্তিতে। উইলিয়াম জেমস প্রয়োগবাদের একজন প্রবক্তা। উইলিয়াম জেমসের মতে, আমরা কোনো কাজ করি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কাজেই আমাদের কোনো বিশেষ কর্ম সত্য কিংবা মিথ্যা, যথার্থ কিংবা অযথার্থ তার নিরূপক হবে সেই উদ্দেশ্য সাধনে তার ক্ষমতা, অক্ষমতার ভিত্তিতে। কোনো কার্য দ্বারা যদি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা হলে কাজটি অবশ্যই সত্য। অবশ্য কোনো কিছুর কার্যোপযোগিতা দ্বারা প্রয়োগবাদীগণ প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণিত সর্বজনস্বীকৃত উপযোগিতাকে বুঝায় না। তাদের কাছে উপযোগিতার নির্ধারক হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব অভিমত। ব্যক্তি যদি মনে করে বিষয়টি উপযোগী তবে তার কাছে তা সত্য।

Predestination, Theory of : নিয়তিবাদ

নিয়তিবাদ হচ্ছে এই বিশ্বাস, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে, মানুষের জন্ম মৃত্যু, ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ব নির্দিষ্ট। সব ঘটনাই অনিবার্য, সব অস্তিত্বই অপ্রতিরোধ্য। নিয়তিবাদ স্বীকার করলে জগতের কিংবা মানুষের সমাজের নতুন ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া কিংবা বিকশিত হওয়ার আর উপায় থাকে না। কেননা জগৎ বা সমাজ কোন্ দিকে যাবে তা ঈশ্বর পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছে। ব্যক্তি সে নির্ধারিত পথ জানে না। তাই তার কাছে ঘটনা নতুন বলে বোধ হয়। সে কারণেই সে মনে করে যে, তার নিজের ইচ্ছামতো ভবিষ্যতের জাগতিক বা সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারবে। জগতের কোনো অণুরই স্বাধীনভাবে অনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। নিয়তিবাদের তত্ত্ব মানুষকে পরিণামে সমস্যার পরিমণ্ডলে অসহায় নিষ্ক্রিয় প্রাণীতে পরিণত করে। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মধ্যে পৃথিবীর সব কিছু ঘটনা কার্যকারণের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বে কোনো কিছুই যেমন ইচ্ছা তেমন ঘটতে পারে না। বিশ্বময় নিয়মের রাজত্ব। কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মের রাজত্ব আর নিয়তিবাদ এক কথা নয়। নিয়তিবাদে ঘটনায় ঘটনায় কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নাই। সব ঘটনার মূল কারণ বিধাতার কারণহীন ইচ্ছা।

Predicables : বিধেয়ক

এ্যারিস্টটল তাঁর যুক্তিশাস্ত্রে একটি যৌক্তিক বাক্যে উদ্দেশ্যপদের সঙ্গে বিধেয় পদের সম্পর্কের শ্রেণী নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত যুক্তিশাস্ত্রে একটি বিধেয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে চার রকম সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। বিধেয়র এই সম্ভাব্য সম্পর্ককে এ্যারিস্টটল প্রেডিকেবলস্ বা বিধেয়ক বলেছেন। চার রকম বিধেয়কের নাম হচ্ছে জিনাস বা জাতি, স্পেসিস বা উপজাতি, ডিফারেনশিয়া বা লক্ষণ এবং প্রপ্রিয়াম বা উপলক্ষণ। 'মানুষ হচ্ছে জীব' এরূপ বাক্য বললে বিধেয়পদ 'জীব', উদ্দেশ্যপদ 'মানুষ'-এর জাতি বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ 'জীব' জাতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মানুষ। 'মানুষ যুক্তিবাদী জীব' বাক্যটিতে 'যুক্তিবাদী জীব' বিধেয় পদটি মানুষকে অপরাপর জীব থেকে পৃথকভাবে সূচিত করছে। এ কারণে 'যুক্তিবাদী জীব' উদ্দেশ্যপদের ডিফারেনশিয়া বা লক্ষণ।

Primary and Secondary Qualities : মৌল এবং অমৌলগুণ

বস্তুর গুণ কোন্‌টি মৌল এবং কোন্‌টি অমৌল, এই পার্থক্য বিশেষভাবে ইংরেজ দার্শনিক লকের (১৬৩২-১৭০৪) রচনায় দেখা যায়। লকের মতে আমরা বস্তুকে শক্ত, নরম, ছোট, বড়, নিরেট, শূন্য, লাল, নীল, গরম, ঠাণ্ডা, সুস্বাদযুক্ত, বিস্বাদযুক্ত বলে অভিহিত করি। এরূপ বর্ণনায় সব গুণকেই বস্তুর মধ্যে অস্তিত্বমান বলে মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুর উপর আরোপিত সবগুণকে বস্তুর মধ্যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বময় বিবেচনা করা যায় না। লকের মতে যখন আমরা বস্তুকে শক্ত বা নিরেট বা গতিময় বা বিশেষ আকারবিশিষ্ট বলি তখন যথার্থই বস্তুর মধ্যে এই সমস্ত গুণের অস্তিত্ব দেখা যায়। কারণ এই সমস্ত গুণ ব্যক্তির নিজের দেখা না দেখার উপর নির্ভর করে না। এই সমস্ত গুণ বস্তুর মৌল বা প্রধান গুণ। কিন্তু একটি বস্তুকে যখন লাল বা সবুজ, সুস্বাদযুক্ত, সুগন্ধযুক্ত প্রভৃতি বলা হয় তখন এই গুণগুলি বস্তুর মধ্যে অস্তিত্বময় থাকে না। এই গুণগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদির উপর। এ কারণে ব্যক্তির এরূপ ইন্দ্রিয় বা মননির্ভর গুণ হচ্ছে বস্তুর অমৌল গুণ। লকের পূর্বে গেলিলিও, দেকার্তে, হবস প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনাতেও বস্তুর গুণের মধ্যে এই রকম মৌল এবং অমৌল কিংবা প্রধান এবং অপ্রধানরূপ পার্থক্য নিরূপণের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে বস্তুর গুণের মধ্যে এরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। বস্তুর শক্তত্ব বস্তুর মধ্যে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বময় বলেও যেমন সেই গুণকে মানুষের অনুভব করতে হয়, তেমনি বস্তুটি লাল বললেও 'লাল' গুণ কেবল মনের সৃষ্টি নয়। বস্তুর সঙ্গে দেহের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক এবং মনের অনুভবের মাধ্যমেই গুণের সৃষ্টি। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বস্তুর গুণের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য স্বীকার করলেও এরূপ মৌল অমৌলরূপ কৃত্রিম পার্থক্যকে স্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে লকের এই পার্থক্যকরণে যে দুর্বলতা ছিল তার ভিত্তিতে ভাববাদী দার্শনিক বার্কলে এবং অজ্ঞেয়বাদী হিউম লকের মৌল, অমৌল সমস্ত গুণকেই মানসিক ভাব মাত্র বলে বর্ণনা করেছেন।

Primitive Communal System : আদি সাম্যবাদী ব্যবস্থা

(দ্র. Communism, Primitive)

Productive Forces : উৎপাদনী শক্তি

সমাজের উৎপাদনী শক্তি বলতে উৎপাদনের যন্ত্র, যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ এবং শ্রমের স্বভাব বা আগ্রহ বুঝায়। বিভিন্ন উপাদান নিয়ে যে উৎপাদনী শক্তি তার মধ্যে যন্ত্রব্যবহারকারী শ্রমিকের ভূমিকাই প্রধান। শ্রমিক একদিকে যেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সম্পদ উৎপাদন করে তেমনি শ্রমের মাধ্যমে যন্ত্রের ক্রমাধিক উন্নতি তারাই সাধন করে, অর্থাৎ যন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতা যন্ত্রের উন্নতির মূল কারণ হিসাবে কাজ করে। শ্রমশক্তির উৎপাদনী ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির মূলেও শ্রমিক। মানুষের সমাজের বিশেষ পর্যায়ের উৎপাদনী শক্তির অবস্থা প্রকৃতির উপর সেই সমাজের শক্তির পরিমাণের পরিচায়ক। উৎপাদনী শক্তি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত এবং উন্নত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে, শ্রমের যন্ত্রের উন্নতি ঘটে প্রথমে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত যন্ত্রের স্থলে

উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। উন্নততর যন্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ভিন্নতর শ্রম বা উৎপাদন সম্পর্কের আবশ্যক হয়। অবশ্য একটিমাত্র উন্নত যন্ত্রের আবিষ্কারেই যে ভিন্নতর উৎপাদন সম্পর্কের আবশ্য হয় এমন কথা বলা হচ্ছে না। ব্যাপকভাবে যন্ত্রের যখন উন্নতি ঘটে তখন দেখা যায় যে, পূর্বকার উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উন্নততর যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, তেমনি পুরাতন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদনও আর বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে এরূপ দ্বন্দ্বের নিরসন হয় বিপ্লবের মাধ্যমে নতুনতর উৎপাদন সম্পর্ক এবং সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়।

Proof of the existence of God : বিধাতার অস্তিত্বের প্রমাণ

ধর্মের মূল হচ্ছে এই বিশ্বাস যে, বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছে। কিন্তু ধর্মের মধ্যে এই দাবির কোনো যুক্তিগত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভাববাদী দর্শন বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ কারণে ধর্ম এবং ভাববাদী দর্শন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভাববাদী দর্শন বিধাতার অস্তিত্বের পক্ষে তিন রকম যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে। যেমন : ১. জগতের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু দেখা যায়। সবকিছুর সৃষ্টি এবং লয় আছে। সবকিছুর ক্ষেত্রে জন্ম ও মৃত্যুর কথা যদি সত্য হয় তা হলে সমগ্র জগৎ সম্পর্কেও একথা সত্য। অর্থাৎ জগৎকেও এক সময় সৃষ্ট হতে হয়েছে। সৃষ্ট হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে-সৃষ্টি, তার সত্তা থেকে পৃথক অপর কোনো সত্তার অস্তিত্ব থাকা। পৃথক সেই সত্তার কারণে অর্থাৎ তার ইচ্ছায় এবং চেষ্টায় সৃষ্টের অস্তিত্ব। বিধাতা হচ্ছে জগতের বাইরের সেই মূল কারণরূপ সত্তা। এই যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা যে, বিশ্ব যে-কোনো বিশেষ বস্তুর ন্যায়ই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সসীম এক সত্তা। এবং যেহেতু সে সসীম, সে কারণে তার পক্ষে ভিন্নতর কোনো শক্তি ব্যতীত অস্তিত্বময় হওয়া সম্ভব হয় নি। দর্শনের এ প্রমাণে যুক্তির চেয়ে ধর্মের ন্যায় বিশ্বাসকেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। বিশ্বজগৎ যে সসীম এটা ভাববাদী দর্শনের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসমাত্র। এই যুক্তির প্রকারভেদ আমরা প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং লাইবনিজের দর্শনে পাই। ২. বিশ্বের স্রষ্টার দ্বিতীয় দার্শনিক প্রমাণ হচ্ছে 'উদ্দেশ্যগত' প্রমাণ। এ প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে এই যুক্তি যে, বিশ্বের সমস্ত ঘটনার মধ্যে উদ্দেশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকার অর্থ উদ্দেশ্যের পিছনে এক উদ্দেশ্যদাতা আছে, যার সচেতন চেষ্টাতেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই বিশ্ব যখন উদ্দেশ্যহীন নয় তখন বিশ্বের পেছনে অতিজাগতিক এক শক্তি আছে যার ইচ্ছাতে বিশ্ব উদ্দেশ্যময় হয়ে কর্মরত আছে। ৩. তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে : মানুষের মনে আদিকাল থেকে বিশ্বস্রষ্টার একটা ভাব বর্তমান আছে। মানুষ মনে করে অসীম শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণ এক স্রষ্টা আছে। যদি কোনো সত্তা না থাকে তা হলে মানুষের মনে এরূপ ভাব সৃষ্টি হতে পারতো না। কাজেই এরূপ অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং সুসম্পন্ন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। অর্থাৎ যা মনে আছে তা অবশ্য অস্তিত্বে আছে। বিধাতার অস্তিত্বের যে-কোনো যুক্তির মূল দুর্বলতা হচ্ছে, একটি বিশ্বাসকে একই সাথে একদিকে সব অস্তিত্বের মূল বা কারণ এবং অপরদিকে সব অস্তিত্বকে সেই বিশ্বাসের প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা। এর মধ্যে প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করার অসঙ্গতি

বিদ্যমান। বিধাতা সব অস্তিত্বের মূলে আছে। সব অস্তিত্ব বিধাতাই সৃষ্টি করেছে। আবার সব অস্তিত্বই বিধাতার অস্তিত্বকে প্রমাণ করছে। ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট বিধাতার অস্তিত্বকে এরূপভাবে প্রমাণ করার অসারতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে, বিধাতা হচ্ছে অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব একটা বোধ। একে বিশুদ্ধ চিন্তা দ্বারা একজন অনুভব করতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা একে প্রমাণ করা চলে না। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বিধাতাকে মানুষের কল্পনা বলে মনে করে। মানুষের এরূপ কল্পনার আবশ্যকতা ছিল কিংবা আছে বলা এক কথা, আর সেই প্রয়োজনের কারণে বিধাতাকে অস্তিত্বময় বলা আর এক কথা। বিশ্ব সসীম নয়। বিশ্বের বাইরে অ-বিশ্ব বা অ-বস্তু বলে কিছুর কল্পনা করা চলে না। বিশ্ব হচ্ছে বস্তু। আর বস্তু হচ্ছে গতিময়। বস্তুর বৈচিত্র্য, মানুষ, মন সবই গতিময় বস্তুর রূপ।

Proposition : প্রতিজ্ঞা, যৌক্তিক বাক্য

যুক্তিশাস্ত্রে দুটি পদের মধ্যে একটি সম্পর্কের উল্লেখমূলক বাক্যকে যৌক্তিক বাক্য বলে। ইংরেজিতে যৌক্তিক বাক্যকে 'প্রপজিশন' বলা হয়। রহিম একজন মানুষ অথবা রহিম হয় একজন মানুষ, একটি যৌক্তিক বাক্যের দৃষ্টান্ত। এখানে 'রহিম' এবং 'মানুষ' বাক্যের দুটি পদ : উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ। বাক্যটিতে এই দুটি পদের মধ্যে একটি সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদকে যৌক্তিক বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের মধ্যকার সংযোজক বা 'কপুলা' বলা হয়। বাংলাতে অনেক সময় উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের মধ্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত যৌক্তিক বাক্য প্রথমে মনের মধ্যে গঠিত হয়। মনের অপ্রকাশিত বাক্যকে মানসিক বাক্য বলা যায়। ইংরেজিতে একে জাজমেণ্ট বলা হয়। উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের মধ্যকার সম্পর্কটি হাঁ-বাচক এবং না-বাচক হতে পারে। আবার বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সংখ্যা বা ব্যক্তার্থের সমগ্র কিংবা উহার অংশবিশেষ সম্পর্কে বিবৃত হতে পারে। সম্পর্কের এই প্রকারভেদের ভিত্তিতে যুক্তিশাস্ত্রের প্রচলিত বাক্য-বিন্যাসের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বাক্যকে ১. হাঁ-বাচক, ২. না-বাচক, ৩. সার্বিক এবং ৪. বিশেষ, এইা চারভাগে বিভক্ত করা হয়। 'সকল মানুষ মরণশীল' এটি একটি সার্বিক হাঁ-বাচক বাক্য। এখানে 'মরণশীল' বিধেয় পদটি 'মানুষ' পদের সকল সংখ্যা সম্পর্কে হাঁ বাচকরূপে বিবৃত হয়েছে। 'কোনো মানুষ অমর নয়।' এখনে 'অমর' বিধেয় পদটি 'মানুষ' পদের সমগ্র সম্পর্কে না-বাচকরূপে বিবৃত হয়েছে। এটি সার্বিক না-বাচক বাক্য। 'কিছু মানুষ সৎ', এটি একটি বিশেষ হাঁ-বাচক বাক্য। এবং 'কিছু মানুষ সৎ নয়' এটি একটি বিশেষ না-বাচক বাক্য। যৌক্তিক বাক্যের এই প্রকারভেদকে সংক্ষেপে সা. হাঁ ; সা. না এবং বি. হাঁ ; বি. না-রূপে উল্লেখ করা যায়। (দ্র. Square of opposition বিরোধিতার বর্গক্ষেত্র)

Protagoras : প্রোটাগোরাস (৪৮১-৪১১ খ্রি. পূ.)

প্রোটাগোরাস ছিলেন একজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। প্রচলিত দার্শনিক মতামতের বিরোধী এবং জনপ্রিয় প্রচারকদের সফিস্ট বলা হতো। প্রোটাগোরাসের দর্শনের জন্য তাঁকেও একজন সফিস্ট বলে গণ্য করা হতো। দেবতাদের ব্যাপারে বা 'অন দি গডস' নামক তাঁর

দেবতা বিরোধী রচনার জন্য প্রোটোগোরাসকে এথেন্স নগর থেকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং তাঁর এই পুস্তককে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত প্রোটোগোরাসকে একজন অবিশ্বাসী এবং চরম প্রয়োগবাদী বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাঁর রচনার এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায় যাতে প্রোটাগোরাসকে চরম অবিশ্বাসী অর্থাৎ জগৎ, বস্তু কোনো কিছুতেই প্রোটাগোরাস বিশ্বাস করতেন না, একথা বলা যায় না। প্রোটাগোরাস বস্তুবাদী ছিলেন। তাঁর মতে, বস্তু অস্থির এবং সব কিছুর কারণ বস্তুতে নিহিত।

Protestantism : প্রোটেস্‌টান্টবাদ

গোঁড়া খ্রিষ্ট ধর্ম, ক্যাথলিক বা রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্ট ধর্ম এবং প্রোটেস্টাণ্ট খ্রিষ্ট ধর্ম—এই তিনটি হচ্ছে খ্রিষ্ট ধর্মের ইতিহাসে তিনটি প্রধান শাখা। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সংস্কারবাদী আন্দোলনের যুগে প্রোটেস্টাণ্টবাদের উদ্ভব ঘটে। প্রোটেস্টাণ্টবাদ গোঁড়া খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মীয় পুরুষ, যিশু খ্রিষ্টের মাতার অলৌকিক উপাখ্যান কিংবা নরক ও স্বর্গের মধ্যবর্তী কোনো শোধনাগারের কল্পনাকে স্বীকার করে না। প্রোটেস্টাণ্টবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রোটেস্টাণ্টবাদ ঈশ্বর এবং ব্যক্তির মধ্যে অপর কোনো মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। প্রোটেস্টাণ্টবাদের মতে ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে ব্যক্তির পক্ষে যাজক বা গির্জার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির মুক্তি নির্ভর করে ঈশ্বরের উপর তার বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর। কোনো ধর্মযাজকের সুপারিশের উপর নয়। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের উপর খ্রিষ্ট যাজক সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্রে প্রোটেস্টাণ্টবাদের এই অভিমত বিরাট আঘাতস্বরূপ। এর ফলে রাষ্ট্রের উপর রোমের পোপতন্ত্রের আধিপত্যে ভাঙ্গন শুরু হয়। পোপতন্ত্র রাষ্ট্রীয় শাসন ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হতে শুরু হয়। প্রোটেস্টাণ্টবাদ ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্পর্কের কথা বলে ব্যক্তির নিজস্ব শক্তি এবং দায়িত্ববোধকে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল বিধিবন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তি সাধনে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করণে প্রোটেস্টাণ্টবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Proudhon : প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫ খ্রি.)

পিয়েরী জোসেফ প্রুধোঁ ছিলেন ফরাসি রাজনীতিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ এবং অর্থনীতিবিদ। তাঁকে নৈরাষ্ট্রবাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে প্রুধোঁ ছিলেন প্রধানত ভাববাদী। তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিকতাকে সরল এবং স্থূল করে কেবলমাত্র 'ভালো' 'মন্দ'র দ্বন্দ্ব হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। ইতিহাস হচ্ছে, প্রুধোঁর মতে ভাবের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। প্রুধোঁর একটি রাজনৈতিক—আর্থনীতিক উক্তি হচ্ছে : 'প্রপারটি ইজ থেফ্‌ট' বা সম্পত্তি চুরির ধন'। কিন্তু এমন উক্তি দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তিনি নাকচ করেন নি। এ উক্তির আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বড় পুঁজিবাদী সম্পদ। প্রুধোঁ কল্পনা করেন যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে একের সঙ্গে অপরের ন্যায্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হলে পুঁজিবাদের অসঙ্গতি দূর

হয়ে যাবে। প্রুধোঁর একখানি পরিচিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'ফিলসফি অব পভারটি' বা 'দারিদ্র্যের দর্শন'। মার্কস প্রুধোঁর এই গ্রন্থকে সমালোচনা করে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নাম দেন 'পভারটি অব ফিলসফি' বা 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

Psycho-Analysis : মনঃসমীক্ষণ

সিগমণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) প্রবর্তিত স্নায়বিক এবং মনোবিকারের বিশেষ নিরাময় পদ্ধতি এবং মনোজগতের বিশেষ বিশ্লেষণকে মনঃসমীক্ষণ বলা হয়। মনঃসমীক্ষণের মতে, মানুষের মন চেতন ও অচেতনে বিভক্ত। মনের চেতন অংশ সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রভাবে গঠিত। কিন্তু এই চেতনঅংশের পরিমাণ বা পরিধি খুবই অল্প। প্রতিমুহূর্তে মানুষের মনের কামনা বাসনা এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে যত ভাবের সৃষ্টি হয় তার খুব অল্প অংশ চেতনার জগতে অবস্থান করে। যৌন অনুভূতি হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের প্রধান উদ্দীপক এবং অনুপ্রেরক। যৌন অনুভূতি বলতে যে কেবল দৈহিক অনুভূতি বুঝায় তা নয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা, সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা, কন্যার উপর পিতার বাৎসল্য, সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, সাহসী কাজ সম্পাদন দ্বারা অপরের প্রশংসা অর্জনের সুখানুভূতি প্রভৃতি সবই যৌনানুভূতির প্রকাশ। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কামনা, বাসনা প্রয়োজন খুব কমই পূর্ণ হয়। ব্যক্তি সমাজ ও পরিবেশকে দেখে তার নিজের কামনা বাসনার প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে। ব্যক্তির অপূর্ণ কামনা বাসনা আপাতদৃষ্টিতে মরে গেলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি মরে যায় না। ব্যক্তির মনের অচেতন ভাণ্ডারে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রতিমুহূর্তে নিজেদের তৃপ্তির পথ অন্বেষণ করে। অপূর্ণ এবং অবাঞ্ছিত কামনা সচেতন এবং পরিচিতভাবে নিজেদের তৃপ্ত করতে পারে না। চেতনা সামাজিক প্রহরী হিসাবে অচেতনের দ্বারে প্রহরারত থাকে। অবদমিত অপূর্ণ কামনা নিরন্তর চেষ্টা করে প্রহরী-চেতনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অচেতনের বদ্ধগুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদিকে ভর করে নিজেদের তৃপ্ত করতে। যে-কামনা স্বাভাবিকভাবে তৃপ্ত হতে পারে নি, সে কামনাই ব্যক্তির স্বপ্নে স্বরূপে কিংবা অরূপে, ব্যক্তির স্নায়বিক বিকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং তৃপ্ত হতে চায়। মনঃসমীক্ষণে মানসিক বিকার মুখ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। মানসিক বিকার নিরাময়ের প্রধান পদ্ধতি হিসাবে মনঃসমীক্ষণ রোগীর স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ স্মৃতিচারণের উপর জোর দেয়। মনঃসমীক্ষণবাদের মতে মনোবিকারের মূল কারণ অতৃপ্তি এবং অবদমন। কাজেই নিরাময় হিসাবে প্রয়োজন হচ্ছে অবদমিত কামনাকে ব্যক্তির চেতনার মধ্যে ফিরিয়ে আনা। ব্যক্তির চেতনা নিজের কামনাকে অবদমনের ফলে চিনতে না পারার কারণেই নিজের কামনার প্রকাশের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ বাধে ; ব্যক্তি তাকে সচেতনভাবে না স্বীকার করতে পারে না তাকে নিজের স্নায়ুকোষ থেকে বিতাড়িত করতে পারে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ব্যক্তি যদি দেখতে পায়, যে-কামনাকে সে অবাঞ্ছিত এবং বৈরী কামনা বা শক্তি বলে মনে করছে সে কামনা তারই প্রয়োজনের সৃষ্টি, তা হলে এই স্বীকৃতিই অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি ঘটাতে সাহায্য করবে এবং ব্যক্তির চেতনার সঙ্গে অবদমিত কামনার বিরোধও দূরীভূত হবে। এককালে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মনঃসমীক্ষণ খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্যক্তির মানসিক জগতের বিশ্লেষণের ফ্রয়েডের বিশেষ অবদানের কথা স্বীকার করেও বলা যায়

যে, ফ্রয়েডের এই বিশ্লেষণ প্রধানত ভাববাদী এবং সমাজের বাস্তব অবস্থার বিবেচনাহীন। ব্যক্তি সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশ তার কামনা-বাসনাকে তৈরি করে এবং তার তৃপ্তি, অতৃপ্তির কারণ হয়। ফ্রয়েডের এ তত্ত্ব ঠিক। এবং এর অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তাই বলতে হয় যে, মনোবিকারের মূল সমাজ, ব্যক্তির মন নিজে নয়। তাই সামাজিক পরিবেশের আনুকূল্য বা প্রতিকূলতাকে ব্যক্তির মনোবিকারের বৃদ্ধি বা হ্রাসের, সৃষ্টি বা নিরাময়ের মূল কারণ এবং উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যভাবে ব্যক্তির মনকে স্বাধীন সত্তা হিসাবে চিন্তা করলে তার বিকারের সার্থক নিরাময়ের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেই কারণে মনঃসমীক্ষণও তার প্রাথমিক চমকের পরে আর তেমন কার্যকর অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয় নি। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদী অনুসারীদের মধ্যে ইয়ং এবং এ্যাডলারের নাম উল্লেখযোগ্য।

Pyrrho : পিরহো (৩৬৫-২৭৫ খ্রি. পূ.)

প্রাচীন কালের গ্রিক দার্শনিক পিরহোকে সন্দেহবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। পিরহোর প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল নীতিশাস্ত্র এবং ব্যক্তির সুখ দুঃখের সমস্যা। তাঁর কাছে সুখ যেমন দুঃখশূন্যতা, তেমনি তা ব্যক্তির নিস্পৃহতার মধ্যেও নিহিত। জ্ঞানের প্রশ্নে পিরহো সন্দেহবাদী ছিলেন। তাঁর অভিমতে, আমরা বস্তু বা সত্তা সম্পর্কে কিছু যথার্থভাবে জানতে পারি নে। সে কারণে কোনো কিছু সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি নে। জীবনের সকল সমস্যার ব্যাপারে নিস্পৃহ এবং নিরুদ্বিগ্ন থাকাই হচ্ছে মনের শান্তির আসল উপায়।

Pythagoras : পাইথাগোরাস (৫৮০-৫০০ খ্রি. পূ.)

পাইথাগোরাস (বা পিথাগোরাস) ছিলেন একজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। তাঁর অনুসারীগণকে পাইথাগোরিয়ান বলা হতো। অঙ্ক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের বিকাশে পাইথাগোরাস এবং তাঁর অনুসারীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাইথাগোরাস এবং তার অনুসারীদের মতে বিশ্ব-অস্তিত্বের মূল হচ্ছে সংখ্যা। তাঁর অনুসারীগণ সংখ্যার উপর অলৌকিক ক্ষমতাও আরোপ করতেন। সংখ্যা ছিল তাঁদের কাছে শক্তির প্রতীক। বস্তুত সংখ্যার এই দর্শন কালক্রমে এক রহস্যময় ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করে এবং পাইথাগোরাস দক্ষিণ ইতালিতে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গ্রিসে দাসের শোষণভিত্তিক সমাজে পাইথাগোরাসের রহস্যবাদী সংখ্যা-দর্শন এবং ধর্ম অভিজাত শাসকশ্রেণীর হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়।

Quality and Quantity : গুণ এবং পরিমাণ

বস্তুর দুটি দিক। একটি তার গুণের দিক, অপরটি পরিমাণের। গুণ বলতে কোনো বস্তুর সত্তানির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র বুঝায়। গুণের বর্ণনার দ্বারা বস্তুকে বুঝার সঙ্গে বস্তুর বিরামহীন পরিবর্তনশীলতা এবং তার আপেক্ষিক স্থিরতার প্রশ্নটি জড়িত। কোনো বস্তুই স্থির নয়। অণুর সংগঠনে বস্তু। কিন্তু অণু গতিময়। তাই বস্তু গতিময়। এই অস্থিরতায় বস্তুকে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে 'এই বস্তু' কিংবা 'ঐ বস্তু'—অর্থাৎ এই গুণসম্পন্ন বস্তু কিংবা ঐ গুণসম্পন্ন বস্তু বলা অসম্ভব বলে বোধ হয়। তথাপি আমরা ব্যবহারিক জীবনে বস্তুকে বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করি। বস্তুর বিশেষণের ভিত্তিতে বস্তুকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং তার পরিবর্তনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। এটা সম্ভব এই কারণে যে, বস্তুর পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও আপেক্ষিকভাবে নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি সংগঠন অপর বস্তু বা সংগঠনের সঙ্গে তার সহস্র সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্টতায় স্থির থাকে। বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে তার পরিমাণের প্রশ্নটিও জড়িত। মূলত বস্তুর পরিবর্তন ঘটে তার অণুর সাংগঠনিকতায়। অণুর সাংগঠনিকতায় ক্রম পরিবর্তনে নতুন সাংগঠনিকতার উদ্ভব ঘটে আর এই নতুন বিন্যাসই নতুন গুণসম্পন্ন বস্তু বলে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে এর সহজ দৃষ্টান্ত উত্তাপে কিংবা শৈত্যের পরিমাণের বৃদ্ধিতে পানির বাষ্প কিংবা বরফে রূপান্তরিত হওয়া। বস্তুর এই পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিবর্তনের পরিমাণ একটা বিশেষ আকার কিংবা মুহূর্ত প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বস্তুর বাহ্যিক গঠন অপরিবর্তিত বলে বোধ হয় এবং এই বাহ্যিক গঠনকে বিশেষ গুণ দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। পানিতে তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি মুহূর্তে পানি পরিবর্তিত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। পানিকে তরল পদার্থ বলে আমরা চিহ্নিত করি। অথচ তাপের মাধ্যমে পানি নিরন্তর তরল থেকে বাষ্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তথাপি যেহেতু উত্তাপের বিশেষ মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত পানির তরলতা পরিবর্তিত হয়ে যায় না, এ কারণে এই বস্তুটিকে তার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও একটা সময় পর্যন্ত পানি বলে অভিহিত করতে পারি। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে পানি, ততক্ষণ পর্যন্ত তার চরিত্র অবশ্যই তরল।

Quietism : শান্তিবাদ

শান্তিবাদ বলতে ইউরোপে সপ্তদশ শতকে ক্যাথলিকবাদের একটি ধর্মীয় এবং নৈতিক তত্ত্বকে বুঝান হয়। শান্তিবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কষ্টভোগ সবকিছুকে প্রতিরোধহীনভাবে গ্রহণ করা। শান্তিবাদকে এদিক থেকে যে-কোনো ধর্মের নিয়মিতবাদেরই প্রকাশ বলে বিবেচিত করা যায়। নিষ্ক্রিয়তা এরং দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে নিস্পৃহতার তত্ত্ব শপেনহারের দর্শনেও পাওয়া যায়।

R

Racialism : জাতিতত্ত্ব

জাতিতত্ত্ব একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর সব জাতিরই সমানভাবে উন্নত হওয়ার অধিকার নেই। যে জাতির রক্ত বিশুদ্ধ তারাই উন্নত হতে পারে এবং অপর জাতির উপর তাদের শাসন করার অধিকার আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মানিতে এডলফ হিটলারের নাজি দল এই তত্ত্বের ভিত্তিতে উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রচার করে। হিটলার 'মাইনকেমফ' নামক যে আত্মজীবনী লিখেছিল তাতে এই স্থূল এবং প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব সে জঙ্গী মনোভাব নিয়ে প্রকাশ করেছিল। হিটলার এবং তার অপরাপর তাত্ত্বিকদের মতে জার্মান জাতি হচ্ছে বিশুদ্ধ আর্যজাতি থেকে উদ্ভূত। এবং আর্যজাতি হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি। আর সকল জাতিকে শাসন করার তাদের অধিকার আছে। এই বিশুদ্ধ জার্মান জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অজুহাতে হিটলার ইউরোপের দুর্বল জাতিগুলিকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে। এবং এর পরিণামে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিজেকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টায় উগ্রজাতিতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে। উন্নতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে জন্মগত কোনো পার্থক্য নাই। ঐতিহাসিক কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণের ফলেই জাতিতে জাতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদ এই পার্থক্যকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য জাতিতত্ত্বের সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিস্তার এবং এর ফলে অঞ্চল এবং জাতি নির্বিশেষে পূর্বকার অনুন্নত জাতিসমূহের বিস্ময়কর সামাজিক, রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক উন্নতি জাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

Radhakrishnan, Sarbapalli : সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (১৮৮৮-১৯৭৫ খ্রি.)

আধুনিক ভারতের অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আন্তর্জাতিকভাবেও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের দায়িত্ব পালন ব্যতীত তিনি অক্সফোর্ড, মস্কো, শিকাগো বিভিন্ন স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে দর্শনের অধ্যাপনা করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনও উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন ভারতে প্রথমে ভাইস প্রেসিডেন্ট, পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসাবেও নির্বাচিত হন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'দি রেইন অব রিলিজিয়ন ইন কনটেমপরারী ফিলোসফি', দি ফিলসফি অব দি উপনিষদ', দি রিলিজিয়ন উই নিড', এ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অব লাইফ' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

Ramkrishna : রামকৃষ্ণ (১৮৩৪-১৮৮৬ খ্রি.)

পরমহংস বলে রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তজনদের দ্বারা আখ্যাত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মের সংস্কারক। তিনি বেদান্তর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের বহু দেবতার জায়গায় এক ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রচার করেন। রামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর প্রভাবের মূল ছিল একদিকে শাস্ত্রের উদার ব্যাখ্যা। অপর দিকে সমাজ সেবাকে ধর্মের মূল হিসাবে প্রচার করা। সত্তার মূলে নির্গুণ ব্রহ্ম। কিন্তু জগৎ মায়া নয়। মানুষ কলিযুগের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এই কলিযুগের স্বভাব। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই মানুষ কলিযুগের এই মনুষ্যত্ববিরোধী এবং ঈশ্বরবিরোধী স্বভাবকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কোনো সক্রিয় সংগ্রামের কথা প্রচার করেন নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য সে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর হিন্দু ধর্মের উদারনীতিক, কুসংস্কারবিরোধী এক ঈশ্বরের তত্ত্ব অবশ্যই একটি সহায়ক শক্তির কাজ করেছে।

Ram Mohan Roy, Raja : রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.)

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের প্রগতিশীল ভারতীয় চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং জাতীয়তাবাদী নেতা।

রামমোহনের জন্ম হয় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। তিনি একটি প্রাচীন জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন। তখনো ভারতে মুসলমানি শাসন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। আরবি এবং ফার্সি ভাষা তখনো সমাজের উচ্চতর মহলে বেশ প্রচলিত। রামমোহন আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রামমোহন নিজে আন্তরিকভাবে যে খুব ধার্মিক ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর নিজস্ব সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রকাশের জন্য হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিষ্টধর্মের উদারতামূলক ব্যাখ্যার তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতাকে তিনি সমালোচনা করেন এবং বেদ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মূল শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার কামনা করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত ভারতবর্ষের জীবনের বন্ধ্যাত্ব এবং কুসংস্কার দূরীভূত হবে না। কিন্তু ইংরেজি সভ্যতার প্রসার কামনা করলেও রামমোহন ইংরেজ শাসনকে ভারতবর্ষের মুক্তিদাতা এবং স্থায়ী শাসক হিসাবে চিন্তা করেন নি। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অধীনে চাকুরি করার মাধ্যমে কিংবা অপরাপর উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পত্তি অর্জন করলেও রামমোহন নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিবোধকে কখনো হারান নি। সমকালীন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শক্তি বিকাশের ব্যাপারে রামমোহন বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ধর্মের উদারনীতিক ব্যাখ্যা এবং সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রচুর সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা ফারসি, আরবি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় রচনা করেন। তাঁকে আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির জনকও বলা হয়। ১৮৩০ সালে রামমোহন

বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট সতীদাহ বা স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দগ্ধ করার কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাকে রদ করার আবেদন করেন। ইংল্যাণ্ডের উদারনীতিক দার্শনিক ও সমাজসেবীগণ রামমোহনের চিন্তাধারাকে সমর্থন করেন এবং তাঁকে সংবর্ধিত করেন। দিল্লির সম্রাটের পক্ষ হয়ে সম্রাটের ভাতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেছিলেন। রামমোহন রায়ের 'রাজা' উপাধি ভারতের তৎকালীন মোগল 'সম্রাটে'র প্রদত্ত। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

Rationalism : অভিজ্ঞতাউর্ধ্ব জ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, হেতুবাদ

১. অভিজ্ঞতাউর্ধ্ব জ্ঞানবাদ অনুযায়ী জ্ঞানের সার্বিক এবং অপরিহার্য সূত্রগুলি ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করে না। এগুলি মানুষের মনের ব্যাপার। মন থেকেই ব্যক্তি এই সূত্রগুলি লাভ করে। স্থান, কাল, কার্যকারণ সম্পর্ক, ২+২=৪ প্রভৃতি সর্বজন স্বীকৃত সত্যসমূহ মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করে না। কারণ, অভিজ্ঞতার মধ্যে এদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এ সমস্ত সত্য মানুষের মনে অভিজ্ঞতার পূর্ব থেকে জন্মগতভাবেই বিরাজমান। অভিজ্ঞতা মনের এই সূত্রগুলিকে পরিস্ফুটিত করে তুলতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা এদের সৃষ্টি করতে পারে না। অভিজ্ঞতাউর্ধ্ব জ্ঞানবাদ তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান তত্ত্বের বিরোধী। অভিজ্ঞতাউর্ধ্ব জ্ঞানবাদের উদ্ভব ঘটে প্রথমে আঙ্কিক সূত্রগুলির বিশ্লিষ্ট এবং বস্তুনিরপেক্ষ সত্যতার সমস্যা আলোচনার ভিত্তিতে। ইউরোপে সপ্তদশ শতকে দেকার্ত, স্পিনোজা এবং লাইবনিজ এবং অষ্টাদশ শতকে কান্ট, ফিকটে, শেলিং এবং হেগেলকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে আমরা দেখতে পাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ বা সার্বিক সত্য এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার পারস্পরিক সম্পর্ক একটি জটিল সমস্যা; এ সমস্যার আলোচনা এবং সমাধান অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব জ্ঞানতত্ত্ব একপেশে। অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে অভিজ্ঞতাউর্ধ্ব জ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ সার্বিক সূত্রগুলিকে চরম সত্তায় পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। এর পরিণামে সার্বিক সূত্রগুলি একদিকে যেমন কেবলমাত্র মনের ভাবে পর্যবসিত হয় তেমনি অন্যদিকে তার মাধ্যমে ব্যক্তি-চিন্তা এবং সত্য-মিথ্যার ক্ষেত্রে যে-কোনো অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণে মানুষের মনের জটিল ক্ষমতা এই উভয় সত্যকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

২. যুক্তিবাদ জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, বিশ্বদৃষ্টি সর্বক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়াকে যুক্তিবাদ বলা হয়। যুক্তি বলতে প্রতিপাদ্য, উদাহরণ, প্রমাণ সিদ্ধান্ত ইত্যাদির পারম্পর্য এবং সঙ্গতি বুঝায়। যুক্তিবাদ অযুক্তিবাদের বিরোধী। অযুক্তিবাদ বলতে প্রধানত সজ্ঞা বা অনুভূতির মাধ্যমে সত্যোপলব্ধিকে বুঝান হয়।

৩. ধর্মের ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে যুক্তিবাদ বা হেতুবাদের সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা ধর্মকে বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য করার জন্য ধর্মের যে অভিমতগুলি যুক্তিগ্রাহ্য কেবল তাদেরকেই সত্য কিংবা সঠিক বলে গ্রহণ করার মত প্রকাশ করেন।

Reflexes : প্রতিবর্ত

কোনো উদ্দীপক বা উত্তেজকের সংস্পর্শে জীবন্ত দেহের কোনো স্নায়ু সচেতন ইচ্ছা ব্যতিরেকে যে প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ করে তাকে প্রতিবর্ত বলা হয়। কোনো ব্যক্তির আঙুলের ডগায় জ্বলন্ত দেয়াশলাই-এর কাঠি ধরলে ব্যক্তি তার আঙুল অবিলম্বে সরিয়ে নেয় ; চোখের উপর তীব্র আলো নিক্ষেপ করলে ব্যক্তি চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলে। তেঁতুল দেখলে কিংবা তেঁতুলের কথা মনে করলে ব্যক্তির জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হয়—এগুলি প্রতিবর্তের দৃষ্টান্ত। প্রতিবর্তকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : অনিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্ত এবং নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্ত। উপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে আগুন থেকে আঙুলের সরে আসা কিংবা আলোর আঘাতে চোখের পাতা বন্ধ হওয়া অনিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তের দৃষ্টান্ত। কিন্তু তেঁতুল দেখলে কিংবা তেঁতুলের কথা মনে হলে জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হওয়া নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তের দৃষ্টান্ত। নিয়ন্ত্রিত এই কারণে যে, এই দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়া গোড়াতে সহজাত কিংবা অনিয়ন্ত্রিত ছিল না। কারণ গোড়াতে তেঁতুল কিংবা টকজাতীয় দ্রব্য জিহ্বার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এলেই মাত্র একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ক্রমে তেঁতুলের সাক্ষাৎ স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত কেবলমাত্র চোখের দেখা কিংবা মনে করার মাধ্যমেও জিহ্বার সেই বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রতিক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তের সুবিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে রুশ বিজ্ঞানী পাভলভের কুকুর নিয়ে পরীক্ষা। উদ্দীপকের জবাবে স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার জন্য পাভলভ কুকুরের ক্ষুধার উপর এই পরীক্ষাটি করেন। তিনি প্রথমে কুকুরের ক্ষুধার সময়ে তার স্নায়ুকে ক্রিয়াশীল করার জন্য তার সম্মুখে এক টুকরা মাংস ধরতেন এবং এই সঙ্গে একটি ঘণ্টাধ্বনি করতেন। মাংস দেখামাত্র কুকুরের জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হতো। মাংসের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি উদ্দীপকটিও কিছুদিন যাবৎ সংঘটিত করার পরে পাভলভ নির্দিষ্ট সময়টিতে মাংসের টুকরাটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টাধ্বনি করে কুকুরের স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখেন যে, মাংসের টুকরাটি না থাকা সত্ত্বেও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হতে শুরু করেছে। এভাবে পাভলভ প্রমাণ করলেন যে, স্নায়ুর বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায়। উদ্দীপকের পরিবর্তন করা চলে। এক উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়া অপর উদ্দীপকে স্থানান্তরিত করা চলে। পাভলভের এই সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানের আচরণবাদী এবং বস্তুবাদী বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

Reformation : সংস্কার আন্দোলন

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র এবং খ্রিষ্টধর্মের গোঁড়া ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল আন্দোলন সংস্কার আন্দোলন বলে পরিচিত। সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক বুর্জোয়া বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। এই পর্যায়ে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সামন্ত শ্রেণীরও একটি অংশ যোগদান করে। সংস্কার আন্দোলন খ্রিষ্টধর্মকে সাধারণের জন্য সহজগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে এবং কুসংস্কার ও আচারের বদলে ব্যক্তির আন্তরিক

বিশ্বাসকে মুক্তির উপায় বলে ব্যাখ্যা করে। সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্রের শাসনে গির্জার প্রভাব হ্রাস করে এবং গীর্জাকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে। সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপীয় দেশসমূহে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং বিজ্ঞানের বিকাশ সহজতর হয়।

Relations of production : উৎপাদন সম্পর্ক

'উৎপাদন সম্পর্ক' কথাটি মার্কসবাদী তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। সমাজের আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক বিদ্যমান সে সম্পর্কের একটি চেতনা-নিরপেক্ষ সত্তা আছে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, বিনিময় এবং বন্টনের ক্ষেত্রে গঠিত সামাজিক সম্পর্কই হচ্ছে উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-সম্পর্ক যে-কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য প্রকাশ। মানুষ যেমন সামাজিক জীব, তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনও একটি সামাজিক অর্থাৎ যৌথক্রিয়া। মানুষকে আদিকাল থেকেই উৎপাদনী যন্ত্র কমবেশি পরিমাণে যৌথভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু যন্ত্র বা উপায়সমূহের মালিকানা সামাজিক বা যৌথ হয় নি। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানার চরিত্র অনুযায়ী উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয়। আদিতে অনিবার্যভাবে উৎপাদনী প্রক্রিয়া যেমন যৌথ ছিল তেমনি উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানাও যৌথ ছিল। উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থাৎ উৎপাদিত সম্পদের মালিকানাও স্থির হয়। কাজেই উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা যেখানে যৌথ সেখানে উৎপাদিত সম্পদের মালিকানাও সমষ্টিগত এবং উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তিগত সেখানে উৎপাদিত সম্পদ ব্যষ্টির, সমষ্টির নয় এবং উৎপাদকদের মধ্যে যন্ত্রের মালিকানাহীন মানুষ যন্ত্রের মালিকদের উপর নির্ভরশীল। আদি সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন উপায়ের মালিকানা যখন ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায় তখন মালিকরা প্রভু এবং মালিকানাহীন উৎপাদকরা দাসে পরিণত হয়। মূলত সামাজিক সম্পর্কের এই বিন্যাস সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী উভয় সমাজের ক্ষেত্রে সত্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী যেখানে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা দখল করতে সক্ষম হয়েছে সেখানে উৎপাদনের সম্পর্কও সামাজিক অর্থাৎ সমষ্টিগত রূপ গ্রহণ করেছে। এক উৎপাদন সম্পর্কের স্থানে অপর উৎপাদন সম্পর্কের স্থাপনা একচোটেই চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে না। এক সম্পর্ক থেকে আর এক উৎপাদন-সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যবর্তীকালে উভয় রকম সম্পর্কের অবস্থান সাময়িকভাবে থাকতে পারে। দাস সমাজের স্থানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ দাস সমাজের ক্ষয় এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত দাস সমাজের সম্পর্কের রেশ চলতে থাকে। সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজও আকস্মিকভাবে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয় নি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলেও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি এবং তার সম্পর্ক আংশিকভাবে চলতে থাকে। পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের পরেও পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটা মিশ্র অর্থনীতির অস্তিত্ব থাকতে পারে। অর্থনীতির কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সম্পদ এবং শ্রমিকের উপর ব্যক্তিগত

মালিকানা কার্যকর থাকতে পারে। কালক্রমে অবশ্য পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্ক পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নতুন সম্পর্ক একমাত্র সম্পর্কে পরিণত হয়।

Religion : ধর্ম

ধর্ম বলতে জীবন এবং জগতের উপর অতিজাগতিক এক কিংবা একাধিক শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস বুঝায়। ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশের একটা পর্যায়ের সূচক। চেতনার একটা পর্যায়ে মানুষ তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিবেশের পরিবর্তন, তার কোনো বস্তুর বিরাটত্ব কিংবা ক্ষুদ্রতা, জীবনের জন্য কোনো বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তিকে হিতকর কিংবা অহিতকর ভাবতে সক্ষম হয়। জীবন রক্ষার জন্য সূর্য, ঝড়, ঝঞ্ঝা, অগ্নি, বিদ্যুৎ পর্বত, বিরাটাকার পশু ইত্যাদিকে বশীভূত করার উপায়ের কথা মানুষ চিন্তা করে। মানুষের এই অসহায় অবস্থায় এবং প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে ধর্মের প্রাথমিক রূপ হিসাবে প্রকৃতি এবং প্রতীকের উপর অলৌকিক শক্তি আরোপ এবং তাদের পূজা আরাধনা শুরু হয়। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটি মাত্র ধর্ম বিকাশলাভ করে নি। একাধিক ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার আনুষঙ্গিক সংস্কার ও অনুষ্ঠানসমূহ বিকাশ লাভ করেছে। ধর্মের অতিজাগতিক শক্তির বিশ্বাস থাকলেও তার একটা জাগতিক ইতিহাস আছে। ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। আদিম অসহায় অবস্থা অতিক্রম করে মানুষ অধিকতর সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করলে মানুষের ধর্মীয় কল্পনাও অধিকতর সংবদ্ধ এবং সূক্ষ্ম আকার ধারণ করতে শুরু করে। গাছ, পাহাড়, পশু ইত্যাদির স্থানে সুউচ্চ পাহাড়ে কিংবা আকাশে বাসকারী এক দেবরাজ্যের কল্পনা তারা করতে শুরু করে। এই দেবতাদের সঙ্গে মানুষের নিজের চারিত্রিক মিল ছিল। মানুষের সমাজের ন্যায়ই দেবতাদের মধ্যে ছোটবড় ছিল। দেবরাজ্যেও মানুষের সমাজের ন্যায় ঝগড়া, বিবাদ, হিংসাদ্বেষ, প্রেম, আকর্ষণ প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল। মানুষের জীবনের ইতিহাসের তুলনায় একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের উদ্ভব খুবই আধুনিক। আর্থনীতিক বিকাশের সাথে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভব এবং সেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অধিকতর বিকাশে সমাজের অধিকতর ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এবং তার রাজনীতিক কাঠামোতে একক নেতৃত্বের প্রয়োজনের পরিপূরক হিসাবে মানুষের মনে অতিজাগতিক এক ঈশ্বরের কল্পনা উদ্ভূত হতে থাকে। আধুনিককালের অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের একটি যোগসূত্র আছে। ভাববাদী দর্শন যুক্তি সহকারে ধর্মীয় বিশ্বাসকে অধিকতর গ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। জগতের উপর ঈশ্বর আছে এই বিশ্বাসের ন্যায় ভাববাদী দর্শনও বলে, কারণ ব্যতীত যখন কোনো কাজ হয় না তখন জগতেরও এক আদি কারণ বর্তমান। ধর্ম ঈশ্বরের কোনো জন্ম, মৃত্যু বা পরিবর্তন স্বীকার করে না। কিন্তু ধর্মের জন্ম, পরিবর্তন ও মৃত্যু ঘটতে পারে। যত ধর্ম একদিন প্রচলিত ছিল তত ধর্ম আজ আর প্রচলিত নাই। ধর্ম অবশ্যই মানুষের বিশেষ প্রয়োজনের পরিপূরক। এ প্রয়োজনের উৎস হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বৃহত্তর সংখ্যক শোষিত মানুষের অসহায় অবস্থা এবং তাদের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হতে না পারা। যে অন্যায় এবং অবিচার শোষিত মানুষ

অসহায়ভাবে ইহজগতে ভোগ করে তার পরিপূরক হিসাবে তার কল্পিত স্বর্গলোকে অন্যায় এবং অবিচারের পরিবর্তে ন্যায়বিচার এবং সুখের চরম লাভ সে আশা করে। সাধারণ মানুষের এই কল্পনা শাসক ও শোষক শ্রেণীর দার্শনিক, ভাবুক, সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্নভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং স্থায়ী করে রাখার প্রয়াস পায়। কেননা এরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচলিত আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রাখার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। সমাজের আমূল পরিবর্তনে, শ্রেণীহীন সমাজের সংঘটনে এবং বিজ্ঞানের বিকাশে ব্যক্তির অসহায়তা যত অধিক দূরীভূত হবে অতিজাগতিক রক্ষাকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন ব্যক্তি তত কম বোধ করবে এবং কালক্রমে ঈশ্বর হয়তো মানুষের মনকে ব্যাপৃত রাখার বিষয় হিসাবে গণ্য হবে না।

Renaissance : নবজাগরণ

সাধারণভাবে নবজাগরণ বলতে নতুন জাগরণ বুঝায়। কোনো দেশ বা জাতি যখন সৃষ্টির বন্ধ্যাত্বে আক্রান্ত হয় তখন তাকে কাটিয়ে উঠতে যে সমস্ত চিন্তা সহায়তা করে তাকে নব জাগরণ বা নব জাগরণের চিন্তা বলা হয়। কিন্তু ইংরেজি 'রিনাইসেন্স' বা নব জাগরণ দ্বারা ইউরোপীয় দেশসমূহে, বিশেষ করে ইতালিতে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়ের যুগে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিকশিত নতুন পুঁজিবাদী সমাজ সৃষ্টির সহায়ক প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে বুঝান হয়। দর্শনের উপর এই সময়ে ধর্মের প্রভাব প্রধান হয়ে থাকলেও আবার জগতের সঙ্গে ইউরোপের সাক্ষাৎ সংযোগের মাধ্যমে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের ঐতিহ্যের পরিচয় এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নতুন উদারনীতিক ও মানবিক চিন্তাধারার উদ্ভবকে সম্ভব করে তোলে। দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কজার নিকোলাস, ব্রুনো, কামপানেলা প্রভৃতি দার্শনিকের রচনায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের ভিত্তিতে যে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে তা ছিল ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত এবং বস্তুবাদী। এই যুগের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) পৃথিবীর ব্যাখ্যায় কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব ; (২) লিউনার্ডো দা ভিঞ্চি এবং গেলিলিওর অঙ্কশাস্ত্রের উপর গবেষণা এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যায় আঙ্কিক গবেষণার প্রয়োগ ; (৩) জগৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এই ধর্মীয় ধারণার স্থানে জগতের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বিধানসমূহের আবিষ্কার। এই সময়কার সামাজিক আর্থনীতিক পরিবর্তন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায়ও প্রতিফলিত হয়। ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ব্যক্তি যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্রীড়নক ছিল সেখানে নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ব্যক্তির মর্যাদা ও ক্ষমতা স্বীকৃত হতে থাকে। ঐক্যবদ্ধ বৃহদাকারের জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে। রাষ্ট্রের উপর ধর্মীয় যাজকতন্ত্রের প্রভাবও হ্রাস পেতে থাকে। ম্যাকিয়াভেলী, বোদিন প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চিন্তাধারায় এই বিকাশের প্রতিফলন ঘটে। এই যুগে জার্মানির টমাস মুনজার (১৪৯০-১৫২৫)-এর ন্যায় সমাজতন্ত্রের কল্পলোক সৃষ্টিকারী চিন্তাবিদেরও সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা ধর্মীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্ত সম্পদের উপর জনগণের সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন।

Revisionism : শোধনবাদ, সংশোধনবাদ

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে শোধনবাদ একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। বাস্তব সমাজ জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের ব্যাখ্যায় মার্কসবাদ অনুসারীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথম দুদশক পর্যন্ত মার্কসবাদের নেতৃত্ব দেন লেনিন। তিনি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন, উহার নেতৃত্ব দেন এবং ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করেন। মার্কসবাদের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের সঙ্গে বার্নস্টাইন, বাউয়ার, কাউট্‌সকী, ট্রটসকী প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক নেতাদের মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। লেনিন এই সমস্ত নেতাদের মার্কসীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাকে সংস্কারবাদ এবং সুবিধাবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে এবং লেনিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদেরকে মার্কসবাদের সঠিক ব্যাখ্যাতা এবং অনুসরণকারী বলে দাবি করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বেশ কিছুসংখ্যক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা উহার অংশবিশেষের সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগত বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটোর বিদ্রোহের মধ্যে এ বিরোধের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৮ সালের দিকে। তখন মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতিকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ 'টিটোবাদ' বলে আখ্যায়িত করতেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সহ-অবস্থানের তাৎপর্য এবং সম্ভাব্যতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশ কি নীতি অনুসরণ করবে এবং করবে না, তৃতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য কিনা, প্রভৃতি প্রশ্নে এই মতবিরোধ বেশ তীব্র আকার ধারণ করে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি পরস্পরকে মার্কসবাদের সংশোধনবাদী বলে আখ্যাত করতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দুই প্রধান কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য মতপার্থক্য অন্যান্য বেশ কিছুসংখ্যক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ ও বিভেদের সৃষ্টি করে এবং কিছুসংখ্যক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পরেই অন্যতম বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি বলে বিবেচিত হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অভিমত ছিল চীনের মধ্যে আধুনিক সংশোধনবাদের চরম প্রকাশ ঘটেছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও অনমনীয়ভাবে অনুরূপ অভিমত পোষণ করত।

Revolution, Bourgeois : বুর্জোয়া বিপ্লব, ধনতান্ত্রিক বিপ্লব, পুঁজিবাদী বিপ্লব

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি এবং রাজনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমিক ও যন্ত্রশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠাকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলা হয়। বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী বিপ্লব মানুষের সমাজের বিবর্তনে একটা পর্যায়কে সূচিত করে। ঐতিহাসিক এ পর্যায়ের পরিধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হতে পারে। বস্তুত পৃথিবীব্যাপী এ পর্যায়ের শুরু সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষয়ের যুগে ইউরোপে ষোড়শ শতকে জার্মানির কৃষক·বিদ্রোহের

মধ্যে সূচিত হয়েছিল বলা যায়। অষ্টাদশ শতকে ১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে এই বিপ্লব একটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রুশ-ভূখণ্ডে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে আরো কয়েকটি দেশে আর্থনীতিক পরিবর্তনে বুর্জোয়া যুগের অবসান ঘটলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া পর্যায়ের অবসান এখনো ঘটে নি। অনেক দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের উচ্ছেদে পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পুঁজিবাদী বিপ্লবের মূল ঐতিহাসিক ভূমিকা হচ্ছে, শিল্প কারখানার প্রতিবন্ধক বিকাশের শক্তিসমূহকে উচ্ছেদ করা। সামন্তবাদী অর্থনীতি উচ্ছেদের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নানা রূপ গ্রহণ করতে পারে। বিপ্লব সাধনকারী শক্তিতেও তারতম্য ঘটতে পারে। বৃহৎ কয়েকটি দেশে পুঁজিবাদী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পরে অন্যান্য দেশে এই বিপ্লব সাধনে নতুনতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশ আন্তর্জাতিকভাবে একচেটিয়া পুঁজি সঞ্চয় ও সরবরাহকারী দেশ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করাতে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এবং অন্যান্য দুর্বল দেশগুলির বুর্জোয়া বিপ্লব নতুনতর চরিত্র ধারণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুগের পূর্বে পুঁজিবাদী বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিকাশমান ধনিকশ্রেণী বিপ্লবের অগ্রগামী শক্তি ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় যে অভ্যুত্থান ঘটে তারও লক্ষ্য ছিল সামন্তবাদী জারতন্ত্রের উচ্ছেদ। কিন্তু এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবেও শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণী সশস্ত্র সংগ্রামের মারফত সামন্তবাদী জারতন্ত্রের পতন ঘটায়। উপনিবেশের বুর্জোয়া বিপ্লব এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন মিলিত হয়ে এই নতুনতর শ্রেণী বিন্যাসকে স্পষ্টতর করে তোলে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে বুর্জোয়া বিপ্লব সাধন করার ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে জাতীয় মুক্তি এবং আর্থনীতিক উত্তরণের পথে প্রতি-বিপ্লবীশক্তি হিসাবে কাজ করে। শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী এই নেতৃত্বমূলক ভূমিকার কারণে বুর্জোয়া বিপ্লব অনেক দেশে নতুন বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্যায়টিকে প্রধানত দুভাবে বিভক্ত করা চলে। ১. অবিমিশ্র বুর্জোয়া বিপ্লব : এ বিপ্লবের প্রধান ভূমিকা ধনিকশ্রেণীর। শ্রমজীবী জনসাধারণের ভূমিকা গৌণ। এরূপ বিপ্লবে আর্থনীতিক রূপান্তর ঘটলেও শ্রমজীবী জনতা বা গরিব কৃষকের অবস্থান কোনো উন্নতি সাধিত হয় না। ২. বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব : এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিপ্লব সাধনে শ্রমিক এবং কৃষক জনতা জাতীয় শিল্পের বিকাশ ছাড়াও শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি এবং জমিতে কৃষকের স্বার্থসাধনকারী কৃষি সংস্কারের দাবিসহ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র ধনিকশ্রেণীর কবলিত হলেও শ্রমিকশ্রেণী তার রাজনীতিক চেতনা, ঐক্য এবং সংগঠিত শক্তির প্রভাবে ধনিকশ্রেণীর সরকারকে নিজের স্বার্থে বেশকিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অধিকতর শক্তির কারণে এরূপ গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বিপ্লব একাধিক দেশে সাধিত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শক্তি, সমাজতান্ত্রিক দেশের নৈকট্য, জাতীয় বুর্জোয়ার দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে এরূপ গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া-বিপ্লব জনগণতন্ত্রের রূপ ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকে আসন্ন করে তুলতে পারে।

Revolution, October : অক্টোবর বিপ্লব (নভেম্বর বিপ্লব)

পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকটি ঘটনা তাদের বিপুলতার কারণে এবং সমাজের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধনের উৎস হিসাবে বিপ্লব বলে পরিচিত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ, ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা, ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ও যুদ্ধ, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব এবং ১৯১৭ সনে অক্টোবর বিপ্লব বিশেষভাবে পরিচিত।

১৯১৭ সালে ৭ নভেম্বর (রাশিয়ার পুরাতন বর্ষপঞ্জি অনুসারে ২৫ অক্টোবর) লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে এবং শ্রমিক কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েত বা সমিতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক এই বিপ্লব অক্টোবর বা নভেম্বর বিপ্লব নামে পরিচিত।

বিশাল রুশদেশে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রধান ছিল জার। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক জারের শাসন, অপরদিকে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদনের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বিকাশমান পুঁজিবাদী শক্তির সাধারণ দ্বন্দ্ব তীব্র হতে থাকে। এই বিরোধের প্রকাশ সামন্ততন্ত্র এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং ঘটনার মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। কেবল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নয়, মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলও সংগঠিত হয়। সামন্ততন্ত্র এবং জার শাসনের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে শ্রমিক, কৃষক জনসাধারণ এবং নৌবাহিনীর নাবিকদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। যুদ্ধ জাহাজ 'পটেমকিন' এর নাবিকগণ নিজেদের জীবনযাত্রা এবং খাদ্যের উন্নতির দাবিতে ধর্মঘট ঘোষণা করে। বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে বন্দরের শ্রমিকরাও যোগদান করে। কিন্তু জার সরকার সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে এই বিক্ষোভ দমন করে। পর্যুদস্ত হলেও ১৯০৫-এর এই ঘটনা ১৯০৫-এর বিপ্লব নামে পরিচিত। লেনিন পরবর্তীকালে ১৯০৫-কে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের 'মঞ্চমহড়া' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। রাশিয়াও এই যুদ্ধ জার্মানির প্রতিপক্ষ হিসাবে লড়াই করে। কিন্তু রুশ বাহিনী যুদ্ধে বিপর্যস্ত হতে থাকে। যুদ্ধে প্রথম আড়াই বছরের মধ্যে রাশিয়ার পঞ্চান্ন লক্ষ সৈন্য নিহত নয়। ক্রমান্বয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সমরাস্ত্র যোগান দেওয়াও সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। সরকারের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। জার তার মন্ত্রিসভাকে ঘন ঘন পরিবর্তন করে। কৃষকদের জমির দাবি এবং সৈন্যদের মধ্যে শান্তির দাবি তীব্র হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ (ফেব্রুয়ারি) ব্যাপক ধর্মঘট এবং হাঙ্গামা শুরু হয়। সরকার সৈন্য বাহিনীকে ধর্মঘট দমন করতে পাঠালে সৈনিকেরা ধর্মঘটিদের সঙ্গে যোগদান করে। এই সময়ে রুশ ডুমা বা পার্লামেন্টও সরকার বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। জার ডুমার অধিবেশন বন্ধ করে দেবার হুকুম দিলেও ডুমা সে হুকুম অমান্য করে এক অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করে। অবস্থাদৃষ্টে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করেন। পুরাতন রুশ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি

মাসে সংঘটিত এই ঘটনা ইতিহাসে 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব' নামে অভিহিত। চরিত্রগতভাবে এই বিপ্লব ছিল পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু অস্থায়ী সরকার জনসাধারণের শান্তি বা জমি এবং রুটির দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তারা তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু সৈনিক, কৃষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অস্থায়ী সরকারের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার হিসাবে দেশব্যাপী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের নির্বাচিত সমিতি বা সোভিয়েত সংগঠিত হতে থাকে। আসলে ১৯০৫-এর বিপ্লবের মধ্যেই সংগ্রামী জনতার এইরূপ সোভিয়েত প্রথম গঠিত হয়েছিল। লেনিন এতদিন দেশের বাইরে নির্বাসিত জীবন-যাপন করছিলেন। বাইরে থেকে তিনি দেশের বলশেভিক দলের বিপ্লবী কাজ পরিচালনা করছিলেন। ১৬ এপ্রিল (১৯১৭) তিনি দেশে ফিরে এলে বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েত কার্যত অস্থায়ী সরকারের বিরোধী সরকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে সরকারের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য সকল প্রশ্নে সোভিয়েতগুলি অস্থায়ী সরকারের আদেশ অমান্য করতে থাকে। শক্তভাবে যুদ্ধ পরিচালনার অজুহাতে এবার অস্থায়ী সরকার সমস্ত বিক্ষোভ এবং দাবিকে দমন করার নীতি গ্রহণ করে। সৈন্য বাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত রেজিমেন্ট বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাদেরকে ভেঙে দেওয়া হলো। কৃষক আন্দোলন দমনেও কঠোরতর ব্যবস্থা গৃহীত হতে লাগল। এতদিন শ্রমিক-কৃষক- সৈনিকদের সোভিয়েতগুলিকে বরদাশত করা হলেও এখন থেকে সেগুলিকে সরকার ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। এমন অবস্থায় ১৬ জুলাই তারিখে অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদের এক চেষ্টা হয়। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় না। এ চেষ্টা বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত ছিল না। কেননা বলশেভিকদের মতে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদের পরিস্থিতি তখনো পরিপক্কতা লাভ করে নি। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে অস্থায়ী সরকারের দমননীতি তীব্রতর হয়ে ওঠে। সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। লেনিন আত্মগোপন করেন। কিন্তু অস্থায়ী সরকারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কেরেন্সকী এবং সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কর্নিলভের মধ্যে বিরোধ ঘটে। জেনারেল কর্নিলভও সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। জেনারেল কর্নিলভের উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী সরকারের চরিত্র পুরোপুরি পালটে দিয়ে তাকে একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারে পরিণত করা। পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিরোধে কর্নিলভের এই চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা প্রকটতর হয়ে ওঠে। খাদ্য সংকট ও শান্তির কামনা জনসাধারণকে সরকারের যুদ্ধচালনার নীতির তীব্র বিরোধী করে তোলে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোনো সাড়াই আর সরকার পায় না। এমন অবস্থায় ৬ নভেম্বর তারিখে লেনিন বলশেভিক নেতৃত্বে পরিচালিত লালবাহিনীকে অস্থায়ী সরকারের দপ্তর পেট্রোগ্রাডের শীতপ্রাসাদ দখলের নির্দেশ দেন। ৭ নভেম্বর (নতুন বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী) সোভিয়েতসমূহের নিখিল রুশ কংগ্রেস বলশেভিক পার্টিকে সরকার গঠনের ক্ষমতা প্রদান করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সরকার হিসাবে জনতার কমিসার বা মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে। রাজধানীর বাইরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরেও বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে। লেনিন দেশের জন্য শান্তি, জমি এবং রুটি বা রুজির নীতি ঘোষণা করলেন। ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করা হলো। প্রতিবিপ্লবী এবং

যাজক প্রতিষ্ঠান গির্জার বিপুল সম্পত্তি সরকারের হাতে বাজেয়াপ্ত করা হলো। কৃষকদের জমির মালিক ঘোষণা করা হল। শ্রমিকরা কারখানা দখল করতে শুরু করল। কৃষকদের মধ্যে জমি বিনামূল্যে বিলি করার নীতি গ্রহণ করা হলো। ৫ ডিসেম্বর লেনিন যুদ্ধ থেকে রাশিয়ার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে যুদ্ধ বন্ধ কার্যকর করেন। ১৯১৮ সালের ৩ মার্চ তারিখে জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটভস্ক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯১৮-এর জুলাই মাসে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়।

Revolution, Socialist : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

পুঁজিবাদের উচ্ছেদের ভিত্তিতে কারখানা, যন্ত্র, জমি এবং প্রাকৃতিক অপরাপর সম্পদের উপর শ্রমিকশ্রেণীর সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য নিহিত। মার্কস এবং এঙ্গেলস মানুষের সমাজের বিকাশ বিশ্লেষণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পুঁজিবাদের পরবর্তী স্তরে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা পুঁজিবাদকে বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদের মূল অসঙ্গতি হচ্ছে, একদিকে উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদিত সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার যৌথ চরিত্র। যৌথভাবে যে সম্পদ শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন করে মালিক শ্রেণী ব্যক্তিগতভাবে তা ভোগ করে। পুঁজিবাদ শ্রমিককে পণ্য এবং শ্রমদাস হিসাবে ব্যবহার করে। শ্রমের বাজারে সর্বহারা বুভুক্ষ অসহায় শ্রমিকের সমস্ত শ্রমশক্তি দিন কিংবা সপ্তাহের চুক্তিতে পুঁজি এবং কারখানার মালিক নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে কিনে নেয়। বিনিময়ের চুক্তি মোতাবেক শ্রমিক তার প্রাপ্য মজুরির সমপরিমাণ সম্পদই মাত্র উৎপন্ন করতে বাধ্য। কিন্তু তার অসহায়তার কারণে শ্রমিক তার প্রাপ্য নির্দিষ্ট মজুরির পরিবর্তে অধিকগুণ বেশি সময় পরিশ্রম করে এবং অধিকগুণ বেশি সম্পদ উৎপন্ন করে। মজুরের এই চুক্তি-অতিরিক্ত শ্রমের ফল আত্মসাৎ করেই পুঁজিবাদ তার মুনাফা তৈরি করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এই অসঙ্গত আর্থনীতিক বুনিয়াদকে ভাবগত প্রচারে এবং শাসনের যন্ত্র দ্বারা স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু উৎপাদনের যৌথ প্রক্রিয়া সর্বহারা শ্রমিককে একতার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পুজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের শোষণগত বিরোধ ব্যতীত এক পুঁজিবাদীর সঙ্গে অপর পুঁজিবাদীর মুনাফার প্রতিযোগিতা এবং এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্য অধিকতর লাভে বিক্রি করার জন্য বিশ্ববাজার দখল এবং বণ্টনের উপর অপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরোধও বিদ্যমান। এই সমস্ত বিরোধের পরিণামে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অপরিহার্য বলে মার্কস এবং এঙ্গেলস অভিমত প্রকাশ করেন। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরকে বিশ্লেষণ করে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অত্যাসন্নতার কথা বলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রসমূহের উল্লেখ করে লেনিন বলেন : ১. পুঁজিবাদের অসমান বিকাশের কারণে শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের এবং পুঁজিবাদের দুর্বল অংশ বা এলাকায় আঘাত করে এক কিংবা একাধিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত স্থানে একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘঠিত হবে এমন কোনো কথা নাই ; ২. পৃথিবীর দেশ বা অংশবিশেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে

পৃথিবীতে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র এই উভয় ব্যবস্থার সহঅবস্থানের প্রশ্নটি জন্মলাভ করবে ; ৩. শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই মাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে ; ৪. বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদ এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বহারার একনায়কত্ব অপরিহার্য ; ৫. সাম্রাজ্যবাদের সংকটকালে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সর্বহারা মুক্তিকামী পরাধীন জাতির মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং মুক্তিকামী জনতার সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণীর এই ঐক্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে লেনিন তারও উল্লেখ করেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ পর্যুদস্ত করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিজয় লাভ এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে বহু জাতির জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশে, চীনে এবং কিউবায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের নিশ্চয়তা বিধানকারী জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুনিশ্চিত করে তুলেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা শ্রমিকশ্রেণীর হস্তগত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটা প্রক্রিয়াবিশেষ এবং সম্পূর্ণ হওয়া সময়সাপেক্ষ। সমাজতন্ত্র উৎপাদনের এবং বন্টনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্যবাদী সমাজ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী সমাজে প্রতিটি মানুষ যেমন তার ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজের জন্য শ্রম করবে তেমনি সমাজও তার সমস্ত প্রয়োজনকে পূরণ করবে।

RosenBerg Couple murder : রোজেনবার্গ দম্পতির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জাপানের হিরোশিরা এব নাগাসাকি নামক দুটি নিরস্ত্র নগরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে। যুদ্ধ ছিল তখন সমাপ্তির পর্যায়। জাপান আত্মসমর্পণের পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। আণবিক বোমা নিক্ষেপের কোন কারণ তখন ছিল না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আণবিক বোমার শক্তির একমাত্র অধিকারী এ কথা বুঝাবার জন্য জাপানের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে এবং মার্কিন কোন মানবিকতাবোধ সম্পন্ন বিজ্ঞানী যেন আণবিক বোমা তৈরির কৌশল জানতে না পারে তার জন্য সেই সমস্ত মানবিকতা-বোধসম্পন্ন বৈজ্ঞানিককে গ্রেপ্তার করে হত্যা করার নীতি গ্রহণ করে। মার্কিন যুদ্ধবাদী অধিনায়কদের ধারণা ছিল যে রাজনীতিক দল এবং ব্যক্তিদের মধ্যে কমিউনিস্ট তথা সাম্যবাদী ব্যক্তিদের মধ্যে আণবিক বোমার অন্যায় ব্যবহার সম্পর্কে এরূপ ধারণা থাকতে পারে। তাই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি দপ্তরে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করে, এমন মানবতাবাদী বিজ্ঞানী রাষ্ট্রযন্ত্রের কোথায় থাকতে পারে। এরূপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তারা রোজেনবার্গ দম্পতি নামক এক মানবতাবাদী বিজ্ঞান দম্পতির সন্ধান লাভ করে এবং এই বিষয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগে রোজেনবার্গ দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে এই বিজ্ঞান দম্পতিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করে।

Rousseau, Jean Jacques : জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রি.)

অষ্টাদশ শতকের ফরাসি মুক্ত-বুদ্ধি-পথিকৃৎদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন জাঁ জ্যাক রুশো। দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ, সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক হিসাবে রুশো খ্যাতি অর্জন করেন। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে একদল বিশ্বকোষিক সংঘবদ্ধভাবে কুসংস্কার এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন। এঁদের মধ্যে ডিডেরট, ডি এ্যালেম্বার্ট, মন্টেস্‌ক্যু, ভলটেয়ার, হেলভেটিয়াস এবং হলবাকের সঙ্গে রুশোর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনাবলী ভাবগতভাবে ফরাসি বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

রুশো জন্ম গ্রহণ করেন সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র ঘড়ি নির্মাতা। ১৭৪২ সনে রুশো ৩০ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস গমন করেন। নিজের জীবনধারণের জন্য শৈশবকাল থেকে রুশো বিচিত্র জীবিকা অবলম্বন করেন। এভাবে তিনি জীবনে বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন। প্যারিসে আসার পরে দিজন একাডেমী ঘোষিত একটি রচনা প্রতিযোগিতার প্রতি রুশোর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় (১৭৪৯)। একাডেমী ঘোষিত প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্প কি মানুষের জীবনকে উন্নত করেছে, না তাকে অধিকতর কলুষময় করেছে? রুশো এই প্রতিযোগিতার জন্য একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। তাঁর এই প্রবন্ধ একাডেমী কর্তৃক সর্বোত্তম বিবেচিত হয় এবং তাঁকে প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর এই রচনাতেই রুশোর রাষ্ট্র এবং সমাজদর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। প্রচলিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধতা করে রুশো তার এই প্রবন্ধেই দেখাতে চেষ্টা করেন যে, তথাকথিত সভ্যতার পূর্ব-যুগেই মানুষ অধিকতর স্বাভাবিক এবং যথার্থ মানুষ ছিল। সভ্য মানুষের শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, তার অন্তরের পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহ, ভয়, হৃদয়হীনতা, আত্মম্ভরিতা, ঘৃণা এবং প্রতারণাকে আড়াল করে রাখার আচ্ছাদন বৈ আর কিছু নয়। রুশোর মতে ইতিহাসে সভ্যতা যত অগ্রসর হয়েছে মানুষের জীবন তত কৃত্রিম এবং জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার পূর্বেই মানুষ সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। রুশোর এই অভিমতের অধিকতর যুক্তিসহ সুবিস্তারিত প্রকাশ ঘটে তাঁর ১৭৬২ সনে প্রকাশিত গ্রন্থ 'দি সোস্যাল কনট্রাক্ট' বা 'সামাজিক চুক্তি'র মধ্যে। লক এবং হবস-এর ন্যায় রুশোও এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রের সংগঠনের পূর্বে মানুষ একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা অবস্থা সম্পর্কে হবস মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সর্বক্ষণ আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। কারণ মানুষ প্রধানত আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখান্বেষী এবং পরদ্বেষী। কিন্তু আত্মঘাতী সংঘর্ষের চরম অবস্থা মানুষের মনে এই চেতনার সৃষ্টি করেছিল যে, কোনো শাসক বা শক্তির কাছে নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকার সমর্পণ করে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং শাসকের বিধান মতো জীবন-যাপন না করলে ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ জীবন-যাপন সম্ভব নয়। এই চেতনা থেকে মানুষ একসঙ্গে চুক্তির মারফত শাসক সৃষ্টি করে নিয়মবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। রুশোও একথা স্বীকার করেন যে, মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থার রূপ এবং চুক্তির প্রকার সম্পর্কে রুশো হবস থেকে পৃথক মত পোষণ করেন। রুশোর মতে, মানুষের চরিত্র মূলত স্বার্থপর নয়। প্রাকৃতিক

অবস্থাতে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল জীবই ছিল। অপরের প্রতি সহানুভূতিবোধ করা মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার এই বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। লকের মতোই একদিকে যেমন রুশো প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের চরিত্রকে একেবারে আদর্শ হিসাবে কল্পনা করেন নি, তেমনি হবস-এর ন্যায় তিনি মানুষকে অধমও ভাবেন নি। রুশোর মতে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে চাইত। কিন্তু একটা পর্যায়ে সে দেখতে পেল যে, ব্যক্তির একার পক্ষে অপরের সঙ্গে সংযোগহীনভাবে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপদ জীবন-যাপন করা এবং নিজের অধিকারসমূহ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এই বোধ থেকে মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্র অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এ চুক্তি সে অপর কোনো শাসক বা অধিনায়কের সঙ্গে করে নি কিংবা চুক্তি মারফত কোনো নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র শাসককে সে তৈরি করে নি। ব্যক্তি চুক্তি করেছে ব্যক্তির সঙ্গে অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে। চুক্তির মূলকথা হচ্ছে, একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। এমনিভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের (নিজের সঙ্গে নিজের) চুক্তিতে সৃষ্ট হয়েছে এক সাধারণ ইচ্ছা বা সাধারণ শক্তি। এই সাধারণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের নিয়ামক। এ ইচ্ছা কোনো ব্যক্তিরই যথার্থ স্বার্থের বৈরী নয়। প্রত্যেকের ইচ্ছা দিয়ে এর সৃষ্টি বলে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই যেমন এই সাধারণ ইচ্ছাকে জবরদস্তি মনে করা চলে না—তেমনি এই সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তির যথার্থ স্বার্থের বিরোধী কোনো নিয়ম বা নিষেধ আকারেও প্রকাশিত হতে পারে না। রুশোর মতে, সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের একটা পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাকৃতিক জীবনে মানুষ যে স্বাধিকার ভোগ করত, সভ্যতার পর্যায়েও যৌথ-সম্মতির ভিত্তিতে মানুষ যেন নিরাপদভাবে সেই অধিকার ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। হবস এবং রুশোর চুক্তির মধ্যে একটা সাদৃশ্য এই যে, উভয় ক্ষেত্রে মানুষ তার চুক্তি-পূর্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে অপর এক শক্তির কাছে সমর্পণ করে দিচ্ছে। কিন্তু হবস-এর তত্ত্বে ব্যক্তি যেখানে একচ্ছত্র শাসকের নিকট শর্তহীনভাবে তার স্বাধীনতাকে ত্যাগ করেছে সেখানে রুশোর ব্যাখ্যায় ব্যক্তির আত্মসমর্পণ কোনো শাসকের কাছে নয় ; এ আত্মসমর্পণ পরস্পরের কাছে। এখানে শাসকের কাছে অধিকার ত্যাগ করে ব্যক্তি কি লাভ করবে? শান্তি? রুশোর মতে শৃঙ্খলিত বন্দিও তো বন্দিশালায় নিরাপদ শান্তি লাভ করতে পারে কিন্তু তাই বলে সে শান্তি কি মানুষের কাম্য হতে পারে? কাজেই সামাজিক চুক্তি ব্যক্তির অধিকার বিনষ্টির জন্য নয়, তা রক্ষার জন্য। রুশোর মতে, মানুষ পারস্পরিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এই চেতনা থেকে যে এককভাবে তার অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। এই চেতনা থেকে সকলে সকলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তার কোনো যথার্থ স্বার্থ থেকে বঞ্চিত হয় নি। কারণ চুক্তিবদ্ধ এক ব্যক্তি এমন কোনো অধিকার অপর ব্যক্তিকে অর্পণ করে দিচ্ছে না যার পরিবর্তে ঠিক সেই অধিকারই সে অপরের নিকট থেকেও লাভ করছে না।

দর্শনের ক্ষেত্রে রুশো ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরতা উভয়কেই স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আবার বস্তুকেও তিনি শাশ্বত বলেছেন। সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে রুশো

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন। সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও শ্রেণীবিন্যাসের উচ্ছেদ করে সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে নতুন যে বিপ্লবীচেতনা দেশের ধনিক শ্রেণী ও কৃষক সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের সে চিন্তাধারাকে রুশো সমর্থন করেছিলেন। সমাজের অসাম্য ও অবিচারের মূল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্বকে প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করলেও রুশো ব্যক্তির জন্য অল্প পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার মতও পোষণ করতেন। শিক্ষার প্রশ্নেও রুশো প্রগতিশীল অভিমত পোষণ করতেন। তাঁর মতে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে এমন এক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে যে শিক্ষা সকল নাগরিককে শ্রমের মার্যাদায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

রুশোর বিপ্লবী চিন্তায় ফরাসি সরকার এবং সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল-শক্তিসমূহ রুষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় নিগ্রহের আশঙ্কায় তিনি এক সময় ফ্রান্স পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বার্ন প্রজাতন্ত্র তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করায় তিনি ইংরেজ দার্শনিক হিউমের আমন্ত্রণে ইংল্যাণ্ড গমন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হিউমের সঙ্গে তার মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় এবং তিনি ফ্রান্সেই প্রত্যাবর্তন করেন।

রুশোর রচনাবলীর মধ্যে 'দি সোস্যাল কণ্ট্রাক্ট' বা 'সামাজিক চুক্তি' ব্যতীত তাঁর 'কনফেশনস' বা আত্মচরিত এবং ডিডেরটের সম্পাদনায় প্রকাশিত ফরাসি বিশ্বকোষে প্রকাশিত 'ডিসকোর্স অন পলিটিক্যাল ইকনমি' এবং 'এমিলি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Roy, M.N. : মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রি.)

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই মানবেন্দ্রনাথ রায় সেকালের স্বাধীন সংগ্রামী গোপন রাজনৈতিক বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। বহু রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম.এন. রায় হিসাবে সমধিক পরিচিত) বহুবার বিভিন্ন সরকার দ্বারা গ্রেপ্তার হন, কারাবন্দি হন এবং কোনো কোনো বন্দিদশা থেকে পলায়ন করে ছদ্মনামে পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লবের পরে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হন। কিন্তু কালক্রমে কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিকের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে এম.এন. রায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। ইংরেজি ভাষায় প্রাঞ্জল রাজনৈতিক রচনাকার এম.এন. রায় তার নিজস্ব অভিমত ব্যাখ্যা ও প্রচার করার জন্য একাধিক ইংরেজি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন', 'নিউ হিউম্যানিজম', 'রিজন, রোমান্টিসিজম এ্যাণ্ড রিভোল্যুশন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এম.এন. রায় প্রচলিত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট মতবাদ থেকে ভিন্নভাবে তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তার চিন্তাধারা 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' নামে পরিচিত।

Russell, Bertrand : বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)

বার্ট্রাণ্ড রাসেল ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ দার্শনিক এবং যুদ্ধবিরোধী শান্তি-আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। রাসেলের জীবন যেমন দীর্ঘ, তেমনি বিচিত্র। তাঁর চরিত্রের

একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, জীবনের কোনো নীতিকেই তিনি বিনা প্রশ্নে স্বীকার করেন নি এবং কোনো নীতিতে অবিচলও থাকেন নি। তাঁর প্রাঞ্জল রচনারীতি তাঁকে বিপুলসংখ্যক পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করে তুলে। চিন্তায় এবং রচনায় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকবছর পূর্বে প্রকাশিত আত্মজীবনীর কয়েকটি খণ্ড তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্কোচ সত্যকথনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আত্মজীবনী ব্যতীত তাঁর প্রচুরসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে গণিত দর্শনের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ এবং 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। রাসেল হোয়াইটহেডের সঙ্গে যুক্তভাবে গণিত দর্শনের উপর গবেষণা করেন। আঙ্কিক ন্যায়-শাস্ত্রকে তিনি বিশেষভাবে উন্নত করেছেন। 'লজিক্যাল সিমবলস' বা ন্যায়ের প্রতীককে তিনি ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে রাসেলের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, তিনি দর্শনকে কাল্পনিক সমস্যার ততোধিক কাল্পনিক সমাধানের আকর না করে দর্শনকে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকারীতে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, দর্শন বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল থেকে সমস্যাকে আহরণ করবে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তত্ত্বকে সামগ্রিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করাই হবে দর্শনের প্রধান কর্তব্য। দর্শন মানুষকে আকাশচারী কল্পনাবিলাসী নয়, দর্শন মানুষকে বৈজ্ঞানিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজতাত্ত্বিকে পরিণত করবে। দর্শনের অপর কাজ হবে, মানুষের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তাকে ভাব প্রকাশের সঠিক বাহনে পরিণত করার চেষ্টা করা। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে রাসেলকে সন্দেহবাদী বলা চলে। সাধারণ জীবনে তিনি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু প্রায় শতাব্দীকালের দীর্ঘ জীবনে তিনি দুটি মহাযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। যে মানবিক আদর্শের তিনি কল্পনা করেছেন ভিয়েতনামের নিরীহ নির্বিবাদী মানুষের উপর অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বর নিধনযজ্ঞে তা ভস্মীভূত হতে দেখেছেন। এত দীর্ঘজীবনে ঘটনার উত্থানপতনে ব্যক্তির পক্ষে হতাশ হয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাসেলের জীবনের বিস্ময়কর দিক এই যে, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হতাশাগ্রস্ত না হয়ে এই ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধের সংগামী সৈনিকে পরিণত হন। তাঁর এই সংগ্রামী মনোভাবের কথা প্রকাশ করে ৯০ বছর বয়সে রাসেল লিখেছিলেন "সাধারণভাবে যে রকম আশা করা হয়, তার ব্যতিক্রম করে আমি ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছি। অথচ আমি বিদ্রোহী হয়ে জন্মগ্রহণ করি নি। ১৯১৪ সন পর্যন্ত আমি কমবেশি দুনিয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলেছি। তখনও অমঙ্গলজনক অবস্থা ছিল। কিন্তু তা হ্রাস পাবে বলে মনে করার যৌক্তিকতা তখনো ছিল। বিদ্রোহীর মন-মেজাজ না থাকা সত্ত্বেও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধৈর্য বজায় রেখে ঘটনার সাথে তাল রেখে চলতে পারলাম না। সংখ্যায় সামান্য হলেও এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটছে যাদের সাথে আমার মতের মিল আছে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাদের সাথে কাজ করে যাবো।"

Saankhya : সাংখ্য

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম ছিল সাংখ্য। পৌরাণিক কাহিনীতে কপিল মুনিকে সাংখ্য শাখার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সত্তার ধারণায় সাংখ্য ছিল দ্বৈতবাদী। পুরুষ এবং প্রকৃতি : উভয়ই মৌলশক্তি। পুরুষ হচ্ছে চেতনা, প্রকৃতি হচ্ছে বস্তু, প্রকৃতি জগৎ। সাংখ্য মতে পুরুষ দ্বারা ঈশ্বর বা স্রষ্টাকে বুঝায় না। পুরুষ হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত বা আবদ্ধ নিত্যকালের চেতনা। ব্যক্তি প্রকৃতির অংশ। ব্যক্তির পরিবর্তন আছে, কিন্তু পুরুষের কোনো পরিবর্তন নেই। প্রকৃতি নিয়ত কার্যকারণের বিধান দ্বারা পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির পরিবর্তনের মূলে আছে সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ এই তিনগুণের সমন্বয়। সত্ত্ব হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণ। স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা হচ্ছে এর বৈশেষ্ট্য। তমঃ হচ্ছে জাড্য বা জড়তা। এবং রজঃ হচ্ছে সক্রিয়তা। বিশ্ব জগৎ এই তিন গুণের সমাহারের সৃষ্টি। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগে বিশ্ব জগতের বিবর্তনের শুরু। ব্যক্তির বিবর্তনও এই দুই মৌল শক্তির সংযোগের ফল। দেহের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি এবং অহং এর স্থিতি। পুরুষের নির্দেশে দেহের ক্রিয়াশীলতা। দেহের বিবর্তনের লক্ষ্য হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে এমন বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করা যে-অবস্থায় দেহের বন্ধন থেকে পুরুষ নিত্যকালের মুক্তিলাভে সক্ষম হবে।

Santayana, George : জর্জ সান্তায়ানা (১৮৩৬-১৯৫২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং লেখক ছিলেন জর্জ সান্তায়ানা। কিন্তু জর্জ সান্তায়ানার জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ সালে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে এবং তিনি মারা যান ইতালির রোম শহরে ১৯৫২ সালে। তাঁর দর্শনকে ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম বা বৈচারিক বাস্তববাদ বলা হয়। জর্জ সান্তায়ানার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'লাইফ অব রিজন' বা যুক্তির জীবন। তাঁর 'যুক্তির জীবন'কে তিনি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করেন। খণ্ডগুলির নাম এরূপ : ১. সাধারণ বোধ যুক্তি ; ২. সমাজ জীবনে যুক্তি ; ৩. ধর্মে যুক্তি ; ৪. আর্ট বা শিল্প কর্মে যুক্তি ; এবং ৫. বিজ্ঞানে যুক্তি।

Sartre, Jean Paul : জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০ খ্রি.)

জাঁ পল সার্ত্রে ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সার্ত্রে ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফ্যাসিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে সার্ত্রে ছিলেন সোচ্চার

এবং সংগ্রামী। সার্ত্রের দর্শনে অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা কিয়ার্কেগার্ড এবং মনঃসমীক্ষণের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রয়েডের চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সার্ত্রের দর্শনের মূল কথা হচ্ছে : সত্তার মূল হচ্ছে মানুষ নিজে। জগতের মধ্যে যুক্তি নেই। মানুষ কোনো বিধি বিধানের দাস নয়। মানুষ নিজের সত্তাকে নিজে তৈরি করে।

Scepticism : সংশয়বাদ

সংশয়বাদ হচ্ছে একটি দার্শনিক তত্ত্ব। বিশেষ করে জ্ঞানের প্রশ্নে প্রাচীন গ্রিসে এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। বিষয়ী বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—এই হচ্ছে সংশয়বাদের মূল কথা। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিক সমাজ যখন সামাজিক অস্থিরতায় সংকটগ্রস্ত তখন প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে সংশয় এবং অস্বীকারমূলক একটা মনোভাব জন্মলাভ করে। প্রাচীন সংশয়বাদের শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে পিরহো, আরসেসিলাস, কারনিয়াডিস, ইনিসিডেমাস, সেক্সটাস এমপিরিকাস এবং অপরাপর দার্শনিকের মধ্যে। সফিস্টরা যেমন প্রচলিত বিধি বিধান সম্পর্কে জনসাধারণের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করছিল তেমনি সংশয়বাদীগণ বলতে শুরু করে : জ্ঞানের প্রচলিত ধারণারই বা নিশ্চয়তা কি? জগৎ সম্পর্কে, বস্তু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আছে বলে পণ্ডিতগণ যে দাবি করেন তার কোনো ভিত্তি নেই। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কোনো জ্ঞান আছে বলে প্রমাণ করা যায় না। ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের সুস্থতা, অসুস্থতা, ব্যক্তির অভাব অভিযোগ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, প্রচলিত বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আচার-আচরণ দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান প্রভাবান্বিত হয়। অথচ জ্ঞান বলতে পণ্ডিতগণ এমন কিছুকে বুঝাতে চান যা ব্যক্তির মন বা পরিপার্শ্ব, তার অবস্থা বা ইতিহাস কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ব্যক্তি এবং অবস্থা-নিরপেক্ষ জ্ঞান যখন সম্ভব নয় তখন বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। প্রাচীন সংশয়বাদীগণ বলতেন যে, জ্ঞানে অতৃপ্তি এবং অসন্তোষের বৃদ্ধি। তাই মনের শান্তির জন্য শ্রেয় হচ্ছে কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তমূলক অভিমত আদৌ গ্রহণ না করা। সংশয়বাদ মধ্যযুগেও গোঁড়া ধর্মীয় এবং দার্শনিক অভিমতসমূহের প্রভাব হ্রাসে বিশেষ সাহায্য করেছে। মধ্যযুগে প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংশয়বাদী চিন্তা বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশকে সহজতর করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিউম এবং কান্ট সংশয়বাদের যে তত্ত্ব প্রচার করেন তাতে জ্ঞান কেবলমাত্র সত্তার বাহ্য প্রকাশে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কান্টের দর্শনে সত্তার যথার্থ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বোধ বা ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমেই মাত্র লাভ করা চলে।

Scholasticism : স্কলাসটিসিজম, সাম্প্রদায়িক বিদ্যাভিমান, ধর্মীয় দর্শন

ইউরোপের দর্শনের বিকাশে 'স্কলাসটিসিজম' শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। ইউরোপীয় দেশসমূহে মধ্যযুগে যখন খ্রিষ্টধর্মের যাজকতন্ত্রের প্রভাব সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবলভাবে চলছে তখন শিক্ষায়তনগুলি ছিল গোঁড়া যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সমস্ত স্কুলে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদের প্রধান কর্তব্য হয় ধর্মের বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকে

যুক্তির সাহায্যে সত্য বা সঠিক বলে প্রমাণ করা। এই ধারায় 'স্কলাসটিক' সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই সকল স্কলাসটিক বা পণ্ডিতগণ যে ধর্ম-যাজক ছিল, তা নয়। কিন্তু এরা ধর্মকে দর্শনের মারফত রক্ষা করাকে নিজেদের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ধর্মরক্ষাকারী এই পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রিসের বিশেষ করে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে খ্রিষ্টধর্মের একটা যুক্তিগত ভিত্তি তৈরি করার চেষ্টা করে। এই ধর্মীয় দর্শনের প্রথমদিকে যে দার্শনিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয় তার মধ্যে সাধারণ বা সার্বিকভাবের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই—প্রশ্নটির উল্লেখ করা যায়। খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সমন্বয় সাধন করার প্রধান চেষ্টা করেন টমাস একুয়াইনাস। টমাস একুয়াইনাস পরবর্তীকালে সেইন্ট বা স্বর্গীয় পুরুষ বলে ঘোষিত হন এবং রোমান ক্যাথলিক অর্থাৎ গোঁড়া যাজকতন্ত্রের দর্শনের মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত হন। মধ্যযুগের ধর্মীয় দার্শনিকদের মধ্যে টমাস একুয়াইনাস ব্যতীত এরিজোনা, আনসেলম, আবেলার্দ এবং অকামের উইলিয়ামের নাম উল্লেখযোগ্য। নবম শতাব্দীতে এরিজেনা নব প্লেটোবাদের ব্যাখ্য করেন ; আনসেলম সত্তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন ; দ্বাদশ শতকে আবেলার্দ সাধারণ বা সার্বিক ভাবের অস্তিত্বগত প্রশ্নের একটা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং চতুর্দশ শতকে অকামের উইলিয়াম বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসের ব্যাপার, যুক্তি দ্বারা প্রমাণের বিষয় নয়।

Schopenhauer, Arthur : আর্থার শপেনহার (১৭৮৮-১৮৬০ খ্রি.)

শপেনহার ছিলেন উনবিংশ শতকের জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর দর্শনের মূলে ছিল বাস্তব সমাজ এবং জগৎ সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং হতাশা। ১৮৪৮ সালের জার্মানি শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানে পূর্ণ ছিল। শোষিত জনসাধারণের এই বিপ্লবী চেতনা এবং চেতনার সংঘটিত প্রকাশে পুঁজিপতিশ্রেণী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রতিক্রিয়ার পথ অবলম্বন করে। এই পর্যায়ে শপেনহার তাঁর দর্শনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। শপেনহার তৎকালীন জার্মানির প্রতিক্রিয়ার মুখপাত্র হিসাবে বিবেচিত হন। পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রবেশ করে, শপেনহারের ভূমিকা তখন অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। শপেনহার বস্তুবাদের বিরোধিতা করেন। কান্টের দৃশ্যমানতার তত্ত্বকে গ্রহণ করে কান্টের দৃশ্যাতিরিক্ত স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সব কিছুর মূলে এক অন্ধ ইচ্ছাশক্তির কল্পনা করেন। এই অন্ধ ইচ্ছাশক্তি কোনো যুক্তির অধীন নয়। অন্ধ ইচ্ছাশক্তি সবকিছুর পরিচালক। কাজেই এই তত্ত্বে প্রকৃতির বিধানের কোনো স্থান নেই এবং কোনো কিছুকে বৈজ্ঞানিকভাবে জ্ঞাত হওয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। শপেনহার ইতিহাসের গতিকে স্বীকার করতেন না। অতীত যদি দুঃখময় হয়ে থাকে, ভবিষ্যতে মহৎ বা সুখময় কিছু আশা করার যুক্তি নেই। ব্যক্তির পক্ষে কামনা-বাসনার কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তির একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত কামনা-বাসনা বিমুক্ত নির্বাণ লাভ। এই নির্বাণের তত্ত্ব শপেনহার বৌদ্ধদর্শনের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। শপেনহারের এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদ এবং হতাশাবাদী জীবনবাদ নিৎসের দর্শনের আদর্শগত পটভূমি রচনা করে দিয়েছিল।

Seal, Brojendar Nath : ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮ খ্রি.)

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত এবং দার্শনিক। ছাত্রাবস্থাতেই ব্রজেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং জ্ঞানের গভীরতার কথা গল্পের আকারে শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৮৪ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীকালে তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ রোমে প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের দায়িত্ব পালন করেন। এক সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক হিসাবেও নিযুক্ত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোনো রচনাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখবেন না—এই কঠিন নীতি অনুসরণ করে চলতেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথের রচনার সংখ্যা খুবই অল্প। কোনো রচনাই তিনি লেখামাত্র প্রকাশ করতে দিতেন না। এজন্য অনেক পাণ্ডুলিপি পরিণামে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এরূপ ক্ষতির উল্লেখ করে ব্রজেন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন : "আমার নিজের চিন্তাধারার এবং অভিমতের বেশ কিছু নোটের পাণ্ডুলিপি আমি অনেকদিন রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু কোনো এক সময়ে আমার তত্ত্বাবধায়কগণ তাঁদের গ্রন্থাগারের মুদ্রিত পুস্তকগুলি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিগুলি উঁই পোকাকে আকর্ষণ করতে পারে এই আশঙ্কায় বিনষ্ট করে ফেলেন।" রচনার সংখ্যা অল্প বলেই হয়তো ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন মৌলিক চিন্তার পণ্ডিত এবং দার্শনিক বর্তমানকালে তেমন আলোচিত কিংবা স্মৃত হন না। তাঁর রচনাসমূহ আজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রচনাবলীর মধ্যে 'নিউ এসেজ ইন ক্রিটিসিজম' (১৯০০), 'ফিজিক্যাল সাইন্সেস অব দি হিন্দুজ' (১৯০৫), এবং 'পজিটিভ সাইন্সেস অব দি এ্যানসিয়েন্ট হিন্দুজ' (১৯১৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Secularism : ইহজাগতিকতা

আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে Secularismকে ধর্মহীন, ধর্মশূন্য ইত্যাদি বলে চিন্তা করার ধারণাটাই প্রবল। আসলে কথাটির উদ্ভব এবং আলোচনার ক্ষেত্র ছিল ইউরোপের মধ্যযুগ।

একদিকে খ্রিষ্টধর্ম তথা পোপের আধিপত্য, অপরদিকে, জাগতিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জাগতিক শাসনের উপর জোর দেওয়াটাই ছিল 'সেকুলার' শব্দের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রতিক সময় ধর্মীয় দাঙ্গা, হাঙ্গামা, গণহত্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে কাউকে 'সেকুলারিস্ট' বলে তাকে অধার্মিক, এমনকি নাস্তিক বলে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল ও বৈরী মনোভাব তৈরির প্রবণতার প্রকাশ দেখা যায়।

কোনো আবেগের বশবর্তী না হয়ে সেক্যুলারিস্ট ইংরেজি শব্দের বাংলা হিসাবে 'ইহজাগতিকতা' ব্যবহার করা সঙ্গত। অনেকে এক্ষেত্রে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' শব্দকে ব্যবহার করতে চান। 'ধর্মনিরপেক্ষ'তা শব্দটিকে নিরীহ বলে বোধ হলেও তারও শেষ অর্থ দাঁড়ায় ধর্মে ধর্মে নিরপেক্ষতা তথা কোনো বিশেষ শাসক বা শক্তির বিভিন্ন ধর্মীয় মতামত বা বিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ পক্ষ অবলম্বন না করার কথা প্রচার করা। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা অর্থহীন। বাস্তব সমাজ জীবনে নিরপেক্ষতার কোনো অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না।

ইউরোপে ম্যাকিয়াভেলীর (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.) পর থেকে রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ, তথা হবস্, লক, রুশো এবং পরবর্তীতে মার্কসবাদ সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব, প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে।

সমাজ, জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রের সবকিছুর ঊর্ধ্বে কোনো অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস থাকতে পারে। এরূপ বিশ্বাস বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। এ জন্যই যুক্তিগতভাবে এরূপ কথা প্রচলিত আছে : যার ধর্ম, তার ধর্ম, 'কিংবা তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার'।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, কোনো ধর্মেরই কোনো রাষ্ট্রগত ভূমিকা থাকতে পারে না কিংবা থাকা সঙ্গত নয়। রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন নাগরিকদের যৌথভাবে গৃহীত নীতি ও পদ্ধতির বিষয়। মূলকথা : রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মের ভালো-মন্দ বলে কোনো নির্ধারক ভূমিকা নির্দিষ্ট করা সঙ্গত নয়।

Seneca, Lucius Annaeus : সেনেকা (খ্রি. পূ. ৪-৬৫ খ্রি.)

রোমের স্টয়েসিজম বা নিস্পৃহ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সেনেকা। সেনেকা সম্রাট নেরোর শিক্ষক ছিলেন। আবার পরিণামে নেরোই সেনেকাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেনেকা বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে নীতিশাস্ত্রের উপর রচিত 'এপিসটলী মরালীস এ্যাণ্ড লুসিলিয়াম' নামক গ্রন্থ অবিকৃত আকারে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেনেকো সম্রাট নেরোর শিক্ষক এবং উপদেষ্টা হিসাবে তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। এই ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতায় তিনি একদিকে একচ্ছত্র সম্রাটের স্বেচ্ছাচার, অপরদিকে সাধারণ মানুষের নৈতিক অবনতি দেখে রাষ্ট্র এবং সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় হতাশা বোধ করেন। এই হতাশা থেকে সেনেকা রাষ্ট্র বা সমাজের বিশেষ রূপের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিষয়ে নিস্পৃহ মনোভাব অবলম্বন করেন। সেনেকা ব্যক্তির জন্য নিজের সততার এবং নিস্পৃহতার চর্চা ব্যতীত শান্তির অপর কোনো পথ দেখতে পান নি। সেনেকা তাঁর নিজের দার্শনিক দৃষ্টিকে বিশেষ রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর মানব সমাজের উপর বিস্তার করেন। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রসীমাতেই বিশ্ব যেমন আবদ্ধ নয়, তেমনি কোনো বিশেষ সমাজেই ব্যক্তি বন্দি নয়। ব্যক্তি বৃহত্তর মানব সমাজের অঙ্গীভূত। বিশ্বব্যাপী এক সত্তা এবং প্রজ্ঞা বিরাজমান। বিশেষ রাষ্ট্র বা তার শাসকের স্বেচ্ছাচারিতা সেই বিশ্বপ্রজ্ঞাকে যেমন বিনষ্ট করতে পারে না, তেমনি সম্রাটের অত্যাচার কিংবা নির্বোধ জনতার অনাচারও বিশ্ব-মানবতার হানি ঘটাতে পারে না। রাষ্ট্রের উন্নতি কিংবা মানুষের মুক্তি উভয়ই নির্ভর করে মানুষের দৃষ্টিকে ক্ষুদ্র সীমার বাইরে বৃহত্তর এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করার মধ্যে। সেনেকার মধ্যে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

Sensation : বেদন, সংবেদন

বস্তুজগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের স্পর্শে ব্যক্তির মধ্যে যে চেতনা বা বোধের উদ্রেক হয় তাকে বেদন বা সংবেদন বলে। যে-কোনো বস্তুকণাকে আমরা উদ্দীপক বলতে পারি। কোনো উদ্দীপক যখন সজীব মানুষের দেহের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তখন স্নায়ুর অন্তগামী তন্ত্রী

উত্তেজনাকে মস্তিষ্কের চেতনাকেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যায়। মস্তিষ্কের চেতনাকেন্দ্রে পৌঁছে উত্তেজনাটি বিশেষ বোধ বা অনুভূতির সৃষ্টি করে। বেদনের মূল তাই উদ্দীপক। উদ্দীপক বাদে বেদনের উদ্ভব ঘটে না। উত্তেজনা বা সংবেদনকে দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

Separation of powers : ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ

রাষ্ট্রযন্ত্রের সমগ্র ক্ষমতাকে আইন, শাসন এবং বিচার প্রধানত এই তিন ভাগে বিভক্ত করাকে ক্ষমতার পৃথককরণ বা বিভাগকরণ বলা হয়। সামন্তবাদ এবং রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে বিকাশমান ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে হ্রাসকরণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের এই ত্রিবিভাগীয় ক্ষমতাকে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রকরণের আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লকের রচনায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার বিস্তারিত আলোচনা সর্বপ্রথম দেখা যায়। পরবর্তীকালে মন্টেস্‌ক্যু এই তত্ত্বকে আরো সুনির্দিষ্ট করেন। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের আন্দোলনে অভিজাত শ্রেণীও রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীকে কিছুটা সমর্থন যুগিয়েছিল। স্বতন্ত্রীকরণ আন্দোলনের প্রধান জোর ছিল ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভায় মূল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতাকে সীমিত করার উপর। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হলেও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ আসলে শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংঘাত হ্রাসের প্রচেষ্টা মাত্র : ক্ষমতার এই বিভাগ বৃহত্তর শ্রমজীবী জনতার স্বার্থরক্ষা কিংবা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে না।

Sheikh Mujibur Rahman : শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু (১৯২০-১৯৭৫ : ১৫ই আগস্ট) ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানকে দেশব্যাপী আন্দোলন এবং তার নেতৃত্বে পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী এবং গণহত্যাকারী লক্ষাধিক পশ্চিম পাকিস্তানীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বন্দী দশাতেও বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ এবং ব্যাপকভাবে জনগণ ও তরুণ এবং বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানপন্থী সশস্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদের আকস্মিক সশস্ত্র আক্রমণে ১৫ই আগস্ট রাতে স্ত্রী, শিশুপুত্র এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনসহ নির্মমভাবে নিহত হন।

Shintoism : শিন্টোবাদ

প্রাচীন জাপানের ধর্মের নাম ছিল শিন্টো। জাপানের ইতিহাসের বিবর্তনে শিন্টোবাদেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের ফলে শিন্টো ধর্মে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটে। বস্তুত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পার্থক্য বুঝাবার জন্য অষ্টাদশ শতকে জাপানের প্রাচীন ধর্মকে শিন্টো বলে অভিহিত করা হয়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শিন্টোকে

রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। শিন্টো ধর্মে প্রাচীনকালে পশু, প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু এবং পূর্ব পুরুষের আত্মাকে পূজা করা হতো। এ পূজাকে বলা হতো কামী পূজা। কামী বা দেবতারা বস্তু জগতের এই সমস্ত দ্রব্যাদির মাধ্যমে জগতে আবির্ভূত হতো। জাপানের সম্রাট বা মিকাডো নিজেও একজন দেবতা। তিনি সমস্ত জাপানবাসীর পূর্বপুরুষ। মিকাডো সূর্যদেব আমাতেরাসুর বংশধর। মিকাডোর মাধ্যমেই ইহজগতের মানুষ দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকেই শিন্টোবাদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পরে সম্রাটও আর দেবতা বলে গণ্য হন না।

Simon, Saint : সেইন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫ খ্রি.)

ক্লড হেনরী দ্যা রুভ্‌রয় সেইন্ট সাইমন ছিলেন ফরাসি দেশের একজন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী। সেইন্ট সাইমনের জীবন ছিল বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ। অভিজাত বংশের সন্তান সেইন্ট সাইমন ফরাসি বিপ্লবের সময়ে উগ্রপন্থী জ্যাকোবিনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেন। দার্শনিক চিন্তায় সেইন্ট সাইমন ভাববাদ এবং ঈশ্বরবাদের বিরোধিতা করে বস্তুবাদ এবং প্রকৃতিবাদের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। মানুষের ইতিহাসকে তিনি সুনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা পরিচালিত বলে মনে করতেন। ইতিহাসকে তিনি কেবল অতীতের বিষয় বলে মনে করতেন না। বিজ্ঞান যেমন মানুষের জীবনকে নানা জ্ঞানে ও সম্পদে সমৃদ্ধ করে, জীবনের ক্ষেত্রে ইতিহাসেরও তেমনি অবদান আছে। ইতিহাসের গতি সম্মুখের দিকে। একটি সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নতর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের মূলে থাকে মানুষের নীতি, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের উন্নতি। সেইন্ট সাইমন মনে করতেন মানুষের সমাজ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে : ধর্মীয় পর্যায়। দাস এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত কল্প-দার্শনিক। সামন্তবাদ এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার পতন এই যুগের বৈশিষ্ট্য। মানুষের সমাজে তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এই পর্যায়ের নিয়ন্ত্রক শক্তি। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের সমাজ এই শেষ পর্যায়ে বিকাশ লাভ করবে। সেইন্ট সাইমন সমাজের বিকাশকে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য বলে বিবেচনা করতেন এবং এই বিকাশে সম্পদ ও শ্রেণীর যে বিশেষ ভূমিকা আছে তাও তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সেইন্ট সাইমন সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেছিলেন যে, সমাজের প্রতিটি স্তর তার পূর্ববর্তী স্তরের মধ্যে জন্মলাভ করে। বৃহদাকারের শিল্প তখনো বিকাশ লাভ করে নি। কিন্তু সেইন্ট সাইমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, ভবিষ্যতের সমাজ হবে বৃহদাকারের শিল্পভিত্তিক। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমাজের শ্রেণীবিভাগকে তিনি অপরিবর্তনীয় মনে করতেন। সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সমন্বয়বাদী। তাঁর ধারণা ছিল ভবিষ্যৎ সমাজ বিকশিত হবে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে, সমাজের সকল মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে। শিল্পপতি, শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কপতি এরা সবাই যে সমাজের জন্য কেবল অপরিহার্য, তাই নয়। সেইন্ট সাইমনের মতে এদের স্বার্থের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতা নেই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ অগ্রসর হবে। এক কথায় বৃহদাকার শিল্প ভিত্তিক সমাজকে তিনি আদর্শ

সমাজ বলে মনে করতেন। এই সমাজের পরিকল্পনা হবে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য। মানুষ মাত্রেরই তার ক্ষমতানুযায়ী সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসাবে কাজ করার অধিকার থাকবে। ভবিষ্যৎ সমাজের কল্পনায় সেইন্ট সাইমনের একটি বিশিষ্ট মত ছিল যে, ভবিষ্যৎ সমাজের চরিত্র হবে শাসনমূলকের পরিবর্তে উৎপাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। সেইন্ট সাইমন মহৎ হৃদয় কল্পনাপ্রবণ দার্শনিক ছিলেন। সমাজের মধ্যে সংঘাতকে তিনি স্বীকার করেন নি। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমিকের উপর অনুষ্ঠিত শোষণের মধ্যকার অসঙ্গতি যে মালিক ও শ্রমিকের মধ্য বিরোধের সৃষ্টি করে এবং এই বিরোধাত্মক সম্পর্ক যে-কোনো শ্রেণীর কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, এ সত্য সেইন্ট সাইমন স্বীকার করতে চান নি। তাঁর ধারণা ছিল বিজ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞানের প্রসারেই সমাজের সব অসঙ্গতি দূরীভূত হবে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সঙ্গতিপূর্ণ প্রগতিশীল এক সমাজ আপনি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

Slave Owning System : দাস ব্যবস্থা

দাস ব্যবস্থা—অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক মানুষ দাস এবং অল্পসংখ্যক মানুষ দাসের মালিক বা প্রভু। দাস ব্যবস্থা মানুষের সমাজের ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দাস ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। পৃথিবীর সব দেশেই এক যুগে দাস ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। দাস ব্যবস্থার চরম বিকাশ দেখা যায় প্রাচীন গ্রিস এবং রোম সাম্রাজ্যে। গ্রিস এবং রোমে দাসরাই ছিল প্রধান উৎপাদনী শক্তি। দাসের প্রভুরা ছিল শাসক শ্রেণী। শাসক শ্রেণীর মধ্যে দাসদের মালিক ব্যতীত জমির মালিক, তখনকার যন্ত্রাদি তৈরির কারখানার মালিক, অর্থ-ঋণদাতা সুদগ্রহণকারী মহাজন এবং বাণিজ্যের সওদাগরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে ছিল কৃষক, হস্তশিল্পী, ভবঘুরে সর্বহারা এবং দুঃস্থ কারিগর। উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনী দাসদের উপর ব্যক্তিগত মলিকানা ছিল দাস ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের মূল ভিত্তি। মালিকশ্রেণী দাসদের পশুবৎ বিবেচনা করত। প্রভু শ্রেণীর দার্শনিক এ্যারিস্টটল দাস প্রথাকে রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর মতে দাস হচ্ছে প্রভুর সজীব যন্ত্র। অজীব যন্ত্রের সঙ্গে দাসের পার্থক্য এখানে যে, অজীব যন্ত্র প্রভুর আদেশ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না ; কিন্তু সজীব দাস প্রভুর আদেশ এবং ইচ্ছা ইশারামাত্র বুঝতে পারে এবং তা কার্যকর করতে পারে। কিন্তু দাস কখনো শাসক হতে পারে না। দাসের কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর জন্য শ্রম করা। এবং প্রভুর কাজ হচ্ছে দাসের শ্রমের ফলে জীবিকার চিন্তামুক্ত যে অবকাশ সে লাভ করছে সে অবকাশকে শাসনকার্যে ব্যয়িত করা। দাসকে পশুর ন্যায় খাটাবার ফলে দাসদের উৎপাদনে আগ্রহ এবং শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। তথাপি দাসের সংখ্যা বিপুল হওয়াতে দাসের পরিশ্রমের ভিত্তিতে গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে এবং রোমে দর্শন, প্রাচীন বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি শাখায় সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। দাস এবং প্রভুতে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর্যায়ে রাষ্ট্রযন্ত্রেরও উদ্ভব ঘটে। শোষিত দাস সর্বদা যে নীরবে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিয়েছিল একথা সত্য নয়। বরঞ্চ দাস সমাজের সমগ্র ইতিহাসই

শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। গ্রিসে এবং রোমে বিভিন্ন সময়ে দাসদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। রোমের দাস স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে খ্রি. পূ. ৭৩ সালে যে বিদ্রোহ ঘটে তা ব্যাপকতায় এবং দাসদের বীরত্বে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। দাসদের বিদ্রোহের সঙ্গে কৃষকদের সহানুভূতি এবং সাহায্যও যুক্ত থাকত। দাসের শোষণের ভিত্তিতে সভ্যতার বিকাশ যখন আর সম্ভব হচ্ছিল না তখন দাস ব্যবস্থায় ভাঙ্গন শুরু হয় এবং কৃষিকাজের যন্ত্রপাতির উন্নতি দাস ব্যবস্থাকে সমাজে অগ্রগতির প্রতিবন্ধক শক্তিতে পরিণত করে। পরিণামে দাস ব্যবস্থার স্থানে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। তবে দাস ব্যবস্থার বিলোপ দাস সমাজ ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে নি। সামন্তবাদী সমাজে দাস ব্যবস্থার রেশ দীর্ঘকাল যাবৎ টিকে ছিল। এখনো যে সমস্ত দেশে সামন্তবাদী অর্থনীতি টিকে আছে সেখনে দাস ব্যবস্থার পরিচয়মূলক প্রথার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

Social Contract, Theory of : সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বিধিবিধানের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি তত্ত্বের নাম হচ্ছে সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বিকাশমান পুঁজিপতি শ্রেণী যখন রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করে শাসন ক্ষমতায় নিজেদের অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করে তখন হবস, গ্যাসেন্দী, স্পিনোজা, লক এবং রুশোর রচনাবলীতে এই তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা দেখা যায়। রাজতন্ত্র এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে যুগের অগ্রসর বুর্জোয়া শ্রেণী সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে একটি আদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রশ্নে রাষ্ট্রের উদ্ভবপূর্ব অবস্থার দুটি চিত্র অঙ্কন করেন। কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ পরস্পর আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এই দ্বন্দ্বের ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে এই দ্বন্দ্ব বন্ধ না করলে সমাজের কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বেঁচে থাকা এবং কোনো অধিকার ভোগ করা সম্ভব হবে না। এই উপলব্ধি থেকে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে শাসক এবং রাষ্টযন্ত্র তৈরি করে। এই ব্যাখ্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হবস-এর 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে। আবার রুশো মনে করেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ ছিল চরমরূপে স্বাধীন এবং সুখী। কিন্তু এরূপ স্বাধীন ব্যবস্থাও ব্যক্তির জন্য নিরাপদ নয়। কেননা এক স্বাধীন ব্যক্তি অপর স্বাধীন ব্যক্তির উপর, তার ধন সম্পদের উপর আক্রমণ করতে পারে। এজন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। সামাজিক চুক্তির এই তত্ত্ব বুর্জোয়া বিকাশের যুগের তত্ত্ব হলেও এর আভাস প্রাচীনকালে গ্রিসের সফিস্টদের বক্তব্য এবং চীনের প্রাচীন দার্শনিক মোজুর দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়।

Socialism : সমাজতন্ত্র

কল-কারখানা ও জমি হচ্ছে রাষ্ট্রের উৎপাদনের উপায়। উৎপাদনের উপায়ের সমষ্টিগত মালিকানার ভিত্তিতে যে আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সমাজতন্ত্র বলে। উৎপাদনের

ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মাত্র সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক মালিকানা দুটি রূপ গ্রহণ করতে পারে : রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং সমবায়মূলক ও যৌথ মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণীশোষণের অবস্থান থাকতে পারে না। উৎপাদনের এবং রাষ্ট্রীয় শাসনে নিযুক্ত শ্রমজীবী জনতা সহযোগিতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান করে। উৎপাদনের উন্নতি শ্রমিকদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়নে প্রতিফলিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতিগত বৈষম্য ও শোষণের অবসান ঘটে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জাতিগত বৈষম্যের মূল কারণ হচ্ছে উন্নত জাতির মালিকশ্রেণী অনুন্নত জাতিকে নিজেদের পণ্যের বাজার হিসাবে দেখে এবং তাদের উন্নতিতে নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন বলে বোধ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা ভোগকারী কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এ কারণে সমাজের কোনো অংশের উন্নতির সম্ভাবনা অপর কোনো অংশের স্বার্থের প্রতি আঘাত বলে গণ্য হতে পারে না। বরঞ্চ সমাজের যে-কোনো অংশের উন্নতি অপর অংশকে উন্নত করে তোলে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শুধু শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, শহরের সঙ্গে গ্রামের এবং মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈহিক শ্রমের বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শহর গ্রামকে জীবনের অশিক্ষিত পশ্চাদপদ অংশ বলে বিবেচনা করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শহর ও গ্রামকে পরস্পরের পরিপূরক আর্থিক এবং সামাজিক অঞ্চল হিসাবে উন্নত করে তোলে। আধুনিক জীবনযাপনের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাকে গ্রামে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে। গ্রামের কৃষি অর্থনীতিকে যৌথ খামারের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতির প্রয়োগে ক্রমাধিক পরিমাণে সুফলপ্রসূ করে গ্রামবাসীর জীবনে অধিকতর অবকাশের সৃষ্টি করে গ্রামকে শহরবাসী ও গ্রামবাসী উভয়ের নিকট আকর্ষণীয় জীবনোদ্যানে পরিণত করে। অধিবাসীমাত্রেরই সাধারণ এবং কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত করে মানসিক শ্রম এবং দৈহিক শ্রমের অসম ব্যবধানকে সমাজতন্ত্র দূরীভূত করে। মানসিক শ্রম বলতে আভিজাত্যসূচক এবং কতিপয়ের অধিকারভুক্ত বলে কোনো শ্রমের আর অস্তিত্ব থাকে না। শ্রম মাত্রই উৎপাদনী সমষ্টির জীবনের মান উন্নয়নমূলক উৎপাদনী এবং গৌরবজনক কর্ম। শ্রমের মধ্যে সম্মান অসম্মানের কৃত্রিম এবং অবৈজ্ঞানিক বিভেদ দূরীভূত হয়ে যায়। সমাজতন্ত্রে সৌভ্রাতৃত্বমূলক দুটি প্রধান শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে : কারখানার শ্রমিক শ্রেণী ; যৌথ খামারের কৃষকশ্রেণী। গোড়ার দিকে বুদ্ধিজীবী বলে পুঁজিবাদের অবশেষ হিসাবে একটা শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বজনীনতার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা আর পৃথক শ্রেণী বলে বিবেচিত হতে পারে না। যে শ্রমিক সেই বুদ্ধিজীবী ; যে কৃষক সেও তার শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক মানে বুদ্ধিজীবী। নাগরিকদের কার্যগত পার্থক্য থাকতে পারে ; কেউ অফিসে, কেউ আদালতে, কেউ কারখানায়, কেউবা খামারে কর্মরত। কিন্তু বুদ্ধিগতভাবে মানুষের কোনো শ্রেণীবিভাগ সমাজতন্ত্রে আর স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় না। পুঁজিবাদে মালিকে মালিকে মুনাফার প্রতিযোগিতার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরস্পরবিরোধী কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব না থাকাতে সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের

আবশ্যক। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলতে শোষক এবং শোষিতের গণতন্ত্র বুঝায় না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রাথমিক সীমাবদ্ধতা এই যে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধী সকল শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায় না। প্রতিরোধী শক্তির অবশেষের জন্য সমাজতন্ত্র কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে না। কিন্তু প্রতিরোধী শক্তির বিলোপের পরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র পরিপূর্ণরূপে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী ব্যক্তিমাত্রেরই জীবিকার জন্য শ্রম করার বিশ্রাম এবং অবকাশ ভোগের এবং বৃদ্ধ বয়সে অবসর যাপনের নিশ্চয়তা বিধান করে। ব্যক্তিমাত্রই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষার এবং চিকিৎসার অধিকার ভোগ করে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। জাতি বা বর্ণগতভাবেও কোনো বৈষম্যের অস্তিত্ব সমাজতন্ত্রে থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সাম্যবাদে পৌঁছানো। উৎপাদনের উন্নতির ভিত্তিতে সাম্যবাদ পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হবে। সাম্যবাদের মূল নীতি হবে : যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনভাবে শ্রম করবে এবং তার যেমন প্রয়োজন, তেমনভাবে তার প্রয়োজনের পূরণ হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য সাম্যবাদের পূর্ব পর্যন্ত অনুসৃত নীতি হচ্ছে : ক্ষমতার ভিত্তিতে কাজ এবং কাজের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ছিল সমাজতান্ত্রিক। বর্তমানে পৃথিবীর আরো অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হচ্ছে।

Socialism, Downfall of ? : সমাজতন্ত্রের পতন?

১৯১৭ সনে বলশেভিক কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার গঠন করে। গোড়ার দিকে ভি. আই. লেনিন এই সরকারের নেতৃত্ব দেন। ভি. আই. লেনিনের অকাল মৃত্যুর পরে (ভি. আই. লেনিন ১৮৭০-১৯২৪) জে. ভি. স্ট্যালিন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নানা পর্যায় এবং বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এই নেতৃত্ব ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে স্ট্যালিনের নীতি সম্পর্কে রাশিয়া এবং তার কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সমালোচনার উদ্ভব হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে এই সমালোচনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চভের বিখ্যাত বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। স্ট্যালিনের জীবন, নীতি এবং কার্যক্রমের এই নেতিবাচক সমালোচনার ধারার পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক দর্শন, আদর্শ এবং রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বৈরীশক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট আদর্শবিরোধী চক্র পার্টি এবং সরকারের ক্ষমতা দখল করে। এই প্রক্রিয়ার প্রধান মুখপাত্র হিসাবে গরভাচেভ ১৯৮৫ সনে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের এবং রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সরকার ও সংগঠন পরিচালনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ক্রটিবিচ্যুতির সুযোগ গ্রহণ করে কমিউনিস্টবিরোধী শক্তি এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী আদর্শকে পরিত্যাগ করে ১৯১৭ থেকে ৭০ বছর যাবৎ কার্যকর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ব্যর্থ বলে প্রচার করে এবং এই

ঘটনাকে তারা সমাজতন্ত্রের পতন বলে আখ্যায়িত করে। আধুনিককালের বিশ্বরাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষীয় মানুষের মনেও এর ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সমাজ বিশ্লেষণের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের মূল কোনো পণ্ডিত বা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা কল্পনার বিষয় নয়। মানুষের বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তার মূল প্রোথিত। এ সত্য প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী শক্তির আঘাতের পরিণতিতে পূর্ব ইউরোপসহ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে মারাত্মক নৈরাজ্যিক এবং আত্মঘাতী রক্তাক্ত জাতিবিদ্বেষ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পুনরায় উদ্ভাসিত হতে শুরু করে।

মানুষের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবতর বিকাশ এবং মানুষের চেতনার বৃদ্ধি ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দর্শন এবং আদর্শের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা কোনো একটি বিশেষ সীমাবদ্ধ কালের হিসাবে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা চলে না।

Socialism, Fabian : ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্র

ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্র হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী একটি সংস্কারবাদী চিন্তাধারা। ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য 'ফ্যাবিয়ান' সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি 'ফ্যাবিয়ান' শব্দের মূলে আছে প্রাচীন রোমের সমরবিদ ফ্যাবিয়াসের নাম। ফ্যাবিয়ান সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণ 'ফ্যাবিয়ান' শব্দ দ্বারা ক্রমবিকাশ বুঝাতে চেয়েছেন। ধীরে ধীরে প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এই তাঁদের ধারণা ছিল। কিন্তু ফ্যাবিয়াস বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর বিলম্ব করার এবং সম্মুখ সমর পরিহার করার নীতি দ্বারা। পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হানিবলের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পেরে উঠবেন না মনে করে ফ্যাবিয়াস যতক্ষণ সম্ভব বিলম্ব করা এবং সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করার পন্থা গ্রহণ করেন। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদের সঙ্গে সংগ্রাম ব্যতীত সম্ভব নয়। কাজেই 'ফ্যাবিয়ান' শব্দ দ্বারা ফ্যাবিয়ান সমিতি পুঁজিবাদের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম বিমুখতার প্রবণতাকে প্রকাশ করেছেন ; ১৯০০ সাল থেকে ফ্যাবিয়ান সমিতি ইংল্যাণ্ডের অন্যতম রাজনীতিক দল শ্রমিক দলের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত লেখক-দম্পতি সিডনী এবং বিয়েট্রীস ওয়েব ব্যতীত ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিবিদদের মধ্যে মর্গান ফিলিপস, ক্লিমেন্ট এ্যাটলী, হার্বার্ট মরিসন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফ্যাবিয়ান সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লেনিন ফ্যাবিয়ান সমিতির চারিত্র্য বিশ্লেষণ করে তাকে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছিলেন।

Socialism, Utopian : ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র, কাল্পনিক সমাজতন্ত্র

সমাজের সম্পদের উপর সামাজিক বা সমষ্টিগত মালিকানা, সকলের জন্য শ্রমের সমান অধিকার এবং দায়িত্ব, সম্পদের সমবণ্টন—প্রভৃতির কল্পনাকে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র বলা হয়। কাল্পনিক এই কারণে যে, পূর্বে যখন এ সমস্ত চিন্তা করা হতো, তখন বাস্তবে কোথাও এর

অস্তিত্ব ছিল না। গ্রিক ভাষায় 'ইউটোপিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্তিত্বহীন কোনো স্থান। টমাস মোর পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে একটি কাল্পনিক দ্বীপে তাঁর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ বর্ণনা দিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্য একে 'ইউটোপিয়া' বলা হয়। পরবর্তীকালে 'ইউটোপিয়ান' বলতে অবাস্তব বা বাস্তবে কার্যকরী করা যায় না এরূপ মতবাদকে বুঝান হয়। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীগণ পুঁজিবাদেরও বিকাশের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক শোষণের মূল বলে চিহ্নিত করেন এবং যুক্তিসহকারে সমাজের সম্পদের উপর সমষ্টির অধিকারের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিন্দার পরিচয় অবশ্য প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের অনেক চিন্তাবিদ এবং মধ্যযুগের ধর্মবিরোধীদের এবং সামন্তযুগে কৃষকবিদ্রোহের মধ্যে পাওয়া যায়। পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করার পরে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র বিভিন্ন ধারা উপধারায় বিভক্ত হয়। ইউরোপের 'রিনাসেন্স' বা পুনর্জাগরণের যুগে বোহেমিয়ার হাউসকা, জার্মানির মুনজার, ইংল্যাণ্ডের টমাস মোর, ইতালির কাম্পানেলা প্রমুখ চিন্তাবিদদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের কল্পনার সুসংবদ্ধ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। বুর্জোয়া বিপ্লব সাধিত হবার পর শ্রমজীবী জনতার অমানুষিক শোষণে পুঁজিবাদের সম্যক প্রকৃতি যখন উদঘাটিত হয়ে আদর্শবাদী চিন্তাবিদদের বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বাপ্নিকরূপ সম্পর্কে মোহমুক্ত করে তুলেছে, তখন কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে ফ্রান্সে সেইন্ট সাইমন এবং ফোরিয়ার ও ইংল্যাণ্ডে রবার্ট ওয়েনের মতো কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের রচনাবলী প্রকাশিত হয়। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের স্বপ্নলোককে বিভিন্ন যুগে নির্যাতিত মানুষের সামনে তুলে ধরে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করেছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের বাস্তব চিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের নিকট থেকে অনেক ভাবধারা গ্রহণ করেছে। কিন্তু কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মূল দুর্বলতা এই যে, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীগণ নির্যাতিতের দুঃখ দেখে সমাজতন্ত্রে কল্পনা করেছেন, সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার কথা চিন্তা করতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁদের কল্পনা ছিল যে, শিক্ষার বিস্তারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজির মালিক তাঁর কলকারখানা সমষ্টির হাতে সমর্পণ করে দেবে—কোনো সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। সেইন্ট সাইমন সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের এবং সম্পত্তির বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরও ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং মানুষের নীতিবোধের উন্নতির ফলে সমাজের শ্রেণীগত বিরোধ এবং শোষণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিপ্লবের কোনো আবশ্যক হবে না। মার্কসবাদ পুঁজিবাদী সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে উৎপাদনের বিকাশের ভিত্তিতে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার যৌথ-চরিত্র এই উভয় ধারার বিরোধ যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পুঁজিবাদী সমাজকে রূপান্তরিত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলে।

Socrates : সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি. পূ.)

সক্রেটিস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক। এথেন্স নগর-রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন তিনি। তিনি নিজে কিছু রচনা করেন নি। তাঁর দর্শন এবং জীবনকাহিনী জানা যায় তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য

প্লেটোর রচনাবলী থেকে। প্লেটো সংলাপের আকারে তাঁর সমস্ত দার্শনিক পুস্তক রচনা করেন। প্লেটোর সকল গ্রন্থেরই নায়ক হচ্ছেন সক্রেটিস। সক্রেটিস পথে-ঘাটে-বাজারে সর্বদা তত্ত্বকথার আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধ্যান ধারণা বিশ্বাস, কোনো কিছুকেই তিনি বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞানের অন্বেষক। তাঁর চরিত্রের সরলতা এবং জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা তাঁকে এথেন্সের তরুণদের নিকট প্রিয় করে তোলে। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং প্রচলিত ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে তরুণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রবণতায় আতঙ্কিত হয়ে এথেন্সের সরকার তাঁকে তরুণদের বিপথগামী করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। সক্রেটিস ক্ষমা প্রার্থনা করে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে আর প্রশ্ন তুলবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে ; অন্যথায় তাঁকে হেমলগ পান করে মৃত্যু বরণ করতে হবে—এথেন্স নগরের আদালত এই দণ্ড ঘোষণা করে। তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে গোপনে কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেয়। কিন্তু সক্রেটিস ক্ষমা প্রার্থনা কিংবা গোপনে পলায়ন করে জীবন রক্ষা কোনোটাকেই গ্রহণ করলেন না। তিনি একদিকে তাঁর বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন যে, তাঁকে বিচার করার কোনো অধিকার তাদের নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের বিচারালয় হিসাবে তাদের দণ্ডাজ্ঞা তিনি গ্রহণ করে হেমলগ পান করে অকম্পিত চিত্তে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর জীবনের এই উপাখ্যান প্লেটোর গ্রন্থসমূহ থেকে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনত্যাগের এই কাহিনী তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। সক্রেটিসের নিজস্ব কোনো রচনা না থাকাতে এবং প্লেটো কোথাও তাঁর রচনাতে সক্রেটিসের কোনো মতকে খণ্ডন না করাতে সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শনের মধ্যে কোনো পার্থক্য চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে প্লেটো অঙ্কিত সক্রেটিস চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায় যে, সক্রেটিস ছিলেন জ্ঞান-প্রেমিক। তাঁর মতে জ্ঞান হচ্ছে আসলে জিজ্ঞাসা এবং অন্বেষা। তিনি বলতেন, আমরা সবাই নিশ্চিন্তে সব সময় বলি যে আমরা সব কিছু জানি। আসলে আমরা কতটুকু জানি? সক্রেটিসকে সকলে সব চেয়ে জ্ঞানী বলতেন। এই খ্যাতির বিশ্লেষণে তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন : আমাকে কেন লোকে জ্ঞানী বলে, আমি কতটুকু জানি, এ প্রশ্নের রহস্যভেদ করার জন্য আমি কতো মানুষকে প্রশ্ন করেছি। নানা সমস্যা সম্পর্কে আমি তাদের প্রশ্ন করেছি। যাকে প্রশ্ন করেছি, সেই-ই অক্লেশে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। দিনের পরিভ্রমণ শেষে ক্লান্তদেহে আমি সিদ্ধান্ত করেছি : এত সব 'জ্ঞানীর' সঙ্গে আমার যদি কিছু পার্থক্য থাকে সে এই যে, আমি জানি যে আমি কিছু জানি না ; কিন্তু এরা জানে না যে এরা কিছু জানে না। সক্রেটিসের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, তিনি মানুষের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ মনে করতেন। বিশ্বের মূল সত্তা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে না। মানুষ কেবল সেই সত্তার সৃষ্ট-ভাবকেই জানতে পারে। ভাব মানুষের মনের ব্যাপার। মানুষের মনে বিশ্বের সেই অজ্ঞেয় সত্তা যে-ভাবের সৃষ্টি করে, তার সঙ্গেই তার পরিচয়। জ্ঞান তাই মনের বাইরের কোনো বিষয় নয়। ব্যক্তির নিজের মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ধাত্রীর মত ব্যক্তির মন থেকে সেই জ্ঞান-শিশুকে বার করে এনে ব্যক্তিকে দেখানো যে, এ তার মধ্যেই ছিল। জ্ঞানের শিক্ষক এই ধাত্রীর কাজ সমাধা করবেন ব্যক্তির সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। প্রশ্ন, জবাব এবং আবার প্রশ্ন, এই ধারায় ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, তা স্পষ্ট হবে। এবং অসঙ্গতি এবং মিথ্যাকে বাদ দিয়ে যা সত্য তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। প্রশ্নোত্তরের

এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছিল সক্রেটিসের জ্ঞান আলোচনার প্রধান পদ্ধতি। সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শন চিন্তার সূক্ষ্মতায় এবং প্রকাশের প্রাঞ্জলতায় অত্যন্ত গভীর এবং আকর্ষণীয় ছিল। এই দর্শন প্রাচীন গ্রিসের দর্শনের বিকাশে একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রিসের দর্শন ছিল প্রধানত বস্তুবাদী এবং প্রকৃতিবাদী। সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শন মূলত ভাববাদী। সক্রেটিস এবং প্লেটোর কাছে ভাবই হচ্ছে সত্য। মানুষ ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়। মানুষের মনের ভাব চরম ভাবের প্রকাশ।

Solipsism : আত্মবাদ, বিষয়ীবাদ

চরম ভাববাদের একটি প্রকাশ হচ্ছে আত্মবাদ। এই মত অনুসারে ব্যক্তির মন বা চেতনার বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। কিংবা থাকলেও ব্যক্তি বা বিষয়ী তা জানতে পারে না। বার্কলে, ফিকটে প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিক আত্মবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মযাজক বার্কলের মতে ব্যক্তির জানার বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি যখন বলি, 'ওখানে একটি টেবিল আছে' তখন আমার এই বলা বা জানার ওপরই অস্তিত্ব নির্ভর করে। আমি যদি না জানতাম তা হলে অন্তত আমার কাছে ওর কোনো অস্তিত্ব থাকতো না। কাজেই যার অস্তিত্বের কথা আমি ঘোষণা করি তার অস্তিত্ব আমার জানার উপরই নির্ভর করে। আর আমি জানি কেবল আমার মনের ভাবকে। টেবিল বলতে, কাঠ, পায়া, ছাদ, শক্তত্ব, চতুষ্কোণ, সবুজ রং প্রভৃতি ভাবের সমাহার বুঝায়। এই যুক্তি অনুসরণ করলে পরিণামে দেখা যায় জগৎ কিংবা সর্ব অস্তিত্বই ব্যক্তির এবং একান্তভাবে মনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যখন নিদ্রা যায় তখন আর তার কাছে কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আবার নিদ্রাভঙ্গে সে পুরোনো অস্তিত্বকে ফিরে পায়। অস্তিত্ব যদি কেবল ব্যক্তিক হয় এবং চেতনাতেই সীমাবদ্ধ তা হলে অস্তিত্বের এই ধারাবাহিকতার জবাব কি? চরম আত্মবাদে এর কোনো জবাব নেই। এজন্য আত্মবাদ স্বীকার করেও ভাববাদী দার্শনিকগণের অনেকে এর যৌক্তিক পরিণাম পর্যন্ত অগ্রসর হতে চান না। অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার জন্য তাঁরা ঈশ্বরের মনের উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে জানার মধ্যেই অস্তিত্ব। কিন্তু ব্যক্তি নিজে যখন জানে না বা চেতনাহীন থাকে তখন ঈশ্বর জানতে থাকেন ঈশ্বর সর্বদা সচেতন। ঈশ্বর সব ভাবের আধার। ব্যক্তির চেতনা, অচেতনা যে ব্যবধান, ঈশ্বর নিজের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সেই ব্যবধানকে ধারাবাহিকতার সূত্রে গেঁথে রাখেন। ঈশ্বর দেখেন বলেই অচেতন ব্যক্তি সচেতন হয়ে তার পুরোনো ভাবকে আবার ফিরে পায়। কারণ বিধাতা ব্যক্তিকে পুরাতন ভাব ফিরিয়ে দেন।

Sorel, Georges : জর্জ সোরেল (১৮৪৭-১৯২২ খ্রি.)

ফরাসি দার্শনিক জর্জ সোরেল জীবনের শুরুতে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং একটি চাকুরিও লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৯২ সনে তিনি তাঁর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে দার্শনিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে প্রুঁধো, বাকুনিন প্রভৃতি নৈরাষ্ট্রবাদী দার্শনিকের চিন্তার ছায়াপাত ঘটেছে। সামাজিক বিকাশ বা প্রগতির তত্ত্বকে তিনি নাকচ করে সমাজের কল্পনাবাদী বা রোমান্টিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক মতামতে তাঁর

কোনো স্থিরতা ছিল না। সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি সিণ্ডিক্যালপন্থী হন এবং শ্রমিকদের ধর্মঘট বা স্ট্রাইককে কেবলমাত্র আন্দোলনের একটি বিশেষ পদ্ধতির পরিবর্তে মূল লক্ষ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসি দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আবার যুদ্ধের পরে কমিউনিজম এবং ফ্যাসিজম উভয়কে সমর্থনের কথা বলেন। জার্মান ফ্যাসিবাদ সোরেলের রচনা থেকে 'করপোরেট স্টেট'-এর তত্ত্ব গ্রহণ করে এবং জনতার আবেগ উদ্দীপিত করার জন্য জাতিগত বীরত্বের কল্পকথার আশ্রয় যে ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ গ্রহণ করে তারও উৎস সোরেলের দর্শন।

Sophists : সফিস্ট, জ্ঞানচারক

বাগ্মীতা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকরূপে প্রাচীন গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে একদল শিক্ষকের উদ্ভব ঘটে। এদের সফিস্ট বা কূটতার্কিক বলে অভিহিত করা হতো। এঁরা বিশেষ কোনো দার্শনিক তত্ত্বের অনুসারী ছিলেন না। এঁদেরকে গ্রিসের লোকায়ত বা লোকপ্রিয় শিক্ষক বলা হতো। প্রচলিত মতামতকেই তাঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতেন। প্রতিষ্ঠিত অনেক রাষ্ট্রীয় এবং দার্শনিক তত্ত্বকে তাঁরা সমালোচনাও করতেন। এজন্য সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের রচনাবলীতে 'সফিস্ট' শব্দটি কোথাও ব্যঙ্গাত্মকভাবে কোনো কূটতার্কিক সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও প্রতিষ্ঠিত মতের বিরোধীকে সফিস্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সফিস্টগণ গ্রিসের প্রচলিত ধর্মকে অস্বীকার করতেন এবং প্রকৃতি জগতের সমস্যাদিকে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের বদলে যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। সফিস্টদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁরা সকলেই সবরকম জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিলেন। মূল সত্তা কি, এ প্রশ্নে সফিস্টদের অনেকে যেমন বস্তুবাদী অভিমত পোষণ করতেন, তেমনি অনেকে সংশয়বাদী মতও পোষণ করতেন। এঁদের অনেকে গ্রিসের দাস সমাজভিত্তিক গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। গ্রিক 'সফিয়া' শব্দের অর্থ—জ্ঞান এবং 'সফিজমা' শব্দের অর্থ কৌশল বা দক্ষতা। জ্ঞান বা তর্কের দক্ষতা থেকে এই দার্শনিকদের সাধারণভাবে 'সফিস্ট' বলা হতো। সফিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে প্রোটাগোরাস, হিপিয়াস, প্রডিকাস, এ্যাণ্টিফন, গরজিয়াস, ক্রিটিয়াস এবং হিপোডামাস-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Species and Genus : প্রজাতি এবং জাতি

প্রজাতি এবং জাতি কথা দুটি যুক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাতি এবং প্রজাতি দ্বারা যুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত জাতিবাচক পদসমূহের ব্যক্তার্থের তুলনাগত সম্পর্ক বুঝান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জীব এবং মানুষ, দুটি পদই জাতিবাচক। এই দুটি পদকে তাঁদের ব্যক্তার্থের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাদের সংখ্যা বা পরিমাণগত অর্থের দিক থেকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, 'মানুষ' পদের চেয়ে 'জীব' পদের পরিমাণ বা ব্যক্তার্থ অধিক। এরূপ দুটি জাতিবাচক পদের তুলনায় যে-পদটি অপর পদের চেয়ে অধিকতর ব্যক্তার্থসম্পন্ন, তাকে অপরটির 'জাতি' এবং সংকীর্ণতর ব্যক্তার্থসম্পন্ন পদটিকে 'প্রজাতি' বলা হয়। কাজেই 'জীব' পদ 'মানুষ'-এর জাতি

এবং 'মানুষ' 'জীব'-এর প্রজাতি। দুই-এর অধিক সংখ্যক জাতিবাচক পদকেও এভাবে তুলনা করা চলে। যেমন 'বাংলার মানুষ', 'এশিয়ার মানুষ', 'পৃথিবীর মানুষ' এই তিনটি পদ পরিধির দিক থেকে একটি অপরটির চেয়ে বৃহত্তর। তাই 'বাংলার মানুষ'কে 'এশিয়ার মানুষ'-এর প্রজাতি, আবার 'এশিয়ার মানুষ'কে 'পৃথিবীর মানুষ'-এর প্রজাতি বলা যায়।

Spencer, Herbert : হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩ খ্রি.)

হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সমাজতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। তাঁর অভিমতসমূহে হিউম, কাণ্ট এবং মিলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। জ্ঞানের প্রশ্নে অজ্ঞেয়বাদের প্রভাবে হার্বার্ট স্পেন্সার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধতার উপর অধিক জোর দেন। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা। কাজেই বৈজ্ঞানিক সত্যের কোনো চরম নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। বিজ্ঞানের পক্ষে তাই অস্তিত্বের রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের এই অজ্ঞেয়বাদ স্পেন্সারকে ধর্মের পরিমণ্ডলে টেনে নিয়ে যায়। ধর্মও মনে করে, বিশ্বনিয়ন্তা অজ্ঞেয়। কাজেই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে আর পার্থক্য কি? ধর্ম এবং বিজ্ঞান পরস্পর সংলগ্ন সত্য। হার্বার্ট স্পেন্সার বিবর্তনকে স্বীকার করেছেন। জড় এবং জীবন—সবই বস্তু এবং বিবর্তনের ফল।

Spengler, Oswald : অসওয়াল্ড স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬ খ্রি.)

স্পেংলার ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানির জঙ্গী জাতীয়তাবাদী দার্শনিক। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইতিহাসের দর্শনমূলক 'ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট' বা 'পাশ্চাত্যের অবক্ষয়' শীর্ষক গ্রন্থ। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে স্পেংলার জার্মান জঙ্গী জাতীয়তাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। ফলে সমরবাদী, রাজতন্ত্রী এবং জঙ্গী জাতীয়তাবাদী জার্মানদের নিকট স্পেংলার বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। যুদ্ধকে স্পেংলার মানুষের চিরন্তন জীবন সত্তার প্রকাশ বলে মনে করেন। সমাজের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস বা বিবর্তনের অনুসন্ধান নিরর্থক। মানুষের ইতিহাস বিভিন্ন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ইতিহাস। ব্যক্তির জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যুর ন্যায় এই সাংস্কৃতিক সত্তাগুলিরও জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যু ঘটে। তাই স্পেংলারের কাছে ইতিহাসের তত্ত্ব বা দর্শন বলতে এই সাংস্কৃতিক সত্তাগুলির নিজ নিজ জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উপলব্ধি বুঝায়। স্পেংলারের মতে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়েছে উনবিংশ শতক থেকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল সামন্তবাদী যুগে। স্পেংলারের অভিমতসমূহের অবৈজ্ঞানিক ভাববাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই চোখে পড়ে।

Spinoza, Baruch : স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রি.)

স্পিনোজা ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইউরোপের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক। হল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। স্পিনোজার মুক্ত চিন্তার জন্য আমস্টারডামের ইহুদি সম্প্রদায় স্পিনোজাকে সমাজচ্যুত

করেছিল। দর্শনে জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন স্পিনোজা। স্পেনের সামন্তবাদী রাজতন্ত্রের আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করার পরে হল্যাণ্ডেই ইউরোপের প্রথম পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। এই পরিবেশে স্পিনোজার দর্শন আত্মপ্রকাশ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বপথিক বেকন এবং দেকার্তের মতো স্পিনোজাও এই অভিমত পোষণ করতেন যে, জ্ঞানের লক্ষ্য হবে, মানুষকে প্রকৃতির প্রভুতে পরিণত করা এবং মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করা। তা ছাড়া স্পিনোজা মানুষের কর্মের স্বাধীনতার তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাকৃতিক বিধান সত্য। প্রাকৃতিক বিধান মানুষ আবিষ্কার করবে। প্রাকৃতিক বিধান মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু তথাপি বিধানের এই অনিবার্যতার মধ্যে মানুষ শুধুমাত্র ক্রীড়নক নয়। মানুষের কর্মের আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে। মানুষের স্বাধীনতার এই তত্ত্ব প্রসঙ্গে জগৎ সম্পর্কে স্পিনোজা নিজের দর্শন ব্যাখ্যা করেন। জগৎ এবং বিধাতা—সত্তার এরূপ কোনো দ্বিধাবিভক্ত স্পিনোজা স্বীকার করেন না। জগৎই অর্থাৎ বস্তু জগৎ-ই একমাত্র সত্তা ; জগৎ নিজেই নিজের কারণ এবং সৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টির জন্য আদি কারণের তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়। জগতের মধ্যেই জগতের সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান। জগৎ স্বতঃসৃষ্টিশীল সত্তা। সত্তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সত্ত্বেও স্পিনোজা জ্ঞানের প্রশ্নে ছিলেন দেকার্তের অনুসারী এবং প্রজ্ঞাবাদী। তাঁর কাছে অভিজ্ঞতাগত বা ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি এবং বিশেষ করে প্রজ্ঞা বা সজ্ঞাগত জ্ঞানই সমস্ত সংশয়োর্ধ্ব জ্ঞান। সত্যকে কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। দেকার্তের মতো, স্পিনোজাও মনে করতেন যে, সংশয়হীন সত্যই চরম সত্য। আর সংশয়হীন সত্য কেবল প্রজ্ঞার মারফতেই লাভ করা যায়। স্পিনোজার ধর্ম সম্পর্কিত অভিমতও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, ধর্মের কাজ হবে মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে তোলা। জীবন, জগৎ, সমাজ, ঈশ্বর সব সমস্যার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে। ধর্ম বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্র—কারো অধিকার নেই ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ করার, কিংবা তাকে নিয়ন্ত্রিত করার। রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্পিনোজা ছিলেন গণতন্ত্রের সমর্থক। গণতান্ত্রিক সরকারই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। এই সার্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণ আসবে ব্যক্তির মতামতের স্বাধীনতার মাধ্যমে। ধর্ম, বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার ক্ষেত্রে স্পিনোজার এরূপ মুক্তচিন্তা সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিবর্তনে বিশেষ সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস স্পিনোজার চিন্তাধারাকে তাঁর যুগ এবং পরবর্তীকালের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন। স্পিনোজার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এঙ্গেলস এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্পিনোজা থেকে ফরাসি বস্তুবাদ পর্যন্ত বিস্তারিত যুগের চিন্তাবিদদের গুরুত্ব এখানে যে, তাঁরা জগৎ-কে জগৎ দ্বারাই ব্যাখ্যা করেছেন—জগৎ বহির্ভূত কোনো শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

Square of Opposition : বিরোধিতার বর্গক্ষেত্র

এ্যারিস্টটল যৌক্তিক বাক্যকে তাঁর 'গুণ' এবং 'পরিমাণে'র ভিত্তিতে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন যৌক্তিক বাক্য 'হাঁ' বাচক এবং 'না' বাচক হতে পারে। আবার একই সঙ্গে যৌক্তিক বাক্য 'সার্বিক' বা সাধারণ এবং 'বিশেষ' হতে পারে। সকল যৌক্তিক বাক্যের শ্রেণীগত সংখ্যা দাঁড়ায় চার ১. হাঁ-বাচক সার্বিক বাক্য (সকল মানুষ মরণশীল) এরূপ

বাক্যের সংকেত হিসাবে ইংরেজি স্বরবর্ণ 'A' ব্যবহৃত হয়)। ২. না বাচক সার্বিক বাক্য (কোনো মানুষ অমর নয়। ইংরেজি স্বরবর্ণ 'E' এই বাক্যের সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়)। ৩. হাঁ-বাচক বিশেষ বাক্য (কিছু মানুষ সৎ। ইংরেজি স্বরবর্ণ 'I' এই বাক্যের সংকেতরূপে ব্যবহৃত হয়। ৪. না-বাচক বিশেষ বাক্য (কিছু মানুষ সৎ নয়। ইংরেজি স্বরবর্ণের 'O' দ্বারা বাক্যটি সংকেতে বুঝান হয়)। এই চার রকম যৌক্তিক বাক্যের মধ্যে এ্যারিস্টটল তুলনার ক্ষেত্রে চার রকম বিরোধিতার উল্লেখ করেন। বিরোধিতাগুলির প্রচলিত ইংরেজি নাম হচ্ছে : কন্ট্রারী, সাব-কন্ট্রারী, কনট্রাডিকটরি এবং সাবঅলটার্ন। ষোড়শ শতকে এ্যারিস্টটলের রচনার অনুবাদক জুলিয়াস প্যাসিয়াস এই চার রকম বিরোধিতাকে সহজে স্মরণ রাখার জন্য একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করেন। বর্গক্ষেত্রটি নিম্নরূপ
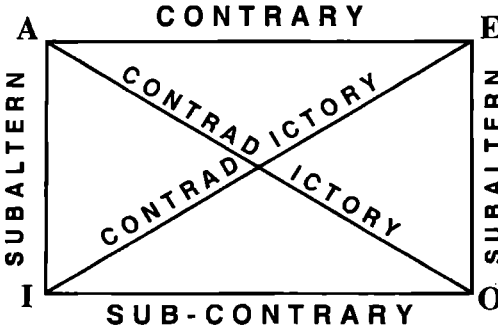
যৌক্তিক বাক্যের এরূপ শ্রেণীবিন্যাস এবং তাদের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে এরূপ বিরোধিতার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দ্বারা এ্যারিস্টটল যৌক্তিক বাক্যের স্বরূপ নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেন। যুক্তির সুনির্দিষ্টতা এবং দ্ব্যর্থহীনতার জন্য বাক্যের সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ আবশ্যক। আমরা গুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত বাক্যগুলিকে সা.হাঁ, সা.না এবং বি.হাঁ ও বি.না—এরূপ সংকেত দ্বারাও সহজে মনে রাখতে পারি। (দ্র. Proposition প্রতিজ্ঞা, যৌক্তিক বাক্য)।

Stalin. J.V. : জে. ভি. স্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫৩ খ্রি.)

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হিসাবে লেনিনের পরেই স্ট্যালিনের নাম কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ উল্লেখ করতেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু-পরবর্তীকালে প্রথমে স্ট্যালিনবাদের তীব্র সমালোচনা শুরু হয় এবং এই পর্যায়ে স্ট্যালিনকে জনমনের অতিভক্তির বেদি থেকে একজন একনায়কতন্ত্রবাদী নির্মম শাসক হিসাবে অপসারিত করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে এই ভারসাম্যহীন সমালোচনার জায়গাতে স্ট্যালিনের গুণ এবং দোষ উভয়ের স্বীকৃতিসহ স্ট্যালিন চরিত্রের একটি ভারসাম্যমূলক বিশ্লেষণের প্রয়াস সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিলক্ষিত হয়। স্ট্যালিনের অতি-স্তুতি এবং অতি-নিন্দা নিঃসন্দেহে স্ট্যালিনকে রুশ ইতিহাসের এক শক্তিধর নায়ক হিসাবে প্রমাণিত করেছে।

একটি শ্রমজীবী সাধারণ পরিবারে জর্জিয়ায় ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্ট্যালিনের জন্ম হয়। ১৮৯৯ সালে স্ট্যালিনকে বিপ্লবপন্থী বলে শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীকালে জার সরকার তাঁকে দুবার সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করে। দুবারই সাইবেরিয়া থেকে পলায়ন করে স্ট্যালিন গোপন মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়া ছিল বহু জাতির দেশ। সাম্যবাদী আন্দোলনে তাই জাতি সমস্যার সমাধান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল। জাতিসমস্যার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনকে বিশেষজ্ঞ মনে করা হতো। ১৯১২ সালে স্ট্যালিন জাতি সমস্যার আলোচনা করে 'মার্কসবাদ ও জাতি-সমস্যা' নামক তাঁর রাজনীতিক নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯১৭ সালে স্ট্যালিন রাশিয়ায় সাম্যবাদী দলের মুখপত্র 'প্রাভদা'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। বিপ্লবের পরে লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম সোভিয়েত সরকারে স্ট্যালিনকে জাতিসমূহের কমিসনার বা মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বিপ্লবের পরে প্রতিক্রিয়ার সর্বাত্মক সশস্ত্র আক্রমণ পর্যুদস্ত করার ক্ষেত্রে স্ট্যালিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরে স্ট্যালিন বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং তারপর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতার মূল তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। একদিকে যেমন স্ট্যালিন তার 'এক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়'—তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীর অন্যত্র বিপ্লব হোক বা না হোক সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্প ও কৃষিতে কঠোর পরিকল্পনার মারফত সমাজতন্ত্রকে মজবুত করতে থাকেন, অপরদিকে তেমনি তার নেতৃত্বের বিরোধী সকল রাজনীতিক নেতাকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিংবা গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে অপসারিত করেন। ১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্ট হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে স্ট্যালিন যুদ্ধপরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে স্ট্যালিন ক্রমান্বয়ে সোভিয়েত সামরিক শক্তিকে সুসংহত করে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের মৃত্যুপণ প্রতিরোধ সংঘটিত করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রতি-আক্রমণে অগ্রসর হন। এই সময়ে সমগ্র বিশ্বে সোভিয়েত জনগণের প্রতিরোধ বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং সোভিয়েতের সর্বাধিনায়ক হিসাবে স্ট্যালিনের সামরিক ও রাজনীতিক প্রজ্ঞা শত্রু-মিত্র সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ের পর স্ট্যালিন দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা বজায় রেখে প্রাকযুদ্ধকালীন অবস্থা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫৩ সালে তার মৃত্যুর পরে কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে (১৯৫৬) তৎকালীন সম্পাদক ক্রুশ্চভ স্ট্যালিন চরিত্র সম্পর্কে এতাবৎকালের বিমুগ্ধতা ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেন (দ্র. Personality Cult ব্যক্তি পূজা)।

State : রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে এতদিনকার প্রচলিত মত ছিল যে, রাষ্ট্র হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনের এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত অধিবাসীর স্বার্থ রক্ষার একটি নিরপেক্ষ সংস্থা। কিন্তু মার্কসবাদ এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে রাষ্ট্রের ভিন্নতর তত্ত্ব তৈরি করেছে। মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজের শ্রেণীগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত। মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হচ্ছে অর্থনীতিক শ্রেণীতে বিভক্ত একটি জনসমাজের অধিকতর শক্তিশালী শ্রেণীর রাজনীতিক যন্ত্র। মার্কসীয় মতে আদিতে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল না। তাই শক্তিশালী কোনো শ্রেণীর স্বর্থরক্ষার জন্য

রাষ্ট্রযন্ত্রেরও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আদি সাম্যবাদী সমাজ অর্থনীতিক বিকাশের ফলস্বরূপ উৎপাদনের উপায়ের মালিক শ্রেণী এবং উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা বঞ্চিত শোষিত শ্রেণীতে যখন বিভক্ত হয়ে গেল তখনি মালিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ আইন-কানুন, বিধিনিষেধ, বিচার, দণ্ড, মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধতা দমনকারী পুলিশ এবং কয়েদখানার উদ্ভব ঘটে। যেহেতু অর্থনীতিকে শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্ম জড়িত সে কারণে যে-কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র হচ্ছে উৎপাদনের উপায়ের মালিক শ্রেণীর অর্থাৎ শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী যন্ত্ররূপে। রাষ্ট্রকে তাই শ্রেণীনিরপেক্ষ কোনো সংস্থা বলে বর্ণনা করা চলে না। এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে রাষ্ট্রের নিজের এরূপ অস্তিত্ব এবং তার এই চরিত্রও ততদিন স্থায়ী হবে। মার্কসবাদ এর অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বলে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও গোড়াতে শ্রেণীহীন রাষ্ট্র নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্বে যেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের শাসন ও শোষণ সমাজের অধিকতর সংখ্যক লোকের উপর চলত সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে অধিকসংখ্যক অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী সমস্ত উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র মারফত অল্প সংখ্যক লোককে দমন করে এবং বৃহত্তর সংখ্যক অধিবাসীর জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির সুব্যবস্থা সাধন করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সামজতন্ত্রের বিরোধী শ্রেণীর যত বিলোপ ঘটবে তত রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্রেরও অবসান ঘটবে। পরিশেষে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হবে যখন রাষ্ট্র সামাজিক সুব্যবস্থাপনার সংস্থায় পরিণত হবে কিন্তু দমনমূলক যন্ত্র হিসাবে তার আর অস্তিত্ব থাকবে না। রাষ্ট্রের বর্তমান প্রচলিত রূপ তখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো দুটি মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর একটি ঐশ্বরিক উৎপত্তির তত্ত্ব এবং অপরটি সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব। (দ্র. Social Contract Theory সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব) ইউরোপের মধ্যযুগে ঐশ্বরিক তত্ত্বই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতির প্রশ্নে প্রধান তত্ত্ব ছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজা ঈশ্বর নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাসক। রাজার ক্ষমতার উৎস ঈশ্বর। ঈশ্বরের বিধান যেরূপ অলঙ্ঘনীয় তেমনি ঈশ্বরের নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজার আদেশও অলঙ্ঘনীয়। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিস্তার ঘটে এবং রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক তত্ত্বের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে।

State and Revolution : রাষ্ট্র ও বিপ্লব

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' লেনিনের একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থে লেনিন রাষ্ট্র এবং বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লেনিন পুস্তকখানি রচনা করেন। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব তখন নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। শ্রমিকশ্রেণী এবং লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি বিপ্লবের বুর্জোয়া চরিত্র অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য সংগঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র কি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের অর্থ কি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেমন করে সাধন করতে হবে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলি তখন বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। লেনিন এই সমস্ত প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণী এবং বলশেভিক পার্টিকে সঠিক জবাবের

আদর্শগত হাতিয়ারে সজ্জিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পুস্তকখানি রচনা করতে শুরু করেন। নভেম্বর মাসে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দখলের সময় পর্যন্ত গ্রন্থ রচনা শেষ হয় নি। লেনিন গ্রন্থখানি অসমাপ্ত রাখতে গিয়ে বলেন যে, বাইরে যখন বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে ঘরে বসে তখন বই লেখা কি করে সম্ভব? কিন্তু অসমাপ্ত গ্রন্থেও লেনিন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করেন। উনবিংশ শতকের বিভিন্ন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, বিশেষ করে ১৮৭১ সালের ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর প্যারি কম্যুনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে লেনিন বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সর্বহারা শ্রেণীকে অবশ্যই ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে তার স্থানে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল রেখে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে না। কাজেই সর্বহারার একনায়কত্ব ধনিক শ্রেণীর দৈহিক এবং আদর্শগত প্রতিরোধ পর্যুদস্ত করার জন্য অপরিহার্য। লেনিন রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা করে রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের উপরও আলোকপাত করেন। রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হলে রাষ্ট্রযন্ত্রেরও আর আবশ্যকতা থাকবে না। বিরোধী শ্রেণীর উপর শাসনের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের তখন বিলোপ ঘটবে। রাষ্ট্র তখন সামাজিক জীবন-যাপনের ব্যবস্থাপনার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে। রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন মার্কসবাদের বিচ্যুতিমূলক নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব এবং সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব লাঘবকারী সুবিধাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

Stoics : নিস্পৃহবাদী

Stoicism : নিস্পৃহবাদ, বৈরাগ্যবাদ

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক সভ্যতায় স্টয়সিজম বা নিস্পৃহতামূলক একটি দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। জেনোকে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। (দ্র. Zeno জেনো) এপিক্যুরাসের নেতৃত্বে অপর একটি দার্শনিক ধারারও উদ্ভব এই সময়ে গ্রিসের জ্ঞান জগতে দেখা যায়। এপিক্যুরাসের তত্ত্বকে প্রাচীন সুখবাদ বলে অভিহিত করা হয়। এই উভয় দর্শনের বিকাশের পটভূমি হচ্ছে এককালের বীর্যবান এবং ঐশ্বর্যময় এথেন্স এবং অন্যান্য গ্রিক নগর রাষ্ট্রের ক্ষয়গ্রস্ত সংকটাপন্ন অবস্থা। বিপুল সংখ্যক দাসের শোষণের ভিত্তিতে যে গ্রিক গণতন্ত্র বিকাশলাভ করেছিল সে গণতন্ত্র নগররাষ্ট্রে, নগররাষ্ট্রে আত্মধ্বংসী যুদ্ধে, রাজনীতিক ও সমরনায়কের দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র এবং দেশদ্রোহিতায় জনসাধারণের কাছে শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপনে অক্ষম শাসন ব্যবস্থা হিসাবে বর্জনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের যে আকর্ষণ গ্রিক নাগরিকদের মধ্যে একদিন ছিল সে আকর্ষণ বিগত। নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে মোহমুক্ত। যে ব্যক্তি একদিন নগর রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রেখেছে এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বাইরে নিজের কোনো অবস্থানের কথা চিন্তা করে নি, সে নাগরিক এখন তার ব্যক্তিক জীবনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বাইরে নির্বিবাদে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের উপায় অন্বেষণ করছে। এই পটভূমিতে

একদিকে এপিক্যুরাস বলেছেন ব্যক্তির জীবনের মূল প্রেরণা সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা। ব্যক্তি তার সুখ নিজের মধ্যেই লাভ করতে পারে। এজন্য তাকে বিবেচক হতে হবে। দুঃখের চিন্তা তার পরিহার করতে হবে। প্রজ্ঞা ও বিবেচনার ভিত্তিতে জীবন-যাপনেই ব্যক্তি পরম সুখ লাভ করতে পারবে।

দার্শনিক জেনো এবং স্টয়েকবাদের অপরাপর প্রবক্তাদের অভিমত হল : ব্যক্তি প্রকৃতির বিধান মেনে জীবনযাপন করলেই মাত্র শান্তি লাভ করতে পারবে। সুখের অন্বেষণে সুখ লাভ করা যায় না। আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই। নিস্পৃহতার চর্চাতেই ব্যক্তি সুখ লাভে সক্ষম। মানুষ নিস্পৃহ হবে এ কারণে যে, মানুষের নিজের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিয়তির কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। জীবনের সব কিছুই পূর্ব নির্দিষ্ট। নিয়তির এই নিয়মকে যে ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় নিয়তির হাত ধরেই সে অনিবার্যের পানে অগ্রসর হয়। তাতে তার কোনো দুঃখ থাকে না। কিন্তু নিয়তিকে যে অস্বীকার করে, সে এই অস্বীকারের মাধ্যমে নিজের জন্য দুঃখ সৃষ্টি করে। কারণ অস্বীকার করে নিয়তিকে সে নিবৃত্ত করতে পারে না। নিয়তি তাকে নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে অবশ্যই ঠেলে দিবে। এই যখন মানুষের ভবিতব্য তখন নিস্পৃহভাব বা নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণই হচ্ছে ব্যক্তির মানসিক শান্তির শ্রেয় পথ।

এপিক্যুরাসের সুখান্বেষণ এবং জেনোর নিস্পৃহতা—উভয় তত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উভয় তত্ত্বই হচ্ছে ব্যক্তির মুক্তির তত্ত্ব। উভয় তত্ত্বই প্রকারান্তরে গ্রিসের সংকীর্ণ এবং দাসদের শোষণ-ভিত্তিক নগর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষ। প্রকৃতির বিধানে সব মানুষই সমান এ অভিমত জেনো, এপিক্যুরাস এবং তদের অনুসারীগণ পোষণ করতেন। প্রকৃতির বিধান হচ্ছে সর্বজনীন। ব্যক্তি তার যুক্তি এবং বিবেকের মাধ্যমেই প্রকৃতির বিধানকে উপলব্ধি করতে পারে। সব মানুষের মধ্যেই যুক্তি আছে। স্বাধীন মানুষ ও দাস নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। গ্রিসের রাষ্ট্রীয় জীবনে এই নতুন দর্শনের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে নগররাষ্ট্রের স্থানে এক বিশ্বনাগরিকতার তত্ত্ব বিকাশ লাভ করে। জগৎ সম্পর্কে স্টয়েক বা নিস্পৃহবাদীদের ধারণা ছিল : জগৎ বস্তুময়। ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুকে বিশিষ্ট হিসাবে জ্ঞাত হতে পারে। বিজ্ঞান নির্বিশেষ বা সাধারণকে জ্ঞাত করায়। কিন্তু নির্বিশেষের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সত্তার ক্ষেত্রে স্টয়েকবাদীগণ চারটি সূত্রকে স্বীকার করত : ১. অস্তিত্ব, ২. গুণ, ৩. সম্ভাব্যতা, এবং ৪. আপেক্ষিক অবস্থা। স্টয়েকবাদ বা নিস্পৃহতার তত্ত্ব গ্রিক সভ্যতার পরে রোম সাম্রাজ্যেও বিস্তার লাভ করে। স্টয়েকবাদের মধ্যে জেনো ব্যতীত সেলুসিয়ার ডায়োজেনিস, সিডনের বিথাস, রোডস-এর প্যানিটিয়াস (খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং রোমের সেনেকা, রুফাস, এপিকটেটাস এবং রোম সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Syndicalism : সিণ্ডিকালবাদ

ঊনিশ শতকের শেষদিকে ফরাসি শ্রমিক আন্দোলনে সিণ্ডিকালবাদ বলে একটি তত্ত্বের উদ্ভব দেখা যায়। সিণ্ডিকেট বা শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে সিণ্ডিকালবাদ বা ইউনিয়নবাদ কথাটি প্রচলিত হয়। সিণ্ডিকালবাদের বক্তব্য হচ্ছে শ্রমিকরাই তাদের কর্ম এবং পরিবেশ তথা তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হবে এবং তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার

প্রয়োজন হবে সে কর্মপন্থা নিজেরাই উদ্ভাবন করবে। সিণ্ডিকালবাদের অন্যতম দার্শনিক জর্জ সোরেল সাধারণ ধর্মঘটকে শ্রমিকদের আন্দোলনের কেবল পন্থা বা পদ্ধতিবিশেষ নয়, শ্রমিকদের লক্ষ্য বা আদর্শ হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

Subconscious : অবচেতন

মনোবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করে ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুসারীগণ মনের চেতনাকে চেতন, অবচেতন এবং অচেতন এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। যখন আমরা মানসিকভাবে কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে অবলোকন করি তখন সেই নির্দিষ্ট বস্তুতে আমাদের চেতনা সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য চেতনার পরিধি বিশেষ সীমাবদ্ধ। কিন্তু চেতনার যে পরিবেশ অর্থাৎ চেতনার মুহূর্ত এবং চেতনার বিষয়টিকে ঘিরে অপর যে সকল বস্তু এবং স্মৃতি অবস্থান করে সেগুলিকে বলা হয় অবচেতন। অবচেতনের বৈশিষ্ট্য এই যে, অবচেতন চেতনার বহির্ভাগে অবস্থান করলেও আমরা ইচ্ছা করলে তার যে কোনো একটিকে চেতনার কেন্দ্রেও নিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুর উপর অবচেতন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব প্রয়োগ করে। মনের অবচেতন অংশে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলি আশ্রয় গ্রহণ করে। অচেতনকে আমরা ইচ্ছা করলেই চেতনার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি নে। অচেতন আমাদের ব্যক্তিত্বকে পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে। (দ্র. Unconscious : অচেতন।)

Sufficient Reason, Principle of : উপযুক্ত যুক্তি বা প্রমাণের তত্ত্ব

উপযুক্ত প্রমাণের তত্ত্ব যুক্তিশাস্ত্রের একটি মৌলিক নীতি। এর মূল মন্তব্য হচ্ছে, আমরা কোনো বক্তব্যকেই উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি নে। কোনো বক্তব্যের প্রমাণ বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটা বক্তব্য প্রমাণিত হতে পারে। আবার প্রতিপাদ্য বক্তব্যটিকে অপর কোনো প্রমাণিত বা জ্ঞাত সত্যের অন্তর্ভুক্ত করে এর সত্যতাকে প্রমাণ করা যায়। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়—এই বক্তব্যটি বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার পরে সত্য বলে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু রহিমের মৃত্যু হবে কিংবা রহিম মরণশীল এ বক্তব্যটিকে আমরা 'সকল মানুষ মরণশীল' এবং 'রহিম একজন মানুষ' অর্থাৎ রহিমকে জ্ঞাত সত্য, স্বীকৃত সত্য, 'সকল মানুষ মরণশীল'-এর অন্তর্ভুক্ত করে 'রহিমের একদিন মৃত্যু হবে' বক্তব্যটিকে সত্য বলে গ্রহণ করি। এখানে রহিম একজন মানুষ' এ প্রমাণই 'রহিমের একদিন মৃত্যু হবে' এ বক্তব্যের জন্য উপযুক্ত প্রমাণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। উপযুক্ত প্রমাণের তত্ত্বটি দার্শনিক লাইবনিজ প্রথম ব্যাখ্যা সহকারে রচনা করেন। অবশ্য এ তত্ত্বের উল্লেখ লিউসিপাস এবং এ্যারিস্টটলের রচনায় প্রাচীনকালেও পাওয়া যায়। উপযুক্ত প্রমাণের বিধানটি যুক্তির অন্যান্য মৌলিক বিধান যথা 'পরস্পর বিরোধী কথা সত্য হতে পারে না' কিংবা ন্যায্যপন্থার বিধান—অর্থাৎ কোনো দুটি বিকল্প যদি পরস্পর বিরোধাত্মক এবং সামগ্রিক হয়, তা হলে তাদের যে-কোনো একটি সত্য না হয়ে পারে না—এই বিধানের ন্যায় ব্যাপক বিধান। এ কারণে এ বিধানের প্রয়োগের পরিধি ব্যাপক এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র সার্বিক।

Sufism : সুফিতত্ত্ব

ইসলামের রহস্যবাদী ব্যাখ্যাকে সুফিতত্ত্ব বলা হয়। এবং এই তত্ত্ব প্রচারকারী সম্প্রদায়কে সুফি বলা হয়। সুফিতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে অষ্টম শতকে। গোড়ার দিকে সুফিমতবাদে সর্বেশ্বরবাদের ছাপ দেখা যায়। অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ, এরূপ অভিমত সুফিরা পোষণ করতেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং দার্শনিক ধারা, বিশেষ করে নব প্লেটোবাদ, ভারতীয় দর্শন এবং খ্রিষ্টীয় ভাবধারার সংমিশ্রণে সুফিবাদ গভীর রহস্যবাদে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহই সব সৃষ্টির মূলে। এখন আর সব কিছু আল্লাহ নয় ; সব কিছুতেই আল্লাহর প্রকাশ ঘটেছে এই ব্যাখ্যা প্রধান হয়ে ওঠে। আর তাই ধ্যানের মাধ্যমে, অভিভূত অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনাই হওয়া উচিত মানুষের একমাত্র সাধনা। সুফিতত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে দ্বাদশ শতকের পারস্যের আল-সুহরাওয়ার্দি, আরব দেশের আল-গাজ্জালী (একাদশ শতক), মনসুর হাল্লাজ, ইবন-আল-আরবি, রুমী এবং জামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুফি সাধকগণ চারটি স্তরের মধ্যে দিয়ে মোক্ষ লাভ করেন। এই স্তরগুলোর নাম : ১. শরিয়ত, ২. তরিকত, ৩. হকিকত, ৪. মারেফাত।

Sun Yat-sen : সান ইয়াতসেন (১৮৬৬-১৯২৫ খ্রি.)

সান ইয়াতসেন ছিলেন চীনের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক নেতা। হংকং-এ সান ইয়াতসেন চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি চীনের পুনর্জাগরণের ঐক্য নামক প্রথম বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে তার প্রভাবে সান ইয়াতসেন চীনের সামন্ততান্ত্রিক মাঞ্চু সরকার উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জনগণের মঙ্গল, এই তিন নীতির ভিত্তিতে সান ইয়াতসেন চীনের সকল বিপ্লবী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করেন। ১৯১১ সালে চীনে একটি জাতীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়। মাঞ্চু সম্রাটের সরকার হ্যাঙ্কাউ শহরে বিপ্লবীদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ করলে অভ্যুত্থান শুরু হয়। সংঘর্ষে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। পরিণামে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। পিকিং-এ জাতীয় পরিষদ সামরিক নেতা জেনারেল ইয়ানশিকাইকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করে। কিন্তু নানকিং-এ জনতার বিপ্লবী পরিষদ সান ইয়াতসেনকে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে। এই জাতীয় বিভেদের পরিসমাপ্তির জন্য সান ইয়াতসেন নিজে ১৯১২ সালে ইয়ানশিকাই-এর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য সান ইয়াতসেনকে নতুনতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে তিনি চীনের মুক্তি আন্দোলনের মিত্র হিসাবে ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সান ইয়াতসেন চীনের জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিনটাংকে পুনর্গঠিত করে তুললেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করতে শুরু করলেন। চীনের জাতীয় আন্দোলন এই সময়ে বৃহত্তম জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। সান ইয়াতসেন এবার সমাজতান্ত্রিক

সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ও কৃষক—এই তিন শক্তির সঙ্গে 'তিন ঐক্যের' নীতি ঘোষণা করেন। সান ইয়াতসেন বিদেশী পুঁজি এবং জাতীয় বৃহৎ পুঁজিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করে চীনের অর্থনীতিকে উন্নত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সান ইয়াতসেন কেবল রাজনীতিক নেতা ছিলেন না ; তিনি চিন্তাবিদ ছিলেন। দার্শনিক মতাদর্শে তিনি বস্তুবাদী ছিলেন এবং জ্ঞানকে মানুষের বাস্তব কাজের কার্যকর হাতিয়ার বলে মনে করতেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'সান ওয়েন-এর তত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য।

Syed Ahmad Khan : সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.)

ঊনবিংশ শতকের ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম চিন্তাবিদ এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার উদ্যোগী সংগঠক পুরুষ। ১৮৫৭ সালের ভারতের সিপাহিবিদ্রোহের পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করলেও তিনি মুসলিম সমাজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের উপর বিশেষ জোর প্রদান করেন। ধর্মের ব্যাখ্যাতেও তিনি উদারতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। উত্তর ভারতের মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দুতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য তিনি একটি অনুবাদকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। "পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও আলোচনার কেন্দ্র হিসাবে গাজীপুর কলেজ এবং আলীগড়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি স্থাপন করেন। কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।" আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত ভারতের মুসলমান সমাজের উচ্চবিত্ত তরুণদের আকর্ষণীয় শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধেরও সৃষ্টি করে। এদিক থেকে পরবর্তীতে পাকিস্তান বা মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির আন্দোলনের আদর্শগত সূত্রপাত আলীগড়ে ঘটে, একথা বলা যায়। নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিকতা এবং চিন্তার উদারতা প্রচারের একনিষ্ঠ উদ্যোগের দিক থেকে সৈয়দ আহমদ খান রাজা রামমোহনের সঙ্গে তুলনীয়।

Syllogism, Figures and Mood : সিলোজিজম, ন্যায়, গঠন এবং মুড

ইউরোপের প্রচলিত যুক্তিশাস্ত্রের এক প্রকার যুক্তি বা ন্যায়কে সিলোজিজম বলা হয়। সিলোজিজম-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, এই যুক্তিতে দুটি দত্তবাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ; যেমন :

সকল মানুষ মরণশীল
সক্রেটিস একজন মানুষ
সক্রেটিস মরণশীল

এখানে প্রথম দুটি হচ্ছে দত্তবাক্য বা প্রেমিস এবং তৃতীয় বাক্য সিদ্ধান্ত। সিলোজিজম হচ্ছে অবরোহী বা ডিডাকটিভ যুক্তির মুখ্য যুক্তি। সিলোজিজম সঠিক হওয়ার জন্য তিনটি নিয়ম মেনে চলতে হয় ; যথা : ১. দত্তবাক্য বা প্রেমিস দুটিকে মিলিতভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ দত্তবাক্য দুটি সম্পর্কহীন হলে চলবে না। ২. সিদ্ধান্তের পরিধি বা প্রয়োগগত ব্যাপকতা দত্তবাক্য দুটির অধিক হতে পারবে না। ৩. সিদ্ধান্তের

সত্যাসত্য দত্তবাক্যের সত্যাসত্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, স্বীকৃত দত্তবাক্যের উপর সিদ্ধান্তের সত্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে।

গঠন বা আকার : সিলোজিজমের দুটি দত্তবাক্য বা প্রেমিসের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে যে পদটি তাকে মধ্যপদ বলে। যেমন উপরের যুক্তিতে 'মানুষ' পদ দত্তবাক্য দুটির সংযোগ রক্ষাকারী পদ। মধ্যপদ দত্তবাক্য দুটির উভয়ের মধ্যে হয় উদ্দেশ্য, নয় বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপদ দত্তবাক্য দুটিতে উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয় পদ হিসাবে বিভিন্ন যুক্তিতে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। মধ্যপদের অবস্থান অনুযায়ী সিলোজিজমের চারটি গঠনগত আকার স্থির করা হয়। ইংরেজিতে উদ্দেশ্যপদকে সাধারণত 'S' দ্বারা, বিধেয় পদকে 'P' দ্বারা এবং মধ্যপদকে 'M' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সাংকেতিকভাবে তাই সিলোজিজের চারটি গঠন করা যায় ; যথা :
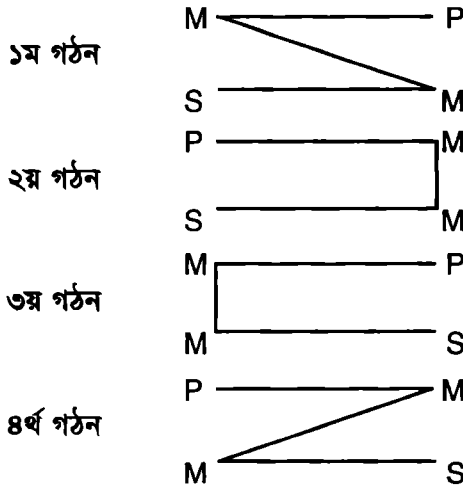
মুড মুড হচ্ছে ডিডাকটিভ লজিক বা অবরোহী যুক্তির মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত একটি শব্দ। দত্তবাক্যের অবস্থান্তরের ভিত্তিতে গঠিত সিলোজিজমকে মুড বলা হয়। একটি সিলোজিজমের দুটি দত্তবাক্যের মধ্যে যে বাক্যে সিদ্ধান্তের বিধেয়বাদ থাকে, তাকে প্রধান দত্তবাক্য এবং যে বাক্যে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদ থাকে, তাকে অপ্রধান দত্তবাক্য বলা হয়। একটি যৌক্তিক বাক্যের পরিমাণ ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে সার্বিক হাঁ বাচক, সার্বিক না বাচক, বিশেষ হাঁ বাচক এবং বিশেষ না বাচক—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি সিলোজিজমের গঠনে এই চার প্রকার বাক্যের বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থান দ্বারা সিলোজিজমের মুড গঠিত হয়। গঠনগত আকার বা মুডের পার্থক্য নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আমরা যে যুক্তি ব্যবহার করি, তাকে সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ করার চেষ্টা হয়েছে।

T

Tao, Taoism : তাও, তাওবাদ

তাও হচ্ছে প্রাচীন চীনের দর্শনের একটি মৌলিক সূত্র। তাও বলতে স্বভাব, প্রকৃতি এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বিধান বুঝাত। একে নীতির সূত্র বা আদর্শ হিসাবেও ব্যবহার করা হতো। চীনের দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'তাও' সূত্রের অর্থেরও বিকাশ ঘটেছে। চীনের ভাববাদী দার্শনিকগণ 'তাও'কে একটি ভাবগত সূত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আবার লাওজু, সুনজু, ওয়াংচাং প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিক তাওকে বস্তুর প্রকৃতি এবং বস্তুর পরিবর্তনের নিয়ম বা বিধান বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

Tautology : শব্দান্তর সংজ্ঞা

প্রচলিত ইউরোপীয় যুক্তিশাস্ত্রে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে টটোলজি বা শব্দান্তর সংজ্ঞা একটি ত্রুটির নাম। শব্দান্তর সংজ্ঞায় যে পদটির সংজ্ঞা দেবার কথা সে পদটির কোনো মৌলিক গুণের উল্লেখ না করে পদটিকে ভিন্নতর শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এটি ত্রুটি এই কারণে যে, সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞেয় পদটির অর্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সংজ্ঞার মধ্যে যদি মূল পদটির শব্দান্তরে পুনরুল্লেখ থাকে কিংবা পদটির সমার্থক্ কোনো শব্দদ্বারা সংজ্ঞার কাজ শেষ করা হয়, তা হলে পদটির অর্থ স্পষ্ট হতে পারে না। 'দেহ্ হচ্ছে শরীর', 'বিদ্যা জ্ঞান', 'ভ্রান্তি হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা'—এগুলি শব্দান্তর সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলা হয় বলে একে 'চক্রক' ত্রুটিও বলা হয়।

Technocracy : বিশেষজ্ঞতন্ত্র, প্রযুক্তিতন্ত্র

গণতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র নয়। বিশেষজ্ঞতন্ত্র। যারা যে বিষয় জানে, যে বিষয়ে যাদের দক্ষতা আছে, তারাই কেবল সে কাজ করতে পারে ; অপরে করতে গেলেই অনর্থ ঘটে। বর্তমানে রাষ্ট্রের শাসনে এত যে বিরোধ, অসন্তোষ, অরাজকতা তার কারণ রাষ্ট্র শাসনে যারা দক্ষ, যারা অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আধুনিক যন্ত্র কৌশল জানে সেই বিশেষজ্ঞদের বদলে বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিকরা রাষ্ট্রশাসনকে একচেটিয়া করে নিয়েছে। কাজেই রাষ্ট্রের অরাজকতা এবং অস্থিরতার মূলে রয়েছে রাজনীতিকদের শাসন। এর স্থানে বিশেষজ্ঞদের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেই রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিকতা প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ থর্সটাইন ভেবলেন। বিশেষজ্ঞতন্ত্রে পুঁজিবাদী সমাজের সংকটের কোনো যথার্থ বিশ্লেষণ নেই। এ তত্ত্ব প্রকারান্তরে বিশেষজ্ঞের নামে একচেটিয়া পুঁজিবাদের শাসনকে স্থায়ী এবং জোরদার করার উদ্দেশ্য সাধন করে।

Teleology : উদ্দেশ্যবাদ

উদ্দেশ্য ব্যতীত যেমন মানুষ নেই, তেমনি প্রকৃতির কোনো কিছুই উদ্দেশ্য ব্যতীত অস্তিত্বময় নয়। এই হচ্ছে উদ্দেশ্যবাদের মূল কথা। মানুষের চালকশক্তি কি? মানুষের চালকশক্তি উদ্দেশ্য। মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। প্রকৃতিজগতের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষ যেখানে সচেতনভাবে তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে এবং সচেতনভাবে সে উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, সেখানে প্রকৃতি-জগৎ অচেতনভাবে তার উদ্দেশ্য সাধনের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই উদ্দেশ্যবাদ প্রকৃতিজগৎকে কেবলমাত্র জড় বলে মনে করে না। বস্তুজগৎ অ-জীব অণুর সম্মেলন নয় ; সজীব অস্তিত্ব কণা দিয়েই সব কিছুর সৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে সে অস্তিত্ব জড় কিংবা জীবন্ত, যেমনই বোধ হোক না কেন। উদ্দেশ্যবাদের প্রথম সুসংবদ্ধ প্রকাশ দেখা যায় এ্যারিস্টটলের দর্শনে। এ্যারিস্টটল মনে করতেন বিশ্বের কোনো কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। সব কিছুই নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের আকর্ষণে অগ্রসর বা ক্রিয়াশীল হয়। এক অসীম সত্তা বা আত্মা সব উদ্দেশ্যের আধার বা নিয়ন্তা। এ্যারিস্টটলের এই তত্ত্বের অনুসরণ আমরা লাইবনিজ, হেগেল, হাইডেগার প্রমুখ দার্শনিকদের মধ্যে দেখতে পাই। সব কিছুর পেছনে উদ্দেশ্য এবং চরম উদ্দেশ্য সব কিছুকে অতিক্রম করে বিরাজমান এ তত্ত্ব ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থাৎ বিধাতার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবেও অনেকে উপস্থিত করেন। একে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগত অস্তিত্বের প্রমাণ বলে অভিহিত করা হয়। এ থেকে বিশ্বের পূর্ব-নির্দিষ্টতার তত্ত্বও অনেকে রচনা করেন। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তার কারণ যখন উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশ্য যখন অতিলৌকিক চরম উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তখন বিশ্বের কোনো কিছুকেই আর স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল বলা চলে না কিংবা কোনো কিছুর পরিণতির মধ্যেই আর কোনো অনিশ্চয়তার স্থান নেই। বিশ্বের সৃষ্টিও চরম উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্বের সব অস্তিত্বের গতিপ্রকৃতিই পূর্বনির্দিষ্ট। জীববিদ্যায় বিবর্তনের প্রশ্নেও সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যবাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ডারউইন বিবর্তনবাদের যে যুক্তিগত ব্যাখ্যা দেন, তাতে বিশেষ অস্তিত্বের আপেক্ষিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ফলে জীববিদ্যায় উদ্দেশ্যবাদ বা পূর্বনির্দিষ্টতার তত্ত্বের প্রভাব অনেকখানি হ্রাস পায়।

Term : পদ

একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত শব্দকে সাধারণত পদ বলে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ এবং উহার ব্যাখ্যার জন্য শব্দের অস্পষ্টতা, এবং তার অর্থে দ্ব্যর্থকতা পরিহার করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা থেকেই বিজ্ঞানে পদ বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দের উৎপত্তি ঘটে। লজিক বা যুক্তি শাস্ত্রে কোনো একটি যৌক্তিক বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলা হয়। এজন্য লজিকে ব্যাকরণের শব্দ এবং যুক্তির পদের মধ্যে পার্থক্য স্থির করে বলা হয় যে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে যে-কোনো ভাব প্রকাশক অক্ষর-সমষ্টি বা ধ্বনিকে 'শব্দ' বলা হয়। কিন্তু যে-কোনো শব্দ যুক্তির ক্ষেত্রে পদ বলে বিবেচিত হতে পারে না। যুক্তির জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে হচ্ছে এই যে, একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকা সম্ভব ; কিন্তু একটি যুক্তির মধ্যে পদ হিসাবে ব্যবহৃত শব্দের কেবল একটি অর্থ থাকে। পদের একাধিক অর্থ থাকা যুক্তির

নিয়মবিরুদ্ধ। যেমন 'পাণি' শব্দটির অর্থ হাত এবং পানীয় জল হতে পারে। 'গুণ' শব্দটির অর্থ মানুষের সৎপ্রকৃতি বা নৌকা টানার দড়ি হতে পারে। 'কলা' শব্দের অর্থ ফল বিশেষ কিংবা সুকুমার শিল্পও হতে পারে। কিন্তু এই শব্দগুলির কোনোটি যদি যুক্তির মধ্যে পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা হলে সেই যুক্তির মধ্যে তার একটি মাত্র অর্থ থাকবে।

Thales : থেলিস (৬২৪-৫৪৭ খ্রি. পূ.)

থেলিস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক। গ্রিসের উপাখ্যানে থেলিসকে সাত জ্ঞানীর এক জ্ঞানী বলে অভিহিত করা হয়। থেলিস ব্যাবিলন এবং মিশরের জ্যোতির্বিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন বলেও কথিত আছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৫-৫৮৪ সালে যে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল তার ভবিষ্যদ্বাণী থেলিস করেছিলেন। থেলিসের দর্শন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ। থেলিসের মনে প্রশ্ন জেগেছিল প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্যের মূল কি? থেলিস এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন : জলই হচ্ছে বস্তু জগতের মূল সত্তা।

থেলিস ছিলেন মাইলেটাস-এর অধিবাসী। মাইলেটাস ছিল এশিয়া মাইনরের সমৃদ্ধিশালী নগর। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের উৎপত্তি গ্রিস ভূখণ্ডে ঘটে নি। এর উৎপত্তি হয়েছিল মাইলেটাস-এ। থেলিস ব্যতীত এ্যানাক্সিমেণ্ডার এবং এ্যানাক্সিমেনিসও ছিলেন মাইলেটাসের দার্শনিক। এই তিন জনের দর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছিল মাইলেটাসের বা মাইলেশীয় দর্শন।

Thomas Aquinas St : সেইন্ট টমাস এ্যাক্যুইনাস (১২২৭-১২৭৪ খ্রি.)

মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় দর্শনের ইতিহাসে তিনজন খ্রিষ্টধর্মীয় যাজকচিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হচ্ছেন : ১. সেইন্ট বার্নার্ড (১০৯১-১১৫৩)। ইনি ক্লেয়ার ভর বার্নার্ড নামে পরিচিত। ২. সেলিসবারির জন (১১১৫-১১৮০)। ৩. সেইন্ট টমাস এ্যাক্যুইনাস (১২২৭-১২৭৪)।

ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান রাজনীতিক সমস্যা ছিল রাষ্ট্র এবং ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতার সমস্যা। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিষ্টীয় ধর্মগুরু পোপের অধিনায়কত্বে সমগ্র ইউরোপবাসী এক খ্রিষ্টীয় যাজক সাম্রাজ্য সংগঠিত হয়েছিল। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা, প্রার্থনার পৌরহিত্য ইত্যাদি এই সংগঠনের করণীয় হলেও ক্রমান্বয়ে এই সংগঠনের ক্ষমতা পারলৌকিক থেকে ইহলৌকিক এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিস্তার লাভ করে। খ্রিষ্টীয় যাজক সংগঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হয়ে মধ্যযুগের অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। রোম নগরীতে এই শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়। যাজকতন্ত্র তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাজা কিংবা রাষ্ট্রীয় সরকারের উপর বিস্তারিত করার প্রয়াস পায়। এই প্রচেষ্টাতে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের, রাজার সঙ্গে পোপের পারস্পরিক বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। কে বড়, ধর্ম না রাষ্ট্র? পোপ না রাজা? এ প্রশ্নে উভয় পক্ষের যুক্তি, প্রতিযুক্তির ভিত্তিতে মধ্যযুগের দর্শন, বিশেষ করে তার রাষ্ট্রীয় দর্শন বিকাশ লাভ করে।

উল্লিখিত দার্শনিকদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং ধর্ম—উভয় শক্তির মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

সেইন্ট বার্নার্ড ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। পোপ জাগতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যেরূপ ধর্মীয় সংগঠনকে জড়িত করেছেন এবং রাষ্ট্র শাসনে যেরূপ হস্তক্ষেপ করেছেন সেইন্ট বার্নার্ড তার নিন্দা করেন। তাঁর অভিমত ছিল : রাষ্ট্রীয় শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। পুরোহিত ধর্মীয় কাজ সমাধা করবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পোপ অর্থাৎ পুরোহিতের হস্তক্ষেপ অনুচিত।

সেলিসবারির জন ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী হলেও তাঁরও প্রধান শিক্ষাস্থল ছিল সেকালের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র প্যারিসে। জনের রচিত 'পলিক্রাটিকাস' (১১৫৯) রাষ্ট্রীয় দার্শনিক চিন্তায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এ পর্যন্ত মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় দর্শনের উপর যা কিছু রচিত হয়েছে তার মধ্যে 'পলিক্রাটিকাস' গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সর্বাধিক ব্যাপক এবং গভীর ছিল। এ্যারিস্টটলের দর্শনের পুনরুদ্ধার এবং পুনঃপরিচয়ের পূর্ব পর্যন্ত জনের রচনাতেই রাষ্ট্রীয় দর্শনের মৌলসূত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। জন এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তার অন্তর্গত সংগঠনসমূহ আপন আপন দায়িত্ব পালন করে এবং নিজ দায়িত্বের বাইরে অপরের দায়িত্বে কোনো হস্তক্ষেপ করে না। জন একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরি করে তার মাধ্যমে নিজের রাষ্ট্রীয় দর্শনকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে ধর্মের শক্তি সর্বাধিক। তাঁর মতে রাষ্ট্র অবশ্যই ধর্মের প্রাধান্য এবং নেতৃত্ব স্বীকার করবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ধর্ম রাষ্ট্রীয় শাসনে হস্তক্ষেপ করবে। যার যে দায়িত্ব সে তা পালন করবে। জনের মতে রাজতন্ত্রই হচ্ছে রাষ্ট্র শাসনের উত্তম পদ্ধতি। কিন্তু রাজা দেশ শাসন করবে নিজের ইচ্ছামতো নয়। রাজা দেশ শাসন করবে ঈশ্বরের শাশ্বত বিধান অনুযায়ী। রাষ্ট্রনীতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে ন্যায় অর্থাৎ ঈশ্বরের বিধান। গির্জা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ঈশ্বরের বিধানের মূর্ত প্রকাশ। কাজেই মানুষের জীবনের সর্বক্ষমতার মূল অধিকারী ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজা নয়। রাজা বিধান প্রয়োগকারী। রাজার স্থান ধর্মের পরে। রাজার আইনকে ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী হতে হবে। রাজা যদি স্বৈরতান্ত্রিক হয়, যদি তার বিধান ঈশ্বরের বিধানের পরিপন্থী কিংবা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘনকারী হয় তা হলে শাসিতের অধিকার থাকবে রাজাকে শাসন ক্ষমতাচ্যুত করার, এমনকি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার। রাজা স্বৈরতান্ত্রিক হলে জনসাধারণের অধিকার আছে তাকে অমান্য করার এবং অপসারিত করার। সেলিসবারির জনের এই তত্ত্বের সেকালে একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। গোড়াতে এ তত্ত্ব ধর্মকে প্রধান করলেও পরবর্তীকালে আইনের শাসন এবং সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর একটি সাহায্যকারী ভূমিকা ছিল।

কিন্তু মধ্যযুগে রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের প্রধান ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন সেইন্ট টমাস এ্যাক্যুইনাস। তিনি ছিলেন ইতালির অধিবাসী। তাঁর রচনার মধ্যে 'সুমমা থিওলজিকা' (১২৬৫-৭৩) ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। টমাস এ্যাক্যুইনাস এ্যারিস্টটলের 'রাষ্টনীতি' বা 'পলিটিক্স'-এর উপর আলোচনামূলক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। টমাস এ্যাক্যুইনাসের প্রধান লক্ষ্য ছিল যুক্তি এবং ধর্মের মধ্যে একটা সমঝোতা স্থাপন। প্রাচীন গ্রিসের চিন্তাধারার সঙ্গে ইতোমধ্যে ইউরোপ আবার পরিচিত হতে শুরু করেছে। ইসলামের সঙ্গে ধর্মীয় যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপ প্লেটো—এ্যারিস্টটলের রচনাবলীর আরবি অনুবাদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের সঙ্গে ইউরোপীয়

চিন্তাবিদদের পরিচয় ঘটতে শুরু করেছে। পাছে এই পরিচয় ধর্মের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে এই আশঙ্কায় এ্যাকুইনাস যুক্তির ভিত্তিতে ধর্মকে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিসঙ্গত করার তিনি প্রয়াস পান। তাঁর রচনায় রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহের আলোচনাও কিছুটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার রূপ গ্রহণ করে। এ্যাক্যুইনাস আইন বা বিধানকে যুক্তির ভিত্তিতে মানুষের মঙ্গলার্থে শাসকের প্রযুক্ত আইনও যে এক প্রকার বিধান—এ তত্ত্ব উপস্থিত করেন। এ্যাক্যুইনাসের মতে চরম বিধান অবশ্যই প্রাকৃতিক এবং ঐশ্বরিক বিধান। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনে মানুষের বিধানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই প্রসঙ্গে এ্যাক্যুইনাসের আইনের প্রকারভেদ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে আইন হচ্ছে চার প্রকারের। মানুষের তৈরি আইন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইনের স্থান হচ্ছে সর্বনিম্নে। মানুষিক আইনের উপর হচ্ছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশমূলক আইন। প্রত্যাদিষ্ট বিধানের উপরে হচ্ছে বিধাতার ইচ্ছার মূর্ত প্রকাশ, প্রকৃতির বিধান। এই প্রাকৃতিক বিধানের দৃষ্টান্ত হিসাবে এ্যাক্যুইনাস উল্লেখ করেন মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা, অপত্যস্নেহ এবং সমাজবদ্ধভাবে বাস করা মানুষের সহজাত প্রবণতা। কিন্তু সর্বোপরি হচ্ছে এক অবিনশ্বর বিধান। বিশ্বসৃষ্টির মূল হচ্ছে বিধাতার এই অবিনশ্বর বিধান। এই শাশ্বত বিধানের মাধ্যমেই বিধাতা বিশ্বচরাচর পরিচালিত করেন। চরম সত্য হচ্ছে এই শাশ্বত বিধান। রাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে এ্যাক্যুইনাস রাষ্ট্রীয় শাসনকে মানুষের সামাজিক চরিত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত করার কথা উল্লেখ করেন। এখানে এ্যাক্যুইনাসের মধ্যে এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রীয় দর্শনকে গ্রহণ করার যেমন আগ্রহ লক্ষ করা যায় তেমনি আবার রাষ্ট্রীয় শাসনের মূলে ঐশ্বরিক বিধানকে নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্র শাসনের সঙ্গে ধর্মকে তিনি যুক্ত করে দেন। বস্তুত যুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও ধর্মের প্রাধান্যকে এ্যাক্যুইনাস পরিত্যাগ করেন নি। তাই তাঁর মতে, জাগতিক সমস্যার শেষ মীমাংসাকারী হচ্ছে গির্জা বা ধর্ম। রাষ্ট্র শাসক রাষ্ট্রকে শাসন করতে ধর্মীয় বিধান কার্যকর করার জন্য। রাজা বা শাসক যদি ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করে তা হলে ধর্ম এবং ধর্মীয় গুরুর অধিকার আছে তাকে সমাজচ্যুত করে জনসাধারণকে রাজার প্রতি আনুগত্য পোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তিদানের। সেইন্ট টমাস এ্যাক্যুইনাসের এই রাষ্ট্রীয় দর্শনের মধ্যে রাজা ও গির্জার দ্বন্দ্বে গির্জার আধিপত্যের যুক্তি প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত পোপ এবং রাজার দ্বন্দ্বে পোপের বিজয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এ্যাক্যুইনাসের রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Time and Space : সময় ও স্থান

সাধারণভাবে বলা যায় যে, স্থান ও কাল হচ্ছে বস্তুর মৌলিক রূপ। কিন্তু 'স্থান' ও 'কাল' কথা দুটি যেমন গভীর অর্থবোধক তেমনি দর্শনের বিশেষ বিতর্কমূলক ভাব। আমরা প্রতিনিয়ত কথা দুটিকে ব্যবহার করি। আমরা বলি, এই বিশেষ ঘটনাটি এই সময়ে ঘটেছে : অর্থাৎ সময় হচ্ছে ঘটনার আধার—যেমন গ্লাস হচ্ছে পানির আধার। সব ঘটনা সময়ের মধ্যে ঘটে। আবার স্থানের ক্ষেত্রে বলি : চেয়ারটি ঐ স্থানে আছে ; বাটিটি এই স্থান থেকে ঐ স্থানে রাখ। অর্থাৎ বিভিন্ন খণ্ড বস্তুর আধার হচ্ছে স্থান। স্থানের মধ্যে বস্তু। কিন্তু

প্রশ্ন হচ্ছে, ঘটনা সময়ের মধ্যে থাকে—এর অর্থ কি এই যে, সময় বাস্তব অস্তিত্বময় কোনো সত্তা? অথবা সময় হচ্ছে মনের ভাব মাত্র? যদি ভাব হয়, তা হলে সে ভাব মনে কীভাবে আসে? সময়ের ভাব কি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আসে? না, সময়ের ভিত্তিতে আমরা অভিজ্ঞতাকে অনুধাবন করি? স্থান নিয়েও একই প্রশ্ন। বস্তু স্থানের মধ্যে থাকে। তা হলে স্থান কিসের মধ্যে থাকে। সেও যদি স্থানের মধ্যে থাকে তা হলে সেই স্থান কোত্থেকে উদ্ভূত হয়। আর স্থান যদি মনের ভাব হয় তা হলে এই ভাব আমরা কেমন করে সংগ্রহ করি। স্থান ব্যতীত আমরা কোনো বস্তুকে আদৌ বুঝতে পারি নে। বস্তু মাত্রকেই স্থানের পটভূমিতে বা স্থানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে বুঝতে হয়। তা হলে 'স্থান' ভাবটি কি আমাদের জন্মগত এবং সকল অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব ভাব? প্রকৃত পক্ষে 'স্থান' ও 'কাল' দর্শনের অন্যতম মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের দুরকম জবাব আদিকাল থেকে চলে এসেছে। এর একটি ভাববাদী অপরটি বস্তুবাদী। বার্কলে, হিউম, কান্ট এঁরা সবাই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে 'স্থান' 'কাল' হচ্ছে মানুষের জন্মগত এবং অভিজ্ঞতা উর্ধ্ব ভাব। এই দুটি ভাব না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে কোনো অভিজ্ঞতাকে বুঝা সম্ভব হতো না। বস্তু হচ্ছে ব্যক্তির কাছে শ্রেফ বিশৃঙ্খল চেতনাপুঞ্জ। এই চেতনাপুঞ্জকে ব্যক্তি তার জন্মগত এবং অভিজ্ঞতাউর্ধ্ব 'স্থান' ও 'কাল' রূপ ছাঁচে ঢেলে তাকে বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা হিসাবে উপলব্ধি করে। তাই সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলে আছে স্থান ও কাল। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থান ও কাল নয়। স্থান ও কালের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা। কিন্তু বস্তুবাদ স্থান ও কালকে কেবলমাত্র ভাব বা কোনো কাল্পনিক সূত্র বলে মনে করে না। বস্তুবাদের কাছে স্থান ও কাল বাস্তব এবং অভিজ্ঞতাগত। স্থান ও কাল বস্তুরই অবিচ্ছেদ্য রূপ। স্থান ও কালের বাইরে কোনো বস্তু নেই। আবার বস্তুর বাইরেও স্থান ও কালের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই।

Tocqueville : তকেভিলা (১৮০৫-১৮৫৯ খ্রি.)

ফরাসি চিন্তাবিদ ও লেখক আলেকসী দা তকেভিলা আমেরিকার গণতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আমেরিকা ভ্রমণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লিখিত তাঁর 'আমেরিকান ডিমোক্রাসি' বা 'আমেরিকার গণতন্ত্র' উনবিংশ শতকের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তাদের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থ ইংরেজিতে অনূদিত হলে তা জন স্টুয়ার্ট মিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিল এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে মিল তাঁর 'অন লিবারটি' বা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসঙ্গ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তার উৎস তকেভিলার 'আমেরিকার গণতন্ত্র' গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতার সমস্যার যে সমাধান ঘটে নি উল্লিখিত দুজন চিন্তাবিদই এরূপ অভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তকেভিলা এবং মিল উভয়ই আধুনিক গণতন্ত্রের অনিবার্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের উভয়ের মতে, ইতঃপূর্বে রাজতন্ত্র বা স্বৈরশাসকদের আমলে যদি সংখ্যা গরিষ্ঠের উপর সংখ্যা লঘিষ্ঠের স্বৈরাচারের সমস্যা ছিল, পার্লামেণ্টারী যে গণতন্ত্র আমেরিকা এবং ইল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও সংখ্যা লঘিষ্ঠের উপর সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। কারণ গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক কেবলমাত্র সংধ্যাধিক্যের যুক্তিতেই

সংখ্যালঘিষ্ঠের সকল বিপরীত মতামতকে উপক্ষো করে। কাজেই গণতন্ত্রেও সংখ্যানির্বিশেষে ব্যক্তির মতামতের স্বাধীনতার কোনো নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা নেই। তকেভিলা এবং মিল ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এরূপ আপসহীন মনোভাব পোষণ করতেন যে তাঁদের মতে শতের মধ্যে একজন ব্যক্তিরও যদি ভিন্নমত থাকে তবে সে ভিন্নমতকে নিরানব্বই জন ব্যক্তির দমন করার কোনো অধিকার নেই। এমন চিন্তায় এরূপ চিন্তাবিদদের মনে গণতন্ত্র একটি উভয় সঙ্কটরূপে প্রতিভাত হয়। গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা চলে না, আবার তাকে গ্রহণেও ব্যক্তির স্বাধীনতার সমস্যার সমাধান হয় না। তকেভিলা এবং মিল উভয়ই গণতন্ত্রকে অবশ্য সমর্থন করেন। কিন্তু সে সমর্থন অনিচ্ছুকের সমর্থন। এজন্য এঁদেরকে 'অনিচ্ছুক গণতন্ত্রী' বা ইংরেজিতে 'রিলাকটাণ্ট ডিমোক্রাটিস' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

Tolstoy Lev Nikolayevich : টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রি.)

বিখ্যাত রুশ মানবতাবাদী লেখক এবং চিন্তাবিদ। যে যুগে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থায় কৃষক সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল সে যুগের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক চিত্র টলস্টয়ের রচনাবলীতে সুপ্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থার যে মূল্যায়ন টলস্টয় করেন তার মধ্যে কৃষকদের জন্য তাঁর সহানুভূতি এবং সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবে কৃষ্টি অর্থনীতির রক্ষণশীল রূপের প্রভাব সুস্পষ্ট। একদিকে টলস্টয় পুঁজিবাদী অত্যাচার এবং কৃষকদের দুর্দশার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন, অপর দিকে তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের কথা বলেছেন। টলস্টয়ের দার্শনিক ও ধর্মীয় মতের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম, কনফুসীয় মতবাদ এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। টলস্টয়ের 'যুদ্ধ এবং শান্তি', 'আনাকারেনীনা' এবং 'রিজারেকশান' বা 'পুনর্জাগরণ' পৃথিবীময় পরিচিত।

Totemism : টোটেমবাদ

টোটেম হচ্ছে পবিত্র দ্রব্য বা পশু কিংবা তার প্রতীক। গাছ, গাছড়া, পশু ইত্যাদিকে পূর্বপুরুষ বা পূর্বপুরুষের প্রতীক বলে বিশ্বাস করা ছিল টোটেমবাদের বৈশিষ্ট্য। টোটেম কথাটি অবশ্য আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের রচিত শব্দ। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত রক্তের সম্বন্ধে সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ গোত্রের উদ্ভব ঘটেছে একটি বিশেষ পশু বা বিশেষ বৃক্ষ থেকে। কাজেই এই পশু বা বৃক্ষ হচ্ছে এই গোত্রের রক্ষক বা দেবতা। রক্তের বাইরে অপর সামাজিক সম্পর্কের তখন বিকাশ ঘটে নি। পশু শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ তখনো জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। এই অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে টোটেমের বিশ্বাসে। অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে টোটেমবাদের রেশ এখনও দেখা যায়। এমনকি পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী ধর্মে ঈশ্বর মানুষের পিতা বলে যে কল্পনা রয়েছে, কিংবা পশু বিশেষকে পবিত্র কিংবা অপবিত্র গণ্য করার যে বিধান এই সমস্ত ধর্মের অনুশাসনে পাওয়া যায় তার মধ্যেও মানুষের আদি টোটেম ধর্মের আভাস দেখা যায়। যে

কোনো দেশের লোককথা ও সাহিত্যে পশুর মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া বা মানুষের পশু জন্মগ্রহণের যে কাহিনী পাওয়া যায় তাও পশুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের টোটেমবাদী বিশ্বাসের রেশ।

Toynbee Arnold Joseph : আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবী (১৮৮৯ খ্রি.)

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক। তাঁর ইতিহাসের দর্শনের মূলতত্ত্ব হলো, ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিক গতি নেই। ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি সভ্যতার বৃত্তের সমষ্টি। একটা সভ্যতা জন্মলাভ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তার চরম বৃদ্ধির পরে তার ক্ষয় শুরু হয় এবং ক্ষয়ের শেষে তার পতন বা মৃত্যু ঘটে। আবার নতুন সভ্যতা জন্মলাভ করে। সেও বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের প্রক্রিয়ার পরিণামে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই এক একটা সভ্যতা হচ্ছে এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্ত বা চক্র।

Transition from Quantity of Quality : পরিমাণ থেকে গুণে রূপান্তর

জগতের দ্বান্দ্বিক গতির একটা মৌলিক সূত্র হচ্ছে পরিমাণ থেকে গুণে রূপান্তর। ব্যক্তির দেহ, বস্তুজগৎ কিংবা মানুষের সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনো অস্তিত্বে যে পরিবর্তন ঘটে তার একটা পরিমাণগত হিসাব চলতে পারে। অর্থাৎ কম থেকে অধিক পরিবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তন এমনি ধারায় কেবল পরিমাণের বৃদ্ধি করেই চলে না। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিমাণের বৃদ্ধিতে একটা বিশেষ অবস্থায় অস্তিত্বের মধ্যে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। এই মুহূর্তকে সংকট মুহূর্ত মনে করে বলা যায় যে, পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে সংকট মুহূর্তে পরিমাণ গুণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বস্তুজগতে এর একটি সাধারণ এবং সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে উত্তাপের বৃদ্ধিতে একটি মুহূর্তে পানির বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করা যায়। পানি যখন বাষ্প হয়ে যায় তখন পানির একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। কারণ পানি এবং বাষ্প ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সমাজের বিকাশেও পরিমাণ থেকে গুণে পরিবর্তনের এই সূত্রকে আবিষ্কার করেছে। সমাজ যে পর্যায় থেকে পর্যায়ে রূপান্তরিত হয় সেও সমাজদেহে ক্রমপরিবর্তনের বৃদ্ধিতে একটা সংকট মুহূর্ত সৃষ্টি হওয়ার কারণে। সমাজদেহের সংকট মুহূর্ত হচ্ছে বিপ্লবী মুহূর্ত। পরিমাণগত এবং গুণগত কথা দুটি অবশ্য আপেক্ষিক। বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ছাড়া অধিকতর পরিমাণকে অনেক সময়ে অল্পতর পরিমাণের তুলনায় গুণগত পরিবর্তন বলা হয়। যেমন পুঁজিবাদের গোড়ার সঙ্গে অর্থাৎ স্বাধীন প্রতিযোগিতার যুগের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভবের যুগকে যদি তুলনা করা হয় তা হলে একচেটিয়া পুঁজিবাদী যুগকে সীমাবদ্ধ অর্থে পুঁজিবাদের গুণগত পরিবর্তিত রূপ বলে আখ্যায়িত করা চলে। কেননা একটির সঙ্গে অপরটির পরিমাণগত পার্থক্য বিরাট। তথাপি মৌলিক চরিত্র অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অধিক সংখ্যক মানুষ অর্থাৎ শ্রমিকদের শোষণের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে সঙ্কট মুহূর্ত উপনীত হলে শ্রমিকশ্রেণীর মালিকানার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুণগতভাবে পৃথক একটি সামাজিক সত্তার উদ্ভব ঘটে।

Trotsky : ট্রটস্কী (১৮৭৯-১৯৪০ খ্রি.)

বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী নেতা। জারের আমলে ১৮৯৮ সালে ট্রটস্কী প্রথম তাঁর রাজনীতিক কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হন। তাঁকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসন থেকে পলায়ন করে ট্রটস্কী লণ্ডন যান। লণ্ডনে তখন (১৯০২) লেনিন প্রবাস জীবন-যাপন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে লেনিনের সঙ্গে রুশ সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে পার্টির মধ্যে বিপ্লবের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। অধিক সংখ্যক সদস্য লেনিনের নেতৃত্ব স্বীকার করেন। অধিক সংখ্যক সদস্যের এই অংশ বলশেভিক পার্টি বলে পরিচিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠগণ মেনশেভিক বলে পরিচিত হয়। ট্রটস্কী মেনশেভিকদের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য জার সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুনরায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। সাইবেরিয়া থেকে ট্রটস্কী পুনরায় পলায়ন করেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। কিন্তু পরে রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং বলশেভিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে নভেম্বরের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করেন। বিপ্লবের সময়ে রাজধানী পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তিনি পেট্রোগাড সোভিয়েতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কিছুকাল সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। ট্রটস্কী মতামতে অস্থির ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাকপটুতা খুব বিখ্যাত ছিল। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেন। বিপ্লবের পরে, বিশেষ করে লেনিনের মৃত্যুর পরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে তার বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর বিপ্লবী চিন্তায় কল্পনার আধিক্য ছিল। তিনি স্থায়ী বিপ্লবের এক তত্ত্ব রচনা করেছিলেন। তাঁর মতে বিপ্লবের কোনো বিরাম নেই এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একইকালে সমগ্র পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। না হলে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো দেশে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলেও টিকে থাকতে পারে না। লেনিন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে স্ট্যালিন এক দেশে, বিশেষ করে বৃহৎ রাশিয়ায় বিশেষ কারণে সমাজতন্ত্র টিকে থাকতে পারে, এই নীতি নিয়ে সমাজতন্ত্র তৈরি করার কাজে অগ্রসর হন। স্টালিনের সঙ্গে ট্রটস্কীর তত্ত্বগত এবং নেতৃত্বগত বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বিরোধের পরিণামে ১৯২৭ সালে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং ১৯২৯ সালে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ট্রটস্কী মেক্সিকোতে যখন অবস্থান করছিলেন তখন ১৯৪০ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন। স্ট্যালিন-বিরোধীগণ মনে করেন ট্রটস্কীর এরূপ মৃত্যুর পেছনে স্ট্যালিনের প্ররোচনা ছিল।

Unconscious : অচেতন

অচেতনের দুটো অর্থ করা যায়। ১. মানুষের অচেতন কাজ। ব্যক্তি সচেতনভাবে যেমন কাজ করে তেমনি সে এমন অনেকগুলি কাজ করে যেগুলিতে তার চেতনা এবং বুদ্ধির ভূমিকা প্রত্যক্ষ নয়। যেমন, চোখের পাতা নড়া। চোখের পাতা আমরা সচেতনভাবেও নাড়তে পারি। এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের সচেতন ইচ্ছা এবং চেষ্টা ছাড়াও চোখের পাতা নড়ে। আমরা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় কেউ আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়কে উত্তেজক দ্বারা স্পর্শ করলে সে ইন্দ্রিয় প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ কাজ আমাদের চেতনা এবং বুদ্ধির দ্বারা সংঘটিত নয়। যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত দেয়াশলাই এর কাঠি আঙুলে ছোঁয়ালে আঙুল আত্মরক্ষার্থে আগুন থেকে সরে যায়। স্বপ্নের ঘোরে ঘুমন্ত অবস্থায় অনেকে অনেক সময় হাঁটে কিংবা অপর কোনো কাজ করে। একেও অচেতন কাজ বলা যায়। কেননা সমস্ত শরীর দিয়ে সে সচেতন ব্যক্তির ন্যায় কাজটি করলেও ব্যক্তি সজাগ ও সচেতন নয়। ২. দ্বিতীয় অর্থে অচেতন বলতে মনের একটি বিশেষ বিভাগকে বুঝানো হয়। ফ্রয়েডবাদীগণ মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে : চেতন, অবচেতন এবং অচেতন। মানুষের মনের চেতন স্তর খুবই সংকীর্ণ। মানুষের অভিজ্ঞতার খুব সামান্যই চেতন স্তরে বিরাজ করে। অভিজ্ঞতার কিছু থাকে চেতনের কাছাকাছি অবচেতনে। অবচেতনের স্মৃতি, ঘটনা, বাসনা মন ইচ্ছা করলেই চেতনের মধ্যে টেনে আনতে পারে। কিন্তু মানুষের কামনা বাসনা—বিশেষ করে অবদমিত কামনা বাসনার অধিকাংশ আশ্রয় গ্রহণ করে মনের অচেতন কোঠায়। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার অধিকাংশের উৎস হচ্ছে যৌনানুভূতি। কিন্তু ব্যক্তির এই যৌনানুভূতি-সঞ্জাত কামনার অধিকাংশের সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতির বিরোধ বর্তমান। ব্যক্তি যেমন ইচ্ছা তেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সমাজে বসবাস করে তার কামনাকে চরিতার্থ করতে পারে না। হয়ত আদিমকালে যখন সামাজিক বিধিনিষেধ তৈরি হয় নি তখন পারত। কিন্তু জটিল সভ্য সমাজে ব্যক্তির বাসনার অধিকাংশই অতৃপ্ত থেকে যায়। ব্যক্তির চেতনা পরিবেশকে মেনে নেয় অতৃপ্ত কামনাকে দমন করে। কিন্তু বাসনামাত্রই একটা শক্তি। তৃপ্ত কামনার শক্তি তৃপ্তিতে নিঃশেষ হয়। কিন্তু অতৃপ্ত কামনার শক্তি নিঃশেষ হয় না। অতৃপ্ত এবং অবদমিত কামনার সঙ্গে শুধু পরিবেশের নয়, ব্যক্তির চেতনারও বিরোধ ঘটে। অব্যয়িত শক্তির অবদমিত কামনা নিয়ত নিজের তৃপ্তির পথ অন্বেষণ করে। ব্যক্তির চেতনা তাদেরকে আর নিজের ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত বলে স্বীকার করতে চায় না। অবদমিত কামনা তাই চেতনার মাধ্যমে আর তৃপ্তি পেতে পারে না। চেতনা সমাজের বিধিনিষেধের প্রতিরক্ষী হিসাবে অচেতনের দরওয়াজা আটকে রাখে যেন অবদমিত কামনা অবচেতনের মধ্য দিয়ে চেতনায় আবার প্রবেশ করতে না পারে। অবদমিত কামনা তাই অচেতনের কোঠা থেকে স্বপ্নের

ঘোরে, শরীরের নতুন কেনো বিকারে বা উপসর্গে কিংবা অপর কোনো দুর্বোধ্য আকারে চেতনাকে এড়িয়ে নিজেদের তৃপ্তি সাধন করতে চায়। কাজেই ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে অচেতন নিষ্ক্রিয় বা শক্তিহীন নয়। ফ্রয়েড নিজে এবং তাঁর অনুসারীগণ মনের এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মনোবিকার নিরসনের জন্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করেন। কিন্তু সে পদ্ধতি মনোবিকারের নিরাময়ের খুব কার্যকর বলে প্রমাণিত হয় নি। মনের এই ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চেয়ে ভাববাদী কল্পনার ব্যবহার অধিক বলে মনোবিজ্ঞানের আচরণবাদী এবং অন্যান্য ধারা অভিমত পোষণ করে।

Unity and Conflict of Opposites, Law of : পরস্পরবিরোধী শক্তির ঐক্য এবং সংঘাতের বিধান

গতিময় বস্তু—অর্থাৎ বস্তুজগতের অস্তিত্বের একটি মৌলিক বিধান হচ্ছে পরস্পরবিরোধী শক্তির ঐক্য এবং সংঘাতের বিধান। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিধানটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল বিধানই হচ্ছে পরস্পরবিরোধী শক্তির ঐক্য এবং বিরোধের বিধান। এই বিধানের অর্থ হচ্ছে : অস্তিত্ব মাত্রেরই দুটি রূপ : অস্তি এবং নাস্তি। অস্তির বিরুদ্ধে নাস্তি। নাস্তির বিরুদ্ধে অস্তি। অস্তি এবং নাস্তির বিরোধ সততই চলছে। এর কোনো বিরাম নেই। অস্তি নাস্তির বিরোধের মধ্য দিয়েই একটা বিশেষ অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। বস্তুত গতি যেমন এই বিরোধের ফল, তেমনি আবার এই বিরোধ বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। বস্তু মানেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তু। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বে অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দুরকমে করা হতো। একটি ব্যাখ্যা ছিল ধর্মীয় এবং ভাববাদী দর্শনের। ঈশ্বর বা চরম ভাব যা কিছু অস্তিত্ব তার সৃষ্টির মূল। ঈশ্বর বা চরম ভাব অস্তিত্ব সৃষ্টি করে দেওয়ার পরেই অস্তিত্বের বিবর্তন শুরু হয়েছে। এবং অস্তিত্বমাত্রই মূলত ঈশ্বরের বা ভাবের প্রকাশ। বস্তুর কোনো মৌলিক অস্তিত্ব নেই। এর বিরোধিতায় বস্তুবাদ বস্তুর অস্তিত্বকে মূল বলেছে। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত বিশেষ করে এই দ্বন্দ্বের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বস্তুর গতির জন্য বস্তুবাদ বস্তু বহির্ভূত কোনো কারণ বা শক্তির প্রয়োজনীয়তা বোধ করত। বস্তুকে তখন জড় পদার্থ বলে মনে করা হতো। আর তাই এক টুকরা পাথরের স্থান পরিবর্তনের জন্য যেমন পাথরটুকরাটির বহির্ভূত অপর কোনো শক্তির আঘাত আবশ্যক, তেমনি সমগ্র বস্তুজগতের গতির জন্য জগৎ-বহির্ভূত এক শক্তির প্রয়োজন। পূর্বের ব্যাখ্যা বস্তুবাদকে যান্ত্রিক বস্তুবাদ সীমিত করে রাখছিল। বস্তুর গতির জন্য বস্তু বহির্ভূত শক্তির প্রয়োজন বোধ করলে বস্তুবাদ পরিণামে ভাববাদে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এ কারণে বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় এবং বিজ্ঞানের বিকাশে বস্তুর দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা একটি বিপ্লব বিশেষ। বস্তু মানেই বিরোধাত্মক শক্তির সম্মেলন—এই তত্ত্বে এবার আর বস্তুর গতির জন্য বস্তুর বাইরে তাকাবার আবশ্যকতা রইল না। অবশ্য বস্তুর দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার চেষ্টা অভিনব নয়। প্রাচীন গ্রিসে হিরাক্লিটাসের চিন্তায় এর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বস্তুজগতের মধ্যে বিরোধ অনস্বীকার্য। কিন্তু এই বিরোধকে যুগে যুগে ভাববাদী দর্শন বাহ্যিক এবং মায়া বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিরোধের এই বিধানকে ইতিহাস এবং সমাজের উপর প্রয়োগ করে সমাজের বিকাশের ধারাও আবিষ্কার করেছে। সমাজের বিকাশ এই বিরোধের বিধানের একটি সহজবোধ্য দৃষ্টান্তও বটে। সমাজের বিকাশ বিরোধের বিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্যেরও সাক্ষ্য বহন করে। সে বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে গতি কেবল তাই নয়। দ্বন্দ্ব নিজেও গতিময়। অর্থাৎ একটা অস্তিত্বের মধ্যে যখন অস্তি ও নাস্তিতে বিরোধ চলতে থাকে তখন সেই বিরোধের মাধ্যমে অস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পরিবর্তন সংঘটিত হতে হতে একটা স্তরে এমন আর এক অস্তিত্বের উদ্ভব ঘটে যে অস্তিত্বের মধ্যে পূর্বকার অস্তি ও নাস্তির একটা সমন্বিত চরিত্র প্রকাশ পায়। আবার এই নতুন অস্তিত্বের মধ্যে নাস্তির উদ্ভব ঘটে এবং অস্তি নাস্তির বিরোধ প্রবল হয়ে অপর এক নতুনতর অস্তিত্বের সৃষ্টি ঘটায়। দ্বন্দ্বের এই অগ্রগতিকে আমরা অস্তি, নাস্তি এবং 'সমস্বস্তি' (সমন্বিত অস্তিত্ব) বলে প্রকাশ করতে পারি। বিরোধের এই গতিতেই জগৎ বিবর্তিত হচ্ছে ; নতুন থেকে নতুনতর সৃষ্টি বৈচিত্র্যের দিকে সমাজের এবং জগতের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। তা না হলে কেবলমাত্র বিরোধ সত্য হলে সে বিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিকাশের পরিবর্তে বদ্ধ চক্রের মধ্যে আবর্তে পর্যবসিত হতো। দাস সমাজের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির মধ্যকার বিরোধ বৃদ্ধি পেতে পেতে নতুন সমাজ সামন্তবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। সামন্তবাদ পূর্বকার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়। পূর্বকার সামাজিক বিরোধের একটা সাময়িক বিরাম ঘটেছে সামন্তবাদে। এদিক দিয়ে সামন্তবাদ পূর্বেকার প্রভু ও দাসের পারস্পরিক বিরোধের নিরসনজনিত উভয় শক্তির একটি সমন্বিত রূপ বলা যায়। পুঁজিবাদও তেমনি সাময়িকভাবে সামন্তবাদের অসঙ্গতির বিরোধের বিরাম বুঝায়। ভূমিদাসের অবসান ঘটেছে। কৃষক জমির অধিকার পেয়েছে। কেবল জমির অধিকার পায় নি, যে জমিহীন কৃষক সে স্বাধীনভাবে কারখানার শ্রমদাস হওয়ার 'অধিকার'ও লাভ করেছে। পুঁজির প্রভুই এ সমাজের প্রধান প্রভু। শ্রম-দাসই এ সমাজের প্রধান দাস। এ সমাজ তাই যেমন পুরাতনের পরিবর্তন, তেমনি পুরাতন ঐতিহ্যের ধারাবাহক। কিন্তু এ সমাজের গোড়ার দিকে বিরোধের প্রাবল্য না থাকলেও আবার নুতন প্রভু এবং নতুন দাসের বিরোধ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে পরিণামে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়। সমাজতন্ত্রে শ্রেণীবিরোধের অবসান ঘটে। কিন্তু উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার যেখানে বিরোধ ছিল সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটেছে এবং উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রে সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই এখানেও পুরাতনের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি নতুনের মধ্যে পুরাতনের ধারাবাহিকতারও অস্তিত্ব রয়েছে।

Universe : বিশ্ব

স্থান ও কালে বিস্তারিত সীমাহীন বৈচিত্র্যময় বস্তুর সামগ্রিক নাম হচ্ছে বিশ্ব। আধুনিক বিজ্ঞান তার বাস্তব পরিমাপের হিসাবে যে জগৎ-কে জ্ঞানের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে সে জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে আমাদের বিশ্বের অসীমতার ধারণাকে

পূর্বের চাইতে অধিকতর বিস্তৃত করে দিয়েছে। (বিজ্ঞানের পরিমাপকের পরিধি ৩০০ কোটি আলোকবৎসর পর্যন্ত বিস্তারিত। এক আলোকবৎসরের পরিমাণ হচ্ছে ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল) জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে আমরা যে সৌরমণ্ডলে বাস করছি—সেটাই একমাত্র সৌরমণ্ডল নয়। অসংখ্য তারকার প্রত্যেকটি তারকাই এক একটি সূর্য। প্রত্যেকেরই গ্রহ উপগ্রহের মণ্ডল আছে। আবার বহু মণ্ডলের স্তূপ নিয়ে রয়েছে মণ্ডল-স্তূপ। এই মণ্ডলে-স্তূপেরও স্তূপ আছে। বস্তুর বিভিন্ন সংগঠনের এই মণ্ডলগুলি গঠিত। বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের কিছুটার সঙ্গে পৃথিবী গ্রহের মানুষ পরিচিত হয়েছে। কিন্তু বস্তুর সাংগঠনিক বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণকারী কোনো নির্দিষ্ট বিধানকে মানুষ আজো আবিষ্কার করতে পারে নি।

Upanishad : উপনিষদ

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ। বেদের ব্যাখ্যা উপনিষদ। শতশত বৎসর ধরে বেদসমূহের যে ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে তার সংকলনে তৈরি হয়েছে উপনিষদ। প্রাচীনতম উপনিষদের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব দশ থেকে ষষ্ঠ শতককে মনে করা হয়। উপনিষদে বেদের দেবতাদের নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে। পুনর্জন্মের তত্ত্বকে মানুষের সৎ অসৎ কার্যের সঙ্গে যুক্ত করে তার একটা নীতিগত যৌক্তিকতা দাঁড় করানো হয়েছে। চরম সত্য কি? কোন্ সত্যের জ্ঞানে সব সত্যের জ্ঞান লাভ ঘটে? এসব প্রশ্নের একটা ভাববাদী জবাব দিয়ে উপনিষদকারগণ বলেছেন ব্রহ্মই হচ্ছে সব সত্যের সেরা সত্য সব অস্তিত্বের সেরা অস্তিত্ব, ব্রহ্ম থেকেই সব অস্তিত্বের সৃষ্টি, আবার ব্রহ্মতেই সব সৃষ্টির লয়। জন্ম হচ্ছে বন্ধন। পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষকে ধ্যান করতে হবে সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে যার সঙ্গে মানুষের আত্মা অভেদ। দেহের বারংবার জন্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি হচ্ছে আত্মার কাম্য। পুনর্জন্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আত্মা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যায়। উপনিষদে বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শনেরও আভাস পাওয়া যায়। কেননা লোকায়ত দর্শনকে খণ্ডন করে উপনিষদকারগণ বেদের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। উপনিষদ থেকেই দেখা যায় যে, লোকায়ত দর্শনের মতে সৃষ্টির মূলে আছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম, বায়ু, স্থান ও কালরূপ বস্তু। লোকায়ত দর্শন মানুষের মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে।

Utilitarianism : উপযোগবাদ

ধনবাদী সমাজের নীতিশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব হচ্ছে উপযোগবাদ। বেনথাম এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ব্যক্তির আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের মাপকাঠি কি? পূর্বে ধারণা করা হতো যে, মানুষের ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হয় ঐশ্বরিক বিধানের সঙ্গে মানুষের আচরণের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে। ঈশ্বর বা পরম মহৎ-এর অনুসরণে যে কাজ সম্পাদিত হবে এবং যে কাজ যত অধিক সেই পরম মহৎ-এর নিকটবর্তী হতে পারবে সে-কর্ম বা আচরণ তত ন্যায্য। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগের দার্শনিক বেনথাম বললেন,

চরম মহৎ নয়, আচরণ থেকে ব্যক্তির সুখ দুঃখলাভের পরিমাণই তার ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি। কোনো আচরণে ব্যক্তি সুখের চেয়ে দুঃখ অধিক ভোগ করে তবে সে আচরণ অসঙ্গত, অনুপযোগী। কারণ ব্যক্তিমাত্রই সুখের অন্বেষণ করে। সুখ হচ্ছে ব্যক্তির চরম চালক শক্তি, বিশিষ্ট কোনো উত্তম বা মহৎ-এর অস্তিত্ব বা ভাব নয়। কোনো আচরণে ব্যক্তির সুখের পরিমাণ যদি দঃখের পরিমাণের চেয়ে অধিক হয় তা হলে সে আচরণ ন্যায্য। আচরণ বিচারের তাই নিরিখ হবে : ব্যক্তির অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক পরিমাণ সুখ। বেনথামের উপযোগবাদে সুখের পরিমাণের উপর অত্যধিক জোর ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল উপযোগবাদের ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিসহ করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে সুখ কেবল পরিমাণের ভিত্তিতেই যে নির্দিষ্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। সুখের গুণগত চরিত্রের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। স্থূল সুখের চেয়ে মহৎ সুখ ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত। দৈহিক সুখই আসল সুখ নয়। মানসিক সুখ দৈহিক সুখের চেয়ে শ্রেয় বোধ হতে পারে। উপযোগবাদ রাষ্ট্রীয় কাজের ঔচিত্য অনৌচিত্য নির্ধারণেও সুখের নিরিখ প্রয়োগ করেছে। রাষ্ট্রীয় যে আইন সর্বাধিক সুখ সাধন করে কেবল সেই বিধানই সঙ্গত বিধান। উপযোগবাদের এই তত্ত্ব ধনবাদী গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি কিছু পরিমাণে বিস্তৃত করতে সহায়ক শক্তির কাজ করেছে। জ্ঞানের তত্ত্বে উপযোগবাদের প্রয়োগে প্রয়োগবাদ বা কার্যকরবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

V

Vaiseshika : বৈশেষিক

বিশেষ থেকে বৈশেষিক। প্রাচীন ভারতের দর্শন শাখাসমূহের একটি শাখা বৈশেষিক দর্শন নামে পরিচিত। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে মুনি কনাদ বৈশেষিক সূত্রে এই দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। খিষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে সংগ্রহসূত্রে বৈশেষিক দর্শন আরো সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। বৈশেষিক দর্শনে বস্তুবাদী অভিমতের বেশ স্পষ্ট সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৈশেষিক দর্শনের সমস্ত অস্তিত্বকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন সত্তা, গুণ, ক্রিয়া, সার্বিকতা, বিশিষ্টতা, অধিকার এবং অনস্তিত্ব। সত্তা, গুণ এবং ক্রিয়া সাবয়ব অর্থাৎ এদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সার্বিকতা, বিশিষ্টতা এবং অধিকার যুক্তির সূত্র। এরা মানসিক ক্রিয়ার ফল। বিশিষ্টতার সূত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্টভাবেই সত্তার প্রকাশ। বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণ বিশিষ্টতা। জগতের সব বস্তুর দুটি চরিত্র তার গুণ এবং ক্রিয়াশীলতা। বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে নটির কথা উল্লেখ করা যায় : ক্ষিতি বা মাটি, পানি, আলো, বাতাস, ব্যোম বা ইথার, স্থান, কাল, আত্মা এবং মন। এর মধ্যে ক্ষিতি, পানি, আলো, বাতাস এই চারটি মূল। এই চার প্রকার সত্তার অণুর কোনো বিস্তার নেই। কিন্তু বিস্তারময় সব বস্তুর সৃষ্টি অণুর সম্মেলনে। অণুর মিলনের মূলশক্তি বিশ্ব আত্মা। পৃথিবী স্থান কাল এবং শূন্যে অবস্থিত। অণুর গতিতে পৃথিবীর গতি। আর এই গতিতেই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ধারা। অণুকে তাদের গুণের ভিত্তিতে চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এই চার রকম অণুর বস্তুর মধ্যে স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ এবং দৃষ্টি এই চার রকম গুণের উৎপত্তি ঘটায়। জ্ঞানের তত্ত্বে বৈশেষিকের সঙ্গে ন্যায়ের সাদৃশ্য আছে। বৈশেষিক চার রকম সত্য জ্ঞান এবং ভ্রান্ত ধারণার বিভাগ স্বীকার করে। অবলোকন, অবরোহণ, স্মরণ এবং সজ্ঞা এই চারটি সূত্র হচ্ছে সত্য জ্ঞান লাভের মাধ্যম।

Vedanta : বেদান্ত

বেদের অন্ত বেদান্ত। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটি শাখা বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদান্তে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার সংমিশ্রণ দেখা যায়। বেদান্ত সূত্রাকারে তৃতীয় এবং চতুর্থ খ্রিষ্ট শতকে এই দর্শনের সুসংবদ্ধতা ঘটে। বেদান্ত দর্শনে দুটো ধারার বিকাশ ঘটেছে। একটি হচ্ছে অদ্বৈতবাদী অভিমত। খ্রিষ্টাব্দের অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈততত্ত্বের যুক্তিগত ব্যাখ্যা রচনা করেন। অদ্বৈত মতে মূল সত্তা হচ্ছে এক ঈশ্বর। ঈশ্বর নির্গুণ, নিঃশর্ত এবং নিঃসংজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঈশ্বর সংজ্ঞার অতীত। কিন্তু বিশ্বের বিচিত্র অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কি? অদ্বৈত মতে বিশ্বের বৈচিত্র্য মায়া, সত্য নয়। অবিদ্যার কারণেই মানুষের মনে এই মায়া বা বস্তুকে সত্য ধারণার ভ্রমের সৃষ্টি হয়। সত্য জ্ঞানের পথ হচ্ছে সজ্ঞা বা অলৌকিক অনুভূতি।

ইন্দ্রিয় বা অনুমান আমাদের যথার্থ জ্ঞান দান করতে পারে না। ব্যক্তির সাধনা হবে মায়া-রূপ বৈচিত্র্যের অন্তরালে যথার্থ ঐক্য এবং সত্তার জ্ঞান লাভের সাধনা করা। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় ধারা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বলে পরিচিত। রামানুজের হাতে খ্রিষ্টীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে এই ধারার ব্যাখ্যা রচিত হয়। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মতে সত্তা তিন প্রকার বস্তু, আত্মা এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর। বস্তু, আত্মা এবং পরমাত্মা পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যক্তির দেহের নিয়ামক ব্যক্তির আত্মা। কিন্তু পরমাত্মা আমাদের দেহ এবং মন—উভয়ের নিয়ন্তা। পরমাত্মা বাদে দেহ এবং মন উভয় ভাব হতে পারে কিন্তু তারা অস্তিত্ব পেতে পারে না। ব্যক্তির সাধনা হবে বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের সাধনা। এ সাধনার উপায় হচ্ছে ধর্ম, জ্ঞান এবং পরমাত্মার প্রেমে নিজেকে লিপ্ত করা। ধর্ম হিসাবে অদ্বৈত ধর্মের আরাধ্য হচ্ছে শিব এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতের আরাধ্য বিষ্ণু। বেদান্ত দর্শন প্রাচীন ভাববাদী দর্শনের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

Vedas : বেদ

বেদ এর অর্থ জ্ঞান। প্রাচীন ভারতের প্রধান ধর্ম ও জ্ঞানগ্রন্থ ছিল বেদ। হিন্দুগণ বেদকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে সম্মান করে। বেদ চারভাগে বিভক্ত ঋক, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব। বেদব্যাস বা ব্যাসমুনি বেদের এই বিভাগকরণ সম্পন্ন করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। বেদের সূত্রসমূহের রচনা বা সংগ্রহ খ্রিষ্টপূর্ব দশম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বেদের সংখ্যা হিসাবে রচিত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদের সূত্রসমূহকেও বেদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। উপনিষদ বেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। উপনিষদের ব্যাখ্যার প্রধান বিষয় : ঈশ্বর, মানুষ এবং প্রকৃতি।

Vivekananda : বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি.)

উনবিংশ শতকের ভারতের অন্যতম চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং জাতীয়তাবোধ সঞ্চারকারী নেতা। বিবেকানন্দের পারিবারিক নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮০—৮৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি মানবতাবাদী ধর্মীয় নেতা এবং দার্শনিক রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাবে আসেন এবং সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তিনি বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। বিবেকানন্দ অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। অদ্বৈতবেদান্ত অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় জীবনাদর্শের ব্যাখ্যাদানের জন্য ১৮৯৩ সাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবী পর্যটনে বের হন এবং যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড এবং জাপানে বহু সুধী সমাবেশে ভাষণ দান করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন নামক ধর্ম প্রচারকারী এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। বিস্ময়কর কর্মোদ্যোগের পুরুষ ছিলেন বিবেকানন্দ। ধর্মপ্রচারে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ভারতবর্ষের তখনকার সামাজিক, রাজনীতিক সমস্যাও তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল। তিনি রাজনীতিক স্বাধীনতার পরিপোষক ছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের নিকট প্রার্থনা করার যে নীতি তখন জাতীয় নেতৃত্ব অনুসরণ

করছিল তিনি তার বিরোধিতা করেন। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণভেদের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন যে, এগুলি সামাজিক বিকাশের পর্যায়সূচক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শাসন শেষ হয়েছে। পুঁজিবাদী যে সমাজ চলছে, সে হচ্ছে বৈশ্যের সমাজ। কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ হবে শূদ্রের সমাজ অর্থাৎ নির্যাতিত মানুষের সমাজ।

Voltaire : ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রি.)

ভলটেয়ার ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের বহুমুখী প্রতিভা। ভলটেয়ার একাধারে, লেখক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং ফরাসিদের নবজাগরণের নেতা ছিলেন। ভলটেয়ার আপসহীনভাবে সামন্তবাদ এবং খ্রিষ্টীয় গোঁড়ামীর বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনার ধার শাসকগোষ্ঠীর নিকট অসহনীয় ছিল। সামন্তবাদ বিরোধী বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য সরকার ভলটেয়ারকে ১৭১৭ সালে একবার এবং ১৭২৫ সালে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করে। জীবনের প্রধান অংশ ভলটেয়ারকে দেশেই বাইরে অতিবাহিত করতে হয়। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি চিন্তাবিদদের আর একটি অবদান ছিল জ্ঞানকোষ রচনা। দার্শনিক ডিডেরটের সঙ্গে ভলটেয়ার এই জ্ঞানকোষ রচনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক অভিমত পোষণের ব্যাপারে ভলটেয়ারের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তিনি বিজ্ঞান বাস্তব জীবনের নিয়ামক বলেছেন তেমনি অপরদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। বিজ্ঞান সত্য। তথাপি বিশ্বের একজন মূল পরিচালক আছেন। তিনি ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় তিনি ধর্মীয় ব্যাখ্যা অস্বীকার করতে চেয়েছেন। প্রকৃতি শাশ্বত বিধানের নিয়মে ক্রিয়াশীল। ঈশ্বর প্রকৃতি থেকে কোনো আলাদা অস্তিত্ব নয়। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশীলতা ঈশ্বর। ভলটেয়ার মন বা আত্মাকে ঈশ্বরের ন্যায় অস্তিত্বময় সত্তা হিসাবে স্বীকার করেন নি : তাঁর মতে চেতনা বস্তুরই অন্তর্নিহিত চরিত্র। কিন্তু এ চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে সজীব দেহে, অপর কোথাও নয়। ভলটেয়ার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপসহীন ছিলেন। দেকার্ত-এর আত্মা এবং জন্মগত ভাবের অভিমত ভলটেয়ার অস্বীকার করে পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে অভিমত প্রকাশ করেন। জ্ঞানের প্রশ্নে ভলটেয়ার লকের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বস্তুবাদের দুর্বলতা এখানে যে, ভলটেয়ার অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মূল বললেও আবার তিনি বলেছেন যে, অভিজ্ঞতাই আমাদের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করে যে বিশ্বের একটা মূল কারণ বা সংগঠক কেউ আছেন। ভলটেয়ার ছিলেন বিকাশমান পুঁজিবাদী শ্রেণীর ভাবগত মুখপাত্র। কারণ তিনি সামন্তবাদের বিরোধিতা করেছেন ; আইনের চোখে সকল মানুষ সমান একথা বলেছেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির মালিকদের ওপর কর ধার্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এগুলি সবই পুঁজিবাদের বিকাশের সহায়ক। ভলটেয়ার তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের, কৃষকের এবং শ্রমিকের দুরবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং মনে করতেন যে, সমাজে ধনী এবং দরিদ্রের বিভাগ চিরন্তন ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রশ্নে ভলটেয়ার সংবিধানগত রাজতন্ত্রকে সর্বোত্তম শাসন

বলে প্রথমদিকে গণ্য করেছিলেন। জীবনের শেষের দিকে অবশ্য তিনি রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্রের মতও পোষণ করেছেন। ইতিহাসের উপর রচিত গ্রন্থাবলীতে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে বাইবেল এবং খ্রিষ্টধর্মের ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। তিনি সমাজের বিকাশের একটি রূপরেখা অঙ্কন করেন। এতে তাঁর ইতিহাসের দর্শন প্রকাশিত হয়। ইতিহাসেরও দর্শন আছে এ ব্যাখ্যা ভলটেয়ারই প্রথম উপস্থিত করেন। ইতিহাসের বিকাশ ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে ঘটে। অবশ্য এই বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে মানুষের ভাবাদর্শ, বাস্তব অর্থনীতিক কারণ এবং আর্থনীতিক শ্রেণী নয়। ইতিহাসের এ ব্যাখ্যা ভাববাদী, ভলটেয়ারের রচনার প্রধান ভঙ্গি ছিল বিদ্রূপাত্মক। আর তার বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য ছিল গোঁড়া যাজক সম্প্রদায়। তিনি খ্রিষ্টীয় গির্জাকে মানুষের প্রগতির প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বিশেষ করে অন্যায়ের দণ্ডদানকারী ঈশ্বরের অস্তিত্বের কল্পনা সাধারণ মানুষের জন্য তিনি আবশ্যক বলে বোধ করতেন। ভলটেয়ার রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ফরাসি বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

Wang Chung : ওয়াং চুং (২৭-১০৪ খ্রি.)

ওয়াং চুং ছিলেন চীনের খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের বস্তুবাদী দার্শনিক। স্বর্গ কিংবা ঈশ্বর সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, ভাববাদের এই তত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর মতে সবকিছুর মূলে আছে 'চী' বা বস্তুগত সত্তা। 'চী'র সম্মেলনে সমস্ত অস্তিত্বের সৃষ্টি এবং চী'র বিয়োজনে সব সৃষ্টির ধ্বংস। মানুষের জ্ঞানের প্রশ্নেও ওয়াং চুং ছিলেন বস্তুবাদী। অভিজ্ঞতাপূর্ব বা জন্মগত কোনো জ্ঞান মানুষের থাকে না। মানুষের জ্ঞানের সূচনা তার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে। সমাজের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না। মানুষই সমাজের চালক শক্তি। তবে মানুষের সভ্যতার উত্থান পতন আছে। সভ্যতা বৃত্তাকারে অগ্রসর হয়। একটা সভ্যতার উদ্ভব, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় ঘটে। এই বৃত্তের পর আবার আর এক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে ; সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পৌনঃপুনিকভাবে সভ্যতার এই বৃত্তি-পরিক্রম চলতে থাকে।

War : যুদ্ধ

যুদ্ধ বলতে দেশে দেশে কিংবা জাতিতে জাতিতে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী জীবন ও ধনসম্পদ নাশকারী সংঘর্ষ বুঝায়। যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতম ঘটনা। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, গোত্রে গোত্রে বিভাগ এবং পরবর্তীকালে দাস-প্রভুর ভিত্তিতে শ্রেণীসমাজে বিভক্ত হওয়া থেকে অদ্যাবধি মানুষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যুদ্ধের এই ইতিহাস থেকে অনেক ভাববাদী দার্শনিক যুদ্ধকে মানুষের স্বভাবেরই প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যা দ্বারা যুদ্ধকে যুক্তিসঙ্গত বলেছেন। আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার জঙ্গী দার্শনিকগণ যুদ্ধকে মানুষের মধ্যে যোগ্যতম জাতির বেঁচে থাকার স্বাভাবিক উপায় হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদ যুদ্ধকে অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত বলে ব্যাখ্যা করে। মার্কসবাদের মতে যুদ্ধের কারণ মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি নয় বা যোগ্যজনের বেঁচে থাকার ইচ্ছা নয়। যুদ্ধের কারণ হিসাবে এক জাতির হাতে অপর জাতির নির্যাতন ও দাসত্ব। দাস কিংবা সামন্তবাদী যুগে সম্রাটগণ যে যুদ্ধাভিযানে বের হতো এবং দুর্বল দেশ বা জাতিকে ধ্বংস করে তাদেরকে দাসে পরিণত করত তার সঙ্গে সেই সময়কার অর্থনীতি সম্পর্কিত ছিল। প্রভুশ্রেণী নিজেদের প্রতাপ, শাসন ও শোষণ কায়েম রাখা এবং বৃদ্ধি করার জন্য যুদ্ধ শুরু করত। যুদ্ধের এই চরিত্র পুঁজিবাদী সমাজে চরম আকার ধারণ করে বিশ্বযুদ্ধের আকার এবং বিশ্বসভ্যতা ধ্বংসের আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে আর্থনীতিকভাবে মানুষের উপর শোষণ লোপ পাওয়ার ফলে যুদ্ধের মূল কারণও দূরীভূত হবে। পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়া থাকার সময়ে যুদ্ধ

শুরু করা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার শক্তিশালীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার ছিল। প্রয়োজনবোধে যে-কোনো ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা দুর্বল দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইউরোপ-এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়াতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে ধ্বংস করতে না পারায় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বর্তমানকালে শান্তির শক্তি যেমন দুর্বল নয় তেমনি বিশ্বে সে সহযোগী শক্তিবিচ্ছিন্নও নয়। মুক্তিকামী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীনভাবে উন্নয়নকামী দেশসমূহ শান্তির সহযোগী শক্তি। ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা তার সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধ বাধাবার পরিকল্পনায় যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে আজ আর সুনিশ্চিত নয়। এ কারণে মারণাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বযুদ্ধ আজ যে-কোনো মুহূর্তের আশঙ্কা বলে অনেকে মনে করেন না। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যেমন শক্তিশালী, শান্তির শক্তিও তেমন শক্তিশালী। এই শক্তির সমতা যুদ্ধ বাধার একটা প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ করছে। শান্তি-তত্ত্বের মূল যুক্তি হচ্ছে কেবল যে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আজ শক্তির ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে তাই নয়। মারণাস্ত্রের ভারসাম্য উভয়পক্ষ বজায় রাখবে এবং সেখানে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা না যেতে পারে। কিন্তু অর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ১৯১৭ সাল থেকে তার একচ্ছত্র প্রভুত্ব হারাতে শুরু করেছে। অর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় দুই ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য নেই। এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বর্তমান যুগের প্রধান অর্থনীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আকর্ষণ সর্বহারা শ্রেণীর পরিধি অতিক্রম করে মুক্তিকামী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত জাতির উন্নয়নের একমাত্র পথ বলে বাস্তবক্ষেত্রে স্বীকৃত হচ্ছে। ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকার ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক দেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুঁজিবাদ আজ তাই কেবল জাতীয় ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বক্ষেত্রে সংকটগ্রস্ত এবং পশ্চাদগামী শক্তি। তাই দুটি সমাজ ব্যবস্থার সহ-অবস্থানের পরিণাম পুঁজিবাদের জন্য আশাপ্রদ নয়। এই সহ-অবস্থানের পরিণামে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ পর্যুদস্ত হতে বাধ্য। এবং যেহেতু পুঁজিবাদ আজ আর নিজেকে যুদ্ধ শুরু করার নিয়ামক শক্তি মনে করলেও যুদ্ধ শেষ করার নিয়ামক শক্তি বলে ভাবতে পারছে না সে কারণে সহ-অবস্থানের নীতি যুদ্ধের আশঙ্কাকে বৃদ্ধি না করে হ্রাস করতে থাকবে। অবশ্য এ নীতিতে সীমাবদ্ধ আকারে কোথাও যুদ্ধ চলবে না এবং মুক্তিকামী জাতি সশস্ত্র সংগ্রামে রত হতে পারবে না অথবা সাম্রাজ্যবাদ কোনো জাতিকে আক্রমণ করতে পারবে না এমন কথা বুঝায় না। কিন্তু শান্তিকামী রাষ্ট্র এবং তার অনুসারী রাজনীতিক ও চিন্তাবিদদের মতে আজকের যুগে যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা আবশ্যক। সীমাবদ্ধ যুদ্ধের মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু আজকের যুগে বিশ্বযুদ্ধের বিশ্ব ধ্বংস ব্যতীত অপর কোনো মীমাংসা নেই। এবং সীমাবদ্ধ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কোথাও অবিমিশ্র বিজয়লাভ করতে সক্ষম হয় নি। আলজেরিয়া, মিশর, বাংলাদেশ এবং ভিয়েৎনামের যুদ্ধের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এ সত্যের প্রমাণ মিলবে। সীমাবদ্ধ যুদ্ধেও মুক্তিকামী জাতির হাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাজয়ই একাধিক পরিমাণে নিশ্চিত হয়ে উঠছে।

Weber, Max : ম্যাকস্ ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০ খ্রি.)

বিখ্যাত জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ। ম্যাকস ওয়বারের মতে সামাজিক অর্থনৈতিক কোনো বিষয়ের প্রকৃতি তার বাস্তব অস্তিত্ব দ্বারা যত নির্ধারিত হয়, তার অধিক নির্ধারিত হয় সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত তথা বিশ্বাস অবিশ্বাস দ্বারা। তাঁর মতে সমাজবিজ্ঞান সমষ্টিকে নয়, সমাজবিজ্ঞান বিচার করে ব্যষ্টি তথা ব্যক্তিকে। আমরা কোনো বিশেষ কিংবা ব্যক্তিকে বিচার করি একটা আদর্শ রূপের ভিত্তিতে বা 'আইডিয়াল টাইপের' পরিমাণে। আইডিয়াল টাইপের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তথাপি 'আইডিয়াল টাইপের' প্রয়োজনীয়তা এবং ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ এই আদর্শ রূপ হচ্ছে যে-কোনো বিশেষ অস্তিত্বের পরিমাপক। আদর্শ রূপের এরূপ ব্যাখ্যা সহজেই ম্যাকস ওয়েবারকে ভাববাদী—বিশেষ করে প্লেটো এবং কাণ্টীয় ভাববাদী দর্শনের অন্তর্গত করে। ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের দর্শন সামাজিক অর্থনৈতিক প্রশ্নে মার্কসীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের বিরোধী।

Whitehead, Alfred North : আলফ্রেড হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭ খ্রি.)

হোয়াইটহেড ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, গণিতশাস্ত্রবিদ এবং যুক্তিবিদ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি আঙ্কিক যুক্তিশাস্ত্রের উপর তিনখণ্ড-বিশিষ্ট 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' নামে বিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। জগতের ব্যাখ্যায় তিনি বস্তুবাদ এবং ভাববাদের একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন। সমাজ বিকাশের ব্যাখ্যায় হোয়াইটহেড ভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিজ্ঞানের শক্তিতে সমৃদ্ধ ব্যক্তির ভূমিকা চরমে নিয়ে যান। তাঁর কাছে এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইতিহাসের নিয়ন্তা। হোয়াইটহেডের অপর মৌলিক গ্রন্থের নাম 'প্রসেস এ্যাণ্ড রিয়ালিটি'। এর প্রকাশকাল ১৯২৯ সাল।

Wundt, Wihlem Max : ভুণ্ড (১৮৩২-১৯২০ খ্রি.)

জার্মানির মনোবিজ্ঞানী, শারীরবিদ এবং ভাববাদী দার্শনিক উইলহেম ভুণ্ড লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ভুণ্ডের খ্যাতি প্রধানত এক্সপেরিমেন্টাল বা প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। ভুণ্ড তাঁর মনোবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনা করেন শরীর-মন সমান্তরাল, এই তত্ত্বের ভিত্তিতে। ১৮৭৯ সালে লাইপজিগে তিনি প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণার স্থাপন করেন। তাঁর অনুভূতির ত্রিমাত্রিকতার তত্ত্বটিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে অনুভূতিকে তিন দিক থেকে নির্দিষ্ট করা যায়। একদিক হচ্ছে অনুভূতির আনন্দ-বেদনার দিক, দ্বিতীয় দিক হচ্ছে তার উত্তেজিত অনুত্তেজিত দিক। এবং তৃতীয় দিক হচ্ছে আশা বা উন্মুখতা—অবসাদের দিক। দর্শনের ক্ষেত্রে ভুণ্ড স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল এবং অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তার সমন্বয়ে সাধনের চেষ্টা করেন। জ্ঞানের প্রক্রিয়াকে ভুণ্ড তিন স্তরে ভাগ করেন : প্রত্যক্ষ অবলোকন, যৌক্তিক বোধ এবং দার্শনিক সমন্বয়।

Xenophanes : জেনোফেনস (আ. ৬-৫ শতক খ্রি. পূ.)

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক জেনোফেনস ইলিয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। জেনোফেনসকে কোলোফনের জেনোফনস বলা হয়। তিনি কবি এবং ব্যঙ্গ রচনাকারীও ছিলেন। মানুষ দেবতাদের নিজেদের মতোই কল্পনা করে। সেই প্রাচীন কালেও করত। তখনো এক ঈশ্বরের কল্পনা আসে নি। মানুষের সমাজের মতো দেবতাদেরও সমাজ ছিল। তাদের জন্ম ছিল। প্রেম, ভালবাসা, বিবাহ, হিংসাদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ছিল। দেবতাদের মধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি দেবতা ছিল। তাদের ক্ষমতারও তারতম্য ছিল। অলিম্পিয়া পাহাড়ে তাদের বাস ছিল। সবাই দেবতাদের বিশ্বাস করত। প্রাচীনকালের মানুষ এমনি করে দেবতাদের ভাবত। কিন্তু জেনোফেনস এ রকম ভাবলেন না। তিনি প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম দার্শনিক যিনি বললেন, দেবতারা মানুষের কল্পনা। মানুষের কল্পনা বলেই দেবতারা মানুষের মতো। পশুদের ভাষা আমরা বুঝি নে। কিন্তু পশুরা যদি দেবতা মানতো তা হলে পশুরাও নিজেদের দেবতাদের পশু বলেই কল্পনা করত। দেবতাকে নিজরূপে কল্পনা করার নাম হচ্ছে মানবীয়তাবাদ। অপর কিছুতে মানব প্রকৃতি আরোপ করা। জেনোফেনস ধর্মের ক্ষেত্রে এই মানবীয়তাবাদের প্রথম সমালোচক। জেনোফেনস সক্রেটিসের পূর্ববর্তী অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় ছিলেন প্রকৃতিবাদী। তিনি বস্তুর মূলে ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি বস্তুকে স্বীকার করে আবার চিন্তার মাধ্যমে সব সত্তার মূলে এক পরমসত্তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁর পরমসত্তা অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনীয়। বহুর স্বীকৃতি থেকে একে উত্তরণের একটা তাৎপর্য ছিল। জেনোফেনস অবশ্য বহু এবং একের পারস্পরিক রূপান্তরের সমস্যাটির কোনো সমাধান দেন নি, কিন্তু বহু এবং একের স্বীকৃতি পরবর্তীকালে বহু এবং একের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের তত্ত্বের পথ উন্মুক্ত করেছিল।

Y

Yang Chu : ইয়াং চু (আ. ৩৯৫-৩৩৫ খ্রি. পূ.)

ইয়াং চু ছিলেন প্রাচীন চীনের একজন বস্তুবাদী দার্শনিক। তাঁর বস্তুবাদ অবশ্য আদি কালের স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল। ইয়াং চু ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অমরতার তত্ত্বকেও তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ইয়াং চু বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতিজগতে যা কিছু ঘটছে সবই প্রকৃতির প্রয়োজনের বিধানে সংঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতির প্রয়োজনের বিধান তাঁর কাছে ভবিতব্য বলে বোধ হতো। ইয়াং চুর মতে মৃত্যু এবং ধ্বংস জন্মের অনিবার্য পরিণাম। যা কিছু জন্মাবে তার অবশ্যই মৃত্যু এবং ধ্বংস থাকবে। কাজেই অমরতা অকল্পনীয়। জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইয়াং চু'র নীতি ছিল, ব্যক্তি তার কামনা, বাসনা, ইচ্ছার পরিপূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন-যাপন করে। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সেই অজ্ঞেয় কিংবা অস্তিত্বহীন ভাগ্যের চিন্তায় বিমর্ষ না হয়ে বর্তমানের জীবনকে ভোগ করাই হবে ব্যক্তির অনুসরণীয় নীতি। প্রাচীন চীনের প্রতিষ্ঠিত কনফুসীয় সমাজনীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইয়াং চুর এই ব্যক্তিবাদের তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছিল।

Yin and Yang : ইন ও ইয়াং

প্রাচীন চৈনিক দর্শনের দুটি মৌলিক ভাব ছিল ইন এবং ইয়াং। ইন এবং ইয়াং বলতে গোড়াতে আলো-অন্ধকার, স্ত্রী-পুরুষ, নরম-শক্ত প্রকৃতির এরূপ পরস্পরবিরোধী চরিত্রকে বুঝাত। পরবর্তীকালে ইন ইয়াং দ্বারা কেবল পরস্পরবিরোধী চরিত্র নয় ; পরস্পরবিরোধী শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ককেও বুঝানো হতো। এই নীতির ভিত্তিতে রাতদিন, চন্দ্র-সূর্য, স্বর্গ-মর্ত্য, অস্তি-নাস্তি, তাপ-শৈত্যকে পরস্পর সম্পর্কিত এবং ক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে চিন্তা করা হতো। কালক্রমে ইন-ইয়াং সূত্র চীনের দর্শনের এবং বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূল দ্বান্দ্বিক সূত্র হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে।

Yoga : যোগ

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ধারার অন্যতম ধারার নাম ছিল যোগ। যোগদর্শনের মূল কথা ছিল জন্ম, মৃত্যু এবং জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জনের সাধনা। এই মুক্তির মাধ্যম ছিল দুটি : বৈরাগ্য এবং যোগ বা ধ্যান। জগৎ এবং জীবনকে মায়া বলে বিবেচনা করলেই মানুষের মনে জগৎ সম্পর্কে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হবে আর যোগের মাধ্যমেই ব্যক্তি ভগবান বা চরম সত্তাকে জ্ঞাত হতে পারবে। প্রাচীন শাস্ত্রকার পতঞ্জলি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে যোগ প্রক্রিয়াসমূহকে 'যোগ সূত্রের' মধ্যে গ্রথিত করেছেন বলে মনে

করা হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই মাত্র ব্যক্তি যোগ সাধনে সক্ষম, যোগসূত্রের এটাই মূল কথা।

Young Hegelians : যুব-হেগেলবাদী

হেগেলীয় দর্শনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ১৮৩০ থেকে ৪০ এর দশকে জার্মানিতে দর্শনের যে ধারা বিকাশলাভ করে তাকে যুব-হেগেলবাদ কিংবা বামপন্থী হেগেলবাদ বলা হতো। যুব-হেগেলবাদীগণের খ্রিষ্টধর্মের সমালোচনা এবং ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। ডেভিড স্ট্রস, ব্রুনো বায়ার প্রমুখ যুব-হেগেলবাদীগণ খ্রিষ্ট ধর্ম এবং যিশু খ্রিষ্টের জন্মের অলৌকিক কাহিনীকে উপকথা বলে ব্যাখ্যা করে যিশুকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে আখ্যাত করেন। যিশুর বাণীর ঐশ্বরিক ভিত্তি বা তার সত্যতাকে সমালোচনা করে ব্রুনো বায়ার বলেন যে, এ সমস্ত আপ্তবাক্য সমাজের উপর চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিবিশেষ কোনো একদিন কল্পনা করেছিল কিংবা রচনা করেছিল। ধর্মের এই ব্যাখ্যার একটি প্রগতিশীল দিক এই ছিল যে, যুব-হেগেলবাদীগণ এভাবে সমাজ চেতনার মূল উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেন কীভাবে একটা ভিত্তিহীন বিশ্বাসও একটা সমাজদেহকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে গ্রাস করতে পারে। মার্কস এবং এঙ্গেল তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার গোড়ার দিকে যুব-হেগেলীয় চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুব-হেগেলবাদীগণ ধর্ম এবং সমাজের বিচার বিশ্লেষণে আগ্রহ দেখালেও বুর্জোয়া সমাজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ইতিহাসের গতি এবং তার মূলশক্তিকে তাঁরা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। ফলে যুব-হেগেলবাদের পরবর্তী বিকাশ কারোর মধ্যে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার সৃষ্টি করে এবং যুব-হেগেলবাদী ধারাকে সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে বিপ্লবী বাকসর্বস্ব অবাস্তব চিন্তাতে পর্যবসিত করে। মার্কস এবং এঙ্গেলস যুব-হেগেলবাদীদের এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন এবং সমাজবিকাশের বাস্তব শক্তিকে উন্মোচিত করে সমাজ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহায়ক শক্তির কাজ করেন।

Z

Zeno of Citium : সাইটিয়ামের জেনো (আ. ৩৩৬-২৬৪ খ্রি. পূ.)

সাইটিয়ামের জেনো স্টয়সিজম বা নিস্পৃহবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপের সাইটিয়াম শহরে জেনোর জন্ম। খ্রি. পূ. ৩০০ অব্দে জেনো এথেন্স নগরীতে তাঁর নিজের নিস্পৃহবাদের দর্শনাগার প্রতিষ্ঠা করেন। জেনোর রচনার খুব অল্পই পাওয়া গেছে। তিনি দর্শনকে যুক্তি, পদার্থ এবং নীতি এই তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। জেনো 'স্টোয়া' অর্থাৎ চিত্রিত বারান্দা-গৃহ থেকে তাঁর দর্শন প্রচার করতেন বলে তাঁর দর্শন স্টয়সিজম এবং তাঁর অনুসারীদের স্টয়েক বলে অভিহিত করা হয়।

Zeno of Elea : ইলিয়ার জেনো (আ. ৪৯০-৪৩০ খ্রি. পূ.)

ইলিয়ার জেনো প্রাচীন গ্রিসের একজন দার্শনিক ছিলেন। বাদ-প্রতিবাদমূলক আলোচনার রীতি তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। জেনো বাস্তব অনেক সমস্যাকে যুক্তির ধাঁধাঁর মাধ্যমে পেশ করেছেন। জেনোর একটি ধাঁধা 'আকিলিস এবং কচ্ছপের ধাঁধা' নামে খ্যাত। জেনো বললেন : ইলিয়ডের বিখ্যাত আকিলিস যদি একটি কচ্ছপের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামেন, আর যদি কচ্ছপটি একটু আগে দৌড়ানো আরম্ভ করতে পারে, তবে কিছুতেই তিনি কচ্ছপটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ যে স্থানটির ওপর দৌড়ানো হবে, সে স্থানটিকে অসংখ্য বিন্দুতে ভাগ করা যাক। এবার দেখা যাক আকিলিস কেমন করে কচ্ছপের নাগাল পান! কচ্ছপ একটু আগে যাত্রা করেছে। তাই আকিলিস যখন শুরু করলেন 'ক' বিন্দু থেকে, কচ্ছপ তখন 'খ' বিন্দুতে। প্রত্যেকটা বিন্দু অতিক্রম করেই তো আকিলিসকে অগ্রসর হতে হবে। আকিলিস তাই যখন 'খ' বিন্দুতে, কচ্ছপ তখন 'গ' বিন্দুতে। আকিলিস যখন 'গ' বিন্দুতে, কচ্ছপ তখন 'ঘ' বিন্দুতে। হয় আকিলিস প্রত্যেকটি বিন্দুতে পৌঁছে পৌঁছে অগ্রসর হবেন, নয় তিনি বিন্দুকে এড়িয়ে অগ্রসর হবেন। কোনো বিন্দুকে এড়িয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। বিন্দু হচ্ছে স্থান। স্থানকে এড়িয়ে যাওয়া বস্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর যদি তিনি প্রতি বিন্দু পৌঁছে অগ্রসর হন তা হলে আকিলিস এবং কচ্ছপের মধ্যকার একটি বিন্দুর ব্যবধান অনতিক্রমনীয়। জেনোর গতির ধাঁধাও অনুরূপ। একটি তীরকে ছুঁড়ে দিয়ে বলা হলো সে এক স্থান থেকে পৌঁছে গেল আর এক স্থানে। কিন্তু কেমন করে সে পৌঁছবে? যে-কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে যখন তীরটির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হবে তখন তার অবস্থান অবশ্যই কোনো একটি বিন্দুতে দেখা যাবে। একটি বিন্দুতে যদি সে অবস্থিত হয় তা হলে অবশ্যই সে অপর বিন্দুতে অবস্থিত নয়। অথচ আমরা বলি তীরটি এইমাত্র এখানে ছিল এবং এইমাত্র সে ওখানে চলে গেছে। অর্থাৎ একই মুহূর্তে তীরটি দুটি বিন্দুতে বা স্থানে অবস্থান করছে। কিন্তু যুক্তিগতভাবে একই বস্তুর একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান সম্ভব নয়। অর্থাৎ গতি অসম্ভব।

জেনো অবশ্য গতির সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, কোনো সমাধান দেন নি। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন উত্থাপনও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই প্রশ্নের মাধ্যমেই গতি এবং স্থিতির দ্বান্দ্বিকতা এবং ঐক্যের তত্ত্বের সূচনা ঘটেছিল।

Zoroastrianism : জোরোয়াস্ত্রবাদ

প্রাচীন পারস্যের দ্বৈতবোধক ধর্ম ছিল জোরোয়াস্ত্রবাদ। উপকাহিনীর প্রেরিত পুরুষ জোরোয়াস্ত্র এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্রি. পূ. ৬০০ শতকে। জোরোয়াস্ত্রবাদের মূলতত্ত্ব হচ্ছে সৎ এবং অসৎ এর দ্বন্দ্ব। সৎ এর দেবতা হচ্ছে আহুরুমাজদা আর অসৎ এর দেবতা আহরিমান। সৎ হচ্ছে আলো, অগ্নি ; অসৎ হচ্ছে অন্ধকার। সৎ এবং অসৎ এর এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন। কিন্তু পরিণামে সৎ এরই বিজয় ঘটবে। জোরোয়াস্ত্রবাদের প্রভাব পরবর্তীকালের ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ভারতের পারসি সম্প্রদায় জোরোয়াস্ত্রবাদের আধুনিক অনুসারী। পারসি সম্প্রদায় অবশ্য প্রাচীন দ্বৈতবাদের সঙ্গে আবার একেশ্বরবাদকেও স্বীকার করেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা (বা জেন্দআবেস্তা)।

'দর্শনকোষ' রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিশ্বকোষ এবং গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. Dictionary of Philosophy. Published by Progress Publishers, Moscow 1967, 1984

২. Encyclopaedia Britannica

৩. Encyclopaedia of Philosophy

৪. Encyclopaedia Americana : 1963

৫. Chamber's Encyclopaedia : 1967

৬. Encyclopaedia of Religion and Ethics 1959

৭. History of Western Philosophy : Bertrand Russell

৮. Everyman's Encyclopaedia

৯. বিশ্বকোষ : নগেন্দ্রনাথ বসু

১০. ভারত কোষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

বিষয়সূচি : বাংলা বর্ণক্রম

বিষয়সূচি : ইংরেজি বর্ণক্রম